অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

সম্পাদনা

ধীমান দাশগুপ্ত

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভূমিকা

'সত্যাসত্য' ছয় খণ্ডে সমাপ্ত করতে বারো বছর লেগে যায়। তার পরে আর কোনো উপন্যাস লেখার মতো দম ছিল না। গুটি কয়েক ছোট গল্প ছাড়া আর কিছুই আমার হাত দিয়ে বেরোয় না। সেই হাতও সরকারি কাজের চাপে হারিয়ে যায়। সরকারি চাকরি না ছেড়ে উপায় ছিল না।

তখন হাত ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রথমে লিখি 'না' বলে একটি ছোট উপন্যাস। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস নয়, চারটি গল্পের এক সূত্রে গাঁথা একটি মালা। বিষয়গত ঐক্য ছিল। বিদ্রোহিণী নারী।

একটু দম সঞ্চয় করার পর লিখি 'কন্যা'। সেটিও সত্যিকার উপন্যাস নয়, আবারও চারটি গল্পের যোগফল। কিন্তু বিষয় একটাই। 'চার ইয়ারি কথা'-র সেই Eternal Feminine. এ বই পড়ে দিলীপদা (দিলীপকুমার রায়) লেখেন, 'এটি তোমার চার ইয়ারি কথা।'

এবার মনে হলো হাত তৈরি হয়েছে। বড় উপন্যাস লিখতে পারি। শুরু করে দিলুম 'রত্ন ও শ্রীমতী'। দুই খণ্ড লেখার পর ভিতরে ও বাইরে পেলুম পর্বতপ্রমাণ বাধা। লেখা বন্ধ রাখতে হলো। মনে হলো বরাবরের মতো। হাত খালি রাখলে হাত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই লেখা হলো 'সুখ' বলে একটি ছোট উপন্যাস।

তার পর উপন্যাসের পর উপন্যাসের তাগাদা আসতে লাগল। আমিও 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র তৃতীয় খণ্ডের জন্যে বসে থাকতে পারিনে। লিখলুম 'বিশল্যকরণী'। এটির পরিকল্পিত নাম ছিল 'রত্ন ও বিয়াত্রিস'। নাম দুটি পালটে দিতে হলো। কেননা রত্নের জীবনের এই অধ্যায়টি শ্রীমতীর সঙ্গে তার প্রণয়ের পরবর্তী। পরবর্তী-কে পূর্ববর্তী করলে 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র তৃতীয় ভাগ মাটি হত।

একই ব্যাপার ঘটে 'তৃষ্ণার জল' উপন্যাসের বেলা। সেটির পরিকল্পিত নাম ছিল 'রত্ন ও স্বাতী'। সেটি রচনাবলীর এই খণ্ডে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। দাম বেড়ে যাবে বলে পরের খণ্ডের জন্য তুলে রাখতে হলো। তারও নাম পালটাতে হয়েছে।

অতঃপর 'রত্ন ও শ্রীমতী'-র তৃতীয় খণ্ড লিখে আমি তেরো বছর বাদে খালাস। সমগ্র 'রত্ন ও শ্রীমতী' আগেই রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে গেছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রাসঙ্গিক ৭

উপন্যাস

না ২১

কন্যা ১২১

সুখ ২২১

বিশল্যকরণী ৩৩৯

পরিশিষ্ট ৪৪৭

প্রাসঙ্গিক

রচনাবলীর ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হল অন্নদাশঙ্করের ছটি ছোট উপন্যাস—না (১৯৫১), কন্যা (৫৩), সুখ (৬১), বিশল্যকরণী (৬৭), তৃষ্ণার জল (৬৯) ও রাজ-অতিথি (৭৮)। লেখকের বাকি তিনটি ছোট উপন্যাস—আগুন নিয়ে খেলা, অসমাপিকা ও পুতুল নিয়ে খেলা রচনাবলীতে ইতোপূর্বেই স্থান পেয়েছে। আগেই বলেছি, আধুনিক মনের স্বাভাবিক ভাষা গদ্য। আধুনিক কথাসাহিত্য তাই পদ্যে লিখিত হয়ে মহাকাব্য নাম ধারণ না করে, গদ্যে লিখিত হয়ে উপন্যাস নাম ধারণ করে। উপন্যাসই হল আধুনিক কালের মহাকাব্য—গদ্যকাব্য।

অন্নদাশঙ্করের শিল্পমেজাজ মুখ্যত এই গদ্যকাব্যের, ঔপন্যাসিকের, বড় মাপের উপন্যাসের, মনোলিথিক স্ট্রাকচারের। এটা স্বাভাবিক যে তিনি ছয় খণ্ডে উপন্যাস লিখবেন (সত্যাসত্য), তারপর তিন খণ্ডে (রত্ন ও শ্রীমতী), তারও পরে চার খণ্ডে (ক্রান্তদর্শী)। এইসব উপন্যাসমালার ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে নানা সময়ে ছোট কিছু উপন্যাসও লিখতে হয়েছে। আয়তন বৃহৎ হলেই যেমন মহাকাব্য বা এপিক উপন্যাস হয় না তেমনি আকারে ছোট হলেই যে ছোটমাপের উপন্যাস হবে তা নয়। লেখকের ভাষায় 'সীমার ভিতর পুরতে জানাই আর্টের বিষয়।' তাঁর একাধিক ছোটগল্প যেমন আসলে বাজাকার উপন্যাস, এইসব ছোট উপন্যাসের অনেকগুলিই তেমনি বড় মাপের থিমকে ছোট উপন্যাসের পরিসরে সাজিয়ে লেখা। এদের অনেকগুলিই কন্‌সেপচুয়াল নভেল তথা রূপক।

একদিক থেকে দেখলে এই উপন্যাসগুলি সবই প্রেমের উপন্যাস, নানান ধরনের প্রেমের অন্বেষণের কাহিনী, কাহিনীতে রয়েছে নানান পদ্ধতিতে প্রেমান্বেষণের কথা। শাশ্বত প্রেমান্বেষণের কাহিনী রত্ন ও শ্রীমতী লেখার আগে লেখককে না ও কন্যা লিখতে হয়েছিল, যেমন রত্ন ও শ্রীমতীর পরবর্তী পর্যায়ের দুটি উপন্যাস বিশল্যকরণী ও তৃষ্ণার জল। এর সঙ্গে আছে মধ্যবর্তী সুখ ও সবশেষে রাজঅতিথি। বিবর্তন একটানা নয়, ছাড়া ছাড়া; কিন্তু মোটেই খাপছাড়া নয়, খুবই সুচিন্তিত। অন্তরঙ্গের দিক থেকে বইগুলি দুরূহ বই। বহিরঙ্গেও তেমন সহজ নয়। সহজ করে লিখলেও সহজপাঠ্য ও সহজপাচ্য নয়। উচ্চতর ভাবের কথা। বইগুলো উপভোগ করবে তারা যারা পাঠক হিশেবে অগ্রসর, সঠিক বুঝবে তারাই যারা জীবনে কিছু-না-কিছু পেয়েছে—তা সে সত্যিকারের সুখ দুঃখ যাই হোক।

যদিও ঔপন্যাসিক শব্দটার চেয়ে কথক শব্দটিতে বিষ্ণুর সায় ছিল বেশি, তবু এই সব প্রেমের উপন্যাসে অন্নদাশঙ্কর যতটা না কথক তার চেয়ে বেশি তাত্ত্বিক। এমন এক তাত্ত্বিক

কথকের সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ ও কবির সঙ্গে যার তলে তলে যোগ রয়েছে। কাব্য প্রধানত আত্মমুখ। কিন্তু নাটক উপন্যাস বিষয়মুখ। অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার কাছে বিষয় বলতে নারীচরিত্র তথা পুরুষভাগ্য। লেখকের মতে অধিকাংশের রুচিরোচন বিষয়ের সীমা মেনে নিয়ে সেই সীমার মধ্যে অল্পসংখ্যকের রুচির জন্যে একটু জায়গা করে নেওয়া হচ্ছে সার্থক শিল্পীর কাজ। এই উপন্যাসগুলি বিষয়বস্তু ও অভিগমনের দিক থেকে এই ধারারই অনুসারী।

লেখক বলেছিলেন যদি মানবহৃদয়ের ঠিক সুরটি বাজে তা হলে বুর্জোয়ার জন্যে বুর্জোয়ার বিষয়ে বুর্জোয়ার লেখা কাহিনী বলে ভবিষ্যতে না-মঞ্জুর হবে না। ছটি উপন্যাসকেই শাশ্বত ও সার্বদেশিক মানুষের কাহিনী করে তোলার জন্য অন্নদাশঙ্কর আন্তরিক চেষ্টা করেছেন।

লেখক আরও বলেছিলেন নভেল কথাটার অর্থ নবীন বা অভিনব। নভেলের কাছে লোকের প্রত্যাশা অভিনবত্ব। লোকে চায় নিত্য নতুন আখ্যান। আখ্যান যদি নিত্য নতুন না হয় তবে ব্যাখ্যান হবে নিত্য নতুন। ছটি উপন্যাসেই অন্নদাশঙ্কর নতুন আখ্যান বানাতে চেয়েছেন, আর আখ্যান যেখানে তেমন নতুন হয়নি সেখানে নতুন ভংগিতে বলতে, নতুন আঙ্গিকে লিখতে, নতুন ছদ্মবেশ পরাতে ও চরিত্রের মধ্যে নূতনত্ব আনতে চেয়েছেন।

ঔপন্যাসিকের জন্য ও উপন্যাস-রচনার জন্য লেখক কতকগুলি শর্ত লিপিবদ্ধ করে ছিলেন। প্রথমত উপন্যাসের একটা দীর্ঘস্থায়ী সাধনা আছে। শুধু জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপন্যাস হয় না, লিখনের অভিজ্ঞতাও চাই। উপন্যাস এক প্রকার গঠনকর্ম। ধৈর্য ধরে দিনের পর দিন উপন্যাস গড়তে হয়। দ্বিতীয়ত কবিতার সঙ্গে উপন্যাসের বিরাট পার্থক্য এই যে কবিতা লিখতে হয় অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে। উপন্যাসের বেলা সে নিয়ম খাটে না। কালের ব্যবধান উপন্যাসের ক্ষেত্রে অপরিহার্য প্রয়োজন। উপন্যাসের বেলা খরগোশদের জিৎ নয়, কচ্ছপের জিৎ। তৃতীয়ত উপন্যাসের চরিত্রসংখ্যা অনেক। শুধু ঘটনার অভিজ্ঞতা বা পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা নিয়ে ঔপন্যাসিকের চলে না, মানব চরিত্রের অভিজ্ঞতাও চাই। যার জন্য দরকার অন্তর্দৃষ্টি ও বহুদর্শিতা। কল্পনা দিয়ে বহুদর্শিতার অভাব-পূরণ হয় না। আর চতুর্থত উপন্যাসের জীবন লেখকের ব্যক্তিগত জীবন বা তার পরিপূরণ বা তার ক্ষতিপূরণ বা তার সম্প্রসারণ নয়। ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে যেতে বা উর্ধ্বে উঠতে না জানলে উপন্যাস লেখা চলে না। এই নিয়ম মেনে আত্মপরীক্ষার ফলস্বরূপ অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসগুলি রচিত।

অ্যাকশনের পরিণতির জন্য, কার্যকারণ সম্পর্কের প্রতিপাদনের জন্য, চরিত্রের বিকাশের জন্য, নিয়তির অনিবার্যতার জন্য কোনো নাটকে যত সময় অতিবাহিত হয়

কোনো উপন্যাসে হয় তার চেয়ে সাধারণত বেশি, অনেক বেশি। লেখকের মতে সত্যিকারের উপন্যাস হবে অন্তত এক হাজার পৃষ্ঠা। ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে নয়, নিজের অন্তর্নিহিত নিয়মে। ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসগুলি দেড়শো দুশো আড়াইশো তিনশো পৃষ্ঠার। কিন্তু বিষয়ের গুণে ও রচনার গুণে অনেকগুলি উপন্যাসই তার আপনার জীবন, তার নায়ক নায়িকার জীবন, নায়ক নায়িকার সঙ্গে যুক্ত বহু মানব মানবীর জীবন, জীবনের আভ্যন্তরীণ নিয়ম বা নিয়তি, জীবনের বৃহত্তম পটভূমি ও জাগতিক রিয়্যালিটি ছুঁয়ে ছাড়িয়ে চলে গেছে—কখনো কখনো উপন্যাসের সীমান্ত গিয়ে ঠেকেছে দর্শনের সীমানায়।

আগেই বলেছি এই ছটি উপন্যাসই মুখ্যত প্রেমের উপন্যাস, এদের মূল বিষয়বস্তু প্রেম। লেখক অল্পবয়স থেকেই একটা জিনিসকে খুব বড় বলে মেনেছেন, তা হচ্ছে নরনারীর প্রেম—একটি মানব আর একটি মানবীর মধ্যে দেহে-দেহে, মনে-মনে, আত্মায়-আত্মায় মিলন। যুগে-যুগে দেশে-দেশে মানুষের প্রেম তার আত্মাকে মহৎ করেছে—এ লেখকের সুগভীর বিশ্বাস। আজ থেকে ৭২ বছর আগে লেখা তাঁর কবিতায় প্রেমের গুরুত্ব এইভাবে স্বীকৃত হয়েছে—

দুটি প্রাণে অখণ্ড প্রণয়
একটি জাগ্রত স্বপ্ন কায়মন সর্বসত্তাময়।
একখানি সম্পূর্ণ জীবন
প্রেম তার কেন্দ্র আর পরিধি যে অনন্ত ভুবন।
শেষ তার পূর্ণ পরিণতি
পবিত্র সুন্দর শিশু আরাধিত কাঙ্ক্ষিত সন্ততি।
চিরন্তন প্রণয়ের কোলে
প্রিয় হতে প্রিয়তর প্রিয়া হতে প্রিয়তরা দোলে।

অন্নদাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস অসমাপিকায় ছিল প্রেমের অন্বেষণের প্রাথমিক প্রয়াস, তা একটি সমস্যামূলক প্রেমের কাহিনী। দ্বিতীয় উপন্যাস আগুন নিয়ে খেলা হল স্বাধীন প্রেমের প্রকাশ, পাঠযোগ্যতা ও সুখপাঠ্যতার সঙ্গে সেখানে যুক্ত হয়েছিল উন্নত রচনাশৈলী ও সম্পন্ন চিন্তাভাবনা। পরবর্তী প্রেমের উপন্যাস পুতুল নিয়ে খেলা হল প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্কের প্রকাশ। আগুন যদি হয় স্বাধীন প্রেম, পুতুল তাহলে হল বাঙালী তরুণীবৃন্দ, ফলে পুতুল নিয়ে খেলায় পাঠক প্রেমিকার বিভিন্ন টাইপ দেখতে পান। লেখক অবশ্য সেটা দেখান সিরিও-কমিক ভঙ্গিতে। আর রত্ন ও শ্রীমতীতে আদর্শ প্রেমের সমুন্নত প্রকাশ, তা শাশ্বত প্রেমের অন্বেষণের এক দার্শনিক ভাষ্য। এবার এই গ্রন্থের উপন্যাসগুলির দিকে পৃথক-পৃথক দৃষ্টিপাত করা যাক।

সর্বপ্রথম না। এই উপন্যাস লেখকের ট্র্যানজিশনাল এজের কাছাকাছি সময়ের লেখা।

তাঁর আসন্ন পরিবৃত্তির নানান আভাস আছে এই উপন্যাসে এবং সমসাময়িক তিনটি গল্প রূপদর্শন, নারী ও অন্তরায়। এই আভাস কন্যা উপন্যাসে এবং রত্ন ও শ্রীমতী উপন্যাসমালার স্পষ্টতর রূপ পাবে।

এই সমস্ত রচনা থেকে আমরা যে-বাণী পাই তা হল এই যে—শাশ্বত প্রেম আছে, কিন্তু তাকে পেতে হলে তার আপন গতিপথ থেকে তাকে ভ্রষ্ট করা চলবে না, নিজের গতিপথে তাকে আকর্ষণ করা চলবে না। তাকে পেতে হলে তার গতিপথেই তাকে অনুসরণ করতে হবে। অথচ নিজের গতিপথে অবিচলিত থাকতেও হবে। ক্ষুরধার পন্থা। পদস্খলন হলেই শাশ্বত প্রেমকে হারাতে হবে চিরকালের জন্য। নয়তো তাকে পাওয়া যাবে চিরকালের মতো।

বেশ বোঝা যাচ্ছে এ-সমস্ত রচনায় শুধু গল্প নয়, জীবনদৃষ্টিও উপস্থিত। লেখকের একটা নির্দিষ্ট অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি, তত্ত্ব ও প্রতীতিগত আদর্শ বা দর্শন আস্তে আস্তে প্রকাশ পাচ্ছে। যার ফলে লেখক নিছক কাহিনীকার না থেকে কথাসাহিত্যিক হয়ে উঠছেন।

তাঁর না উপন্যাস সম্পর্কেও এ-কথা অনেকটা প্রযোজ্য। তার অনেকগুলি উপন্যাসেই বস্তুর চেয়ে ভাবের প্রাধান্য বেশি। এগুলি তাত্ত্বিক উপন্যাস (বিশেষ ভাব-প্রধান বা সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রতীকী)। এগুলি বিশেষভাবে একটি যুগের কাহিনী নয়, চিরকালের উপাখ্যান। সেখানে আপাত রূপ নয়, শাশ্বত রূপের অনুসন্ধান। বস্তুগত নয়, বস্তুময় নয়, বস্তুত্ব। বিসমিল্লার মতো ধ্রুপদী সংগীত শিল্পীর শিল্পদর্শনে যেমন।

রত্ন ও শ্রীমতী লেখার আগে লেখককে যে না ও কন্যা লিখতে হয়েছিল সেই দুটি প্রায় একই ধরনের উপন্যাস। জীবনের রাজপথের নয়, আলপথের কাহিনী না-র থিম হলো সৌন্দর্যবোধ বা নারীসৌন্দর্যের অনুসন্ধান। সেদিক থেকে এই উপন্যাস লেখকের বহু-প্রতীক্ষিত 'বুক অব বিউটি'-র প্রথম খসড়া। যুগল বা সমষ্টি নয়, ব্যক্তি এখানে নায়ক। নায়ক প্রিয়দর্শন চিরন্তন নারীসৌন্দর্যের অন্বেষণে রত। প্রিয়দর্শন নিজে আবার লেখকও। এই চরিত্র কল্পনা ও নির্মাণে লেখকের বিশেষ আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে। উপন্যাসের এই সমস্ত উক্তি তার প্রমাণ—'যখন কবিতা আসে না, তখন উপন্যাস আসে, যখন উপন্যাস আসে না, তখন প্রবন্ধ আসে।' অথবা 'আমার বয়স তখন কত? বত্রিশ তেত্রিশ। কবে যৌবন যাবে তার জন্যে আমার ভাবনা ছিল না। ভাবনা শুধু কবিতার জন্যে। কবিতা ইতিমধ্যেই দুর্লভ হয়েছিল।'

এই ধরনের আত্মোক্তি ও আত্মচিন্তার জন্যই তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ হিসেবে না মূল্যবান। বলেছি উপন্যাস সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের যে ধারণা তাতে উপন্যাসে থাকবে অভিনবত্ব—নিত্য নতুন আখ্যান। আখ্যান যদি নিত্য নতুন না হয় তবে ব্যাখ্যান

হবে নিত্য নতুন। এই অভিনবত্ব ছাড়া উপন্যাসে আর থাকবে আখ্যান, চরিত্র, চরিত্রের বিকাশ ও নিয়তির জন্য অ্যাকশন বা ক্রিয়া। অ্যাকশনের পরিণতির জন্য, কার্যকারণ সম্পর্কের প্রতিপাদনের জন্য, চরিত্রের বিকাশের জন্য, নিয়তির অনিবার্যতার জন্য উপন্যাসে প্রয়োজনীয় বিস্তার বা পরিসর থাকা চাই।

এই মাপকাঠিতে না রসোত্তীর্ণ কিনা সেই প্রশ্ন উঠলে আমরা দেখি, এই উপন্যাস নাট্যাত্মক নয়, যথেষ্ট বর্ণনাত্মকও নয়, বরং ভাবাত্মকই। তাই অর্থ দেখো না, প্রয়োগ ভাখো—নব্যদর্শনের এই প্রতিজ্ঞার বিপরীত নীতিই এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে, প্রয়োগ দেখো না, অর্থ ভাখো। এমনিতে না-উপন্যাসের কাহিনীতে কল্পনার ভাগ যথেষ্ট। অথচ পাঠকের কাছে তা দূরকল্পনার মতো মনে হয় না। মনে হয় দৈনন্দিন স্তরে প্রকৃত না হলেও এক উচ্চতর স্তরে সত্য। শিল্পের স্তরে সত্য। জীবনদর্শনের স্তরে সত্য। এই বিভিন্ন স্তরে গ্রহণযোগ্যতাই উপন্যাসটির বিশেষত্ব এবং সেই কারণেই এ-উপন্যাসের আবেদন সাধারণ পাঠকের তুলনায় সিরিয়স বা দূরান্বিত পাঠকের কাছে অনেক বেশি।

লেখক একবার বলেছিলেন কোন উপন্যাস কালোত্তীর্ণ হবে কিনা তা তিনি জানেন না, শুধু তাকে রূপোত্তীর্ণ ও রসোত্তীর্ণ করার চেষ্টা করেই তিনি ক্ষান্ত। এই রূপ ও রসের মিলন ছাড়াও আরও দুটি মিলন ঘটে এই উপন্যাসে। একটি সৌন্দর্য ও প্রেমের —থিমের স্তরে, অন্যটি আসক্তি ও নিরাসক্তির—অ্যাপ্রোচের ক্ষেত্রে। না-র নায়ক প্রিয়দর্শন ও অন্নদাশঙ্কর দুজনের মধ্যেই আসক্তি ও নিরাসক্তির বিচিত্র সহাবস্থান ঘটেছে।

না ছাড়া কন্যাও রত্ন ও শ্রীমতীর পূর্ববর্তী পর্যায়ের উপন্যাস। অন্নদাশঙ্করের প্রধান থিমগুলি হল সত্যের অন্বেষণ, প্রেমের অন্বেষণ, সৌন্দর্যের অন্বেষণ, পুনর্নবীকরণ আর শাশ্বতী নারীর সাধনা। কন্যা এই শাশ্বতী নারীর অন্বেষণের কাহিনী। এই প্রসঙ্গে রত্ন ও শ্রীমতীর সঙ্গে কন্যার ভাবগত তারতম্যের কথা উঠবে। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে এ-সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—**There is a basic difference between the ruling idea of 'Kanya' and that of 'Ratna O Srimati'. The latter is a love story concerning a Free Man and a Free Woman. The former is a quest for the Eternal Feminine. Imagine her as four women or aspects—She who has great physical beauty and charm but cannot be possessed for long ; She who has spiritual and intellectual beauty shining through her face but is beyond our hero's reach ; She who is capable of rare feats of heroism or is beautiful in action but becomes commonplace if pos-**

sessed and She who is everywhere and nowhere—the Woman among Women—the womanly spirit or feminine principle—who is not to be possessed but felt...এক ব্যক্তিগত পত্রে লেখক বলছেন, 'আমি কাউকে পরামর্শ দেব না এই চারটি পথের পথিক হতে। বরং সতর্ক করব। ধরে নাও যে ও বইটাই (কন্তা) একটা warning বা চেতাবনী।'

একটা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অন্নদাশঙ্কর আমাকে বলেছিলেন, 'পরমা নারীর আইডিয়াটা পাই আমি গ্যেটের কাছ থেকে—The Eternal-Womanly draws us above ; সে-ই সেরা রমণী, চিরন্তন তবু চিরনতুন রাধা, সৃষ্টির হ্লাদিনী শক্তি, প্রেমের সাধ্য শিরোমণি।'

'মানুষ যদি কোনোখানে বাঁধা না পড়ে, ক্ষান্তি না দেয়, তবে প্রকৃতির নিয়মে তার মৃত্যু হলেও মৃত্যুতে তার বিরতি নেই। তার চলা এবার মর্ত্যে নয়, অতিমর্ত্য লোকে। এবার তার সাথী শয়তান নয়, শাশ্বতী। এই বিশ্বের অন্তর্লোকবাসিনী যে নারী মর্ত্য-লোকে মানবসঙ্গিনী হতে পারল না, মর্ত্যে যার পরিসর সংকীর্ণ বলে অসীমের অভিসারক যাকে পরিত্যাগ করল, স্বর্গে সেই নারী ভাগবত করুণাবাহিনী, তারই নিত্য প্রার্থনা ভাগবত করুণাকে আবাহন করে আনল, গঙ্গোদকের মতো মানবের শীর্ষে ছিটিয়ে দিল, মানব ধরল দিব্য কলেবর। একটি কেন্দ্রে স্থিত হয়ে সে করেছে আপনাকে নিস্পৃহ, সে রেখেছে মুহূর্তের প্রেমকে চিরন্তন করে, তার তপস্যা তার প্রিয়তমকে ঘিরে। সেই কল্যাণরূপিণী যদি প্রদর্শক না হয় তবে মানব যে মানব-অভিজ্ঞতার চরমে গিয়ে—মৃত্যুতে উপনীত হয়ে—অমৃতের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকবে, পায়চারি করতে থাকবে, প্রবেশ পাবে না। নারী তাকে ছাড়পত্র এনে দেয়, ভিতরে নিয়ে যায়, ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর লোকে ক্রমাগত নিয়ে চলে। সেই নিরুদ্দেশ ঊর্ধ্বযাত্রাই নিরন্তর স্বর্গভোগ। সে ভোগ নারী-সমন্বিত। পরমসঙ্গিনীর প্রশস্তিতে গ্যেটের 'ফাউস্ট' সমাপ্ত হলো। স্থান বৈকুণ্ঠ, কাল চিরকাল। প্রশস্তিকারকরা স্বর্গীয় চারণ।

"All things corruptible
Are but reflection.
Earth's insufficiency
Here finds perfection.
Here the ineffable
Wrought is with love,
The Eternal-Womanly
Draws us above."'

এই যে-কথা গদ্যে লিখেছিলেন তিনি 'ফাউস্ট' প্রবন্ধে (১৯৩৪-এ) পরে (১৯৮৪-তে) সেই কথাই অন্যভাবে আবার বলেছেন কবিতায়—

শাশ্বতীর দেখা পাই নব নব বেশে
প্রেমের অমিয়া ভরে জীবন যৌবন
মধুর রসের মধু করে আস্বাদন
অমৃত হয়েছি আমি মর্ত্যলোকে এসে।

সাধনার ধন বটে রমণীর প্রেম
হোক না সে রজকিনী অথবা গোপিনী
কুব্জাও অনুরাগে অপ্সরারূপিণী
প্রেম যেথা সত্য সেথা নিকষিত হেম।

দেবী নয়, নারী, তবু ঊর্ধ্বে নিয়ে চলে
ঊর্ধ্ব হতে আরো ঊর্ধ্বে বৈকুণ্ঠ যেথায়
কবিপ্রিয়া বিয়াত্রিস সবাি দেখায়
কবি তার সঙ্গ বাখে একা নভস্তলে।

ধরায় রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি
তাই তো এখনো আমি ছাড়িনি ধরণী।

কন্যা এই বাণীরই রূপকল্প তথা রূপক। সমালোচকের ভাষায় যেমন তার বিষয় তেমনই প্রকরণ, যেমন বিন্যাস তেমনই রূপায়ণ। অল্প কথায় অনেক কথা বলা।

সুখ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হল সুখ। সুখ কাকে বলে? মানুষ সুখী হয় কিসে? আর তারই সঙ্গে দুঃখমোচন তথা সুখবর্ধনের প্রসঙ্গ। উপন্যাসের থিম বা ভাববস্তু ব্যক্তি-সুখ ('একটি মানুষকে সুখী করা কি সোজা কাজ। আমি তো মনে করি এর চেয়ে একটা সাম্রাজ্য জয় করা সহজ।') থেকে দ্বৈতসুখ ('আমরা দু'জনে যদি দু'জনকে সুখী করতে পারি তা হলে এমন কিছু করলুম যাতে জগতে সুখের অনুপাত বেড়ে গেল, তার ফলে জগতে দুঃখের অনুপাত কমে গেল। এ যেন অমাবস্যার রাত্রে একটি রংমশাল জ্বালানো। সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যা হয়ে যায় দেওয়ালী। ক্ষণকালের জন্যে হলেও আবার আলো হয়ে যায়। আমাদের সুখ আর কারো সুখে বাদ সাধছে না। বরং আর সকলের অজ্ঞাতে আর সকলকে সুখী করতে একটি পাথরকে প্রাণদানও প্রাণের সর্বতো-বিস্তার।') থেকে জাগতিক সুখ ('মানুষ সুখ শান্তির জন্যে সমাজ গড়ে, পরিবার গড়ে।

সুখ শান্তি না পেলে আবার ভেঙে গড়ে না কেন ? কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে যে সুখ শান্তি না পেলেও সমাজকে, পরিবারকে আস্ত রাখতে হবে ? ধর্ম ? সেইজন্যে ধর্মের উপর থেকে একালের মানুষের শ্রদ্ধা চলে গেছে। শ্রদ্ধা ফিরে আসবে তখনই, যখন ধর্ম বলবে সুখ শান্তির জন্যে ভেঙে আবার গড়। ভাঙনটাও ধর্ম, যদি পুনর্গঠনের জন্যে হয়। আর সেই পুনর্গঠন হয় মানুষের সুখ শান্তির জন্যে।') হয়ে মহাজাগতিক সুখ ('আমি জানি যে, এ জগৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আমার মতো নগণ্য প্রাণীকে সুখী করার জন্যে এত বড় বিশ্বব্যাপার ফেঁদে বসেননি। তাঁর অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। তাই কোনো দিন তাঁকে ভুলেও প্রার্থনা করিনি যে, প্রভু আমাকে সুখী কর। প্রার্থনা যখন করেছি তখন এই বলে করেছি যে, প্রভু, আমাকে সৃষ্টিক্ষম কর, সৃষ্টিতৎপর কর। আমার সামান্য একটুখানি সীমার মধ্যে আমিও যেন তোমারই মতো স্রষ্টা হতে পারি। তেমনি নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে। তেমনি ক্রয় বিক্রয়ের অতীত।') অবধি চলে গেছে। উপন্যাসের সীমান্ত গিয়ে ঠেকেছে দর্শনের সীমানায়।

শেষ উদ্ধৃতিটি থেকে বোঝা যায় লেখক সুখের সঙ্গে সৃষ্টিকে সমন্বিত করছেন এই উপন্যাসে। বিজ্ঞান চিত্রকলা সাহিত্য—অন্তত তিনপ্রকার সৃষ্টিকর্মের কথা এসেছে এখানে। আর সৃষ্টিসুখও একপ্রকার সুখ।

সৃষ্টিশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখাই শিল্পীর কাজ। সৃষ্টিশক্তি হল একপ্রকার আগুন। যে আগুন মহাজগতে জ্বলছে সে আগুন শিল্পীর অন্তরেও। তাকে জ্বালিয়ে রাখাই শিল্পী-বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-সাহিত্যিক হওয়ার পূর্বশর্ত। শিল্পী এসেছেন একটা দীপশিখা নিয়ে। ভাসিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রদীপ কালস্রোতে। হয়তো তা নিবে যাবে একদিন, কিন্তু তার আগে জ্বলতে থাকবে, আঁধার রাতে আলো দিতে দিতে। হয়তো একজনের দীপ থেকে আর কেউ জ্বালিয়ে নেবেন তাঁর দীপ। যেমন লেখক নিয়েছেন কারো কারো কাছ থেকে।

> 'দুঃখমোচন ছিল ব্রত একদা
>
> এখন দিয়েছি তারে গঙ্গাজলে।
>
> আর কোন্ ব্রত আছে প্রেমব্যতীত
>
> এবার বাঁচব আর কিসের ছলে ?'

ফলে লেখককে আবার ফিরে আসতে হয় বিশুদ্ধ প্রেমের সাধনায়, লিখতে হয় রত্ন ও শ্রীমতী এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের বিশল্যকরণী ও তৃষ্ণার জল। বিশল্যকরণী হল রত্ন ও শাশ্বতীর নামান্তর আর তৃষ্ণার জল হল রত্ন ও স্বাতীর নামান্তর। উপন্যাসগুলোর মধ্যে কাহিনীর পরম্পরা আছে। রত্ন তথা হারীত তথা প্রবাহন। শ্রীমতী থেকে শাশ্বতী থেকে স্বাতী। প্রথম পুরুষে লেখা হলেও উপন্যাসগুলিতে কিছুটা করে আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে।

বিশল্যকরণীতে হারীতের মনে গভীর বেদনা। প্রেমের কারণে তার বুকে একটি শল্য বিঁধে আছে। কে তাকে বিশল্য করবে? নারীই তাকে বিশল্য করতে পারে। প্রেম-শক্তিরই সেই ক্ষমতা আছে।

লেখক প্রেমের সঙ্গে সৌন্দর্যকে সমন্বিত করেছেন এই উপন্যাসে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে হারীতের মনে যে বিষাদ তা থেকে মনে হতে পারে সে বিশল্য নয়। তবু সেই শল্যবিদ্ধ ভাবটা আর নেই। আর থাকেও যদি তবে প্রেমের দরুন নয়, আর্টের দরুন। জোনের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সে নতুন একটা দায় মাথায় নিয়েছে। সৌন্দর্যের দায়। কথা দিয়েছে সে সৌন্দর্যের দায় গ্রহণ করবে ও বহন করবে। আজীবন শেলের মতো বিঁধে থাকবে এ দায়। তার রূপলোক যাত্রা সমাপ্ত না হওয়া অবধি। সেই জন্য হারীত ঠিক বিশল্য নয়। তবু আগের তুলনায় বিশল্য।

জীবনকে নিয়ে কত কী করতে পারা যায়, যদি ঠিক হয়ে যায় কে কার পুরুষ, কে কার নারী। আবারও সে প্রসঙ্গ আসে তৃষ্ণার জলে (সপ্তম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত)। এই উপন্যাসটি লেখকের দু-খণ্ডে লেখার ইচ্ছে ছিল। একটি খণ্ডই লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি লেখা না হলেও প্রথম খণ্ডটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তৃষ্ণার জলের প্লট কী, থিম কী—প্রশ্ন করতে একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অন্নদাশঙ্কর আমাকে বলেছিলেন, প্লট তো বইটা পড়লেই জানা যায়, আর থিম?—তৃষ্ণা বলতে তো শুধু জলের পিপাসা নয়, অন্য পিপাসাও, যেমন প্রেমতৃষা।

অনন্ত প্রেমপ্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে। আর সেই স্রোতে ডুব দিয়ে ক্রমাগত গাগরী ভরে চলেছি আমরা। এই উপন্যাসের নায়কের নামও প্রবাহন। নরনারীর এই প্রেম মানবপ্রেম হয়ে বিশ্বপ্রেম পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে—

আমাদের সুন্দর প্রণয়
সে তো শুধু আমাদের নয়।
নিখিলের সকলের তরে
তারে মোরা আনিয়াছি ঘরে।

আমাদের যুক্ত প্রেমে অবনী কি হয়েছে নবীন
মানবের দেশে দেশে অকল্যাণ কিছু হলো ক্ষীণ?

তৃষ্ণার জলে প্রেমের সঙ্গে আনন্দকে সমন্বিত করেছেন লেখক, মীনপিয়াসীতে যেমন—'এ পৃথিবী একদিন আমাকে তার ঐশ্বর্য্য পারাবারের মীন করবে। আমি তার আনন্দলীলার সাক্ষী হব। আনন্দ! আনন্দ! চারদিকে আনন্দ! আমি সেই আনন্দ পারাবারের মীন। যে দিকেই সাঁতার কাটি সে দিকেই আনন্দ। আনন্দ ভিন্ন আর কিছু

নেই। নিরানন্দ কোথায় তা দেখতে হলে আনন্দের বাইরে যেতে হয়। কিন্তু আনন্দের বাইরে কি যাওয়া যায়? না, একবার সেই অবস্থায় পৌঁছতে পারলে আর যাওয়া যায় না। আনন্দের ভিতরে আমি, আমার ভিতরে আনন্দ। বাইরে। বাইরে বলে কোনো কথাই নেই। ভিতরে। ভিতরে। সমস্তই ভিতরে।'

দুঃখে শোকে হতাশায় মানুষের ভিতরটা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তবু সেই শতচ্ছিদ্র গাগরী দিয়ে সে শ্রীরাধার মতো যমুনার জল ভরে। আনন্দ? হাঁ, আনন্দ এরই নাম। এত যে আনন্দ এত যে ভালোবাসা তবু পিপাসা মেটে না। তৃষ্ণা বলতে তো শুধু জলের পিপাসা নয়, সমস্ত পিপাসাই।

যৌবনে ফিরে গিয়ে লেখা বড় কঠিন কাজ। প্রেমের ভাষায় লেখা তার চেয়েও কঠিন। রক্তের অক্ষরে লেখা কঠিনতম। লেখকের মতে এসব উপন্যাস যে আদৌ লেখা হল এই যথেষ্ট। যেমনটি হতে পারত তেমনটি হল না। লেখকের ক্ষমতার অভাবে নয়, তার অন্তরাত্মার অনিচ্ছায়।

যৌবনের চেয়েও পিছনে ফিরে গেছেন লেখক রাজঅতিথি উপন্যাসে (সপ্তম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত)। ফিরে গেছেন তাঁর কৈশোর কালে। এই সময়টি রূপ পেয়েছে একদিকে তাঁর কিশোর উপন্যাস পাহাড়ীতে অন্যদিকে আলোচ্য রাজঅতিথি উপন্যাসিকায়। দুটি রচনাই আত্মজৈবনিক। লেখকের ভাষায়, পাহাড়ী সত্যিকার কাহিনী-ই। ছোটদের জন্যে লেখা আমার ছোটবেলার কাহিনী। কাহিনীর প্রতাপগড় জীবনের ঢেঙ্কানালগড়। এখনকার ঢেঙ্কানাল তখন ছিল ওড়িশার এক দেশীয় রাজ্য। ওখানেই আমার জন্ম, ছেলেবেলা, লেখাপড়া।

পাহাড়ীর পরিবেশ-পটভূমি, সময়-মেজাজ, চরিত্র-সম্পর্ক আবার নতুনভাবে ফিরে এল রাজঅতিথিতে। পাহাড়ীর কিশোর নায়ক চঞ্চল, রাজবাড়ির অতিথি সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীভূমানন্দ ভারতী, তাঁর কন্যা সুনন্দা পিসিমা এঁদেরই দেখা পাই যেন আমরা নামান্তরে ও পাত্রান্তরে রাজঅতিথিতে। উপন্যাসিকার ভূমিকায় লেখক বলছেন কাহিনীর ত্রিভুজটা আসলে যে তিনজনকে নিয়ে তাদের একজন হচ্ছে একটি শিশু, আরেকজন তার মা (গোলাপ পিসি), আরেকজন তার ঠাকুমা। গল্পের লক্ষ্যটা কী এবং এ কাহিনীর রস কোথায় পাঠককেই খুঁজে নিতে আহ্বান করেছেন লেখক তাঁর ভূমিকায়। গল্প লেখার গল্প প্রবন্ধে লেখক লিখেছিলেন—নিতান্ত ঘটনাপ্রধান বা পরিস্থিতি-নির্ভর গল্প লিখে আর আমার তৃপ্তি হয় না। কোথায় তার মীনিং বা নিগূঢ় অর্থ? এই হয় আমার জিজ্ঞাসা। এরই উত্তর পেতে ও দিতে চাই। একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারেও আমাকে এই ধরনের কথাই বলেছিলেন তিনি—কোথায় গল্পের নিগূঢ় অর্থ, সূক্ষ্ম তাৎপর্য—এই আমার জিজ্ঞাসা। বেশ কিছুদিন থেকে আমার লেখার উদ্দেশ্য সৃষ্টির দায় থেকে মুক্তি।

রসের দায় থেকে মুক্তি। রূপের দায় থেকে মুক্তি। এই মুক্তির আস্বাদন পেলেই আমি তৃপ্ত। এক-একটা গল্প যদি উতরে যায় তাহলে তার মতো মুক্তি আর নেই। শুধুমাত্র বাইরের রূপ নিয়ে আমি করব কী, যদি অন্তঃসৌন্দর্য আমাকে ধরা না দেয়? সেই আমার সাধ্য শিরোমণি। তো মীনাপিয়াসী গল্পে, ও গল্পে, বিনা প্রেমসে না মিলে গল্পে, রাজঅতিথি উপন্যাসে, কুৎসার সোনাটা কবিতায়, রাতের অতিথি কাব্যনাট্যে—এই সমস্ত রচনায় আমি মুক্তির আস্বাদন পেয়েছি।

প্রেমের ধারণা রাজঅতিথি উপন্যাসে ভগবদ্‌প্রেম পর্যন্ত প্রসারিত—জন্মদিনে গল্পে যেমন—'আক্ষেপের প্রতিকার হেতু যদি থাকে তবে সেটা এই যে স্বয়ং যাদের চেয়েছেন তাদের সবাইকে পাননি। ও যাদের পেয়েছেন তাদের সবাই চাননি। ভালোবেসে না পাওয়াটা অন্যায় নয়, কিন্তু পেয়ে না ভালোবাসাটা অন্যায়। না ভালোবেসে পাওয়াটাও অন্যায়। অন্যায় না বলে বলতে পারা যায় প্রেমের ঋণ। সেসব প্রেমের ঋণ শোধ হবে কী করে? তারা সবাই বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে। মথুরা থেকে বৃন্দাবন বহুদূর। ফিরে যাবার পথ হারিয়ে গেছে, রথই বা কোথায়। স্মৃতিটুকুই সম্বল। ভাবতে ভাবতে মনে উদয় হয় এই ভাব যে, অমিতাকে আরো বেশি করে ভালোবাসলেই সে ভালোবাসা ভগবানের কাছে পৌঁছবে ও সে প্রেমের উদ্বৃত্ত তার মারফৎ যাদের পাওনা তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে।

প্রেমের অন্বেষণে কখনো কখনো প্রেমের সঙ্গে সুন্দরের মিলন ঘটে যা প্রেমময় তা সুন্দর ও যা সুন্দর তা প্রেমময় হয়ে ওঠে, সে এক সুগভীর অভিজ্ঞতা, তার আস্বাদ পেলে প্রেমের মধ্য দিয়ে মুক্তির আস্বাদ। রাজঅতিথিতে এর আভাস আছে।

এই হল অন্নদাশঙ্করের ছোট উপন্যাসগুলির কথা। এগুলির মধ্যে যেমন আত্ম-জৈবনিক উপাদান আছে তেমনি এদের নিজেদের ভিতর আছে দাবার চালের মতো আন্তঃ আদান-প্রদানও। যেমন বিদেশের বিভিন্ন রেফারেন্স ও পটভূমির ফিরে ফিরে আসা, আগুন নিয়ে খেলার সঙ্গে বিশল্যকরণীর মিল, অথবা কন্যায় কন্যাগুলির মধ্যে একটির নাম বকুল যার কথা আসে আবার বিশল্যকরণীতে যে বকুলের জন্যে হবাতের নিগূঢ় বেদনা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে যায়। তাছাড়া সবচেয়ে বড় সাদৃশ্য লক্ষ্য করছেই যে এই সবকটি উপন্যাসই মেটাফিজিক্যাল নভেল। প্রেম বিষয়ে তাত্ত্বিক উপন্যাস। অন্নদাশঙ্করের অনেক নায়কই শিভালরস নাইট। নারী বিপন্ন শুনলেই উদ্ধারে এগিয়ে আসবে। বলবে, আমি মধ্যযুগের নাইট, বিপন্ন নারীকে উদ্ধার আমার শিভালরির অঙ্গ।

উপন্যাসের মধ্য দিয়েই অন্নদাশঙ্করের জীবন, শিল্প ও জীবনশিল্পের সম্পর্ক সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও জোরালোভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এবং অন্য আর যে-কোন গুণের চেয়ে

প্রেমই তাঁর জীবনশিল্পের সাধনায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে। যে প্রেমকে তিনি নারীর জন্যে পুরুষের ও পুরুষের জন্যে নারীর প্রেম থেকে মানুষের জন্যে মানুষের ও জনগণের জন্যে শিল্পীর প্রেম পর্যন্ত প্রসার দেন। রচনাবলীর ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসগুলির বিভিন্ন চরিত্র ও বিবিধ সম্বন্ধ সৌরমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহের মতো একটি তারকাকে ঘিরে আপন আপন কক্ষপথে সতত আবর্তমান। এই তারার নাম প্রেম—

ধর্মভেদ বর্ণভেদ জাতিভেদ মায়া / এসব প্রাচীর খত মানুষের গড়া

প্লাবনের তোড়ে ভাসে এইসব চড়া / প্রেমই পরম বস্তু, আর-সব ছায়া।

অন্নদাশঙ্করের জীবনবেধ যদি তাঁকে উপন্যাসাভিমুখী করে থাকে, করে থাকে বহিঃস্থ ও কেন্দ্রাতিগ, তাঁর জীবনবোধ তাহলে তাঁকে কাব্যাভিমুখী করেছে, অন্তঃস্থ ও কেন্দ্রাভিগ। তাঁর উপন্যাসে জীবনের প্রতিভাস, কবিতায় আত্মজীবনের উদ্ভাস। তাই তাঁর কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই থাকে তাৎক্ষণিকতার মোহ, ত্বরিতানুভূতির স্পর্শ। তার উপন্যাস ও কবিতার মেজাজে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। বস্তুত তারা পরস্পর বিপ্রতীপতার সূত্রে নিবদ্ধ। তাঁর উপন্যাস দৃঢ় পুরুষালি মননশীল, কবিতা নমনীয় রমনীয় আবেগপ্রবণ। তাঁর প্রেমের উপন্যাসগুলিকে এই দুই বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্ব, সন্ধি ও সমাসরূপে উল্লেখ ও বর্ণনা করা যায়।

অভিজ্ঞতা (এক্সপিরিয়েন্স) বাদ দিয়ে একজন বড় বা মহৎ লেখকের যে গুণগুলি থাকা দরকার তা হল ইমাজিনেশন (কল্পনা), ইনটেলেক্ট (মনন), ইনটুইশন (স্বজ্ঞা) ও ইন্‌সটিংক্ট (প্রবৃত্তি)। এই গুণগুলির মধ্যে অন্নদাশঙ্করের ক্ষেত্রে মনন ও স্বজ্ঞাই প্রধান। তাই তাঁর প্রধান রচনার বেশ কিছু মননশীল ও যুক্তিবাদী তো আর কিছু উপলব্ধিপ্রসূত ও মরমী। অন্তত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো লেখকের ক্ষেত্রে কল্পনা ও প্রবৃত্তির যে বিরাট ভূমিকা তা অন্নদাশঙ্করের বেলায় কখনোই নয়। বরং তাঁর রচনা বিশেষভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভরও। বস্তুত তার সাহিত্যকর্মের একটি বড় অংশই হয় আত্মজৈবনিক নয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত, যদিও তার মধ্যে কল্পনার অনুপ্রবেশও ঘটেছে। অন্নদাশঙ্করের আত্মজীবনীমূলক বিভিন্ন রচনা, আত্মশিল্পমূলক চরিত্র বিন্দুর জবানীতে রচিত বিবিধ রচনা এবং 'আমি' নামক নানান চরিত্র ও নানান নামের আমি চরিত্রের মধ্য দিয়ে কথিত রচনাদি (বিশেষত বিভিন্ন নায়ক-কেন্দ্রিক ছোট উপন্যাসগুলি ও কয়েকটি বড় গল্প) পাশাপাশি রেখে ত্রিমাত্রিক প্রতিতুলনা করলে এ-কথা খুব ভালো বোঝা যাবে। আমি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের মধ্য দিয়ে এ-কাজ শুরুও করেছি। অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যকর্ম এইভাবে একইসঙ্গে ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক, মনস্বী ও মরমী।

সারাজীবন ধরে তিনি জীবনের একটি ধৃতিকেন্দ্র চেয়েছেন ও তাঁর রচনায় এক স্থির সুবিন্যস্ত দর্শন গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তার জন্য তিনি নিজেকে কোন

সোশ্যাল, ইন্‌টেলেকচুয়াল বা মরাল ফোর্স অথবা একটা ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক শক্তি হিশেবে ভাবেন না। তবে এও জানেন এসব শক্তি কিছু-কিছু যে তাঁর ভিতরে একেবারেই নেই তাও নয়।

বলা হয়েছে, শিল্পের ইতিহাসকে মোটামুটি চারটি প্রকরণগত ভাগে ভাগ করা চলে : বাস্তবতা (রিয়্যালিজম), অতি-বাস্তবতা (সুপার রিয়্যালিজম), নির্মাণতন্ত্রনির্ভরতা (কনস্ট্রাকটিভিজম) ও প্রকাশবাদ (এক্সপ্রেশনিজম)। নানাভাবে এই চারটি রীতি মানুষের সচেতনতার চারটি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত—চিন্তা (থট), আবেগ (ইমোশন), স্বজ্ঞা (ইনটুইশন) ও ইন্দ্রিয়চেতনা (সেনসেশন)। শিল্পের শৈলী ও প্রবণতা সাধারণত এক একটি বিভাগের সঙ্গে বা সচেতনতার এক একটি ক্ষেত্রের সঙ্গে এক এক সময়ে সংযোগ স্থাপন করেছে, বাকি তিনটিকে অনেকটা উপেক্ষা করে। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতা-আত্মজীবনী—তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে অন্নদাশঙ্কর সচেতনতার চারটি বিভাগের সঙ্গেই সংযোগস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন, কথা বলেছেন সামগ্রিক আবেদনের ভাষায়।

বীতশোক ভট্টাচার্যের মতে, 'চারিত্রের সন্ধানে বেরিয়ে তিনি ঠেকে শিখেছেন হৃদয় যখন বোঝে বোঝায়, ভাবে ভাবায় তখনি তা সত্যকারের হৃদয়। এ রকম লিখতে গেলে পুরো মানুষটাকে লাগে, তৃপ্তি অস্তিত্বের সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে হয়। অন্নদাশঙ্কর তাই বুদ্ধিজীবীর চেয়ে বড়, একজন হৃদয়জীবী।'

রচনাবলীর এই খণ্ড তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর তারই ধারাবাহিকতা সপ্তম খণ্ডে।

ধীমান দাশগুপ্ত

না

ভূমিকা

'মনপবন' ও 'যৌবনজ্বালা'র মতো 'না'তেও আমি নিজেকে প্রক্ষেপ করেছি। এর থেকে যদি কেউ মনে করেন যে, এই বইগুলি আমার আত্মজীবনীর অঙ্গ, তা হলে ভুল করবেন। গল্প বলার একটি বিশেষ রীতি আমি অবলম্বন করেছি উদ্‌ভাবনের ভাগ কমিয়ে আনবার জন্যে। তা হলেও গল্প গল্পই। কাহিনী কাহিনীই। চরিত্রগুলি কাল্পনিক।

২রা ডিসেম্বর ১৯৫১ — অন্নদাশঙ্কর রায়

॥ এক ॥

হাওয়াবদলের জন্যে সেবার যেখানে যাই সেটা সাঁওতাল পরগনার একটা নাম করা জায়গা। গিয়ে দেখি সে-বছর তেমন লোকসমাগম নেই, বাড়ীগুলো খালি পড়ে আছে। বেশ তো, আমি তো জনতা চাইনি, আমি চেয়েছি বিজনতা। কিন্তু দিন পনেরো পরে আমার আর ভালো লাগল না। মনে হলো কথা বলার জন্যে জনমানব না থাকলে বিজনতায় সুখ নেই।

তখন আমি সকাল-সন্ধ্যা রেলস্টেশনে হাজিরা দিতে শুরু করি। হাতে কাজ নেই, বেড়াতে বেড়াতে চলে যাই ট্রেন দেখতে। ছেলেবেলা থেকে রেলগাড়ীর উপর আমার অহেতুক একটা টান আছে। রেলগাড়ী দেখলে আমি যাত্রাসুখ অনুভব করি। বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে আসতে বা দিয়ে আসতে রেলস্টেশনে যাওয়া আমার কাছে চিরদিন সমান চাঞ্চল্যকর। বলতে যাচ্ছিলুম রোমাঞ্চকর কিন্তু ওটা রাখতে চাই জাহাজের জন্যে।

ট্রেন দেখতে যাবার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। কে জানে হয়তো কোনো চেনা মুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। নয়তো কোনো অচেনা মুখের সঙ্গে আলাপ জমে উঠবে। কিন্তু ট্রেন দাঁড়ায় মাত্র দু'মিনিট। চেনা মুখ নজরে পড়ে না। অচেনার সঙ্গে পরিচয় হয় না। ফিরে আসি শূন্য মনে। কিন্তু নেই যে বলেছি রেলগাড়ীর উপর আমার অহেতুক একটা টান আছে। ট্রেন আসছে, থামছে চলছে, চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমার শূন্য মনকে পূর্ণ করে দেয় অপরূপ উত্তেজনায়। উত্তেজনা কেবল দৃশ্যের জন্যে নয় শব্দের জন্যেও। চলতে থাকা রেলগাড়ীর ঝক্ ঝক ঝক আওয়াজ আমার কানে অদ্ভুত ভালো লাগে। সেইজন্যে বার বার যাই।

একদিন নামলেন এক বিশালকায় ভদ্রলোক, সঙ্গে বিস্তর লটবহর। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে গেলেন স্থানীয় দু-একজন ভদ্রলোক, তাঁদের একজনের নাম পরিতোষবাবু। আমি অবাক হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছি, ভাবছি ইনি কোনো আমীর ব্যক্তি হবেন। এমন সময় অন্য এক কামরা থেকে ব্যাগ হাতে করে নামলেন এক কৃশকায় ভদ্রলোক। মুখখানা শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। চোখ দুটো উজ্জ্বল। এঁর উপর দৃষ্টি পড়ার পর আমি কতকটা আনমনা ভাবে এঁর দিকে এগিয়ে যেতে থাকলুম। আগে কখনো দেখা হয়নি, অথচ মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি।

'আসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই,' বললেন পরিতোষবাবু। আমাকে নিয়ে গেলেন বিশালকায়ের সকাশে, তিনি গাইবাঁধার কুমার বিভূতিনারায়ণ। কৃষ্ণকায়কে নিয়ে এলেন আমার সমীপে, ইনি তাঁর ম্যানেজার প্রিয়দর্শন ভদ্র। এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তাই হলো। জমিদার আমার সাহিত্যিক পরিচয় উপেক্ষা করে সরকারী পরিচয় শুনে গদগদ হলেন। কিন্তু তাঁর ম্যানেজার আমার সরকারী পরিচয় উপেক্ষা করে আমার সাহিত্যিক পরিচয়ের সমাদর করলেন।

আমার দুই হাত নিজের দুই হাতে চেপে ধরে অনেকক্ষণ নির্বাক থেকে প্রিয়দর্শনবাবু বললেন, 'অবশেষে!'

আমিও বললুম, 'অবশেষে!'

আমাদের দু'জনের এই সাঙ্কেতিক ভাষা বুঝতে পারে তেমন লোক সেখানে ছিল না। জমিদার তো মোটরে গিয়ে উঠলেন। পরিতোষবাবুরাও লটবহরের সঙ্গে চললেন। প্ল্যাটফর্মে কেবল প্রিয়দর্শন ও আমি।

'আপনি আমাকে লণ্ডন থেকে যে চিঠি লিখেছিলেন মনে আছে?'

'মনে আছে।'

'তার পরে আট-নয় বছর কেটে গেছে, কিন্তু প্রত্যেকটি লাইন আমার মুখস্থ। শুনবেন, বলব?' প্রিয়দর্শন আমাকে চমৎকৃত করে দিলেন।

'আপনার প্রত্যেকটি বই আমি পড়েছি। কিন্তু ওকথা থাক। এখানে ক'দিন আছেন বলুন। এই সংসাররূপ বিষবৃক্ষে দুটিমাত্র অমৃত ফল। কাব্যাস্বাদন আর সজ্জনসঙ্গ।'

প্রিয়দর্শন ভদ্র আমার বাল্যকালের প্রিয় লেখক। তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আমাকে যখন কেউ চেনে না তাঁর তখন দেশজোড়া নাম। একদিন সেই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে চিঠি লিখে আমার রচনার জন্যে অভিনন্দন জানালেন। বললেন, তিনি সারা জীবন যা লিখতে চান, লিখতে পারছেন না, আমি প্রথম চেষ্টায় তাই লিখে তাঁকে ভারমুক্ত করেছি। এর পরে তাঁর আর কিছু লেখবার রইল না। আমি তখন লণ্ডনে। চিঠির উত্তরে আমার বাল্যকালের ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলুম। বললুম, দেশ তাঁর কাছে অনেক আশা করে। আমার সাধ্য নেই যে দেশের সে আশা আমি পূরণ করি। অতএব তাঁকে লিখতেই হবে।

তারপরে সত্যি তিনি আর বিশেষ কিছু লেখেননি। আমি চিঠি লিখে অনুযোগ জানিয়েছি। দেখাসাক্ষাৎ হয়ে ওঠেনি যোগাযোগের অভাবে। পত্রালাপ বন্ধ হয়েছে সময়ের অভাবে। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে মিলন হলো সাঁওতালদের দেশে।

তাঁর জন্যে মোটরখানা ফিরে আসবে কথা ছিল। আমরা ততক্ষণ স্টেশনে পায়চারি

করতে করতে কথাবার্তা চালালুম। তিনি বার বার আমার হাত টেনে নিয়ে বন্দী করতে লাগলেন। আবার হাত ছেড়ে দিয়ে চোখ মুছতে থাকলেন।

'ভবভূতির সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি মনে পড়ে?'

'কোন্‌টি?'

'কালোহ্যয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী। আমি ভাগ্যবান যে আমার সমানধর্মার জন্যে যুগযুগান্তর অপেক্ষা করতে হলো না।'

ছেলেবেলায় প্রিয়দর্শনের প্রতিকৃতি দেখেছিলুম 'ভারতী'তে। দেখে মনে হয়েছিল সার্থকনামা। বিশ বছর কেটে গেছে। সে স্বাস্থ্য, সে রূপ, সে সহাস ভাব আর নেই। গাল দুটো চোপসা, কয়েকটা দাঁত পড়ে গেছে, চামড়াটা রুক্ষ, চুলগুলো কাঁচাপাকা ও পাতলা। অনেক দুঃখ-পাওয়া, অনেক পোড়-খাওয়া বিদগ্ধ জনের মতো চেহারা। তবে গড়নটি ছিপছিপে লম্বা। তীরের মতো সোজা। যৌবনের আমেজ আছে চাউনিতে, চলনে। পরনের ধুতি, পিরান ও চাদর ধবধবে তকতকে।

সেদিন তাঁকে মোটরে তুলে দিয়ে বিদায় নেবার সময় বললুম, আবার দেখা হবে। ইচ্ছা ছিল তাঁদের ওখানে যাব, কিন্তু তিনি নিজে এসে উপস্থিত হলেন।

'কুমার বাহাদুর মানুষ মন্দ নয়। কিন্তু সাহিত্যের একবিন্দু বোঝেন না। আপনি যে একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এর জন্যে আপনার এক কানাকড়ির মর্যাদা নেই তাঁর কাছে। আমারও নেই। যেদিন তিনি শুনলেন আমি একজন কবি, ঠাওরালেন আমি কবিওয়ালা। কবির গান শুনবেন বলে আবদার ধরলেন। সে এক সংকট।'

'তারপর সংকট মোচন হলো কী করে?'

'হলো কী করে?' তিনি একটু হাসতে চেষ্টা করলেন। 'আমাদের মা-লক্ষ্মীরা না থাকলে আমাদের চিনত ক'জন? যদি খবর নেন শুনবেন তাঁরাই আপনার বই সব চেয়ে বেশি পড়েন। আমার পূর্বজন্মের পুণ্যফলে কুমার বাহাদুরের অন্তঃপুরিকারা আমাকে চিনতেন। আমার দু-একখানা বইও ছিল তাঁদের গ্রন্থাগারে। তা ছাড়া, ছিল বাঁধানো মাসিক পত্র। ছবিও ছিল তাতে। কুমারকে বোঝানো গেল—কবি, যে কবিতা লেখে। যেমন, জল পড়ে পাতা নড়ে। যেমন, মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।'

আমি হেসে আকুল হলুম।

'কিন্তু বিপদে পড়ি যখন মা লক্ষ্মীরা বলেন, আমরাও কবিতা লিখি, আমাদের কবিতা কেন মাসিকপত্রে ছাপা হয় না তার প্রতিকার করুন। তখন খোদার উপর খোদকারি করতে হয়। সংশোধন করতে বসে খোল আর নলচে বদলে দিই। ছাপা হয় তাঁদের নামে। এমনি করে চাকরি বজায় রাখি। জমিদারির কাজ হাজার ভালো

জানলেও চাকরি থাকে না। ম্যানেজার মানে জমিদারির ম্যানেজার নয়, জমিদারের ম্যানেজার তথা তাঁর পরিবারের।'

আমি হাসব, না, কাঁদব বুঝতে না পেরে নীরব রইলুম।

'আচ্ছা, ম্যানেজার হয়েছি বলে কি সব ম্যানেজ করতে হবে আমাকে? পারে কখনো কেউ? কিন্তু অনেকের ধারণা আমি পারি। এমন ঘটনা একবার নয়, দু-বার নয়, তিন বার নয়, চার-বার আমার জীবনে ঘটেছে—সম্পূর্ণ অপরিচিতা মহিলা এসে আমার সাহায্য চেয়েছেন। অর্থ সাহায্য নয়, তা হলে বেঁচে যেতুম।'

আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল, কিন্তু প্রকাশ করতে সাহস হচ্ছিল না। শুনে যাচ্ছিলুম।

'ভেবে দেখুন, মিস্টার রায়, কেউ যদি আপনার কাছে এসে বলে, 'আমি শরণাগত', তা হলে আপনি কেমন বোধ করেন? শরণাগতকে শরণ দিতে হবে, এটা হলো আমাদের দেশের ঐতিহ্য। কিন্তু যার বিরুদ্ধে শরণ দিতে হবে সে যদি হয় প্রবলপ্রতাপ শত্রু, তা হলে কি পারবেন শরণ দিতে। দিলে চাকরি থাকবে!'

কী উত্তর দেব? আমি হলে কি পারতুম শরণ দিতে?

'বার বার চাকরি হারাতে হলো। অভাবে পড়লুম। ভাগ্যিস বিয়ে করিনি। তা হলেও বাঙালীর সংসারে পোষ্যের কমতি নেই। তাদের নিয়ে অকূলে ভাসতে হলো। কেন লেখা বন্ধ করে দিলুম জানতে চেয়েছিলেন। লেখা বন্ধ করব কি, লেখা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। লেখা থেকে যাঁদের দু-পয়সা হয় তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু আমার তো লোকসানের কারবার। লিখেছি, লিখে নিজের খরচে ছাপিয়েছি। নয়তো বিলিয়ে দিয়েছি। লিখতে আমার এত ভালো লাগে। যখন লিখি তখন এত আনন্দ পাই। মনে হয় আমি দেবতা, আমি স্রষ্টা, আমি নিজের জগৎ নিজে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু গত দশ-বারো বছরে আমি একটি কবিতাও লিখে শেষ করতে পারিনি। বোধ হয় একেবারে নিবে গেছি।'

'না, না।' আমি আশ্বাস দিলুম। 'নিবে যাবেন কেন! আপনি লিখবেন আবার। আরো ভালো লিখবেন। ফরাসী কবি ভালেরি বিশ বছর লেখা বন্ধ রেখেছিলেন। আবার যখন লিখলেন তখন সুন্দর কবিতা এলো।'

'কাব্যলক্ষ্মী অভিমানিনী। একবার অবহেলা করলে চিরতরে চলে যান। আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, ভাই অন্নদাশঙ্কর।' এবার তিনি অন্তরঙ্গের মতো বললেন।

'তবে জীবনকে ফাঁকি দিইনি। ডাক শুনে সাড়া দিয়েছি। চ্যালেঞ্জ করেছে, পাঞ্জা কষেছি। দয়া করেনি, ভেঙে পড়িনি। এখনো আমি বনস্পতির মতো খাড়া রয়েছি।'

সে কথা ঠিক। আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করলুম, বললুম, 'কবিত্বের চেয়ে জীবন

বড়। জীবন যদি খাঁটি হয় তো কবিতা তার থেকে ঝরবে। জীবনের যত্ন নিন. কবিতা আপনি আপনার যত্ন নেবে।'

প্রিয়দর্শন কিছুক্ষণ চুপ করে কী ভাবলেন। তারপর বললেন, 'শুনলেন তো আমার অবস্থা। এবার আপনার কথা বলুন। নতুন কিছু লিখছেন?'

'কবিতা লেখা প্রায় বন্ধ। নভেল লিখছি, কিন্তু চতুর্থ খণ্ডের পর আর এগোতে পারছিনে। দম ফুরিয়ে এসেছে। শরীর ভালো নেই, মন খারাপ।'

'অত খাটলে শরীর ভালো থাকে কখনো? কিন্তু মন খারাপ বললেন। জানতে পারি. কেন?'

'মন খারাপ অনেক দিন থেকে। দেশ স্বাধীন হয়নি, তার জন্যে যা করা উচিত তা করা হচ্ছে না। আমি নিজে বিপক্ষের শিবিরে। গ্লানি দিন দিন বাড়ছে। ছাড়ব ছাড়ব করে ছাড়তে পারছিনে চাকরি। নিজের উপর বিশ্বাস কমে যাচ্ছে। তবু যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকত। তাও হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমার সম্বল মানুষে বিশ্বাস। কিন্তু আবিসিনিয়ার যুদ্ধের আলোয় মানুষের যে চেহারা দেখলুম তা আমাকে হতাশ করেছে। সত্যি কি এরা কেউ ন্যায়ের জন্যে অস্ত্র ধরবে!'

প্রিয়দর্শন সহানুভূতির স্বরে বললেন. 'মন খারাপির কারণ আছে মানি। তবু আপনাকে নিজের কাজে মন দিতে অনুরোধ করি। সাহিত্যের কাজ যারা করবে তারা যদি দুনিয়ার কথা ভেবে মন খারাপ করে তা হলে দুনিয়ার কী লাভ জানিনে, কিন্তু সাহিত্যের দুর্দিন।'

'সাহিত্যিকরা,' আমি হেসে বললুম, 'আপনার সঙ্গে একমত হবেন না। ইংলণ্ডের জনকয়েক তরুণ লেখক স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে অসি ধরেছেন। মসী এখন শিকেয় তোলা'।

'আমি কিন্তু এত খবর রাখিনে, রাখতে চাইনে। হাতের কাছে যা দেখি তাতে হাত দিই। হাতের কাজ শেষ করে তার পরে অন্য কথা। সমষ্টির দুঃখের চেয়ে ব্যক্তির দুঃখই আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। দেশের জন্যে ভাববার লোক যথেষ্ট আছে, কিন্তু একটি বিপন্ন মেয়ে একা লড়াই করছে তার স্বামী নামক দৈত্যের সঙ্গে। তার কথা ভাববার জন্যে কেউ নেই। আমাকে দাদা বলে ডেকেছে! আমাকেই ভাবতে হয়।'

আমি আবার কৌতূহলের সঙ্গে শুনি।

'আমি যেন একটা চুম্বক। যেখানে যত দুঃখিনী আছে আমি তাদের আকর্ষণ করি আমার কাছে। চিনিনে, জানিনে, চাইনে, তবু তাদের টানি। কেউ বলে দাদা, কেউ বলে ভাই, মিতা পাতায় কেউ। প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে যে সংগ্রাম করতে হয় তাদের, সে সংগ্রামে আমি তাদের দোসর। আমি বল জোগাই, নইলে তারা হার মানত,

আত্মসমর্পণ করত। তা হলে সেটা হতো সত্যিকারের ট্রাজেডী। মরণকে আমি ট্রাজেডী বলিনে। দুঃখবরণকে তো নয়ই।'

'এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আমার এত মনের জোর নেই যে মৃত্যু দেখলে অভিভূত হব না। মৃত্যু কেন, যে কোনো দুঃখ দেখলে আমি দ্রবীভূত হই।'

'সেটা কবিধর্ম। কবির হৃদয় স্বভাবত কোমল। নতুবা সে কবি হতো না, আর কিছু হতো। কিন্তু এইসব দুঃখিনীদের সংস্পর্শে এসে এদের সংগ্রামের শরিক হয়ে আমার হৃদয় ক্রমে ক্রমে কঠিন হয়ে উঠেছে। কবিতা লিখতে না পারার সেটাও একটা কারণ।'

চা খেয়ে আমরা চললুম সাঁওতাল পল্লী আবিষ্কার করতে। মাঠের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হলো। এক এক জায়গায় জল জমেছিল। লাফাতে হলো। প্রিয়দর্শনবাবু উৎসাহের সঙ্গে লম্ফ দিলেন। বললেন, 'এখনো বুড়িয়ে যাইনি। তার দেরি আছে।'

'বুড়িয়ে যাবেন এই বয়সে! এখনো পঞ্চাশ পেরোয় নি।'

'পঞ্চাশ দূরের কথা। পঁয়তাল্লিশ পার হয়নি।'

'তা হ'লে আপনার এ দশা কেন?'

'সে কথা যদি জানতে চান তো অনেক কথা বলতে হয়। রীতিমতো নভেল। কিন্তু দোহাই আপনার, এসব কথা লিখবেন না, আমি যতদিন বেঁচে আছি।'

'আচ্ছা, তা হলে লিখব না। কথা দিচ্ছি। আপনিও কথা দিন যে আরো পঁচিশ বছর বাঁচবেন।'

'পঁ-চি-শ বছর!' তিনি অবিশ্বাসের সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন। 'ততদিন আমার পরমায়ু থাকলে তো। জোর দশ-বারো বছর।'

এই অলক্ষুণে বিষয়ে আর বাক্যালাপ করলুম না। সাঁওতালদের পল্লীর কাছে এসে পড়েছিলুম। কী সুন্দর তাদের কুটিরগুলি! এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি যে দালানকেও লজ্জা দেয়। ইচ্ছা করে তাদের সঙ্গে বাস করতে। প্রিয়দর্শনবাবুরও সেই ইচ্ছা।

'শেষ জীবনটা এইখানেই কাটিয়ে দেব ভাবছি। এরা যদি আমাকে থাকতে দেয়। চেহারাটাও তো ক্রমে এদেরি মতো হয়ে আসছে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে, আমি দিব্যি গৌরবরণ ছিলুম। এবার এদের ভাষা শিখতে হবে।'

এই বলে তিনি একজনের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। বাংলা থেকে হিন্দী, হিন্দী থেকে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো দুটো একটা সাঁওতালী শব্দ। তাঁর একজন শিক্ষকও জুটে গেল। কিছু টাকা তিনি খয়রাতি করলেন সাঁওতালদের দেবতাদের জন্যে। একেই বলে ম্যানেজার।

ফেরবার পথে প্রিয়দর্শন বললেন, 'জমিদারবাড়ীতে কাজ করতে করতে আমার একটু অভ্যাসদোষ ঘটেছে। সাঁওতালদের সঙ্গে আমার বনবে ভালো। কিন্তু আপনার সঙ্গে বনবে না। আপনার ও দোষ নেই।'

'কী করে জানলেন?'

'আমি মানুষ চিনি। বলতে গেলে মানুষ চেনা তো আমার পেশা। তাই করেই তো খাচ্ছি। কবিতা লিখে এ দেশে পেটের ভাত জোটে না।'

বিদায় নেবার সময় বললেন, 'আমার সম্বন্ধে আপনাকে আমি সতর্ক করে দিই। আপনি যাকে দেখছেন সে সাহিত্যিক প্রিয়দর্শন। চাঁদের উল্টো পিঠের মতো আর একজন প্রিয়দর্শন আছে, সে ম্যানেজার প্রিয়দর্শন। তার সঙ্গে আপনার পরিচয় না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কথায় বলে, যেমন দেবা তেমনি দেবী। যেমন রাজা তেমনি উজির। যেমন জমিদার তেমনি ম্যানেজার। আমার প্রোপ্রাইটরের সঙ্গে আপনার যেটুকু আলাপ হয়েছে সেইটুকু যথেষ্ট। যদি কোনো দিন রংপুর জেলায় বদলি হন তাঁর সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব উঁচু হবে না। তখন তাঁর ম্যানেজারের সম্বন্ধেও আপনার ধারণা নেমে যাবে। কাজ কি চাঁদের উল্টো পিঠ দেখে। আপনাকে আমার অনুনয়, আপনি আমার প্রোপ্রাইটরের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন না। তবে তিনি যদি আপনাকে নিমন্ত্রণ করেন তা হলে অবশ্য আসা উচিত।'

জমিদারের ম্যানেজার যাঁরা হন তাঁদের সাধারণত কয়েক রকম সদ্‌গুণ থাকে। প্রিয়দর্শন জানতেন যে, একদিন না একদিন সে সব আমার চোখে পড়বে কানে আসবে। সেইজন্যে আগে থেকে আমার মনটাকে মোহমুক্ত করে রাখলেন। এর প্রয়োজন ছিল। আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুতা যাতে সাহিত্যক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে তার জন্যে তিনি ও আমি দু'জনেই যত্নবান ছিলুম। যে কয়দিন আমরা একত্র হয়েছি, বেড়াতে গেছি, গল্প করেছি, সাহিত্যের বিষয় ভিন্ন আর কোনো বিষয়ে কালক্ষেপ করিনি। তাঁর সঙ্গে কোনো জমিদারী পাইক বা বরকন্দাজ আসত না। তাঁর মালিক আমাকে নিমন্ত্রণ করেননি, আমি তাঁর ওখানে যাইনি। ভদ্রলোক নাকি সব সময় অসুস্থ ছিলেন।

'আমি বেশ বুঝতে পারছি' এক দিন তিনি বললেন, 'আমার ভিতরে ভাঙন ধরেছে। বাইরের ভাঙন তার প্রতিরূপ। আয়নার দিকে তাকাতে ভালো লাগে না। ভালো লাগে আপনার দিকে তাকাতে। আপনি আমার আয়না। আপনার চোখে আমার যে রূপ দেখতে পাই সে রূপ নিত্যকালের প্রিয়দর্শনের। কবি প্রিয়দর্শনের। বেঁচে থাক সেই সত্যিকারের প্রিয়দর্শন। মরে যাক এই বৃদ্ধ ব্যর্থ বন্ধ্যা প্রিয়দর্শন।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ছি ছি। ও কী বলছেন আপনি। বাঁচতে হবে আপনাকে

বাংলা সাহিত্যের মুখ চেয়ে। লিখতে হবে আপনাকে আপনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাগুন যদি ধরে থাকে তবে তা রোধ করতে হবে, লড়তে হবে তার সঙ্গে। কেন তার কাছে আপনি আত্মসমর্পণ করবেন? এই তো সেদিন বলছিলেন যে, আত্মসমর্পণ হচ্ছে ট্র্যাজেডী।'

'একশো বার। কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে দেখাও তো কম দুঃখের নয়। নিজেকে বাঁচাতে পারি, কিন্তু পরকে বাঁচাতে না পারাও তো ব্যর্থতার বেদনায় ভরপুর।'

জানতে ইচ্ছা করছিল কী বৃত্তান্ত, কিন্তু আগ্রহটা অশোভন হতো।

'আমার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ', তিনি বলতে লাগলেন, 'আমার জীবনের দুর্লভ অভিজ্ঞতা। সে গ্রন্থ লেখা হয়ে গেছে আমার সত্তার পরতে পরতে, আমার মনের আনাচে কানাচে, আমার শরীরের শিরায় শিরায়, রোমকূপে রোমকূপে, আমার চেহারায়, আমার চোখে। ক্ষমতা থাকলে তাকে আমি অনুবাদ করতুম মুখের ভাষায়, লেখনীর মুখের ভাষায়। অনুশীলনের অভাবে ক্ষমতা যেটুকু ছিল সেটুকুও হারিয়েছি। ফিরে পাবার কথা ভাবতেও ভুলে গেছি। এখানে হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা না হলে কেউ কোনো দিন ও কথা আমাকে মনে করিয়ে দিত না। আমি কবে একজন কবি ছিলুম, মরে ম্যানেজার হয়ে গেছি। আমার এটা সূক্ষ্ম শরীর।'

'আপনার দুর্লভ অভিজ্ঞতা আপনার সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবে। দেশ তার অংশ পাবে না। ভাবতে কষ্ট হয়, প্রিয়দর্শনদা।' আমি আফসোস জানালুম।

দাদা ডাক শুনে তিনি গলে গেলেন। বললেন, 'তুমি আমার সমানধর্মা। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছি সেই দিন থেকে মনে করেছি তোমার হাতেই সঁপে দিয়ে যাব আমার অভিজ্ঞতার অলিখিত পুঁথি। তুমি এক দিন লিখবে। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে নয়। অবশ্য তোমার যদি লিখতে ইচ্ছা না করে লিখবে না। লিখতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি।'

তাঁর চোখে জল এসে গেছল। গলার স্বর ভারী। আমি বললুম, 'দাদা, আপনি লিখলে যেমনটি হবে আমি লিখলে তেমনটি হবে না। কাজেই আপনি নিজের হাতে আরম্ভ করে দিন। আপনি এখনো অনেক দিন বাঁচবেন। তবে আমাকে শোনাতে চান শোনান। আমি মনে রাখব। আপনি যদি না লেখেন আমি লিখব। আপনার জীবন-কালে নয়, কথা দিচ্ছি।'

তিনি নীরবে চোখের জল ঝরালেন। তার পর আমার দুই হাত নিজের দুই হাতে চেপে ধরলেন। কবিতে কবিতে ভাব সম্মেলন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস।

॥ দুই ॥

প্রিয়দর্শনদার ওই এক দোষ। অতি সহজে অভিভূত হন। চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না। কথা বলেন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে। বলতে বলতে থেমে যান।

কিছু দিন থেকে কাগজে কাগজে কানাঘুষা চলছিল স্বয়ং সম্রাটকে কেন্দ্র করে। এমন মুখরোচক গুজব বহুকাল শোনা যায়নি। যার সঙ্গে দেখা হয় সে-ই প্রশ্ন করে, 'এর পরিণাম কী হবে বলে মনে হয়?' উত্তর দিতে পারিনে।

একদিন দেখি প্রিয়দর্শনদা ছুটে আসছেন কাগজ হাতে করে—তখনো আমার কাগজ এসে পৌঁছয়নি। কাগজখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে ভেঙে পড়লেন। চোখে জল থই থই করছে। কথা বলার মতো অবস্থা তাঁর নয়।

এডওয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করেছেন।

রেডিওতে তাঁর বিদায়-ভাষণ দেবার আগে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন নি। তাতে তাঁরা রাগ করেছেন। মানুষ এডওয়ার্ড মানুষের কাছে হৃদয় খুলেছেন। তাঁর হৃদয়ের ব্যথা সকলের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে। তিনি লেখক নন, বক্তা নন। কিন্তু যে করুণ রসের অবতারণা করেছেন তা মর্মভেদী।

অনেকক্ষণ লাগল কাগজখানা উলটে পালটে পড়তে। ততক্ষণ প্রিয়দর্শনদা নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করছিলেন। আমিও যেমন, তাঁকে সিগারেট দেখাতে ভুলে গেছি। আমারও বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

কাগজ পড়া হয়ে গেলে একপাশে সরিয়ে রাখলুম। বললুম, 'তার পর?'

'তার পর!' তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'তারপর আর কী। অযোধ্যার মূঢ় প্রজা তাদের রানীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ইংলণ্ডের মূঢ় প্রজা দিল রাজাকে তাড়িয়ে। আধুনিক যুগ, আধুনিক যুগ বলে গর্ব করো! কোথায় তোমার আধুনিকতা? সেই সনাতন মূঢ়তা! পাঁচ হাজার বছরে উন্নতি এইটুকু হয়েছে যে, রাজা এবার সিংহাসনের চেয়ে রানীকেই মূল্যবান বলে জেনেছেন। নারীর মূল্য বেড়েছে। সেইজন্যে আমি মনে মনে খুশি।'

খুশির লক্ষণ অবশ্য দেখলুম না। বললুম, 'এর কিন্তু একটা ট্র্যাজিক দিক আছে, প্রিয়দর্শনদা। সাম্রাজ্যই বলুন, জমিদারীই বলুন, ম্যানেজারিই বলুন, এমন কি পিয়নই বলুন, এক কথায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। পুরুষের জীবনে পুরুষোচিত বৃত্তি কেবল ভাত-কাপড়ের ব্যাপার নয়। সমাজের আর দশজন পুরুষের সঙ্গে তুলনা করলে মনটা দমে যায়। তাদের সঙ্গে খাপও খায় না। এর পরে আসছে ছন্নছাড়া খাপছাড়া জীবন।

সিংহাসন তো গেলই, সঙ্গে সঙ্গে গেল পুরুষযোগ্য ভবিষ্যৎ।'

'তুমি যা বললে তা ঠিক।' প্রিয়দা একটু চাঙ্গা হয়ে বসলেন। সিগারেট চেয়ে নিলেন। 'কিন্তু আমি যা বলছি তাও বেঠিক নয়। আচ্ছা, তুমি তো অনেক পড়াশুনা করেছো। বলতে পারো, ইতিহাসে আর কোনো রাজা নারীর জন্য রাজ্যপণ করেছেন?'

'মনে তো পড়ে না।' আমি চিন্তা করে বললুম।

'তা হলে ভেবে দেখ, নারীর মূল্য কতোখানি বাড়ল।' তিনি কাগজখানা ভাঁজ করে সযত্নে তুলে রাখলেন। তাঁর চোখে আনন্দের আমেজ।

'দাদা কি তা হলে ফেমিনিস্ট?'

'না, ভাই। আমি তোমার আধুনিক যুগের ফেমিনিস্ট নই।' 'আমি' তিনি একটু ইতস্তত করে নম্রভাবে বললেন, 'মধ্যযুগের নাইট।'

নাইট। আমি আশ্চর্য হলুম। মধ্যযুগের নাইট।

'আশ্চর্য হচ্ছ! কোন্‌টা শুনে আশ্চর্য হচ্ছ? নাইট শুনে, না মধ্যযুগের শুনে?'

'কী জানি ঠিক বুঝতে পারছিনে।' আমি চিন্তান্বিত হয়েছিলুম। আধুনিক বলে সত্যি আমার একটু গর্ব ছিল। আর নাইট তো একটা অর্থহীন খেতাব।

প্রিয়দর্শনদা উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, 'শিভ্যালরির যুগ এখনো অতীত হয়নি। এখনো নারীর জন্যে পুরুষ আত্মত্যাগ করে। অনেক স্থলে হয়তো সে নারী তার প্রেমিকা নয়, তার কেউ নয়। তা হলেও সে নারী। সে মহিলা। তার জন্যে বিপদ বরণ করতে প্রতিদিন প্রস্তুত থাকাই তো নাইটের জীবনব্রত। ডাক শুনলে যে পুরুষ সাড়া দেয় সে-ই তো নাইট। পুরুষোচিত বৃত্তির কথা ভেবে যে অসাড় থাকে সে কি পুরুষ!'

বুঝতে পারলুম প্রিয়দা তাঁর নিজের সম্বন্ধে আভাস দিলেন। শুনতে ইচ্ছা ছিল তাঁর গল্প। কিন্তু হাতে কাজ ছিল।

প্রিয়দাও গল্পের জন্য তৈরী ছিলেন না। বললেন, 'একটি কবিতা লিখতে চাই। এত বড় একটা ঘটনা এ জীবনে দ্বিতীয় বার ঘটবে না। ইতিহাসে ঘটে কি-না সন্দেহ। হে সম্রাট, হে সম্রাট কবি।...নাঃ। রবিবাবুর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছিনে। হে কুমার, হে রাজকুমার...'

কবিতা লেখার জন্যে কাগজ-কলম এগিয়ে দিলুম। তিনি লিখতে বসলেন।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর দাদা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'ও আমাকে ছেড়ে গেছে। আর ফিরবে না।'

জানতে চাইলুম, 'কে?'

'কবিতা।'

আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন। 'স্তোকবাক্য শুনিয়ে

কী হবে। তুমি কি পারবে দূর করতে আমার এ দুঃখ। দরদীরা বলে, গল্প আপনি লেখেন না কেন, নভেল লেখেন না কেন? আরে, গল্প লিখে কি কবিতা লেখার সুখ পাওয়া যায়? কবিতা লেখা যেন উত্তমা নায়িকার সঙ্গলাভ। আর উপন্যাস লেখা যেন— থাক, আর বললুম না। তুমি উপন্যাস লেখ কিনা।'

আমি হাসির ভান করলুম। কথাগুলো হুল ফোটাচ্ছিল। কিন্তু অপ্রিয় হলেও অসত্য নয়।

'তা বলে আপনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেবেন এ কেমন কথা!' আমি আক্ষেপ জানালুম।

'আমি কি ছাড়তে চাই? ও-ই তো ছেড়ে গেছে। নইলে এত বড একটা উপলক্ষ্য গীতিবদ্ধ হয় না! এই বা কেমন কথা!'

'দুদিন সবুর করুন। কবিতা আপনি আসবে। ওর উপর জোর খাটানো ঠিক নয়। উপলক্ষ্য তো একদিনেই বাসি হচ্ছে না।'

'এ তো মহাকাব্য নয়। এ হলো লিরিক। এ যদি আজ না আসে তো কাল আসবে না। কাল কি আমার অনুভূতি এমনি নিবিড় থাকবে, মনে করো?'

সে কথা ঠিক। প্রিয়দর্শনদা হতাশ হয়ে কাগজ-কলম সরিয়ে রাখলেন। বললেন, 'তোমার যখন কবিতা আসে না তখন উপন্যাস আসে, যখন উপন্যাস আসে না তখন প্রবন্ধ আসে। আমার তো দ্বিতীয়া তৃতীয়া নেই। আমার ঐ একমাত্র প্রিয়া। ও আর ফিরে আসবে না। নইলে এমন দিনে ওর দেখা পেতুম না?'

বুঝতে পারলুম তাঁর কিসের দুঃখ। এ বেদনা আমিও মাঝে মাঝে অনুভব করি। কিন্তু অতখানি নয়। এর কোনো উপায় নেই। অপেক্ষা করতে হয়। আশা রাখতে হয়। তার মানে, অনেক দিন বাঁচতে হয়। কিন্তু যার আয়ু ফুরিয়ে আসছে তাকে ও কথা বললে কি স্তোকবাক্যের মতো শোনাবে না?

আমাকে নীরব দেখে তিনি আপনা থেকে বললেন, 'থাক, মন খারাপ কোরো না। একদিন এ দশা তোমারও হতে পারে। এটা কবিদের নিয়তি।'

তা শুনে আমার আরো মন খারাপ হলো। আমারও তো কত কথা বলবার আছে, তার কতক বলা হবে কবিতায়, কতক উপন্যাসে ও ছোটগল্পে, কতক প্রবন্ধে ও ভাষণে, কতক হয়তো নাটিকায়। একদিন যদি দেখি যে কোনোটাই আমার আসছে না, আমি প্রিয়দর্শনদার মতো অসহায়, তখন?

দু'জনের জন্য দু'পেয়ালা কফি এলো। শীত পড়েছে। দিনের বেলাও কফি চলে।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে তিনি বললেন, 'তুমি যা ভাবছ তা আমি আন্দাজ করেছি। তোমার যখন আমার বয়স ও আমার দশা হবে তখন তুমি কী করবে? কেমন,

এ তো ? ঠিক ধরেছি আমি।'

আমি লজ্জায় নিরুত্তর রইলুম।

'কিন্তু তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবান। তোমার তো কেবল কবিতা নয়, তোমার তূণে অনেক রকম বাণ। এমন দশা তোমার কোনো দিন হবে না। কিন্তু তুমিও তো মানুষ। তোমারও যৌবন চিরদিন থাকবে না। দেখবে, সেইটেই সব চেয়ে দুঃখের '

আমার বয়স তখন কত ? বত্রিশ-তেত্রিশ। কবে যৌবন যাবে তার জন্যে আমার ভাবনা ছিল না। ভাবনা শুধু কবিতার জন্যে। কবিতা ইতিমধ্যেই দুর্লভ হয়েছিল।

দাদা বললেন, 'ওঃ। এর কি কোনো তুলনা আছে। এই দুঃখের। এই যে আমার যৌবন চলে যাচ্ছে, অথচ সৃষ্টি হচ্ছে না, এ যেন দু'দিক থেকে পুড়ছে আমার মোমবাতি। ও যদি যৌবনটা থাকত। প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভাবি প্রকৃতি যেমন ষোড়শী ছিল তেমনি আছে। আমি শুধু দিন দিন প্রবীণ হচ্ছি। প্রকৃতির সঙ্গে আমাকে আর মানাবে কেন।'

তিনি উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকালেন। সব নতুন চির নতুন। তিনিই শুধু পুরাতন। বললেন, 'প্রত্যহ আমার মনে হয় চলে যাচ্ছে। যৌবন চলে যাচ্ছে সরে যাচ্ছে। যৌবন সরে যাচ্ছে। আমি যেন কূলে দাঁড়িয়ে। নৌকা ছেড়ে যাচ্ছে। লালাবাবুর মতো আমারও কানে বাজে, কে যেন বলছে, 'দিন যে গেল।'

আমি এ প্রসঙ্গের প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছুক নই। বলি, 'আপনি লিখলেই ভালো হতো, তা যখন পারছেন না, আমাকে বলুন আমি একদিন লিখব শুনি আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা।'

'সত্যি। তুমি শুনবে ?' তিনি যেন ভাসতে ভাসতে অবলম্বন পান। তার মুখ ভরে যায় আনন্দের আভায়। চোখ ছল ছল করে খুশিতে।

এমন করে সূত্রপাত হলো যে-কাহিনীর তা বোনা হলো দিনের পর দিন ধীর মন্থরভাবে অতি সূক্ষ্ম মসলিনের মতো। কখনো আমার বাসায়, কখনো সাঁওতাল পল্লীর পথে, কখনো রেল স্টেশনে, কখনো রেল লাইনের ওপারে গোরুর গাড়ীর রাস্তায়। সাধারণত সন্ধ্যায়, কোনো কোনো দিন সকালে, কচিৎ দুপুরে।

'একটা কথা গোড়াতেই বলে রাখতে চাই', সেদিন তিনি গৌরচন্দ্রিকা করলেন, 'এ কাহিনী আমার জীবনের কাহিনী নয়। কবিরা আত্মকাহিনী লেখেন না, তাঁদের কাব্যই তাঁদের আত্মকাহিনী। আমি আমার গল্প শোনাতে চাইনে, শোনাতে চাই তাদের গল্প যারা কবি নয়, লেখিকা নয়, যাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। তাদের কাহিনীর সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে গেছে বলেই নিজের সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা দরকার। নয়তো এসব কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য হবে না। লোকে মনে করবে বানানো। তুমি কী

মনে করবে জানিনে। হয়তো ভাববে এসব কবিকল্পনা।'

আমি বললুম, 'নিজের সম্বন্ধে দু-চার কথা কেন, যা মনে আসছে বলে যান। নিজেকে বাদ দিয়ে গল্প বলতে গেলে সে-গল্প অকৃত্রিম হয় না। এমন কি বানানো গল্পকেও অকৃত্রিম বলে চালাতে হলে 'আমি'র জবানীতে বলতে হয়। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প 'আমি'র মাধ্যমে বলা। গল্প জিনিসটাই একটা কনফিডেন্স ট্রিক। বিশ্বাসের খেলা। কেউ যদি বিশ্বাস না করে তো গল্প ওৎরায় না। যাতে সকলে বিশ্বাস করে তার জন্যে যা কিছু করা দরকার, সমস্ত করতে হবে।'

দাদা হেসে বললেন, 'জমিদারী চালিয়ে খাই। আদালতের জন্যে মিথ্যা সাক্ষী শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠাই। কী করি, বলো। ওটা আমার পেশা। তা বলে দেবী সরস্বতীর দরবারে মিথ্যা সাক্ষী দেব? অসম্ভব। সেইজন্যেই আমার হাত দিয়ে নভেল হলো না। কত লোক নভেল লিখে করে খাচ্ছে। তার সাড়ে পনেরো আনাই মিথ্যে।'

'জীবনের দিক থেকে যা মিথ্যা আর্টের দিক থেকে তা সত্য হতে পারে, প্রিয়দা। অবশ্য সব সময় তা নয়।'

'হাঁ, বড় বড় মিথ্যাবাদীর ঐ একই সাফাই। আর্টের দিক থেকে সত্য।' তিনি উষ্মার সঙ্গে বললেন, 'কোনো বড় কবি কোনো কালে মিথ্যা কথা বলেছেন? হোমর বাল্মীকি মিথ্যার ফাঁদ পেতেছেন? কবিদের যে লোকে শ্রদ্ধা করে তার কারণ কি এই নয় যে, তারা কখনো চাতুরীর জাল বোনে না? তুমি দেখছি কবিদের দল থেকে নাম কাটিয়ে নিয়ে নভেলিস্টদের কুসঙ্গে পড়ে আর্টের মূলনীতি ভুলে যাচ্ছ।'

আমি মাথা হেঁট করে নীরবে পরিপাক করলুম।

'উপন্যাসকে আমি নীচু দরের আর্ট বলি কেন?' দাদা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'বলি এই জন্যে যে, তার প্রথম প্রতিজ্ঞা হচ্ছে জীবনে যা মিথ্যা আর্টে তা সত্য। ঠিক আমাদের আদালতের জবানবন্দীর মতো। অমন করে মামলা জেতা যায়, পাঠকের মাথায় হাত বুলিয়ে দালান তোলা যায়, হয়তো একদিন নোবেল প্রাইজ পাওয়া যায়, কিন্তু ভাবী কালের শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না, অন্নদাশঙ্কর।'

এসব যেন আমাকেই উদ্দেশ করে বলা। যেন আমি হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছি মিথ্যা জবানবন্দী দিতে গিয়ে সরস্বতীর ধর্মাধিকরণে। আসামী যেমন বিচারকালে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে আমিও তেমনি হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকলুম।

'নোবেল প্রাইজের লোভ তোমারও আছে। না, ভাই?' এবার তিনি কোমল স্বরে বললেন।

'আছে।' আমি অস্ফুট স্বরে কবুল করলুম।

'ওটা দুর্বলতা। শুধু ও লোভ নয়, সব রকম লোভ কাটিয়ে উঠতে হবে। মনে রেখো,

যার সামনে দাঁড়িয়ে আছো সে তোমার পাঠকমণ্ডলী নয়, সে মহাকাল। তাকে কোনো মতেই ভোলানো যায় না। নিরেট নিপট সত্য কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাই সে কানে তুলবে না। যদি রক্ত দিয়ে লিখতে পারো তা হলে সে লেখার দাম আছে। আর সব তো সময়ের খেলনা।'

এর পরে তিনি কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হলেন। আত্মমনস্ক বোধ হয়। কখন এক সময় বলতে আরম্ভ করে দিলেন, 'তা আমারও লোভ ছিল কবিযশের। এককালে কী যে ভালো লাগত নিজের লেখা ছাপার হরফে দেখতে। তখনো আমি স্কুলের ছাত্র। কলেজে যখন ভর্তি হলুম তখন আমাকে ঘিরে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠল। আমার কবিতা ছাপা হতো 'প্রবাসী' 'ভারতী' 'মানসী' প্রভৃতি সেকালের সেরা মাসিক-পত্রে। ওদের লেখা ফিরে আসত না-মঞ্জুর হয়ে। নয়তো ছাপা হতো মফঃস্বলের কোনো অখ্যাত পত্রিকায়। এই নিয়ে আমাদের মান-অভিমান হতো না তা নয়। তবু মোটের উপর আমরা ছিলুম বেশ। প্রায়ই আড্ডা বসত আমাদের এক জমিদার-বন্ধুর বাড়ী। তার জমিদারী উত্তর বঙ্গে। কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ থেকে মাসোহারা আসত। কলকাতায় থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তেন। আমি পড়তুম রিপনে। সুরেন্দ্রনাথের উপর আমার অসামান্য ভক্তি ছিল। গবর্ণমেন্টের উপর ছিল সেই পরিমাণ বিরাগ।'

তিনি যেন তলিয়ে গেলেন বিস্মৃতির সাগর থেকে স্মৃতির মুক্তা তুলতে।

রবীন্দ্রনাথ যে বছর নোবেল প্রাইজ পান তার পরের বছর আমি এম. এ. পরীক্ষায় ফেল করি। কেন জানো? রাত জেগে কবিতা লিখতুম আর সে-কবিতা ইংরেজীতে তর্জমা করে বিলিতী কাগজে পাঠাতুম। সে-বয়সে আমার আত্মবিশ্বাসের সীমা ছিল না। থাকলে আজ আমার এ দশা হতো না। মাইনর পোয়েট হয়ে সন্তুষ্ট থাকলে আমার জীবন হয়তো অন্য রকম হতো। কিন্তু বাঙালীর বরাতে একবার যখন নোবেল প্রাইজ জুটেছে তখন আর একবার কি জুটবে না, যদি সাধনা করি, যদি সাধনার ফল জগতের সামনে ধরি? আমার বন্ধুরাও আমাকে উৎসাহ দিত, তাদের কারো ধারণা ছিল না যে নোবেল প্রাইজ অত সোজা নয়।' তিনি ম্লান হাসি হাসলেন।

'অল্প বয়সে আমারও ধারণা ছিল না। আমি স্বীকার করলুম।

'তুমি তো ছেলেমানুষ ছিলে। তোমার চেয়ে যারা অনেক বড় তাদেরও মাথা ঘুরে গেছল। ডারবির টিকিট কেনার মতো লুকিয়ে নোবেল প্রাইজের চেষ্টা করা তখনকার দিনে বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে আমার মতো নির্বোধ বেশি ছিল না। ওরা সবাই পাস করল, চাকরি বা ওকালতি যা হয় একটা কিছু করল, তার আগে বা তার পরে বিয়ে করল। আমি শুধু পরীক্ষায় ফেল করলুম, চাকরি যদি বা পেলুম রাখতে পারলুম না, বিয়ে করতে গিয়ে শিশুপাল হলুম। বনিতা আমার ভাগ্যে নেই, তবু যদি কবিতা

না

আমাকে না ছাড়ত !' তিনি ভাবাবেগে নীরব হলেন।

'যাক, সে গল্প তোমাকে বলব না। এই যা বলছি এও বলতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এর দরকার ছিল। পরে বুঝতে পারবে কেন দরকার ছিল। এম. এ. পরীক্ষায় ফেল করেছি শুনে আমার গুরুজন আমাকে কলকাতা থেকে এলাহাবাদে সরাবার উদ্‌যোগ করলেন। আমার কিন্তু কলকাতা থেকে নড়বার ইচ্ছা ছিল না। আমি ইতিমধ্যে 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখক হয়েছিলুম। 'ভারতী' আমাকে একটা কাজ দিল। কলেজের পড়া সেই সঙ্গে চলল। বন্ধ হলো শুধু নোবেল প্রাইজের সাধনা। প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে সব কিছু করতে হতো, যায় চাঁদা আদায়। এখন মনে হচ্ছে, এলাহাবাদে না গিয়ে ভুল করেছি। সেখানে আর যাই হোক, সাধনার ব্যাঘাত হতো না। কিন্তু মানুষ তো ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। আমি পাস করলুম ঠিকই। পাস করতে না করতে চাকরিও পেয়ে গেলুম। উত্তর বঙ্গের সেই জমিদার যুবক কোর্ট অফ ওয়ার্ডস থেকে তাঁর জমিদারী ফেরৎ পেয়ে আমাকে সাধলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হতে। আমার কাব্যসাধনায় তিনি বাধা দেবেন না, বরং সব রকম সুবিধা করে দেবেন, এই শর্তে তাঁর প্রস্তাবে রাজী হই।'

'গ্যেটের ভাইমার যাত্রার মতো লাগছে।' আমি মন্তব্য করলুম।

'কার সঙ্গে কার তুলনা !' তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। 'অথচ এ কথা যদি সেদিন কেউ আমাকে বলত আমি মনে মনে খুশি হতুম। তখনো আমার বিশ্বাস ছিল আমি একটা কেষ্ট-বিষ্টু না হয়ে ছাড়বো না। কুমার বারিকামোহন আমাকে গ্যেটের মর্যাদা দিয়েছিলেন। একখানা আস্ত বাগানবাড়ী ছিল আমার জন্যে বরাদ্দ। সেখানে থেকে আমি কাব্যচর্চা করতুম। উত্তর বঙ্গ আমি আগে দেখিনি। প্রথম দর্শনে তার প্রেমে পড়লুম। জমিদারের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে অনেক বার, কিন্তু উত্তর বঙ্গের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেনি আজ অবধি। তুমি তো বাংলাদেশের সর্বত্র ঘুরেছ। কোন্ অঞ্চলে তোমার সব চেয়ে ভালো লাগল ?'

'সর্বত্র ঘুরেছি বললে ঠিক বলা হবে না। তবে সব চেয়ে ভালো লাগল কোন্ অঞ্চল, বলব ?'

'বলো।' তিনি কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

'উত্তর বঙ্গ।'

'যা বলেছ। সত্যি ওর সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। আমি তো প্রথম কয়েকটা বছর মধুমাসের মতো কাটিয়ে দিলুম। বৌ নেই, তবু হানিমুন (honeymoon)। কুমার আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করে দিলেন। কেন তিনি জানেন। খাটুনি ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল অবাধ ভ্রমণ।

গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাছারি করি, দেশকে চিনি। দেশের লোকের নাড়ি-নক্ষত্র

জানি। ওরা আমাকে ভালোবাসে, আমিও ওদের ভালোবাসি। ওদের অনুরোধে ওদের উপকার করার জন্যে আমি লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে দাঁড়াই। হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলে আমাকে ভোট দেয়। এখনকার মতো সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ তখনকার দিনে ছিল না। মেম্বর হতে না হতে চেয়ারম্যান হয়ে গেলুম তাদেরই সমবেত আগ্রহে। এখন মনে হচ্ছে ওটা আমার পরধর্ম। পরধর্মো ভয়াবহঃ।'

'তার পর?'

'তার পর আরো জনপ্রিয়তা ছিল কপালে। গান্ধীজীর আবির্ভাব হলো। অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপ দিলুম। রাজদ্রোহের কবিতা লিখে কারাবরণ করলুম। ফিরে এসে দেখি আমার জন্যে গ্রামে গ্রামে তোরণ তৈরী হয়েছে। অন্তহীন সম্বর্ধনা। এমন সময় এক অপরিচিতা মহিলা এসে আমার দর্শন প্রার্থনা করলেন।' এই পর্যন্ত বলে দাদা সেদিন গা তুললেন।

॥ তিন ॥

আর এক দিনের কথা। বলছিলেন প্রিয়দর্শনদা। শুনছিলুম আমি।—

সকালবেলা দোতলার ঘরে বসে লিখছি এমন সময় মাসী এসে খবর দিলেন কলকাতা থেকে কে একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। ভদ্রমহিলা! কলকাতা থেকে! আমি চমকে উঠলুম। মাসীকে বললুম, তুমি শুনলেই চলবে। আমার সাধ্যে কুলোলে সাহায্য করব। খুব সম্ভব কন্যাদায়ের চাঁদা।

মাসী তাঁর সঙ্গে কথা বলে তার পরে আমাকে জানালেন, না, ওসব কিছু নয়। তিনি একজন লেখিকা। এখানে বেড়াতে এসেছেন। কলকাতা ফিরে যাবার আগে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

লেখিকা! আলাপ করতে চান! আমার ভাগ্য। চেহারাটাকে কবিজনোচিত করা সম্ভব ছিল না, ইতিমধ্যে আমলাজনোচিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পোশাকটাকে কবিসুলভ করতে কিছু সময় লাগল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, কাব্য পড়ে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো। অতি সত্য কথা। জমিদারী চালাতে চালাতে আমার চালচলনে এমন একটা পরিবর্তন এসেছিল যা আমাকেই নিজের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে তুলত। আমি কি সেই মানুষ?

ভদ্রমহিলা আমাকে প্রতিনমস্কার করে বললেন, 'আপনিই প্রিয়দর্শনবাবু?' এমন

স্বরে বললেন, যেন আমি নামে প্রিয়দর্শন, আসলে তা নই।

আমি সপ্রতিভভাবে বললুম, 'এককালে ছিলুম। এখনো লোকে সেই নামেই ডাকে।'

তিনি হেসে বললেন, 'আমার নাম অনুপমা দেবী।'

ইনি 'ভারতী'তে লিখতেন। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। যখন আমি 'ভারতী'তে কাজ করি তখন এঁর কাছে লেখা চেয়ে চিঠি লিখেছি. এঁর লেখা পেয়ে এঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। এঁর লেখার প্রুফ দেখেছি। তার উপর খোদকারিও করেছি। এই নিয়ে এঁর সঙ্গে একটু মনোমালিন্যের মতো হয়েছিল। ইনি পরে আমাকে ক্ষমা করেছিলেন। তার জন্যে আমাকে কাগজে কলমে মাফ চাইতে হয়েছিল। লিখেছিলুম দিদিরা ছোট ভাইদের দুষ্টুপনা সহ্য না করলে কে করবে!

সে সব কথা মনে ছিল না। মনে পড়ে গেল। খুশি হয়ে বললুম, 'দিদি দেখছি তাঁর দুষ্টু ভাইটাকে ভুলে যাননি। কিন্তু আর বাবু বলে লজ্জা দেবেন না।'

মাসী জানতেন না কোন্ সুবাদে উনি আমার দিদি। মাসীকে সেসব কথা শোনাতে হলো। মাসী উঠে গেলেন চায়ের আয়োজন করতে।

দিদি বললেন, 'যাক, ওসব কথা ভেবে আপনি মন খারাপ করবেন না।'

আমি বললুম, 'মন খারাপ করব যদি আপনি আমাকে 'আপনি' বলেন।'

'আচ্ছা, এখন থেকে 'তুমি' বলব। কিন্তু তোমার কী হয়েছে বলো তো? অনেক দিন তোমার কবিতা দেখিনে। দেখলেও তাতে রাজনীতির গন্ধ।'

এই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। তারপর দিদি বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি সাহিত্য আলোচনা করতে এসেছি, এটা লোকদেখানো সত্য। তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকারী কথা আছে।' বললেন নীচু স্বরে।

'তাই নাকি? বেশ তো।' আমি অভয় দিলুম।

'আমি এখানে বেড়াতে এসেছি, এটাও লোকদেখানো সত্য। কলকাতার লোক আমরা। বেড়াতে আসব এই পাণ্ডববর্জিত দেশ!'

আমি নিশ্বাস চেপে বললুম, 'তবে?'

'প্রিয়দর্শন, আমি তোমার দিদি, তোমাকে অনুনয় করে বলছি, তুমি একথা আর কাউকে বোলো না! কুমারকে তো নয়ই, অন্য কোনো ইয়ার-বক্শীকেও না!'

আমি তাঁকে কথা দিলুম। বস্তুত আমার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না।

'যদি কোনো সূত্রে জানাজানি হয়ে যায় তা হলে একজনের সর্বনাশ হবে। সে বেচারি এমনিতেই কত কষ্ট পাচ্ছে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কি সইতে পারবে! হয়তো আত্মঘাতী হবে।'

আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশ করলুম না। শুধু বললুম, জানা-জানি হবে না, দিদি। আমি কবি হলেও কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে। নইলে কেউ আমাকে জমিদারীর ভার দেয়?

তিনি যে কোন্‌খানে লুকিয়ে রেখেছিলেন তা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, কোন্‌খান থেকে বার করলেন তাও এতদিন পরে মনে নেই। হঠাৎ এক রাশ চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি উপরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে এসো। খবরদার, কেউ যেন দেখতে না পায়। সর্বনাশ ঘটবে।'

স্বদেশীযুগের ছেলেরা যেমন রিভলবার বা পিস্তল পেলে আতঙ্কে উল্লাসে উত্তেজনায় দোদুল্যমান হতো আমিও তেমনি উদ্বেলচিত্তে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেলুম। আমার একটা ইস্পাতের আলমারি ছিল। চিঠিগুলো তার একটা গোপন ডালায় রাখলুম। কেউ টের পেল না।

দিদি বললেন, 'এখন তোমার হাতে একজনের সম্মান সঁপে দিলুম। তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই এ কাজের ভার দিচ্ছি। নইলে কলকাতা থেকে কেউ এই অজ পাড়াগাঁয়ে আসে।' এখানে বলে রাখি যে, আমাদের এটা অজ পাড়াগাঁ নয়। মহকুমা শহর। রেল লাইনের ধারে। তবে আমরা যে অঞ্চলে থাকি সেটা পল্লীর সঙ্গে অভিন্ন।

আমি তাঁকে বার বার অভয় দিলুম। কিন্তু আমাকে কী করতে হবে তা বুঝতে পারছিলুম না। চিঠিগুলো গচ্ছিত রাখতে হবে, না, পড়ে দেখতে হবে?

তিনি আমার সংশয় ভঞ্জন করে বললেন, 'চিঠিগুলো অবসর পেলে পড়ে দেখবে। তার পর আমাকে ফেরত দেবে। আমি এখানে দিন চারেক আছি। আবার একদিন এসে হাজির হব। তুমি তোমার কবিতা পড়ে শোনাবে? কেমন?'

'আমার সৌভাগ্য। সেদিন যদি আপত্তি না থাকে আমাদের এখানে একটু মিষ্টিমুখ করবেন। আজ তো আমরা প্রস্তুত ছিলুম না। মাসী কী আয়োজন করছেন জানিনে।'

'আয়োজন গুরুতর বলেই মনে হচ্ছে। অন্য সময় হলে বাধা দিতুম, কিন্তু আজ আমি তাঁকে ব্যস্ত রাখতে চাই। ততক্ষণ তোমাকে বলি একটা কথা।'

আমি মনোযোগ করলুম।

'ওকে ওর স্বামীর হাতে দিয়ে যাচ্ছি বটে, মনটা কিন্তু কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। পরের মেয়েকে নিজের বাড়ীতে ক'দিন আশ্রয় দেওয়া যায় বলো? সব জিনিসের একটা সীমা আছে। সেই জন্যে আমার এখানে আসা। এসেই শুনতে পেলুম তুমি এখানে আছো। মনে হলো অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে একটা ভেলা পেয়েছি। কেন বলতে পারব না, তোমার উপর আমার গভীর বিশ্বাস। তোমার কবিতা শুধু কবিত্ব করা নয়, তোমার ভিতরে যে মানুষটা আছে সেই মানুষটার পরিচয় দেওয়া।

তাকে আমি স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি, তাকে আমি অসঙ্কোচে বিশ্বাস করি।'

আমি বিচলিত হয়ে বললুম, 'দিদি, আমি কি এর যোগ্য!'

'আমার মন বলছে তুমি যোগ্য। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তোমার অনিষ্ট হবে। প্রিয়দর্শন, তোমার অনিষ্ট হোক, তোমার দিদি এটা চায় না। ভেলাশুদ্ধ যদি ডোবে তা হলে তো বিপদের কথা। না, না। আমার ভুল হয়েছে তোমার কাছে আসা। পরের মেয়ের ভালো করতে গিয়ে পরের ছেলের মন্দ করব?'

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার বুক দুড় দুড় করছিল। কিন্তু পুরুষ আমি, নারী যদি বিপন্ন হয়ে আমার শরণ নেয় কেমন করে শরণাগতকে বিপদের মুখে ঠেলে দেব? মেয়েটি কে, কী তার বিপদ, আমার কাছে কী তার প্রত্যাশা এসব না জেনেশুনেই বলে বসলুম, 'আমার অনিষ্টের জন্য ভাববেন না। আমি যদি আপনাদের কোনো কাজে লাগতে পারি তা হলে অনিষ্টের ভয়ে পেছিয়ে যাব না। তবে, হাঁ, আমার ক্ষমতা অল্প।'

দিদি খুশি হয়ে বললেন, 'ক্ষমতা অল্প, কিন্তু প্রভাব অনেক। সকলে তোমার সুখ্যাতি করে। কেবল তোমার ম্যানেজারবাবু করেন না, ম্যানেজারের একটা দল আছে। ওঁরাও তোমাকে সুনজরে দেখে না। তা কী করবে বলো? এমন মানুষ কে আছে যার শত্রু নেই? সাবধানে থাকবে। ম্যানেজারকে একটু দূরে দূরে রাখবে।'

আমাদের স্থানীয় রাজনীতি ইতিমধ্যে দিদির কর্ণগোচর হয়েছে দেখে হাসি পেলো। বললুম, 'দিদি, শহর থেকে আমি কত দূরে থাকি তা তো স্বচক্ষেই দেখছেন। কাছারির কাজ ছাড়া ওদের সঙ্গে আমার আর কোনো যোগসূত্র নেই। সেইজন্যে ওরা আমার উপর রুষ্ট। কী করি, ওদের সঙ্গে মিশতে কি আমার অসাধ। কিন্তু তা হলে সাহিত্যের সাধনা ছেড়ে দিতে হয়।

'না, ওদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়, তোমার ঐ ম্যানেজারটি একটি ছদ্মবেশী রাক্ষস। মায়া মারীচ বা সোনার হরিণ এমন দুষ্কর্ম নেই যা ওর অসাধ্য। তুমি একটু দূরে দূরে থাক, দলের সব খবর রাখ না। এই ক' দিনে আমি ওর পরিচয় যা পেয়েছি তার পরে আমার বোনকে দোষ দিতে পারছিনে। বোন যাকে বলছি সে আমার মায়ের পেটের বোন নয়। পাতানো বোন। তা হলেও আপন বোনের মতো। তার স্বামীটিকে কলকাতায় যত বার দেখেছি তত বার প্রশংসা করেছি। মনে হয়েছে ম্যানেজার যদি রাখতে হয় তো এ রকম লোকই রাখতে হয়। আমার নিজেরও সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি আছে। বেশির ভাগ উড়িষ্যায়। তোমার যদি কোনো দিন কাজের অভাব হয় আমাকে এক লাইন লিখো।'

আমার সঙ্গে দিদির সম্পর্ক লেখকের সঙ্গে লেখিকার, আমার ইচ্ছা ছিল না যে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক মালিকের সঙ্গে কর্মচারীর হয়। কিন্তু সাহস ছিল না তাঁর মুখের

উপর সে কথা বলতে। নীরবে পরিপাক করলুম।

তিনিও যে একজন জমিদার এ কথা জানার পর আমি তাঁর যথাযোগ্য আপ্যায়নের জন্য বিশেষ চিন্তিত হলুম। তাঁর অনুমতি নিয়ে মাসীর সঙ্গে দেখা করে বললুম, ব্যবস্থাটা রাজোচিত হওয়া চাই।

দিদি আমাকে মিঠেকড়া ধমক দিয়ে বললেন, 'কেন ওসব করছ? আমি কি রাক্ষসী যে অত কিছু খাব? নিয়ে এসো এক গ্লাস ডাবের জল, না হয় মিছরির সরবৎ। দেখছ না কখন থেকে বকবক করছি।'

আবার ছুটে গেলুম মাসীর কাছে। বললুম, 'যা হয়েছে নিয়ে এসো।'

দিদি দু-একটা জিনিস মুখে ছুঁইয়ে হাত ধোবার জল চাইলেন। বললেন, 'খেয়ে বেরিয়েছি। ফিরে গিয়ে আবার খেতে হবে। কাজেই আমাকে মাফ করবেন, মাসীমা।'

তারপর আমাকে বললেন, 'এবার চলো তোমার বাগান দেখাবে। শুনছি এমন সুন্দর বাগান এ অঞ্চলে নেই।'

বাগানটি আমার দেখবার মতো। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মাসীমাকে পরিহার করে আমার সঙ্গে গল্প করা। বাগান দেখতে দেখতে বললেন, 'কুমার তোমাকে এই চমৎকার বাগানবাড়ীটা বাস করার জন্যে দিয়েছেন। তুমি বুঝি তাঁর দক্ষিণ হস্ত?'

'কে বলল এ কথা?' আমি আশ্চর্য হলুম।

'জনরব। কেন, এতে লজ্জিত হবার কী আছে? আমরা তো চাই তুমিই একদিন ম্যানেজার হও ; ঐ শয়তানটাকে বিদায় করে দাও। ওটা না খেতে পেয়ে আসুক আমার খর্পরে। তা হলে হয়তো আমার বোনটি সুখী হবে।'

অদ্ভুত চিন্তাধারা। কী করে যে তিনি ওরকম ভাবতে পারলেন? কিন্তু প্রতিবাদ করার মতো মনের জোর আমার ছিল না।

'ওকে কেমন করে সিধে করতে হয় সে আমি জানি। কিন্তু এখানে থাকতে নয়।' তিনি বলে চললেন ফুল দেখতে দেখতে। 'বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা। এখানে ওর ভয়ে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। দারোগা ওর মুঠোর মধ্যে। এস. ডি. ও. নাকি ওর পরামর্শ না নিয়ে কোনো কাজ করে না। তাই বড্ড বাড় বেড়েছে লোকটার। কুমারের সঙ্গে তোমার গলায় গলায় ভাব। একদিন কথায় কথায় বলতে পারো না, ওটা নরকের কীট? ওটাকে বরখাস্ত করা উচিত?'

আমি বিরক্ত হয়েছিলুম। বিরক্তি চেপে বললুম, 'তা হলে কুমার মনে করবেন আমি আমার উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্যে ম্যানেজারের নামে লাগাচ্ছি। ম্যানেজার তো থেকে যাবেই, মাঝখান থেকে আমার শত্রু বাড়বে।'

'যা বলেছ!' দিদি আমার সঙ্গে একমত হলেন। 'না, সরাসরি তুমি বলবে না

কুমারকে। আর কাউকে দিয়ে বলাবে। নাপিত হলেই ভালো হয়।'

'কিন্তু দিদি', আমি দপ করে জলে উঠলুম, 'শিববাবু আমার এমন কোনো ক্ষতি করেননি যার জন্যে আমি তাঁর এতবড় অপকার করব।'

'যা বলেছ,' তিনি এবারেও একমত হলেন। 'আমি ভেবেছিলুম নিজের পদোন্নতির জন্যে তুমি হয়তো এ কাজ করতে রাজী হবে। সেটা আমার ভুল। তুমি সাধারণ লোক নও। তুমি কেন এমন হীন কাজ করবে!'

আমি তা শুনে গলে গেলুম। সে বয়সে মনটা ছিল মাখনের মতো।

'কিন্তু ভাই, আমি যে বড় আশা করে তোমার কাছে এসেছিলুম। আমার নিজের এক বিন্দু স্বার্থ নেই। মেয়েটি আমার নিকট বা দূর সম্পর্কের কেউ নয়। ওকে ওর ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসি। বিয়ের পর থেকে দেখাশুনা বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু চিঠি লেখালেখি শুরু হয়েছিল। সে সব চিঠিপত্র তোমার জিম্মায় রেখে যাচ্ছি। পড়ে দেখো। অবশেষে সে আর সহ্য করতে পারল না। কলকাতা গিয়ে আমার শরণ নিল। আমি তাকে মোটেই প্রশ্রয় দিতে চাইনি। কিন্তু যা শুনলুম তাকে ফিরিয়ে দিতে এসে যা দেখলুম তাতে আমার বুঝতে বাকী নেই যে লোকটা মানবরূপী দানব। তবে একটা কঠিন আঘাত না দিলে সে মানুষ হবে না।'

ম্যানেজারকে আমি রোজ দেখছি। তিনি যে একজন ডাক্তার জেকিল ও মিস্টার হাইড এমন কথা কখনো আমার মনে উদয় হয়নি। আর কারো মনে উদয় হয়েছে বলে শুনিনি। তবে কি চাঁদের উলটো পিঠ পুরুষদের চোখে পড়ে না, মেয়েদের চোখে পড়ে? কোথায় যেন পড়েছি, কে যেন লিখেছেন যে প্রত্যেক পুরুষেরই দু-দুটো রূপ। একটা রূপ তার স্ত্রীর কাছে, আর একটা অন্য সকলের কাছে।

'না, এবার আমার সত্যি ভয় করছে।' আমি বললুম।

'কেন, কিসের ভয়?'

'শিববাবুর হয়তো আর একটা রূপ আছে যেটা তাঁর স্ত্রীর চোখে দেখা। আমি তাঁর সে রূপ দেখিনি বলে নির্ভাবনায় বাস করছি, দেখলে হয়তো রাজ্যি ছেড়ে চলে যাব। আমাকে দিয়ে আপনার কোন্ কাজ হবে তা হলে?'

'হাঁ, তোমার ভয়ের কারণ আছে বইকি। ও যদি তোমাকে খুন করে, কেউ কোনো দিন ওকে সন্দেহ করবে না। পুলিশ ওকে রক্ষা করবে। কাজেই তোমাকে আমি অন্যায় অনুরোধ করব না। তুমি যদি চিঠিগুলো পড়ে সন্তুষ্ট হও যে মেয়েটি একটা রাক্ষসের মুখে পড়েছে, তার পরে যদি কৃতসঙ্কল্প হও যে বিপন্নকে উদ্ধার করতে হবে, তা হলে তুমি যা ভালো মনে করো তা করবে।'

আমার তখন কম্পমান অবস্থা। ম্যানেজার আমাকে খুন করতে পারে শোনার পর

থেকে আমার হাড়ের ভিতর বরফজল বইছে। আমি কী একটা বলতে চাইলুম, কিন্তু দাঁতে দাঁতে খট্‌খটানি বেধে গেল।

তিনি তা লক্ষ করে হেসে ফেললেন। বললেন, 'আচ্ছা লোকের কাছে সাহায্য আশা করেছিলুম। থাক তা হলে, দিয়ে দাও আমার চিঠির তাড়া।'

আমিও মনে মনে বললুম, 'কন্যাদায়ের চাঁদা নয় রে বাবা। দশটা টাকা দিয়ে খালাস হব তার উপায় নেই। কবি প্রিয়দর্শন ভদ্র অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে নিহত।'

চিঠির তাড়া আনতে গেলুম বটে, কিন্তু আমার পৌরুষ বিদ্রোহী হলো। কিসের পুরুষ আমি, যদি নারী তার বিপৎকালে আমাকে ডেকে আমার সাড়া না পায়। কাগজে যখন নারীহরণের খবর পড়ি তখন আমার অন্তরাত্মা লজ্জিত হয়। দেশে এতগুলো পুরুষ থাকতে কেউ একজন এগিয়ে যায় না রাবণ বধ করতে, বা রাবণের হাতে মরতে! বাংলা দেশ কি নিরস্তপাদপ। আমরা কি সব এরণ্ড! কবিতা লিখি বাংলা দেশের পৌরুষকে ধিক্কার দিয়ে।

আলমারি খুলতেই বেরিয়ে পড়ল আমার পিস্তল। চিঠির তাড়ার বদলে পিস্তল হাতে করে নেমে এলুম। দিদি তা দেখে বিস্মিত হলেন।

বললুম, 'আমি কাপুরুষের মতো মরব না, দিদি। মরতে যদি হয় তো পুশকিনের মতো মরব।'

দিদি জানতেন না পুশকিন কে! তাঁকে বলতে হলো, 'রুশ দেশের সেরা কবি পুশকিন স্ত্রীর সম্মানের জন্যে ডুয়েল লড়ে মারা যান।'

তিনি হেসে বললেন, 'আর বাংলা দেশের সেরা কবি প্রিয়দর্শন পরস্ত্রীর সম্মানের জন্যে ডুয়েল লড়ে মারা যাবেন।'

আইডিয়াটা আমার খাসা লাগছিল। একশো বছর পরে যখন প্রিয়দর্শন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হবে তখন পুশকিনের সঙ্গে আমার তুলনা করা হবে। মহিমা বেশি হবে আমারই, কারণ আমার মৃত্যু সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। তবে আমি না মরে যদি শিবপদ মারা যায় তা হলেই হয়েছে। তখন আমার ফাঁসি হবে। ও কথা মনে হতেই আবার আমার দাঁতে দাঁতে খট্‌খটানি।

পিস্তলটাকে যথাস্থানে বন্ধ করে এলুম। কন্যাদায়ের চাঁদা নয়। এ যে বিষম ধাঁধা। হায় কবি প্রিয়দর্শন!

দিদি বিদায় নিলেন আর এক দিন আসবেন বলে। আমি তাঁকে যথারীতি নিমন্ত্রণ করলুম। কিন্তু যতই ভেবে দেখলুম, ততই নিজের যোগ্যতায় সন্দিহান হলুম। আমি সাহিত্যিক মানুষ। কাছারির কাজ করে যেটুকু সময় পাই সাহিত্যের পিছনে ব্যয় করি। লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে অবধি তাতেও টান পড়ছে। আমি আমার নিজের

সমস্যা নিয়ে বিব্রত। হঠাৎ আমার উপর সীতা-উদ্ধারের দায় চাপিয়ে দিলে আমি পারব কেন ?

আর দিদির সব কথা বেদবাক্য বলে মেনে নেবই বা কেন ? যাকে তিনি রাবণ ঠাউরেছেন সে হয়তো সাধারণ একজন অত্যাচারী স্বামী। অমন কত আছে ! আমি কি তাদের সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে মরব। মেয়েরা যদি পড়ে পড়ে মার খায়, পালটা মার দিতে না শেখে, তা হলে তাদের দুঃখ কেউ কোনো দিন দূর করতে পারবে না। অত্যাচার আবহমান কাল চলে আসছে, আবহমান কাল চলতে থাকবে। মাঝখান থেকে আমি কেন জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করি ?

চিঠিগুলো পড়তে ঔৎসুক্য ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে দ্বিধাও ছিল। পরের চিঠি পড়া কি উচিত ? আলমারিতে বন্ধ করবার সময় কয়েকখানার উপর দৃষ্টিপাত করেছিলুম। কোনোটা শিববাবুর লেখা, কোনোখানা আভা দেবীর। এঁদের কারো অনুমতি নিইনি। বিনা অনুমতিতে পরের চিঠি পড়াও তো চুরি করা। দিদির কথায় চুরি করা যেমন অন্যায় দিদির কথায় চিঠি পড়াও তেমনি।

আলমারি খুলে চিঠিগুলো পড়তে বসা এক মিনিটের কাজ। কিন্তু এত সহজে বলেই ও কাজ এত কঠিন ! আমি আবো চিন্তা করব বলে সময় নিলুম। আপাতত হাতের কাজে মন দেওয়া দরকাব। মন দিতে পারছিলুম না, তবু চেষ্টা করলুম।

থেকে থেকে আমার শঙ্কা বোধ হচ্ছিল। কোথাও কিছু নেই, অকস্মাৎ কলকাতা থেকে এক ভদ্রমহিলা এসে আমার প্রশান্তি ভঙ্গ করলেন। এখন এর পরিণাম কী হবে ! এত দূর এগিয়ে তার পরে পেছিয়ে যাওয়া ভালো দেখায় না ; পেছিয়েই যদি যাব তবে চিঠিগুলো ফেরত দিলেই চুকে যেত। পিস্তল বার করে বীরপুরুষ সাজার দরকার কী ছিল ! কবিরা যে বীরপুরুষ নয়, বাল্মীকি যে রামচন্দ্র নন, ব্যাসদেব যে অর্জুন নন, কে না জানে ! দিদি উপহাস করতেন, কিন্তু কিছু মনে করতেন না। তাঁর চোখে বীরপুরুষ হতে গিয়ে বড বেশি দূর এগিয়েছি। কী এক অনির্দিষ্ট নিয়তির পানে পা বাড়িয়ে দিয়েছি।

॥ চার ॥

জীবনের বড বড় ঘটনাগুলোর সূত্রপাত এই রকম ছোটখাটো ঘটনা থেকেই হয়। —বলতে লাগলেন প্রিয়দর্শনদা।

আমি কবি প্রিয়দর্শন, আমার কী দরকার ছিল পরের চিঠি পড়ার! কোন্ কাজের কী পরিণাম তখন যদি জানতুম তা হলে আমার দুর্দমনীয় কৌতূহলকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতুম। কিন্তু তখন সেটা বীরত্বের ছদ্মবেশ পরে এসেছিল। তাই সেটাকে কৌতূহল বলে চিনতে পারিনি।

চিঠিগুলো পড়তে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। না পড়লেও চলত। পড়ব বলে তুলে রেখেছিলুম বলে পড়বই পড়ব এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি। অনায়াসে বলতে পারতুম, এই নিন, দিদি, আপনার চিঠির তাড়া। পরের চিঠি পড়া আমার দ্বারা হলো না। বিবেক অনুমতি দিল না।

কিন্তু দিদি তা শুনে কী মনে করতেন। হয়তো ঠাওরাতেন কবিদের কাব্য এক রকম, জীবন আর এক রকম। কবিতা বীররসে পূর্ণ, জীবন ভয়ভাবনায় ভরা। বেচারা প্রিয়দর্শন গোটা কয়েক বীররসের কবিতা লিখেছে বলে এমন কী অপরাধ করেছে যে, তাকে প্রমাণ করতে হবে সে কাপুরুষ নয়, সে বীরপুরুষ। আচ্ছা, ভাই প্রিয়দর্শন, তুমি নিরাপদে বেঁচেবর্তে থেকে রাজদ্রোহ সমাজদ্রোহ বাঁচিয়ে কাগজে কলমে দেশ-উদ্ধার করতে থাকো। দ্বিজেন্দ্রলালের অমর সৃষ্টি নন্দলালের মতো তুমিও অমর হও। তোমার কাছে বীররসের কবিতা চাইতে আসা উচিত ছিল। তা না করে বীরোচিত জীবন চাইতে এসেছিলুম। আচ্ছা, এর পরে যদি কখনো বীরত্বপূর্ণ কবিতার প্রয়োজন হয় তোমাকে জানাব।

কাব্যের সঙ্গে জীবনের সঙ্গতি থাকবে, এরূপ একটা প্রত্যাশা আমার নিজের কাছে নিজের ছিল। দিদির ছিল কি না জানিনে। মনে হলো দিদিরও আছে। প্রত্যেক পাঠকের আছে। যে কবিতা লিখবে সে কবিতার মতো করে বাঁচবে, তবেই তার কবিতা সার্থক, তার জীবন সার্থক। আমার এই প্রত্যয় আমাকে বীরোচিত জীবনের প্ররোচনা দিয়েছিল বলেই না আমি রাজদ্রোহের কবিতা লিখে কারাবরণ করলুম। একবার কারাবরণের পর আমি নিজের চোখেই যথেষ্ট বড় হয়েছিলুম। দিদির চোখে বড় হতে চাওয়া বিচিত্র নয়। অন্তত ছোট হতে যাওয়া অস্বস্তিকর।

এই রকম সাত পাঁচ ভেবে চিঠিগুলো পড়তে বসলুম। বিবেকের বাধা মানলুম না। কতক চিঠি আভা দেবীর লেখা। কতক শিববাবুর। অবশিষ্ট দিদির, অর্থাৎ অনুপমা দেবীর। তিন জনের ধরন তিন রকম। হাতের লেখা, লেখার ভাষা, বলার কথা। মনে হলো যে আমরা চারজনে মিলে আলাপ করছি। আমিও একজন। আমার যোগদান অপর তিনজনের অলক্ষ্যে, তবু আমিও তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত। আমরা চারজনে মিলে চতুরঙ্গ। আশ্চর্য। এ কথা মনে আসতেই বিবেকের ভার একেবারে হাল্কা হয়ে গেল। বাধা তো পেলুমই না, বাধার কল্পনা কোথায় মিলিয়ে গেল।

আমিও চতুরঙ্গের অঙ্গ। আমারও এই উপাখ্যানে একটা অংশ আছে। এত দিন এ উপন্যাস শেষ হয়নি আমারি অপেক্ষায়। আমার ভূমিকায় আমাকে অভিনয় করতে হবে, এই হচ্ছে জীবন-নাট্যকারের নির্দেশ। আমার সাধ্য কী যে আমি এড়িয়ে থাকব আমার নিয়তি!

চিঠিগুলো পড়ে চললুম। পড়তে পড়তে কৌতূহল বাড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল ভয়, লজ্জা, ক্রোধ। একটা কী-করি, কী-করি ভাব এলো। মাথার চুল ছিঁড়ি আর ভাবি, কী করা যায়, কী করা উচিত। যেন কেউ আমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে যে কিছু একটা করতেই হবে। না করলে নয়।

অদ্ভুত! না? এখন পিছন ফিরে তাকাচ্ছি আর নিজের মূঢ়তায় অবাক হচ্ছি। নিরাসক্ত ভাবে বিচার করলে মনে হবে, কিছু না করলেও চলত। চিঠিগুলো ফেরত দিয়ে বললেই যথেষ্ট হতো যে, আমার কিছু করবার নেই। আমি বড় জোর কিছু পরামর্শ দিতে পারি। কিন্তু পরামর্শ দেবার মধ্যে পৌরুষ কিছুমাত্র ছিল না। পরামর্শ চাইছেই বা কে। দিদি চান একটা হাতে কলমে সমাধান। যাকে দিয়ে তা হতে পারে তেমন মানুষ তাঁর মতে প্রিয়দর্শন ভদ্র। কারণ এই লোকটি কেবল কবি নয়, কেবল বাক্যের সঙ্গে বাক্যের মিল দিয়ে ক্ষান্ত নয়, কবিতার সঙ্গে জীবনের মিল দিয়ে থাকে। নইলে জেল খাটতে যায় কোন্ দুঃখে!

বিশ্রী চিঠি! বীভৎস ব্যাপার। সব কথা তোমাকে বললে তুমিও কানে আঙুল দেবে। সব কথা আমার মনেও নেই। এই চোদ্দ-পনেরো বছরে বিস্তর ভুলেছি। ইচ্ছা করেই ভুলেছি। তবু যা স্মরণ আছে তাই বা কম কী। তোমার অত সময় নেই, তা ছাড়া, আমি গুছিয়ে বলতেও জানিনে। যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছি। লিখতে বসলে অন্য রকম করে লিখতুম।

শোন: শিববাবুরা প্রাচীন জমিদার বংশ। শরিকান স্বত্বে শিববাবুর ভাগে যা পড়েছিল তা মর্যাদার সঙ্গে বাস করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এরূপ ক্ষেত্রে অপরে যা করে থাকে, শিববাবুও তাই করলেন। অর্থাৎ বড়লোকের বাড়ী বিয়ে। অবস্থার দিক থেকে বড়লোক, কিন্তু সম্ভ্রমের দিক থেকে ছোট। এই কারণে স্ত্রীকে তিনি বরাবর একটু অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। অথচ অপূর্ব সুন্দরী তাঁর স্ত্রী। কেবল রূপবতী নন, গুণবতী। তখনকার দিনে লেখাপড়ার সঙ্গে বিয়ের কোনো সম্বন্ধই ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন ভালোই। তাঁর দাদা অধ্যাপক। বোনকে নিজের হাতে গড়েছিলেন তাঁরই মতো কোনো অধ্যাপকের ঘরণী হবার জন্যে। বাবা আবগারি কর্মচারী। বহু টাকা জমিয়েছিলেন, তার জোরে জাতে উঠতে চেয়েছিলেন জমিদারবংশে মেয়ের বিয়ে দিয়ে। জামাইয়ের পড়াশুনা বেশি নয়, কিন্তু জমিদারী-সংক্রান্ত কাজে

সহজাত নিপুণতা ছিল। অন্যান্য শরিকের সম্পত্তি তিনিই দেখাশুনা করতেন। পরে তিনি অপরের ম্যানেজার হন। অনেক জায়গায় ম্যানেজারি করার পর কুমার রাধিকা-মোহনের ম্যানেজার হয়ে আসেন। চিঠিগুলো বিভিন্ন সালে বিভিন্ন জমিদারী থেকে লেখা।

পর পর দুটি সন্তান হবার পর আভা দেবী লক্ষ করলেন—কী লক্ষ করলেন তা কি তোমাকে অত কথায় খুলে বলতে হবে? আচ্ছা, তা হলে শোন। তিনি লক্ষ করলেন—নাঃ, আমি বলতে পারব না। তুমিই যা হয় এক রকম কল্পনা করে নিয়ো। মোট কথা, শিববাবু আর ছেলেপুলে চাইলেন না। বললেন, জমিদার বাড়ীতে দুটিই যথেষ্ট, নইলে সম্পত্তি ভাগ হতে হতে কড়া ক্রান্তিতে ঠেকবে।

স্ত্রীর মনে দুঃখ হবে তিনি তা জানতেন। ব্যথার উপর প্রলেপ দিতেন এই বলে যে, অভিজাতদের নীতিশাস্ত্র ও মধ্যবিত্তদের নীতিশাস্ত্র এক নয়। তাঁদের মূল্যবোধও স্বতন্ত্র। অভিজাতরা স্ত্রীর রূপলাবণ্যকে এত বেশি মূল্য দেন যে, স্ত্রীকে বহু সন্তানবতী হতে দেন না। সেইজন্যে দুটি একটি সন্তান হবার পর স্ত্রীর কাছে আসেন না। অন্যত্র যান। আর মধ্যবিত্তরা একত্রবাসকে এত বেশি মূল্যবান মনে করেন যে, স্ত্রীকে বহু সন্তানবতী হতে দিয়ে তার রূপলাবণ্য ধ্বংস করেন। তবু পারতপক্ষে অন্যত্র যান না। বড় ঘরের মহিলারা সারা জীবন সুন্দরী থাকেন। ছোট ঘরের মেয়েরা অকালে বুড়িয়ে যায়। বুর্জোয়া মরাল কোড এর জন্যে দায়ী। কিন্তু শিববাবু তো বুর্জোয়া মরাল কোডের দ্বারা শাসিত নন। তাঁকে শাসন করে অ্যারিস্টোক্র্যাটিক মরাল কোড। তাঁর স্ত্রীকেও।

স্বামীর চিঠিতে এসব তত্ত্বকথা পড়ে আভা দেবী যেমন আহত তেমনি অপমানিত বোধ করতেন। সন্তানজননীকে আত্মহত্যার চিন্তা মনে আনতে নেই। তবু সে চিন্তা বার বার উদয় হতো। মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি। মেয়েদের দৌড় বাপের বাড়ী। কয়েক বার দৌড় দিয়ে দেখলেন তাতে বাপ-মাকে বিব্রত করা হয়। স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করা হয় না। তা ছাড়া ছেলেমেয়েরই বা অপরাধ কী! কেনই বা তারা পরের বাড়ী মানুষ হবে! জমিদারবাড়ীর শিশু জমিদার বাড়ীতে মানুষ না হলে সহবৎ ভুলে যায়। আভা দেবীর মনেও আভিজাত্যের ছোঁয়াচ লেগেছিল। তা বলে তিনি অভিজাতদের মরাল কোড মেনে নিতে রাজী ছিলেন না।

আচ্ছা, তুমিই বলো এ ছাড়া আর কী উপায় আছে যাতে তোমারও রূপযৌবন রক্ষা হয়, আমারও বিষয়সম্পত্তি? প্রশ্ন করতেন শিববাবু।

আভা দেবী এর উত্তর দিতে গিয়ে নিজের ফাঁদে নিজে পা দিতেন। এক বার বললেন, ব্রহ্মচর্য। স্বামী যেন এই কথাটির প্রতীক্ষায় ছিলেন। বললেন, এই তো আমি চাই। তুমি মনে প্রাণে এই নিয়ে থাকো। আমার কথা যদি বলো, আমি পাপী তাপী

না

মানুষ। জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতে গিয়ে দু'বেলা কত পাপ করতে হচ্ছে। পাপের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছি আমি। আমার কি সাধু হওয়া সাজে। বলো তো সাধু হয়ে বনে চলে যাই। তখন এ সংসারের ভার তোমার উপর পড়বে কিন্তু।

চিঠিপত্রের এই পর্যন্ত পড়ে পড়া বন্ধ করলে শিববাবুকে আমি খুব বেশি দোষ দিতে উদ্যত হতুম না। কিন্তু এর পরে যা এলো তা ভয়ঙ্কর।

আভা দেবী কেমন করে জানতে পেলেন যে, তাঁর স্বামী তান্ত্রিক দীক্ষা নিয়েছেন। রাত্রে শ্মশান-অঞ্চলে গিয়ে ভৈরবীচক্রে বসেন। বলা বাহুল্য ব্রহ্মচারিণীর সঙ্গে নয়। তান্ত্রিক সাধনায় পঞ্চ ম'কারের ব্যবস্থা আছে। তিনি তার কোনো একটিকে অবহেলা করলেন না। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে এক দফা পত্রবিতর্ক চলল।

শিববাবু বললেন, তোমাকে ভালোবাসি বলেই এসব করি। উপপত্নী গ্রহণ করলে কি তুমি সুখী হতে?

আভা দেবী বললেন, তা বলে তুমি ধর্মের নাম করে কতকগুলো গরিবের মেয়ের ধর্মনাশ করবে! তার চেয়ে গণিকা ভালো!

শিববাবু যেন এই কথাটির জন্যে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, তাতে যদি তুমি সুখী হও তা হলে সে-ই ভালো। আচ্ছা, এখন থেকে তোমার কথা রাখব।

আভা দেবী নিজের বাক্যের জালে নিজেই বন্দী হলেন। কী করবেন উপায় খুঁজে পেলেন না। কেমন করে স্বামীকে ফেরাবেন। লোকটা যে তাঁকে ভালোবাসে না তা নয়। কিন্তু লোকটা ভালো লোক নয়।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার পর তিনি দিদিকে স্মরণ করলেন। এখন থেকে দিদির সঙ্গে চিঠিপত্র শুরু। বছর দুই ধরে দিদির সঙ্গে চিঠি লেখালেখি চলল।

ইতিমধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর স্বামী তাঁর বেনামীতে তালুক কিনতে আরম্ভ করছেন। টাকা কোথায় পেলেন? স্ত্রীর কাছে তো চাননি। অনুসন্ধান করতে করতে যা শুনতে পেলেন তা রোমহর্ষক। একটা ডাকাতের দলের সঙ্গে নাকি তাঁর স্বামীর বন্দোবস্ত ছিল। তিনি তাদের আইনের হাত থেকে বাঁচাবেন, তারা তাঁকে বখরা দেবে।

একথা কানে আসতেই তিনি কলকাতা গিয়ে দিদির বাড়ী উঠলেন ও সেখান থেকে পত্রক্ষেপ করলেন। আর এক দফা মসীযুদ্ধ চলল।

স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, এসব কী শুনছি! তোমার কি ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই?

স্বামী উত্তর দিলেন, কেন? উকিলেরা তো নিত্য ঐ কর্ম করছে। ওরা আদালতের সাহায্যে করে। আমি পুলিশের সাহায্যে করি। এমন কী তফাৎ?

এটা কি অভিজাতদের উপযুক্ত কর্ম? উকিলরা কি অভিজাত?

তা যদি বলো, আমাদের সাত পুরুষ এই ভাবে ধনসংগ্রহ করে এসেছে। এমন কোন্ জমিদার বংশ আছে যে বংশের কেউ না কেউ ডাকাতের দল পোষেনি? লাঠিয়াল বলে দিনের বেলা যাদের পরিচয় ছিল রাত্রিবেলা তাদের অন্য রূপ দেখা যেত, যখন এত বেশি থানা পুলিশ ছিল না।

তা বলে তুমি লুটের ধন দিয়ে আমার নামে সম্পত্তি কিনবে!

তোমাকে ভালোবাসি বলেই তোমার নামে কিনি। আমি যেদিন থাকব না তুমি সেদিন ভোগ করবে। তুমি ও তোমার পুত্রকন্যা। যদি ভাগ করবার মতো সম্পত্তি হাতে পাই তা হলে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আবার তোমার কাছেই ফিরে আসব। আরো হবে।

ইঙ্গিতটা এত স্পষ্ট যে আভা দেবী থ' হয়ে গেলেন। চিঠি লেখা তখনকার মতো বন্ধ হলো। তিনি দিদিকে ধরে বসলেন, তাঁকে যেন আর স্বামীর ঘর করতে না হয় এমন একটা উপায় বাতলে দেন। এবার তিনি ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাননি। কাজেই তাদের খাতিরে ফিরে আসার আবশ্যক ছিল না। তবে তাদের দেখতে ব্যাকুলতা ছিল বইকি। সেইজন্যে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতে সাহস হচ্ছিল না।

দিদি বললেন, পাগলী, স্বামীর ঘর না করে কেউ পারে! অমন কথা চিন্তা করাও পাপ। স্বামী যদি অন্যায় করেই থাকে তবু তাকে ত্যাগ করতে নেই। তাকে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করাই কর্তব্য। দূর থেকে সেটা সম্ভব নয়। নিকট থেকেই সম্ভব। তোমাকে ফিরে গিয়ে স্বামীর প্রাত্যহিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। স্বামীও তো বলতে গেলে ছেলের মতো। ছেলেকে কি কেউ ফেলে আসতে পারে! তাকে নিজের হাতে মানুষ করতে হয়। তা তুমি তো ছেলেকেও ফেলে এসেছ। মেয়েকেও।

আভা দেবী কিছুতেই রাজী হলেন না। দিদির কাছে দিনের পর দিন কাটালেন। দিদি তাঁর আপন দিদি নন। পরের মেয়েকে কত কাল আশ্রয় দেবেন! তার স্বামী যদি দাবি করে তখন কী করবেন! শিববাবুকে চিঠি লিখে স্তোক দিয়ে তিনি কত কাল নিরস্ত করবেন!

দিদি যখন দেখলেন যে আভা দেবী কিছুতেই যাবার নাম করবেন না তখন নিজেই তাঁকে তাঁর স্বামীর ঘরে পৌঁছে দেবার আয়োজন করলেন। তাঁর একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন শিববাবুর কর্মস্থানে। তাঁকে টেলিগ্রাম করে কলকাতায় ডাকিয়ে নিয়ে ব্যাপারটা যথাসম্ভব রেখে ঢেকে বুঝিয়ে বললেন। আত্মীয় শশব্যস্ত হয়ে তাঁকে কী একটা উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করলেন। বোধ হয় অন্নপ্রাশনের। সকলের জন্যে যথাযোগ্য উপহার কিনে দিদি চললেন অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। সঙ্গে আভা দেবী।

তারপর আমাদের মহকুমা শহরে কলকাতার সেই ভদ্রমহিলার সদয় পদার্পণ। নাকে

দেবার জন্যে ভাগ্যিস এক রাশ রুমাল এনেছিলেন। নইলে তিনি সেই দিনই ফিরতি ট্রেন ধরতেন। তা হলেও আমাদের পক্ষিরাজের গাড়ীতে চড়ে তাঁর পক্ষাঘাতের মতো হয়েছিল। দিন কয়েক বিশ্রাম করতে বাধ্য হলেন। ইত্যবসরে শিববাবু সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করলেন। খোলা মন নিয়ে এসেছিলেন, আগে থেকে বিচারফল স্থির করে আসেননি। কিন্তু সন্ধান করে যা জানলেন তা আভা দেবীরও অজানা। লোকটা খুন পর্যন্ত করিয়েছে। একবার যদি তার মাথায় ঢোকে যে অমুক আমার শত্রু তা হলে অমুকের ভিটে মাটি উচ্ছন্ন তো করবেই, বাধা পেলে মিথ্যা মামলা সাজাবে, তাতে যদি সে খালাস পায় তবে তাকে মারতে মারতে মেরে ফেলার হুকুম দেবে। যারা বেঁচে গেছে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, আর শত্রুতা করেনি। যারা মরে গেছে তারাও শত্রুতা করতে পারছে না।

আভা দেবী যে এই রাক্ষসকে নিজের সৎ প্রভাবের দ্বারা মানুষ করতে পারবেন, এ বিশ্বাস ক্রমে হারিয়ে ফেললেন দিদি। বোনটিকে এর হাতে দিয়ে যাওয়ার চেয়ে একে শুদ্ধ কলকাতা নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ। তারপর সেখানে তিনি স্বয়ং এর উপর প্রখর দৃষ্টি রেখে এর স্বভাবের পরিবর্তন যাতে ঘটে তার কিনারা করবেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যাবেই বা কেন এ?

দিদি দেখলেন, শিববাবুকে এখান থেকে কলকাতায় সরাতে হলে কুমার রাধিকা-মোহনের সেরেস্তা থেকে তাড়াতে হয়। কুমারকে তিনি চিনতেন না। কুমারের কে কে অন্তরঙ্গ তার খোঁজ নিতে গিয়ে তিনি পেয়ে গেলেন আমার খোঁজ। তখন তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমাকে দিয়ে কুমারকে প্রভাবিত করে শিববাবুকে বরখাস্ত করাবেন ও নিজে তাঁর হিতৈষী সেজে তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাবেন অন্য কোনো চাকরির আশা দিয়ে। শিববাবু গেলে আমিই তো ম্যানেজার হব, সুতরাং আমারও স্বার্থ তাঁকে তাড়ানো। এইজন্যে আমার কাছে আসা, আমাকে চিঠিপত্র পড়তে দেওয়া, ষড়যন্ত্রের শরিক করা। আমাকে দিয়ে এ কর্ম যদি না হয় তা হলে আর কাউকে দিয়ে করানো যায় কি না সে কথাও তিনি ভাবছেন। সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী নন তিনি।

ম্যানেজারটা যে এত বড় একটা শয়তান এত দিন আমার জানা ছিল না। রাগে আমার অন্তঃকরণ জ্বলছিল। এই লোকটার সঙ্গে একই জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতে ঘেন্না বোধ হচ্ছিল। ভাবছিলুম কুমারকে বলব, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আর কোথাও চলে যাই, এখানে আমার অনেক দিন থাকা হলো, কবিদের কি কোনো এক জায়গায় চিরদিন থাকতে ভালো লাগে!

কিন্তু বিষয়টা আমার সুখ-দুঃখ নয়, আভার সুখ-দুঃখ। ওকে আমি নিজের বোনের মতো মনে করতে শুরু করেছিলুম। আমি চলে গেলে ওর দুঃখ কমবে না, বরং কমে

যাবে। ওকে অমন অবস্থায় ফেলে যাওয়া কাপুরুষতা। তা বলে ম্যানেজারের মতো একটা শয়তানের অধীনে কাজ করাও পুরুষোচিত নয়। আভাকে আর কোথাও নিয়ে যেতে পারলেই সব চেয়ে ভালো হতো। তা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে শিববাবুকে বরখাস্ত করাই মন্দের ভালো। তাতে আমারও শান্তি, দিদিরও অভীষ্টসিদ্ধি। কে জানে হয়তো আভারও দাম্পত্য সুখ।

আভাকে আর কোথাও নিয়ে যাবার কথা ভেবে দেখলুম। আইডিয়াটা আমার নয়, আভার নিজের। সে আর এমন স্বামীর ঘর করতে চায় না। যার ধর্মাধর্মজ্ঞান নেই তার সহধর্মিণী হওয়া তো পাপের ভাগী হওয়া। লোকটা ডাকাতি করতে করতে কোন্ দিন ধরা পড়বে। খুন করতে করতে কোন্ দিন ফাঁসি যাবে। স্বামীর ঘর ছেড়ে আর কোথাও চলে গেলে যদি স্বামীর চৈতন্য হয়। চৈতন্য হলে পরে তখন ফিরে আসা যাবে। তার আগে নয়।

কিন্তু গোড়ায় গলদ, আভার দুটি শিশু। বড়টির বয়স সাত-আট। ছোটটির পাঁচ-ছয়। কিছু দিন এদের মমতা কাটিয়ে আর কোথাও থাকা যায়। কিন্তু সেই কিছু দিন কি চৈতন্য সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট? ভগবানের বিশেষ করুণা বিনা অত কম সময়ে কারো চৈতন্য উদয় হয় না। সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় এ পাকা ঘুঁটি এক চালে কাঁচবে না। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। কিন্তু সবুর করতে হলে শিশু দুটিকেও সঙ্গে নেওয়া চাই। তা কি সম্ভব! বাপ যদি দাবি করে, তখন? আইন তো বাপের দিকেই ঝুঁকবে। যে জননী স্বামীগৃহে বাস করে না তার চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হলে আদালত তাকে তার সন্তানের ভার দেবে না। তা ছাড়া খোরপোষের প্রশ্ন আছে। বাপ যদি না দেয় মা কার কাছে হাত পাতবে? নিজের কী করে চলবে সেই ভাবনাই যথেষ্ট। এমন বাল্মীকি মুনি কে আছেন যে সীতাকেও দেখবেন, তার শিশু দুটিকেও পালবেন?

এক বার খেয়াল হলো, কেন, আমি তো আছি। কবি প্রিয়দর্শন কী করে মহাকবি হবে যদি বাল্মীকির মতো মহান দায়িত্ব বহন করতে না পারে? সীতা বাল্মীকির কেই বা ছিলেন। আভা প্রিয়দর্শনের নাই-বা হলো কেউ। একটি দুঃখিনী নারীর জন্যে আপনাকে উৎসর্গ করা কি একটা মহৎ ব্রতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করা নয়? যার জীবনে তেমন কোনো মহৎ ব্রত নেই, কোন্ চালাকির দ্বারা সে মহাকবি হবে?

ভাবতে লাগলুম। এখন হাসি পায়, কিন্তু আমার নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। মহাকবি? হাঁ, মহাকবি হবার সম্ভাব্যতা আমার মধ্যেও আছে। সম্ভাব্যতাকে সুযোগ দিলে সে একদিন সম্ভবের পর্যায়ে উঠবে। সুযোগ কি গাছে ফলে? এই তো সুযোগ। এ ধরনের সুযোগ ক'জনের জীবনে আসে। একটা চাকরি, একখানা বাড়ী, একটি স্ত্রী,

না

এ সম্বন্ধে যদি সুযোগ বলো তো বহু লোকের জীবনে এ সুযোগ জুটেছে। অথচ তারা কেউ মহাকবি দূরের কথা, বড় কবি হয়নি। তার কারণ, সুযোগ বলতে কবির জীবনে যা বোঝায় তা সুখের সুযোগ নয়, তা দুঃখের সুযোগ। বিপদের সুযোগ, সঙ্কটের সুযোগ, সংঘাতের সুযোগ।

হাঁ, সুযোগ এসেছে আমার জীবনে। মহাকবি বাল্মীকির জীবনে যে সুযোগ এসেছিল। আমি যদি এ সঙ্কটে উত্তীর্ণ হই তা হলে বিশ্বসাহিত্যে অমর হব। নয়তো বাংলা সাহিত্যের এক কোণে একটি কুলুঙ্গিতে আসন পাব। লোকে বলবে, ভদ্র কবি।

এমন একটা ঝড় বইতে লাগল আমার অন্তর্জীবনে যে আমার বহির্জীবনও তার দাপটে বিপর্যস্ত হতে বসল। মাসী বুঝতে পারলেন না আমার কী জ্বালা। কেন আমি অমন ছটফট করছি? কী আমার বিপদ? কেন আমার মুখ অত ফ্যাকাশে? আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করেন, হাঁ রে, তোর কি কোনো অসুখ করেছে? কই, না তো! গা তো গরম নয়। যা তুই একবার ডাক্তারকে দেখিয়ে আয়। আমি তাঁকে অভয় দিয়ে বলি, ও কিছু নয়। একটা দুর্ভাবনা। দেশের জন্যে ভাবছি। আবার কবে জেলে যেতে হবে।

তারপর দিদি এলেন নির্দিষ্ট দিনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। প্রথম কথা, চিঠিগুলো পড়া হয়েছে? দ্বিতীয় কথা কী করতে বলো?

বললুম, আভার দিক থেকে বিবেচনা করলে দুটি পথ আছে। একটি—আপনার দেখানো পথ। আর একটি—আমার দেখানো পথ। আমার দেখানো পথটাই সব চেয়ে ভালো। আপনার দেখানো পথটা মন্দের ভালো। এখন আভার যেটা অভিরুচি।

তিনি জানতে চাইলেন আমার দেখানো পথ কোন্‌টা। বললুম, স্বামীর ঘর থেকে দীর্ঘকালের জন্যে বিদায় নেওয়া। ছেলেমেয়ের মমতা কাটানো। স্বামীর চৈতন্য উদয় হলে ফিরে আসা। না হলে, না আসা।

॥ পাঁচ ॥

প্রিয়দর্শনদা বলে চললেন—

তার পরে দিদির সঙ্গে আমার মতভেদ ক্রমে বাড়তে থাকল। আভাকে তিনি দুটোর একটা পথ বেছে নিতে দেবেন না। তার অভিরুচির উপর নিজের অভিরুচি আরোপ করবেন। ওতেই নাকি তার কল্যাণ।

দিদি বললেন, 'তোমরা ছেলেরা মেয়েদের দিক থেকে ভাবতে পারো না। মেয়েরা দ্বিজ হয় যখন বাপের ঘর থেকে স্বামীর ঘরে যায়। তাদের বিবাহই তাদের উপনয়ন। স্বামী হয়তো পর হয়ে যায়। কিন্তু স্বামীর ঘর তা বলে পরের ঘর হয়ে যায় না। স্বামীর ঘর হচ্ছে নিজের ঘর। নিজের ঘর কেউ কখনো ছাড়ে? তোমরা একালের লেখকেরা মেয়েদের যে সব মন্ত্রণা দিচ্ছ সে সব শুনলে আমার রাগ ধরে। ঐ যে কী ওর নাম! সেন গো সেন! বদ্যির ছেলের মতো নাম।'

'নরেশ সেন?'

'না, না। বিলিতী বদ্যি। মনে পড়েছে। ইবসেন। মুখপোড়া একটা নাটক লিখেছে। স্বামীর ঘর নাকি পুতুলের ঘর। মেয়েটা চলে গেল স্বামীর ঘর ছেড়ে। স্বামী দোষ করেছে, তা বলে স্বামীর ঘর কী দোষ করল শুনি! তোমাদের সব উলটো বিচার। রবি ঠাকুরকে আমি মুনি ঋষি বলে জানতুম। তিনিও শেষকালে 'স্ত্রীর পত্র' লিখলেন। তোমরা ছেলেরা মেয়েদের দিক থেকে ভাবতে পারো না। তাই এমন সব দাওয়াই বাতলাও যা রোগের চেয়েও মারাত্মক।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা, আভা তো ছেলেমানুষ নয়। সে নিজেই স্থির করুক কিসে তার মঙ্গল, কোন্ পথে গেলে শুভ।'

'সে আমার জানাই আছে। যেখানেই যাক, স্বামীর সঙ্গেই তাকে যেতে হবে। স্বামীর সঙ্গে থাকতে হবে। স্বামীর চরিত্রের যাতে উন্নতি হয় তা করতে হবে। স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীর মুক্তি? ইবসেনের মুখে আগুন।'

ইবসেন আমার প্রিয় লেখক। তখনকার দিনে আমরা সবাই তাঁর কাছে কিছু কিছু ঋণী ছিলুম। দিদির কিন্তু তাঁরই উপর রাগ। রবীন্দ্রনাথকেও তিনি ক্ষমা করবেন না। আমার সঙ্গে তা হলে তাঁর কোন্ সূত্রে মিলবে!

বললুম, 'দিদি, আপনি আভার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমিও তাই। কিন্তু আপনি কিংবা আমি তার মতো বিপদে পড়িনি। কাজেই আমাদের পরামর্শ চোখ বুজে মেনে নেওয়া তার পক্ষে অনুচিত। সে তার নিজের দিক থেকে বিবেচনা করে দেখুক। হয়তো আপনার পরামর্শ ই শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করবে।'

তিনি আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। তার পরে কী মনে করে হাসলেন। 'তোমরা এ কালের ছেলেরা মেয়েদের যতটা স্বাধীনতা দিতে চাও ততটা তাদের সইলে তো! তুমি ভাবছ দিদিটা কী রক্ষণশীল! আভাকে এইটুকু স্বাধীনতা দিতে চায় না যে, সে তার নিজের পথ বেছে নেবে। না বাপু। দিদি তেমন রক্ষণশীল নয়। দিদিও স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কিন্তু যেখানে সামান্য ভুল করলে পরম সর্বনাশ, সেখানে ভুল করার স্বাধীনতা নিজের ছোট বোনকে দিতে তুমিও রাজি হবে না, প্রিয়দর্শন।'

এর পরে আর কথা চলে না। আমি জানতে চাইলুম, 'তা হলে আমাকে কী করতে হবে, দিদি?'

'তা কি তোমাকে এক বার বলেছি? আবার বলি, শোন। কুমারকে বলে শিবুর ম্যানেজারিটা ঘুচিয়ে দাও। যদি তোমার মুখে বাধে তা হলে নাপিতকে দিয়ে বলাও। তাও যদি না পারো, কুমারকে কলকাতা নিয়ে চলো, সেখানে আর কাউকে দিয়ে বলাবে। এইটেই একমাত্র পথ। আর যেটাকে পথ বলছ সেটা বিপথ।'

আমি আমার মনঃস্থির করেছিলুম। সাফ বলে দিলুম, 'আমাকে দিয়ে হবে না, দিদি। আমি কিছুতেই পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারব না। তার চেয়ে নিজে ইস্তফা দিয়ে সরে যাব। কুমারের সঙ্গে দেখা হলে বলব, আমাকে ছুটি দিন। আমার বদলে অন্য লোক নিন।'

ওমা। তুমি ইস্তফা দেবে কোন্ দুঃখে। তোমাকে যেতে বলছে কে।'

'না, দিদি। ও রকম একটা দুর্জনের সঙ্গে একই সেরেস্তায় কাজ করতে পারব না। আমি তো ওর সহধর্মিণী নই যে ওর দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকব।'

'সেইজন্যেই তো বলছি ওটাকে সরাও।'

'আমি সরাবার কে। জমিদারী কি আমার নিজের। যার জমিদারী, সে-ই হয়তো একদিন সরাবে। তার আগে আমি সরে যাব স্বেচ্ছায়। দিদি, আপনি আমাকে সর্পাঘাত থেকে বাঁচালেন। সাপের সঙ্গে বাস করছি এ জ্ঞান আমার ছিল না। চিঠিগুলো পড়ে এই উপকারটুকু হলো। প্রজাদের দুঃখ দূর করা আমার সাধ্য নয়। কিন্তু এ রাজ্যে আমি আর থাকছিনে।'

দিদি ক্ষুণ্ণ হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার দোষে তোমার চাকরিটা গেল। অথচ আমারও সুবিধা হলো না।'

দিদিকে বিদায় দিয়ে আমি আমার তল্পিতল্পা গুটানোর যোগাড় করলুম। তার পরে একদিন কুমারকে গিয়ে বলব যে আমার ছুটি চাই। আপাতত হাওয়া বদলের জন্যে পুরী, আর পরে কাজকর্মের সন্ধানের জন্যে কলকাতা। পুরী যাব শুনে মাসীর মুখে হাসি ফোটে। কিন্তু আমার মুখ তেমনি ফ্যাকাশে।

দানবের সঙ্গে লড়াই না করে চলে যাচ্ছি। তার কবলে ফেলে যাচ্ছি একটি অসহায় মানবীকে। কে জানে কী আছে বেচারির কপালে। মনটা হুহু করতে থাকল। গোটা কতক কবিতা লিখে কিছুটা শান্তি পেলুম। কবিতা আজ আমার ডাক শুনে আসে না। তখনকার দিনে ডাকলেই আসত। আমার মাথায় শান্তির হাত বুলিয়ে দিত। আমার একমাত্র প্রিয়া।

কুমারের সঙ্গে দেখা করতে যাব এমন সময় একখানা চিঠি এলো আমার নামে।

ডাকের চিঠি। কিন্তু স্থানীয় ডাকঘরের মোহর দেওয়া। খুলে দেখলুম—আভা। সে কেমন করে জানতে পেরেছে আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে লিখেছে, আমি যেন অমন কাজ না করি। বলেছে, আমি যদি ও কাজ করি তা হলে দেশের লোক আমার সেবা থেকে বঞ্চিত হবে, কারণ আমি যে লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান। জনসাধারণ একজন বান্ধব হারাবে। কারণ আমি যে হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী। পুলিশের স্পর্ধা বেড়ে যাবে, মহকুমা হাকিম ধরাকে সরা জ্ঞান করবে। আর ওই ম্যানেজার। কবি ও চেয়ারম্যান বলে আমার প্রতি ওর ভয়ডর ছিল। আমি চলে গেলে ওর ভয়ডর থাকবে না। কুমার তো খোশামোদের বশ। তিনি কিছু বলবেন না। তা হলে কত লোকের জীবন দুর্বহ হবে। সুতরাং আমি যেন যাওয়া বন্ধ করি।

আভার চিঠি। এ চিঠি আমি কল্পনায় প্রত্যাশা করিনি। চমৎকৃত হলুম। কিন্তু যাওয়া বন্ধ করা কি উচিত? এ রকম একটা দানবের সঙ্গে জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করব? আমার গায়ে কি তার পাপের দাগ লাগবে না? গবর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করব না বলে জেল খাটলুম। ডাকাতের সঙ্গে সহযোগিতা করব। তবু আভাকে ওর কবলে ফেলে যেতে পা উঠছিল না। আভা আমার কেউ নয়। তা হলেও তার চিঠি থেকে মনে হয়, তার জীবন দুর্বহ হবে। আমার অবর্তমানে একটি মানুষের জীবন দুর্বহ হবে, আমি লোকটা এত গুরুত্বসম্পন্ন! তাই তো।

দিদি ওদিকে তলে তলে কলকাঠি টিপছিলেন। একদিন কুমার আমাকে ডেকে পাঠালেন। চুপি চুপি জানতে চাইলেন, কুড়ুলকাঠি ডাকাতির মামলায় হাবু শেখ যে স্বীকারোক্তি করেছে তাতে আমার নাম করেছে কি-না।

আমি লাফ দিয়ে উঠলুম: 'আমার নাম।'

কুমার বললেন, 'হাঁ। তোমার নাম।'

আমি পাগলের মতো বললুম, 'আপনি ভুল শুনেছেন। আমার নাম নয়। আপনার গুণধর ম্যানেজারের নাম।'

কুমার অবাক হলেন। আমি বলে গেলুম, ম্যানেজারের বিরুদ্ধে যা কিছু শুনেছিলুম। তবে তার পারিবারিক জীবন বাঁচিয়ে। কুমার আমাকে বিশ্বাস করতেন। আমি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। কোনোদিন আমি পরনিন্দা করিনে। ম্যানেজার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলে গেল। তিনি উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। কী করবেন স্থির করতে না পেরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, এ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কী?'

আমি ওকথা ভেবে দেখিনি। বলতে পারলুম না তাঁর কর্তব্য।

তিনি বললেন, 'ওকে আমার কলকাতার সম্পত্তি দেখাশুনার ভার দিয়ে এখান

থেকে বদলি করি, কী বলো ?'

আমি বুঝতে পারলুম, এর পরের প্রস্তাব আমাকে ম্যানেজার হতে বলা। চুপ করে শুনে যেতে থাকলুম।

'কিন্তু তুমি কি ম্যানেজারের কাজ চালাতে পারবে, প্রিয়দর্শন ? আর দু'এক বছর পরে তোমাকেই ম্যানেজার করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ এই মুহূর্তে ?'

ম্যানেজার হতে আমার লেশমাত্র স্পৃহা ছিল না। বললুম, 'আমিও তার জন্যে প্রস্তুত নই। ও কাজের জন্যে অন্য লোক খুঁজতে হবে, কুমার।'

তিনি চিন্তিত হলেন। সেদিন আর কোনো কথাবার্তা হলো না। বাড়ী ফিরতে ফিরতে আমার মনে অনুতাপ জন্মাল। কেন করতে গেলুম পরনিন্দা। সত্যি-মিথ্যা নিজে পরখ করে দেখিনি। যদি অবিচার করে থাকি তবে তার প্রতিকার কী। আর ওই রাক্ষসটা যদি জানতে পায়, আমি ওর নামে কী লাগিয়েছি, ও কি আমাকে আস্ত রাখবে।

পরে বোঝা গেল দিদির কারসাজি। তিনিই কুমারের কানে আমার বিরুদ্ধে ও-কথা বলার জন্যে চর নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। চাকরি গেল না আমার, কিন্তু বদলির হুকুম হলো ম্যানেজারের। কলকাতা বদলি শুনে ম্যানেজার মহা খুশি। আনন্দে তার চোখ দিয়ে জল ঝরল। কিন্তু ভান করল দুঃখের। প্রার্থনা জানাল যেন কলকাতার বাড়ীর একটা অংশ ওকে ভোগ করতে দেওয়া হয়। কুমার রাজী হয়ে গেলেন।

দিদি আর একবার এসেছিলেন আমাকে ধন্যবাদ দিতে, আমার কাছে মাফ চাইতে। বললেন, 'তুমি আমার যে উপকার করলে আমি তা কোনো দিন ভুলব না। তুমি যশস্বী হবে। কিন্তু আমি তোমার যে অপকার করলুম সেটা তুমি ভুলে যেয়ো। তাতে তোমার ক্ষতি হলো না কিছু। তুমি থেকে গেলে।'

ব্যাপারটা অত সহজে চুকে গেল বলে আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কিন্তু এর পরে যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য। ম্যানেজার যাবার আগে সতাই একজনকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করাল। তাতে আমার নাম ছিল। আমি নাকি মদ খাই, মেয়েমানুষ রাখি, চোরাই মালের কারবার করি। মহকুমা হাকিম আমাকে তলব করলেন তাঁর বাংলোয়। বললেন, 'আপনার মতো লোকের নামে এসব বিশ্রী উক্তি শুনে আমাদের শুদ্ধু মাথা কাটা যায়। কী করি ! রেকর্ড না করে পারিনে। যা হোক, আমি থাকতে আপনার অনিষ্ট হবে না। কিন্তু কাজ কী আপনার পাঁচজনকে শত্রু করে ? জায়গাটা বেয়াড়া, লোকগুলো ছুঁচো ; আমি বলেই টিকে আছি এখনো। জানেন, মশাই, আমার আগে যাঁরা এস. ডি. ও হয়ে এসেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই অপমান হয়ে বদলি হয়েছেন !

কিংবা বদলি হবার সময় অপমান হয়েছেন।'

মহকুমা হাকিম নথিপত্র ধামাচাপা দিলেন, কিন্তু খবরটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। আমি বাড়ী থেকে বেরনো বন্ধ করলুম। মাসী বললেন, 'চল, পুরী চল। এখানে আর এক দণ্ড নয়। আমি তোর মাসী। আমাকে তোর সঙ্গে জড়ায়। আমি বিষ খেয়ে মরব।'

ম্যানেজার তো গেলই, আমাকেও যেতে বাধ্য করল। চাকরিটা গেল আমারই, তার নয়। সে কুমার বাহাদুরের কলকাতার বাড়ীর এক অংশে গুছিয়ে বসল। কুমারের কলকাতার গাড়ী চড়ে থিয়েটার দেখে বেড়ালো। কোন এক অভিনেত্রীর সঙ্গে তার রসের সম্পর্ক গড়ে উঠল। আর আমি! আমি চোরের মতো কুমারের সেরেস্তা থেকে ছুটি নিয়ে সেই যে সরে পড়লুম আর ওমুখো হলুম না। কুমার আমাকে বার বার চিঠি লিখেছিলেন। আমি ফিরে যাইনি। কয়েক বছর খবরের কাগজে কাজ করার পর আবার উত্তর বঙ্গের টানে কলকাতা ছাড়লুম। কিন্তু আর ও জেলায় নয়। যদিও ওর সঙ্গে আমার প্রথম দর্শনে প্রেম।

প্রিয়দর্শনদার কাহিনী শেষ হলে আমি তাকে আমার সহানুভূতি জানিয়ে বললুম, 'তারপর আভা দেবীর কী হলো কিছু খবর রাখেন?'

তিনি নিঃস্পৃহের মতো বললেন, 'সে সব অনেক দিনের কথা। আভা আমাকে দেখবে বলে বায়না ধরেছিল। পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে, পা ধ'রে মাফ চাইবে। আমি তার চিঠির জবাব দিইনি। দিদিও চিঠি লিখে চাকরির প্রস্তাব করেছিলেন। আমি সে চিঠি দিয়ে সিগারেট ধরিয়েছি। আভার চিঠি কিন্তু আমার কাছে তোলা রয়েছে। বেচারি আভা!'

'আশা করি, পরে তিনি সুখী হয়েছেন।'

'সুখী হয়েছে কি না, ভগবান জানেন। এক বার ওর ছেলেকে পাঠিয়েছিল আমার কাছে। ছেলে তখন কলেজে পড়ে। আমার অটোগ্রাফ চায়। ফোটোগ্রাফ তুলে নিয়ে যায়। শুনলাম তার বাপ অনেক টাকা করেছে। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার। বালিগঞ্জে নিজের বাড়ী। আর তার মা কলকাতার গরম সহ্য করতে পারে না। বছরের মধ্যে ছ'সাত মাস পুরীতে কাটায়। ও নাকি আশা করে যে পুরীতে একদিন আমার দেখা পাবে। ফোটো থেকেই চিনবে। আমার পায়ের ধুলো না নিয়ে তার শান্তি নেই।'

প্রিয়দর্শনদার চোখে জলের রেখা। বললেন, 'গেছলুম পুরী।'

'গেছলেন?' আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'দেখলেন?'

'দেখলুম।' প্রিয়দা চোখ মুছে বললেন, 'সুন্দর মেয়ে আভা। আমার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল। কত কথা বলার ছিল। বলতে পারল না। কাঁদল। আমিও বলতে

চাইলুম দু'এক কথা। পারলুম না। কাঁদলুম। তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলুম। মনে মনে বললুম, না। না। না। এক টুকরো কাগজে ঐ মন্ত্র লিখে দিলুম।'

'তার মানে?'

'তার মানে?' প্রিয়দা দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'তার মানে, হার মানবে না। আত্ম-সমর্পণ করবে না।'

'তার পর?'

'তার পর আর কী? চিঠিপত্র মাঝে মাঝে পাই। চিঠির সুরে হতাশা। বলে, তুমি যে মন্ত্র দিয়েছ তা প্রাণপণে জপ করছি। কিন্তু পেরে উঠছি কই? আমি যে অবলা।'

'আর দেখা হয়নি?'

'পরে বলছি। কিন্তু আমার বাণী যা ছিল তা তো একটি অক্ষরে ব্যক্ত করেছি। কেউ যদি পালন করবার শক্তি পায় তা হলে দেখবে ওই একটি শব্দের শক্তি অসীম। তখন সে আর অবলা বলে করুণা ভিক্ষা করবে না। অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠবে। আমি যে নারীর ধ্যান করি সে পূর্ণ প্রজ্বলিত বহ্নি। সে আছে প্রতি নারীর অন্তরে। সে তো অবলা নয়।'

প্রিয়দা ক্ষণকাল নীরব থেকে বন্দনার মতো গেয়ে উঠলেন, 'কে বলে, নারী, তুমি অবলা! তুমি মহাশক্তিমতী। তুমি মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। তুমি তারায় তারায় দীপ্তিমতী, তুমি উষসী, তুমি সবিতা। তুমি বিদ্যা, তুমি বাক্। তুমি চিন্তা, তুমি কীর্তি। তুমি কবিতা, তুমি গীতি। তুমি বাঁশরি, তুমি বীণা। হে নারী, তুমি ধন্যা।'

দাদা ধ্যানস্থ হলেন। তাঁর ধ্যানের পরশ পেলুম আমিও।

এই ভাবে কতক্ষণ কেটে গেল। দাদা বললেন, 'যার কথা হচ্ছিল তার কথাই হোক। আভার কথা।'

'আর কারো কথা ভাবছিলেন নাকি?'

'এক সঙ্গে অনেকের কথা। দেখতে অনেক। আসলে এক। জগতে একটি নারীই আছে। চিরন্তনী নারী। তারই ধ্যান করছিলুম আমি। তার বিভিন্ন রূপ। বিচিত্র নাম। সব একসঙ্গে এসে চোখের সামনে ভাসছিল। তাদের ঘিরে বিরাজ করছিল একটি নারী, একমাত্র নারী।'

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলুম। মনে হচ্ছিল আমিও যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি। সেই নারীকে, যে সব নারী অথচ এক নারী। এক নারী হয়েও সব নারী।

'আভার কথা বলছিলুম। না? আচ্ছা, তার পরে কী হলো শোন। একদিন কলকাতা গেছি। আভার ছেলে এসে আমাকে খবর দিল তার মা'র অসুখ। আমাকে দেখতে চায়। বেলা তিনটের সময় আমি যেন তাদের বালিগঞ্জের বাড়ীতে যাই। তার

বাবা সে সময়ে থাকবেন না। তাঁর ফিরতে রাত হবে। আমি অনেক বার এড়িয়েছি। এবার এড়াতে পারলুম না। অসুখ শুনে উদ্বেগ বোধ করছিলুম। পরের অসুখ শুনলে আমার মন কেমন করে।'

'তার পর ?'

'তার পর যেতে যেতে চারটে বাজল, বোধ হয় অবচেতন মন দেরি করিয়ে দিচ্ছিল। শিববাবু কী মনে করবেন ! তাঁর অবর্তমানে তাঁর সংসারে অনধিকারপ্রবেশ। কিন্তু অপমান যা করবার তা তো করে রেখেছিলেন। নতুন আর কী করতেন ! তার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়ে গেছলুম। আভার ছেলে মুকুল আমাকে সোজা নিয়ে গেল অন্দরে, তার মা যেখানে রোগশয্যায়। দেখে বুঝতে পারলুম যে এ রোগ এক দিনের নয়, এক দিনে সারবে না। শুনলুম অনেক দিন ভুগছে। সরু সরু দু'খানি হাত তুলে আমাকে নমস্কার করল। বলল, পায়ের ধুলো নেবার শক্তি নেই। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলুম। বেশ জ্বর। বললুম, সেরে উঠবে। ভয় নেই।'

আমার জানতে ইচ্ছা করছিল সেরে উঠল কি না ! কিন্তু চুপ করে শুনতে থাকলুম।

'আভা বলল, ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি আসছে মাঘ মাসে ; ছেলে তো বিলেত যাবে বলে জেদ ধরেছে। আই. এ. পাস করেই আই. সি. এস. পড়বে। আমি তা হলে থাকব কী নিয়ে ? কাকে নিয়ে ? এত দিন সব সহ্য করেছি ওদের মুখ চেয়ে। ওরা চলে গেলে সহ্য করব কার মুখ চেয়ে ? ঠাকুর দেবতা আমি মানিনে। ভগবান আছেন কি না জানিনে। দেশের কাজ করতে সাধ যায়। কিন্তু ঘরে বসে তো ও কাজ করা যায় না। তার জন্য বাইরে যেতে হয়। যেতে দিচ্ছে কে ? বই পড়ে কিছু বল পাই। কিন্তু বই পড়ে তো অন্তরের শূন্যতা ভরে না। বই খেয়ে কি পেট ভরে !'

শুনতে শুনতে আমার চোখ ছল ছল করছিল। বলতে বলতে দাদারও।

'আমার তো বাণী বলতে ওই একটি অক্ষর। তার উপর আর কিছু বলবার ছিল না। আভার মাথায় হাত রেখে মনে মনে জপ করতে থাকলুম, না। না। না। না। না। না। না। আমার মনের কথা তার মনে পৌঁছচ্ছিল ঠিক। আমি টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করি। সে বলল, তোমার মন্ত্র আমি দিনরাত জপ করছি। কিন্তু ওতে বেঁচে থাকার প্রেরণা পাচ্ছিনে। ওটা কি জীবনের মন্ত্র ? না, মরণের ? আমি বললুম, সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে পারলে জীবনের। নয়তো মরণের। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আত্মসমর্পণ করা চলবে না। আভা বলল, কিন্তু আমি যে পারছিনে গো। আমি বললুম, আমি তোমাকে অন্তরে অন্তরে বল দিচ্ছি, যেমন বাবর দিয়েছিলেন হুমায়ুনকে তাঁর আয়ু। সে বলল, তুমি তোমার নিজের জন্যে কিছু রাখছ না ? আমি

বললুম, আমি এ বিষয়ে বেহিসাবী। দিতে দিতে বল যেমন ফুরোয়, তেমনি অন্য কোনো উৎস থেকে আসে। আমি ভগবান মানি।'

আমি শঙ্কিত হয়ে বললুম, 'আপনি কি এমনি করে নিজের আয়ু খরচ করে বসে আছেন, দাদা! ভগবান যদি না থাকেন!'

'না থাকলে আমার পরমায়ু বেশি দিন নয়; কিন্তু তার জন্যে আমার আফসোস নেই। আমি শুধু জানতে চাই যে, সংগ্রাম অবিরাম চলছে. সেনাপতি যেমন জানতে চায় যে সৈনিক প্রাণপণে যুঝছে। যুঝতে যুঝতে যদি মরে যায় তো দুঃখ নেই। দুঃখ, যদি আরামের লোভে আপস করে। যাক, কী বলছিলুম। আভা আমাকে কিছুতেই উঠতে দেবে না। সমস্তক্ষণ চোখে চোখে রাখবে। এক রাশ খাবার নিঃশেষে খাওয়াবে। যতই বলি, এবার আমাকে যেতে হবে, ততই বলবে, না, না, এই তো এখুনি এলে। এরই মধ্যে যাবে! ওদিকে অবচেতন মন আমাকে ঠেলছিল আর তাড়া দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সে-ই জিতল। পাঁচটা বাজল দেখে হুড়মুড় করে উঠে পড়লুম। চোখে চোখে বললুম, ফাইট।'

এর পরে আর একটি কথা জানবার ছিল। দাদা অনুমানে বুঝলেন। বললেন, 'বেঁচে আছে। কিন্তু পারেনি। আবার মা হয়েছে।'

অব্যক্ত বেদনায় তাঁর মুখের ভাব বিকৃত হলো। আমিও মুখ নীচু করলুম।

॥ ছয় ॥

দু'জনেই আমরা অভিভূত। বলতে বলতে প্রিয়দর্শনদা। শুনতে শুনতে আমি। কে কাকে সহানুভূতি জানাবে। চেষ্টা করলুম দু'এক কথা বলতে। মুখে যোগাল না। তাঁর দুই হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিলুম।

তিনি চোখের জল মুছে বললেন, 'ভালো থাকুক আভা। যাতে ওর মঙ্গল হয় তাই হোক। আমার কিন্তু কোনো সান্ত্বনা নেই। আমার দৃষ্টিতে যে মেয়ে হার মানে সে পতিতা।'

আমি চমকে উঠলুম, 'কী বললেন! কী?'

'থাক, তোমার মনে আঘাত দিতে চাইনে। যা বলেছি তা ফিরিয়ে নিচ্ছি, ভাই। ক্ষমা করো।'

কথাটা আমার মনে আজ অবধি খচ্ খচ্ করছে। তখন আমাকে কী পরিমাণ ঘা

দিয়েছিল তা এর থেকে আন্দাজ করতে পারা যাবে।

দাদা বললেন, 'যাক, এ প্রসঙ্গ আর নয়। এই শেষ।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা।'

কিছুদিন পরে পাটনায় আমার ডাক পড়ল সাহিত্যসভায় ভাষণ দিতে। দাদাকে খবর দিতে তিনি বললেন, 'নিশ্চয় যাবে।'

আমি বললুম, 'যেতে ইচ্ছা করছে না। জীবনে যা করতে এসেছিলুম তা করা হয়নি। হাতের কাজ হাতে রেখে লোকের সামনে দাঁড়াব কোন্ লজ্জায়!'

'তোমার তো দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। ও কথা তোমার বেলা খাটে না। খাটে আমার বেলা। আমাকে কিন্তু আজকাল কেউ ডাকে না।' তিনি বিষণ্ণ স্বরে বললেন।

এই নিয়ে আলোচনা হতে হতে এক সময় তিনি বলে ফেললেন, 'পাটনায় কে থাকে, জানো? কুসুমিতা।'

'কুসুমিতা।' আমি কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

'কুসুমিতা। সুমিতা। মিতা। তিনটে নাম ঐ একটি মেয়ের।' দাদা অতীতের স্রোতে অবগাহন করতে করতে তলিয়ে গেলেন।

'সুন্দর নাম।' আমি কতকটা আপন মনে বললুম।

'কী বলছ? হাঁ, সুন্দর নাম। দেখতে কিন্তু তেমন সুন্দর নয়। আভার কাছে লাগে না। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি তেজস্বী। ঝকঝকে তলোয়ারের মতো গড়ন। তেমনি দীপ্তি। ও মেয়ে পথ ভুলে বাংলাদেশে জন্মেছে। রাজপুত হলে মানাত।'

আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে পাটনার কথায় সুমিতার কথা এসে পড়েছে। এখন সুমিতার কথাই চলছে। তাই পাটনার উল্লেখ না করে চুপ করে থাকলুম।

'ওর সঙ্গে অনেক দিন আমার দেখাসাক্ষাৎ নেই। চিঠি লেখাও বন্ধ।' দাদা বললেন।

'জানিনে কেমন আছে। দেখতে কেমন হয়েছে। কাগজে পড়েছিলুম ওরা পাটনায় বদলি হয়েছে। ওর স্বামী ওখানকার বড় অফিসার।'

আমার জানতে ইচ্ছা ছিল নাম ধাম পদ, কোনো এক ছলে আলাপ করে আসতুম। কিন্তু দাদার ইচ্ছা ছিল না জানাতে। তিনি ওই ভদ্রলোকের উপর আগুন হয়ে রয়েছিলেন। তৃতীয় নয়ন দিয়ে ভস্ম করতেন, যদি পারতেন।

'মাঝে মাঝে যে ভূমিকম্প হয় তার কারণ কী জানো! বসুমতী আর সহ্য করতে পারেন না এই সব পাপীদের ভার। আমার তো বিশ্বাস, বেহার ভূমিকম্পের আসল কারণ পাটনায় ওই লোকটার বদলি।'

আমি হো হো করে হেসে উঠলুম। দাদা খাপ্পা হয়ে বললেন, 'একথা গান্ধীজীর

মুখে শুনলে হাসতে ?'

গান্ধীজীর উপর সে সময় আমি খুব প্রসন্ন ছিলুম না তাঁর মুখে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা শুনে। বললুম, 'আচ্ছা, হাসি বন্ধ করছি। তা বলে বেহার ভূমিকম্পের আসল কারণ স্বস্মিতার স্বামী—না, দাদা, হাসি থামছে না।'

দাদা আবার অন্যমনস্ক হলেন। কখন এক সময় আপনা থেকেই বলতে শুরু করে দিলেন স্বস্মিতার কাহিনী। তাঁর আত্মজীবনীর আর এক অধ্যায়।

কুমার রাধিকামোহনের সেরেস্তার কাজ থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতা চলে যাই, বলেছি তোমাকে। কলকাতায় আমার না ছিল চাল, না ছিল চুলো। থাকবার মধ্যে ছিল জনাকয়েক অকৃত্রিম বন্ধু। তারা আমাকে লুফে নিল। তাদের একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, চলছিল কোনো মতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আমাকে ধরে বসল আমি যেন তার সম্পাদনার ভার নিই। গদ্য লেখার অভ্যাস কোনো কালে ছিল না। কিন্তু হাতে যখন একখানা পত্রিকা এলো তখন দেখা গেল গদ্য আপনি আসছে। জ্বালাময়ী ভাষায় প্রাণ খুলে লিখতুম ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে, মনুর শাসনের বিরুদ্ধেও। লোকে দাম দিয়ে আমার কবিতার বই কিনত না, কিন্তু পত্রিকা কিনত। আমার লেখার দাম আছে তা এই প্রথম আবিষ্কার করলুম। প্রথম আবিষ্কারের পুলক আমাকে পাগল করে তুলল। কী যে লিখে যাচ্ছি তার মানেও সব সময় বুঝিনে। বুঝতে বাধ্য হই যখন পুলিশের লোক শাসিয়ে যায় যে, এইবার জামানত তলব হবে। তখন সংযত হই।

এই নিয়ে আছি, এমন সময় এক দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে একটি প্রৌঢ় গোছের লোক এলো। লোকটি ঘরে ঢুকে একবার এদিকে তাকায়, একবার ওদিকে। জানালার কাছে গিয়ে দেখে কেউ বাইরে থেকে আড়ি পাতছে কি না। দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারে, কেউ বাইরে থেকে আসছে কি না। আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'বসুন ঐ চেয়ারে। বলুন কোন্‌খান থেকে আসছেন। লালবাজার, না, ইলিসিয়াম রো ?'

লোকটি অপ্রস্তুত হলো। বুঝতে পারলুম পুলিশের লোক নয়। একটু ইতস্তত করে আমার হাতে একখানা চিঠি গুঁজে দিল। তার পরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কড়িকাঠ গুণতে লাগল। চিঠিখানা খুলে দেখি মেয়েলি হাতের লেখা। যিনি লিখেছেন তাঁর নাম সম্পূর্ণ অজানা। অথচ নীচে লিখেছেন, স্নেহের বোন স্বস্মিতা। পড়ে দেখলুম, আমার সঙ্গে তাঁর কী যেন জরুরী কাজ আছে। আমি যেন তাঁর সঙ্গে অতি অবশ্য দেখা করতে যাই। কলকাতায় তিনি মাত্র কয়েক দিনের জন্যে এসেছেন। বলতে গেলে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই আসা। আমি যেন তাকে নিরাশ না করি। তাঁর যা বলবার আছে তিনি মৌখিক বলবেন। এই লোকটি তাঁর ঠিকানা জানাবে।

চিঠি পড়া শেষ করে লোকটির দিকে তাকালুম। লোকটি বলল, 'দিদিমণি কী

লিখেছেন আমি জানিনে। তবে আমার উপর ভার দিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যাবার। কখন আপনার সময় হবে জানলে আমি নিজে এসে নিয়ে যাব।'

আমি তাকে প্রশ্ন করে বিশেষ কিছু বার করতে পারলুম না। সে যা বলল তার থেকে মনে হলো মহিলাটির খুব লেখার ঝোঁক। দিন রাত লিখছেন তো লিখছেন। কেউ তাঁকে শিখিয়ে দেয় না কেমন করে লিখতে হয়। সেই জন্যে তাঁর লেখা ছাপা হয় না। আমি যদি একটু দেখিয়ে দিই তা হলে তিনি তাঁর রচনা প্রকাশ করতে দেবেন।

আমি বললুম, 'তিনি যদি কিছু লিখে থাকেন আমাকে পাঠালে আমি শুধরে দিয়ে ছাপতে পারি। এর জন্যে আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে কেন?'

'আজ্ঞে, তাঁর যদি উপায় থাকত তিনি নিজেই আসতেন আপনার কাছে। কিন্তু সে কথা আমার বলা বারণ। আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে খরচ যা লাগবে তিনি দেবেন। কিন্তু যাওয়া আপনার চাই-ই। নইলে তিনি হয়তো—'

'হয়তো কী?'

'সে সব আমার বলা বারণ। তাঁর শরীর মোটেই ভালো নয়, কখন কী করে বসেন কে জানে। আমরা তো ভয়ে ভয়ে আছি।'

আমি লোকটা যে এমন দরকারী লোক তা আমার জানা ছিল না। তবু কথা দিতে পারলুম না যে দেখা দেব।

লোকটি অনেক অনুরোধ উপরোধ করল। তার সঙ্গে কথা বলে যত দূর বুঝতে পারলুম মহিলাটি কলকাতা এসেছেন চিকিৎসার জন্যে। উঠেছেন ছোট বোনের বাড়ী। লোকটি ছোট বোনের শ্বশুরকুলের আশ্রিত। প্রকাশ্য পরিচয় সরকারবাবু। পরের বাড়ীতে গিয়ে অপরিচিতার সঙ্গে দেখা করা কী করে সম্ভব! এ কথার উত্তরে সে বলল, 'আপনি তো পর নন। আপনি দিদিমণির দাদা। আপনার নাম শরৎবাবু।'

মিথ্যার আশ্রয় নিতে আমার অন্তরের আপত্তি ছিল। সে বলল, 'মিথ্যা যা বলার তা আমিই বলব। আপনাকে বলতে হবে না। আপনি আমার মুখের দিকে তাকাবেন। আমি আপনার নামধাম নাড়ি-নক্ষত্র জানাব। তারপর একবার দিদিমণির সঙ্গে কথা-বার্তা আরম্ভ হলে আর কেউ সেখানে আসবে না। আমি পাহারা থাকব।'

এমন চমৎকার একটা অ্যাডভেঞ্চার আমার সামনে। ক্ষতি কী, যদি যাই এই লোকটির সঙ্গে? কিন্তু কথা দিতে আমি রাজী হলুম না। মনে হলো, না। কাজ নেই আমার অ্যাডভেঞ্চারে। শরৎবাবু সেজে কোন অন্ধকার গলিতে কার দালানে ঢুকব, সেখানে যদি আমাকে আটক করে রাখে তা হলে উদ্ধার করবে কে আমাকে? কে জানে কার মনে কী আছে?

বললুম, 'দেখুন, আমাকে আর অনুরোধ করবেন না। মিথ্যার অভিনয় করতে আমি

কিছুতেই রাজী হব না। আমার যা সত্য পরিচয় সেই পরিচয় বহন করে যদি আমার যাওয়া সম্ভব হয় তা হলে যেতে পারি কি না ভেবে দেখব।'

সে বলল, 'তা হলে যা হয় একটা উত্তর দিন। আমি যদি খালি হাতে ফিরে যাই দিদিমণি আমার মুখদর্শন করবেন না। তাঁকে আমি কী সান্ত্বনা দেব? আপনার কি দয়ামায়া নেই? বড়ঘরের বৌ, বিপদে পড়ে আপনাকে ডাকছেন, আপনি কি সাড়া দেবেন না? তা হলে ওসব বই কাগজ লেখেন কেন? টাকার জন্যে? কত টাকা চান?'

আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল টাকার কথা শুনে। লোকটার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালুম যে সে চোখ বুজে দু'হাতে মুখখানা ঢাকল। তাড়াতাড়ি একটুকরো কাগজের উপর আমার বক্তব্য লিখে দিলুম। লোকটা তাই নিয়ে বিদায় হলো।

দেখ দেখি কী জ্বালা! সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় রচনা লিখি বলে পাঠিকারা আমাকে ডেকে পাঠাবেন, না গেলে বলে পাঠাবেন, কেন লেখেন? টাকার জন্যে? কত টাকা চান? খ্যাডভেঞ্চারের শখ যেটুকু আমার ছিল এই অশিষ্ট উক্তির পর কোথায় মিলিয়ে গেল। আমি নিজের কাজে মন দিলুম। ভুলে যেতে চাইলুম যে সুস্মিতা বলে কেউ আমাকে দেখতে চেয়েছিল। আমি রাজী হইনি। কিন্তু ভুলে যাওয়া অত সহজ নয়। জীবনে এ ধরনের ডাক কদাচ আসে। কেন ডেকেছে, কী বলতে চায়, কী বিপদ, কী করতে পারি, এসব প্রশ্ন একে একে উদয় হতে লাগল। যে মেয়ে বিপদে পড়েছে তাকে উদ্ধার করতে হবে, পৌরুষের প্রথম কথা হচ্ছে এই। মধ্যযুগের নাইটদের এই ছিল জীবনব্রত। আমরা এ কালের লেখকেরা কেবল কলম চালাতে জানি। তাও পত্রিকার জামানত বাঁচিয়ে। অচেনা মানুষ দেখলেই গোয়েন্দা ঠাওরাই। অজানা জায়গায় যাবার নাম শুনলে ভাবি, ফাঁদ পাতা রয়েছে। আমি প্রিয়দর্শন ভদ্র আর পাঁচজনের চেয়ে বড় কিসে?

তা বলে শরৎবাবু সেজে অন্ধকার গলিতে কে জানে কার বাড়ীতে ঢুকে বোনকে দেখতে চাওয়া! এ যে রীতিমতো নাটক! এর জন্যে আমি প্রস্তুত নই। যদি ধরা পড়ে যাই তো পরের দিন কাগজে বেরোবে কবি ও সম্পাদক প্রিয়দর্শন ভদ্র পরের অন্তঃপুরে অনধিকার প্রবেশ করে প্রহৃত হয়েছেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক। হরি, হরি!

ভেবেছিলুম ব্যাপারটা চুকে গেছে, সুস্মিতা আর আমাকে জ্বালাতন করবেন না। কিন্তু একদিন কি দু'দিন পরে দেখি দুটি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে কাকে খুঁজছে। আমাদের মতো নগণ্য বাংলা পত্রিকা কি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা পড়ে? কই, তাদের তো আমরা গালিগালাজ দিইনি। বা অন্য কোনো উপকার করিনি। কেন তা হলে তারা আমাদের আপিসে জুতোর ধুলো দেয়?

'ওয়েল লেডিজ, আপনাদের জন্যে আমরা কী করতে পারি?' আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

'আপনার নাম কি মিস্টার বাড্রা ? আপনি কি ম্যানেজার ?'

'আমার নাম ভদ্র। আমি এডিটর।'

'ওহ্। আপনাকেই আমরা খুঁজছি। এই নিন আপনার নামে চিঠি।'

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মনে হলো পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্যে ইঙ্গভারতীয় সমাজের কোনো লেখক কিছু পাঠিয়েছেন। বাংলায় ভাষান্তরিত করতে হবে। কিন্তু খুলে দেখা গেল দিব্যি বাংলাভাষায় লেখা। লেখিকার নাম সুস্মিতা।

আমি তো অবাক। চিঠিতে সে আর এক বার অনুরোধ করেছে। আমি যেন নিশ্চয়ই তার সঙ্গে দেখা করি। তার স্বাস্থ্য ভালো নয়। নার্সের সাহায্য নিতে হচ্ছে। নার্স দয়া করে তার পত্রবাহক হয়েছে। পত্রবাহকের হাতে যেন এক লাইন লিখে জানাই যে আমি রাজী। তার পরে যা করবার তা সরকারবাবু করবেন।

নার্স ও তার বান্ধবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হলো। তাদের ধারণা আমি সুস্মিতার সত্যিকারের দাদা। কোনো কারণে তার ওখানে যাচ্ছিনে। আমাকে তারা পুনঃপুনঃ অনুনয় করল আমি যেন আমার বোনের সঙ্গে দেখা করি। শুনলুম, সুস্মিতারা থাকে ল্যান্সডাউন রোডে। সেটা মোটেই অন্ধকার নয়। বরং আমিই থাকি অন্ধকার গলিতে। নিজে অন্ধকারে থাকি বলে অন্ধকার কল্পনা করছি। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স বাখতে পারে যে তার অবস্থা আমার চেয়ে বহুগুণ ভালো। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বৌ নিশ্চয়। আর আমি একজন চালচুলোহীন সাহিত্যিক। আমাকে তার প্রয়োজন। আমার ছেঁড়া জুতো আর আধময়লা ধুতি আর মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি দেখলেই তাদের বাড়ীর দারোয়ান সন্দেহ করবে। তবে হাঁ, সরকারবাবুর বন্ধু বলে পরিচয় দিলে বিশ্বাস করতে পারে।

বললুম, 'আমার কি যাবার জো আছে ? কাগজখানার পিছনে যথেষ্ট সময় না দিলে সেখানা চলবে না ভালো করে। ওয়েল, সিস্টার, আপনি তাঁকে দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন আমি দুঃখিত।' নার্সের বান্ধবীকে কিছু না বললে খারাপ দেখায়, তাই তাকে বললুম, 'মিস্, আপনারা কষ্ট করে এসেছেন বলে আমি উৎফুল্ল।'

বান্ধবীটি মুখরা। সে বলল, 'আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত, মিস্টার বাড্রা। কেমনতর ভদ্রলোক আপনি, দু'জন মহিলা আপনার বাড়ী বয়ে এসে অনুরোধ জানাচ্ছেন, তবু আপনি তাঁদের মুখ রাখবেন না ?'

এতক্ষণে আমার খেয়াল হলো যে মহিলাদের চা দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমার আপিসের ভাঙা পেয়ালায় চা যদি বা দেওয়া যায় টোস্ট মাখন বিস্কুট কোথায় পাই ! অগত্যা উঠতে হলো আমাকে। বলতে হলো, 'আমি সত্যিই লজ্জিত। বিশেষ করে লজ্জিত এইজন্যে যে আমার আপিসে চায়ের আয়োজন নেই। আসুন আমরা বেরিয়ে

পড়ি একটা চায়ের দোকানের সন্ধানে। মহিলাদের সম্মান রাখতে হবে।'

কাছাকাছির মধ্যে ভদ্রভাবে চা খাওয়া যায় শিয়ালদা স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে। সেখানে নিয়ে গেলুম তাদের। ভাগ্য ভালো কোনো পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হলো না। নইলে জবাবদিহি করতে হতো। বিশিষ্ট লেখক প্রিয়দর্শন ভদ্র দু'পাশে দুই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা নিয়ে ইউরোপীয়ান রিফ্রেশমেণ্ট রুমে চা খাচ্ছেন, এটা একটা দেখবার মতো দৃশ্য। খদ্দরের পাঞ্জাবি, তিন দিনের বাসি কাপড়, শুকতলা ক্ষয়ে যাওয়া জুতো। তবে হাঁ, সদ্য ক্ষৌরি করা গোঁফদাড়ি, ব্রাশ দিয়ে আঁচড়ানো চুল। সাবান দিয়ে মুখ-হাত ধোওয়া। প্রিয়দর্শন বোধ হয় অপ্রিয়দর্শন নয়। দশজনের মধ্যে একজন বলে চেনা যায়। এমনি কবিত্বময় তার চেহারা।

চা খেতে খেতে খুলে বললুম আমার অবস্থা। আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে না জেনে-শুনে পরের বাড়ী যাওয়া। তাও হয়তো পারি, কিন্তু দাদা বলে পরিচয় দিতে পারব না। নাম বদলাতে পারব না। এ শুধু ধৃষ্টতা নয়, এটা হচ্ছে প্রতারণা।

নার্স বলল, 'সত্যি তাই।'

বান্ধবী বলল, 'ওহ্, আপনি একটি দেবদূত। তা আপনি স্বর্গে চলে যেতে পারেন, এই ধূলির ধরণীতে আপনাকে মানায় না।'

আমি এর উত্তরে কী বলব ভেবে পাইনে। নার্স বলে, 'কিন্তু আমরা আপনাকে পীড়াপীড়ি করতে পারিনে। মিসেস-কে আমি বুঝিয়ে বলব।'

বান্ধবী বলে, 'কী বুঝিয়ে বলবে ? বলবে হীন ভয়ে আধমরা। এমন পুরুষের উপর আমার করুণা হয়। পৃথিবীর অযোগ্য।'

দেখলুম ওরা উঠল। আমি বয়কে ডেকে বিল চুকিয়ে দিলুম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মুখ তুলে তাকাতে পারছিলুম না। অন্যমনস্ক ভাবে কখন এক সময় ওদের সঙ্গে 'গুড বাই' বিনিময় করলুম।

তারপর আমার খেয়াল হলো যে সুস্মিতার চিঠির জবাব দিতে ভুলে গেছি। ততক্ষণে ওরা ট্রামে উঠে পড়েছে। বাড়ীর নম্বরটা জানা নেই যে লিখে জানাব। কিন্তু জানাবার আছে কী! সম্ভব নয় তা তো বলে দিয়েছি।

ভেবেছিলুম এই শেষ, কিন্তু দিনকয়েক পরে দেখি একজন দারোয়ান গোছের লোক আমার মেসের ঠিকানায় হাজির। দিদিমণির কাছ থেকে চিঠ্ঠি।

খুলে দেখি সুস্মিতা নার্সের মুখে আমার বক্তব্য শুনে আমার আপত্তির কারণ উপলব্ধি করেছে। আমাকে বাধ্য করতে চায় না। কলকাতায় আরো কিছু দিন থাকবে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায়। তার এখনো আশা আছে আমি একদিন রাজী হব। একদিন আমার আপত্তির খণ্ডন হবে। সে ধৈর্য ধরবে। আমাকে শোনাবার জন্যে সে

ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। সে সব কথা চিঠিতে বলা যায় না। কে জানে কার হাতে পড়বে কোন্ দিন সে চিঠি।

এবার এর একটা উত্তর আমাকে দিতে হলো দারোয়ানের হাতে। বললুম, আমারও মনে হয় তার সঙ্গে আমার দেখা হবে একদিন। কিন্তু কোথায় কী ভাবে জানিনে। কাল নিরবধি। পৃথিবী বিপুল। দু-দশ বছর দেরি হলে ক্ষতি কী। দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনলেই তো আর দুর্ভাগ্যের প্রতিকার করা যায় না। শক্তি অর্জন করতে হয়। সেটা সুস্মিতার হাতে।

দারোয়ান আমাকে একটা লম্বা সেলাম করে চলে গেল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম যে সুস্মিতাকে তার চিঠির জবাব দিতে পেরেছি।

ওর সঙ্গে সত্যি আমার দেখা হবে এত বড় দুরাশা আমার ছিল না। আমার কাগজের উপর সরকারের শনির দৃষ্টি পড়েছিল। আমার সহকারীকে ওরা গ্রেফতার করে বর্মায় পাঠিয়ে দেয় সুভাষের সঙ্গে। বোধ হয় ওরা জানত যে আমার যা-কিছু বিষ কলমের মুখে। গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমি নেই। সেইজন্যে আমাকে ধরেনি। তবে জামানত দাবি করেছে। জামানত দিয়ে আমাদের ক'জনের ভাগে যা অবশিষ্ট ছিল তাতে পাওনাদারের বকেয়া মিটিয়ে নিজেদের অন্নবস্ত্র জোটে না। তার চেয়ে জেলে যাওয়া ভালো। সেখানে খাওয়া পরার ভাবনা নেই, পাওনাদারের ভয় নেই। জেলে যাওয়ার জন্যে আমরা ক'জন মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলুম। সেইজন্যে মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে সুস্মিতার দিকে নজর দিতে পারছিলুম না। সেও আমাকে একটু নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ দিয়েছিল।

এমন সময় আবার একদিন এলো সেই প্রৌঢ়মতন লোকটি। সরকারবাবু যার পরিচয়। এবারেও তার সঙ্গে ছিল একখানা চিঠি। নতুন কথার মধ্যে এই যে, সুস্মিতা আর বেশি দিন কলকাতায় থাকবে না। তার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। আমি কি কোনো মতেই আমার মত বদলাতে পারিনে? একটি দুঃখিনী বোনের জন্যে আমার হৃদয়ে কি এতটুকু জায়গা হতে পারে না? আমি যদি রাজী হই সরকারবাবু সমস্ত ব্যবস্থা করবেন।

জেলে যাবার জন্যে যে মানুষ তৈরী হচ্ছে তার পক্ষে একটি অপরিচিতা ভগিনীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা এমন কিছু দুরূহ কর্ম নয়। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। সরকারকে বললুম, 'তা হলে কী করতে হবে, সরকারদা?'

'আমি আপনাকে মোটরে করে নিয়ে যাব ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে। আপনি বাইরে বসবেন। আমি ভিতরে খবর দেব। আমি যা বলব তার জন্যে আমি দায়ী, আপনাকে মিথ্যা কথা মুখে ধরতে হবে না। ভিতর থেকে ডাক আসবে একটু পরে।

মিষ্টি মুখ করবেন। সে সময় পর্দাটা একটু সরিয়ে দিদিমণি আসবেন আপনার সামনে। প্রণাম করবেন আপনাকে। আপনি বলবেন, কেমন আছিস, দেখতে এলুম। তার পরে কথাবার্তা হবে। দিদিমণিকে তখন কেউ বিরক্ত করবে না। বৌদিদি তার ব্যবস্থা করবেন।'

এই তো চমৎকার একটি ষড়যন্ত্র। তবে যে বলছিলুম ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমি নেই। মনে মনে হাসলুম। সরকার বলতে লাগল, 'আপনার আশঙ্কার কারণ নেই। ওঁরা কলকাতার একটি বনেদী বংশ। সম্প্রতি ল্যান্সডাউন রোডে উঠে গেছেন। আগে থাকতেন বাগবাজারে। এখনো সে অঞ্চলে তাঁদের শরিকরা আছেন। আপনি গেলে সুখী হবেন। কেউ আপনাকে অপমান করবে না। আপনার আশীর্বাদে আমাকে সকলে মানে। দারোয়ান তো আপনাকে অভ্যর্থনা করবে। আপনার জন্যে ফুলের মালা আনিয়ে রাখা হবে। আমরা কি জানিনে আপনি দেশের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন?'

॥ সাত ॥

এক একজনের দুর্বলতা এক এক জায়গায়। আমার দুর্বলতা কোন্‌খানে জানো? (দাদা প্রশ্ন করলেন ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন) কেউ যদি বলে আমি দেশের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছি তা হলে যেমন দুর্বল বোধ করি তেমন আর কিছুতে না! তখন আমাকে দিয়ে যার যা খুশি করিয়ে নেয়। সরকারবাবুও আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিল যে আমি যাব।

কথা দিয়ে কথার খেলাপ করিনি কখনো। যেতেই হলো ল্যান্সডাউন রোড। সরকারের সঙ্গে কড়ার ছিল যে, আমি নিজের পরিচয়েই যাব, শরৎবাবুর পরিচয়ে নয়। কেউ যেন আমাকে আমার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত না করে। ওসব চক্রান্ত-টক্রান্তর মধ্যে আমি নেই। তাই যদি পারতুম তা হলে দিদির প্রস্তাবে রাজী হতুম।

বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার কত না গরমিল। আশা করে ছিলুম গেটে দারোয়ান থাকবে, মালা হাতে। সরকার থাকবে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। গেট খোলা। ভিতরে যাবার রাস্তার দু'ধারে বাগান। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দু দিকে দু'খানা বাড়ী। নম্বর আন্দাজ করে তার একখানার বারান্দায় উঠে দাঁড়ালুম। একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চান?'

বাড়ির মালিকের নাম জানা ছিল না। বিপদে পড়লুম! বললুম, 'আমার নাম

প্রিয়দর্শন ভদ্র।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'চিনতে পারলুম না। আপনি কি ছেলেদের টিউটর হতে চান ? কত দূর পড়াশুনা করেছেন ?'

বলতে ইচ্ছা করছিল, মা ধরণী দ্বিধা হও। চলে যাব কি-না ভাবছিলুম। ভদ্রলোক বুঝতে পেরে বললেন, 'কাকে আপনার দরকার বলুন ? ডেকে দিচ্ছি !'

তাও কি জানি যে বলব ! সুমিতাকে দরকার বললে অনর্থ বাধবে। সরকারকে সরকার বললে মান থাকবে না। কী বলা যায় চিন্তা করছি, এমন সময় দুটি ছোট ছোট মেয়ে এসে আমাকে মালা পরিয়ে দিল। নিয়ে গেল উপরে। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ থ' হয়ে দেখলেন। তার পর গম্ভীরভাবে বললেন, 'বুঝেছি। ঘটক !'

মালা পেয়ে মনটা সরস ছিল, নইলে ভদ্রলোকের উপর চটে যেতুম। উপরে আমাকে নিয়ে ওরা একটা ঘরে বসিয়ে দিল। সে ঘরে আর কেউ ছিল না। কী করে থাকবে। বাগবাজারের বাড়ীর যাবতীয় সম্পদ ল্যান্সডাউনের বাড়ীতে ঠাসা হয়েছে। ওটা একাধারে বসবার ঘর, শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর। বোধ হয় খাবার ঘরও।

একটি বারো-তেরো বছর বয়সের সুসজ্জিতা কিশোরী মেয়ে এলো খাবার দিতে। মনে হলো, এরই জন্যে ঘটক আনাগোনা করছে। কে জানে হয়তো ঘটকালির জন্যেই আমাকে ডেকে আনা হয়েছে। তখনকার দিনে যাদের দাদা বলা হতো, আমিও তাদের একজন। আমার হাতে কয়েকটি সোনার চাঁদ ছেলে ছিল। আমি আদেশ করলে তারা কন্যা উদ্ধার করত, কেবল দেশ উদ্ধার নয়। সুমিতা কি তা হলে আমাকে এই জন্যে স্মরণ করেছে !

এতক্ষণ লক্ষ করিনি যে পিছনে একটা পর্দা ছিল। ওপাশে আর একখানা ঘর। সেই ঘরে আর একজন বসেছিল। চুড়ির টুং-টাং কানে আসতেই আমি তার সম্বন্ধে সচেতন হই। ভাবছি সে কে, এমন সময় সে নিজের থেকে বলল, 'দাদা, একটু মিষ্টিমুখ করুন। ওসব বোনের হাতের তৈরী। বাইরের নয়।'

আমি অপ্রতিভ ভাবে বললুম, 'সুমিতা নাকি ?'

'হ্যাঁ, দাদা। আমিই।'

'বেশ, বেশ। শুনেছিলুম শরীর ভালো নয়। ভাবলুম একবার খবর নেওয়া যাক।'

'বড় কষ্ট পাচ্ছি, দাদা। আরো কিছু দিন কলকাতায় থাকতে পারলে হতো, কিন্তু তার তো উপায় নেই।'

'শুনে দুঃখিত হলুম, দিদি।'

এই ভাবে শুরু হলো আলাপ। মাঝখানে একটা মোটা কালো পর্দা। দু'ধারে দুই ভাইবোন। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলুম না। এসব হলো বনেদী ঘরের নিয়ম।

কথাবার্তার সুর মাঝে মাঝে বদলাচ্ছিল। বোধহয় অন্য লোকের যাতায়াতের দরুন। কেউ ও পথ দিয়ে গেলে সুমিতা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে উঁচু গলায় বলে। নইলে নীচু গলায়।

ওর একটা ডায়েরী ছিল। অনেক দিনের লেখা। ঐ বইখানা ও আমাকে দিতে চেয়েছিল। প্রকাশ করার জন্যে নয়। পড়ে দেখার জন্যে। তার থেকে আমি জানতে পারব কী ওর দুঃখ। জানতে পারলে হয়তো বলতে পারব কী করলে ওর দুঃখ দূর হবে। এত লেখকের রচনা পড়ে। একমাত্র আমার উপরেই ওর বিশ্বাস।

বেচারিকে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল যে, লেখার বেলা আমরা ওস্তাদ। কাজের বেলা আমাদের অন্য মূর্তি। চাঁদের উলটো পিঠ দেখলে আমার রচনাও তার বিস্বাদ লাগত।

বইখানা আমাকে দেবার জন্যে সে যখন পর্দাটা একটু ফাঁক করল তখন দেখতে পেলুম তার মুখ। দেহের অসুখ না মনের অসুখ কিসের অসুখ জানিনে। অসুখের বিষাদ ছিল তার মুখে। তা সত্ত্বেও সে মুখ রাজপুতানীর মুখ। ঝকঝকে তলোয়ারের সঙ্গেই তার তুলনা। গনগনে আগুনের মতো তার চাউনি। দীর্ঘকাল অনিদ্রায় ভুগলে চোখের দৃষ্টি এ রকম জ্বলজ্বলে হয়।

সে যে দেহে মনে জলছে তা আমি সেই দিনই বুঝতে পেরেছিলুম আর একটু পরে। তার গল্প সে আভাসে ইঙ্গিতে ও যত কম কথায় পারে তত কম কথায় ব্যক্ত করল আমার কাছে। তার পরে বলল, 'আমি আত্মহত্যা করব না।'

আমি শিউরে উঠলুম।

'নরহত্যাও করব না।'

আমি রোমাঞ্চ বোধ করলুম। সে যে ওসব কাজ পারে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না।

'এই দুটি সংকল্প গ্রহণ করতে আমার অনেক দিন অনেক রাত লেগেছে। এতদিন কলকাতায় থেকে আমি আর একটি সংকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছি। আজকালের মধ্যেই সেটা নেওয়া হয়ে যাবে।'

আমার কৌতূহল জাগছিল, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

সে নিজের থেকে বলল, 'আমি আলাদা থাকব না। এক সঙ্গেই থাকতে হবে। অথচ—'

আমি বুঝতে পেরেছিলুম। তাকে বলতে হলো না। কিন্তু আমাকে চিন্তা করতে হলো। এ মেয়ে যদি স্বামীর ঘর করতে যায় তা হলে কোন্ দিন বিষ খেয়ে মরবে, কিংবা বিষ খাইয়ে মারবে। চিন্তা করতে করতে আমারই মুখ কালো হয়ে গেছল। তার তো বটেই।

আমি বলতে গিয়ে দেখলুম গলা শুকিয়ে গেছে। এক ঢোক জল খেয়ে বললুম, 'কাজ কী তাড়াতাড়ি অমন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে? মানুষ যখন ইচ্ছা এক সঙ্গে থাকবে, যখন ইচ্ছা আলাদা থাকবে। ইচ্ছার স্বাধীনতা যদি না থাকে তা হলে জীবন দুর্বহ হয়।'

'না, না। আপনি বুঝতে পারলেন না। আমি যে আলাদা থাকব না, এর মানে আমি আলাদা থাকতে দেব না। বিশ্রী লাগবে একসঙ্গে থাকতে। প্রতিদিন নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করতে। সে যে কী জ্বালা তা কি আমি জানিনে? পদে পদে আত্মসমর্পণের বিপদ। আর আত্মসমর্পণ মানেই তো আত্মহত্যা। তার পরে আমি কি আর বেঁচে থাকতে পারি! দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।'

সুমিতা কখন এক সময় পর্দার আবরণ সরিয়ে ফেলেছিল। তার দেহ দেখতে পাচ্ছিলুম। দীপশিখার মতো সে জ্বলছিল। সুন্দরী নয়, স্বাস্থ্যবতী নয়, কিন্তু সুমিতা, সুগঠিতা। হায়, এ নারী যদি কুসুমিতা হতো।

আমি বললুম, 'অমন একটা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নাই বা করলে, মিতা।'

মিতা সম্বোধন শুনে সে প্রথমটা সচকিত হলো। তার পরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। 'মিতা', সে ধরা গলায় বলল, 'বড় নিঃসঙ্গ আমি। বড় নিঃসঙ্গ।

কেউ কাঁদছে দেখলে আমারও কান্না পায়। চোখের কোণে জল এসে পড়ে সমবেদনার সঙ্গে বললুম, 'আমিও।' তার পরে যোগ করলুম, 'দূর থেকে দুজনে পরস্পরকে সঙ্গ দেব।'

তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, 'বাঁচালে। আমি তা হলে কালকেই চলে যাই। এখানে একটুও ভালো লাগে না থাকতে।'

দু-চার কথার পর সেদিন আমি বিদায় নিলুম। ডায়েরী আমার বগলে। মিতা বলল 'ও বই আমার প্রাণ দিয়ে লেখা। আমার প্রাণ আছে ঐ কৌটায়। আর কাউকে দিয়ো না। হারিয়ে যাবে।'

আমি তাকে আশ্বাস দিলুম। নামবার সময় মুখোমুখি হলো সরকারবাবুর সঙ্গে। সে মাফ চেয়ে বলল, 'পরের চাকর আমি। হঠাৎ কোথাও পাঠালে 'না' বলতে পারিনে। মালা দিয়ে গেছলুম খুকুমণিদের হাতে। পরিয়েছিল তো ঠিক?'

সেই ভদ্রলোক ইতিমধ্যে আমার পরিচয় পেয়েছিলেন। কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, 'আপনার মতো সজ্জনের পায়ের ধুলো পড়ল আমার অঙ্গনে। কী সৌভাগ্য আমার। চিনতে পারিনি বলে কিছু মনে করবেন না, স্যর। ঘটককেও কতকটা আপনার মতো দেখতে।'

গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেবার সময় সরকার বলল, 'বাবুমশায়ের চোখও কান দুই খারাপ।'

সুমিতার কথা ভাবছিলুম। দারোয়ান যখন 'প্যারে বাবু' বলে সেলাম করল তখন

আমি অন্যমনস্ক। প্রতিনমস্কার করতে ভুলে গেলুম।

সেই প্রথম দেখাই শেষ দেখা। কিন্তু চিঠিপত্র সম্প্রতি কয়েক বছর থেকে বন্ধ। নইলে পত্রালাপের বিরাম ছিল না। সে বোধ হয় ইতিমধ্যে তার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে। কিংবা বিশ্বাস করেছে যে, এ জন্মে এর কোনো সমাধান নেই। যদি না দেশ জুড়ে বিপ্লব হয়, যার যা বাঁধন আছে তা আপনি ছিঁড়ে যায়।

সেদিন বাসায় ফিরে তার ডায়েরীখানার পাতা ওলটালুম। সে লেখিকা নয়, মনের কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। কিন্তু দেখছি তো লেখিকাদের দস্তুর। তাঁরা গুছিয়ে বলতে জানেন বটে, কিন্তু যে কথা বলেন সে তাঁদের মনের কথা নয়। মনের কথা লুকিয়ে রাখাই তাঁদের স্বভাব। সুমিতার বেলা কিন্তু তা নয়। সে যা বলে তা খোলা-খুলি বলে। হাতে রেখে বলে না। সম্পাদক হিসাবে কত লেখিকার লেখা পড়তে হয়। সে সব পড়ে আমি লেখিকাকে পাইনে। কিন্তু সুমিতার বেলা লেখা তুচ্ছ, লেখিকাই আসল। সেই জন্যে সে আমার মিতা।

পরের দিন থেকে ডায়েরীখানা ভালো করে পড়তে আরম্ভ করি। আগাগোড়া পড়ে শেষ করতে আমার কয়েক দিন লাগে। সে তো ডায়েরী নয়। একটি মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়। ইংরেজ কবি অতি দুঃখে লিখেছিলেন, **What man has made of man**! সে মানুষ আর কেউ নয়, নিজের স্বামী, নিজের স্ত্রী।

এদের সম্বন্ধ শুনতে বেশ মধুর ছিল। কী করে যে এরা নিকটতম হয়েও দূরতম হয়ে উঠল সে অনেক কথা। অনেক দিনের ক্রমবিকাশ। ক্রমবিকাশ না ক্রমবিকার? মোট কথা, যা হয়েছে তা একদিনে হয়নি। ক্রমে ক্রমে হয়েছে। ধীরে ধীরে অলক্ষিতে হয়েছে। ভূমিকম্প হঠাৎ হয়, কিন্তু তার প্রস্তুতি অনেক দিন ধরে চলে।

এদের বেলা যে ভূমিকম্প ঘটে সেটাও অকস্মাৎ। একদিন সুমিতা তার নারীসুলভ সহজ বোধ দিয়ে বুঝতে পারল তার স্বামী আর কোনো মেয়ের সঙ্গে সহবাস করেছে। সে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলে, বলো, সত্য কি না?

প্রথমে উত্তর পেল না। তার পরে উত্তর পেল, না। তার পরে বহু পীড়াপীড়ির পর যা জানতে পেল তা ভূমিকম্পের চেয়ে কিসে কম! বরং আরো নিদারুণ।

সুমিতা আশা করেছিল তার স্বামী লজ্জিত হবে, অনুতাপ করবে, মার্জনা চাইবে। প্রতিজ্ঞা করবে যে আর ওপথে যাবে না। কিন্তু তার স্বামী তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিল। এমন ভাব দেখাল যেন সে স্বামীর কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে মহা অপরাধ করেছে। ক্ষমাপ্রার্থনা যদি করতে হয় তবে করতে হবে তাকেই তার অনধিকার চর্চার জন্যে।

হতাশ হলো সুমিতা। হতভম্ব হলো। লজ্জার মাথা খেয়ে সখীদের বলতে পারে না

কী হয়েছে, কেন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। দিদিকে লিখতে পারে না। মা'কে জানাতে পারে না। বিয়ের তু'বছর পুরতে না পুরতে বিয়ের ফুল ভালো করে ফুটতে না ফুটতে এ কী ঘটল তার জীবনে। সে যে মা হয়নি এখনো। স্বামীর সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটাবে কী করে! পারবে কেন। কত দিন পারবে!

তার স্বামী তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এত দিন তাই তো সে জানত। এটা কি বন্ধুর মতো কাজ হলো। বন্ধুর মতো কাজ হচ্ছে। স্বামী কথাবার্তা বন্ধ করেছে এইজন্যে যে সে প্রতিদিন কৈফিয়ৎ চাইবে, তাকে প্রতিবার একই রকম উত্তর দিতে হবে, কথায় কথা বাড়বে। তার চেয়ে চুপ করে নিজের কাজ করে যাওয়া ভালো। স্মিতা কী করে, কী করতে পারে দেখা যাক।

সাজানো সংসার ফেলে হঠাৎ বাপের বাড়ী চলে যাওয়া মুখের কথা নয়। একবার চলে গেলে তার পরে ফিরে আসাও পরাজয় স্বীকার ও প্রশ্রয় দান। তবে কি আত্মহত্যা করলে সকল দাহ জুড়াবে?

ডায়েরীর পাতার পর পাতা আত্মহত্যার প্রসঙ্গে ভরা। আত্মহত্যার পক্ষে ও বিপক্ষে যত রকম যুক্তি থাকতে পারে প্রত্যেকটির উল্লেখ ও বিচার ছিল তাতে, কিন্তু একসঙ্গে নয়। এক এক দিন এক এক রকম চিন্তার উদয় হয়। কোনো দিন ভাবে, আত্মহত্যা যে করবে তার ফলে কার কতটুকু আসবে যাবে? স্বামীর কি শিক্ষা হবে? বৈরাগ্য জন্মাবে? গোবিন্দলালের মতো সোনার ভ্রমর পূজা করবে? মরবার পরে সোনার প্রতিমা হতে কেই বা চায়? কোনো দিন ভাবে, ফলাফল কী হবে না হবে কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না কিন্তু একজন দিনের পর দিন পাপ করে যাবে, আর একজন দিনের পর দিন তা সহ্য করে যাবে, এর একটা সীমা আছে। শেষ সীমায় পৌঁছালে আত্মহত্যাই একমাত্র পরিণাম।

একমাত্র? না, একমাত্র কেন? নরহত্যা বলে আর একটা পরিণাম আছে। অনুরূপ অবস্থায় কেউ আত্মহত্যা করে, কেউ করে নরহত্যা। স্ত্রী যদি রমণী হয় ক'জন স্বামী আত্মহত্যা করে? অনেকেই তো করে নারীহত্যা। আদালতের বিচারে তারা খালাসও পায়। জনমতের বিচারেও। সতীনকে হত্যা করাও তো সনাতন প্রথা। নিজের হাতে করতে হবে না। অপরকে দিয়ে করাতে হবে। ধরা পড়ার চেয়ে ধরা না পড়াই সম্ভবপর। ধরা পড়লেই বা এমন কী ক্ষতি। সাজা হবে, কিন্তু সেটা তেমন সাংঘাতিক নয়।

ডায়েরীর পাতার পর পাতা জুড়ে নরহত্যার পক্ষে ও বিপক্ষে যত রকম তর্ক উঠতে পারে তার উল্লেখ ও আলোচনা। পড়তে পড়তে মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার। লিখতে লিখতে ওর যে হবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে। কয়েক মাসের ডায়েরী কেবল পাগলের প্রলাপ! ও যে পাগল হয়েছিল এবিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে ওর

পাগলামি হিংসাত্মক হয়নি। নইলে নরহত্যা বা আত্মহত্যা একটা কিছু ঘটে যেত।

সব চেয়ে অদ্ভুত কথা, স্বামীর কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। যার হৃদয় আছে তার হৃদয়ের পরিবর্তনও আছে। সে অনুতাপ করে, ক্ষমা চায় দাম্পত্য সম্বন্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে যত্নশীল হয়। কিন্তু এ লোকটা একেবারে পাষাণ। সুস্মিতা একদিন তাকে কাতর ভাবে শুধালো, ওগো বলো আমাকে, আমার কী কর্তব্য। আমি যে আর পারিনে।

সে তার কী উত্তর দিল জানো? শুনলে বিশ্বাস করবে? কখনো কল্পনা করতে পারো?

বলল, তুমি আর কারো সঙ্গে সুখী হতে পারো। আমার সঙ্গে যদি রুচি না হয়।

কেমন, ভায়া, চমকে উঠলে তো? আমিও লাফ দিয়ে উঠেছিলুম। দুনিয়ায় এমন রাক্ষসও আছে। এ যে আভাব স্বামীকেও তার মানায় ডায়েরী ছেড়ে সেদিন আমি পিস্তলের খোঁজ করলুম পুলিশের ভয়ে লুকোনো ছিল ওটা পিস্তলটা হাতে নিয়ে ভাবলুম আমার সোনার চাঁদ ছেলেদের একজনকে দিয়ে বলি, যাও গীতায় যা করতে বলেছে নিষ্কাম ভাবে করো। ফাঁসি হয় তো স্বর্গে যাবে

পিস্তল খুঁজে পাওয়া গেল না। সুকুমার ওটাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রেখেছিল

খানিকক্ষণ লম্ফঝম্প করে আবার ফিরে গেলুম ডায়েরীর পাতায় অবাক হয়ে পড়লুম সুস্মিতাও রিভলভারের জন্য বাড়ী তোলপাড় করেছিল কাকে খুন করত লেখেনি। স্বামীকে, না, সতীনকে না, নিজেকে রিভলভার খুঁজে পাওয়া যায়নি। একটা পেনসিল কাটা ছুরি তুলে নিয়েছিল, কিন্তু তা দিয়ে কাউকে আঘাত করার আগে তার স্বামী তাকে কোলে টেনে নেয় ও আদর করে সে অবশ্য দস্তুরমতো বাধা দেয় কিন্তু শুধু দস্তুরমতো।

বাস্তবিক মেয়েদের দুর্বলতা দেখে দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেছে, ভায়া। ছি ছি ছি। যে মেয়ে এক মিনিট আগে রিভলভার হাতে পেলে অনর্থ বাধাত সেই মেয়ে এক মিনিট পরে একটুখানি ধস্তাধস্তি করে তার পরে—যাক, আমি তো বিয়ে করিনি, আমি তার কী জানি। তুমি জানো।

দাদা বদন বিকৃত করে নীরব হলেন। আমিও লজ্জায় ক্ষোভে অধোবদন।

এই তোমার স্ত্রীজাতি। (দাদা আবার আরম্ভ করলেন) এরই বন্দন করে আমি কবিতা লিখেছি এবং সেই বন্দনায় বিশ্বাস করে জীবনভর কেঁদেছি যাক্ শোনো যা বলছিলুম

সুস্মিতা যে উল্লসিত হয়েছিল তার ডায়েরী থেকে তা বোঝা যায়। কিন্তু কুসুমে কীট থাকার মতো আনন্দে সন্দেহ ছিল। তার স্বামী কি তা হলে অনুতপ্ত। আর কখনো ও

পথে যাবে না! কী জানি! প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। যদি উত্তর না পায়, যদি সেই পুরাতন উত্তর পায়!

কাজ নেই প্রশ্ন করে। প্রশ্ন করতে গিয়েই তো এত কাণ্ড। চোখ বুজে থাকলে তো. বেশ সুখে থাকা যেত। কত মেয়ে চোখ বুজে আছে বলেই সুখে আছে। আগে মা হও, আগে জীবনের বড় বড় সাধগুলো মিটুক, তার পরে প্রশ্ন করা যাবে।

এই ভাবে সুমিতা মনকে চোখ ঠারল। ডায়েরীর পাতা হিসাব করলে দেখা যায় এই ভাবে কাটল দেড় বছর। কত বার তার বুক ঠেলে উঠল সেই প্রশ্ন, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোল না, মুখের আগায় ঝুলল। সে জানত সে প্রশ্নের কী উত্তর, নতুন করে জানবার ছিল না কিছু। জানবার যা ছিল তা বিনা বাক্যেও জানতে পারা যেত। অভিচার থেকে বিরতি!

সে মনে করেছিল একদিন সে মা হবে। মা যদি হয় তা হলে তার সব দুঃখ সার্থক হবে। তার পরে আর স্বামীসঙ্গের প্রয়োজন থাকবে না। সে সীতার মতো তপস্বিনী হবে। কত শত পতিপরিত্যক্তা আছে, তাদের যদি সহ্য হয় তারও হবে।

কিন্তু কই, তেমন তো কিছু ঘটল না। তা হলে কি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষার ধারা কি এই। এমন করে কি মনুষ্যত্ব বাঁচে! যার মনুষ্যত্ব নেই তার নারীত্ব থাকে কী করে! সে তো বিশুদ্ধ স্ত্রীপশু!

অবশেষে সে তার স্বামীকে বলল, 'তোমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই? নিজের সুখ নিয়ে আছ, আর এক জন যে ভরা ভোগের মাঝখানে অসুখী। এটা কি ভোগ, না. দুর্ভোগ?'

স্বামী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, 'তোমাকে সুখী করার জন্যেই আমার চেষ্টা। তুমি যদি সুখ না পাও তবে আর কেন?'

তাদের সম্পর্কের সুতো আবার ছিঁড়ে গেল। তখন সে সাহস করে সেই প্রশ্নটা আবার তুলল। উত্তরে শুনল, 'হিন্দীতে একটি দোঁহা আছে। কবিরের না তুলসীদাসের, ঠিক মনে নেই কার।

চম্পায় হৈ তিন গুণ রঙ্গ, রূপ ঔওর বাস
এক অবগুণ হৈ জো ভ্রমর ন জাওয়ে পাস।

তোমারও তিনটি গুণ আছে। কিন্তু একটি অবগুণ আছে যার জন্যে ভ্রমর তোমার পাশে আসে না।'

সুমিতা জানতে চাইল, 'আমার অবগুণ কী দেখলে তুমি?'

উত্তর পেলো, 'তুমি বড় বেশি ঝাঁজালো।'

সুমিতা অবাক হয়ে বলল, 'ওটা এমন কী দোষের!'

শুনল, 'দোষের কি না জানিনে। হয়তো দোষের নয়। আর কারো কাছে গুণের হয়তো। সুমিতা, তোমার উচিত ছিল আর কাউকে বিয়ে করা।'

সুমিতা রাগ করে বলল, 'তোমারও উচিত ছিল আমাকে বিয়ে না করা। এখন ওকথা বললে চলবে কেন!'

সে দিন ওদের বোঝাপড়া শেষ হলো না। জের চলল দিনের পর দিন। দু'পক্ষে অনেক বক্তব্য জমেছিল। কেবল বক্তব্য নয়, জ্ঞাতব্য। স্বামী কোথায় যায়, কার কাছে যায়, কী তার গুণ, সে কি এক, না, একাধিক। এমনি কত কথা।

শেষে সুমিতা বলল, 'তোমার বিশ্বাস তুমি যা খুশি করতে পারো, কেননা তুমি পুরুষ। তোমার এই বিশ্বাস ঠিক নয়।'

তার স্বামী বলল, 'তুমিও যা খুশি করতে পারো, আমার আপত্তি নেই।'

সুমিতা জ্বলে উঠল, 'কী করতে পারি?'

শয়তানটা বলল, 'যাতে তোমার সুখ!'

তারপর তাদের মধ্যে হাতাহাতি বেধে গেল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত! সুমিতা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'লম্পট। ...নিজে যেমন, মনে করেন সকলে তেমনি!'

॥ আট ॥

তার স্বামী আবার মৌনব্রত অবলম্বন করল।

তার পরে?

তার পরে নিজের করাল রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেল সুমিতা। কে জানে কোন্ দিন খুন করে বসবে স্বামীকে অথবা নিজেকে। তার চেয়ে কোথাও চলে যাওয়া ভালো, যেখানে স্বামী নেই, স্বামীর উপর রাগ করে খুনোখুনির ভয় নেই। চলে যাবার কথা আগেও ভেবেছে, কিন্তু যদি ফিরে আসতে হয় কোন্ মুখে ফিরে আসবে! হয়তো এসে দেখবে তার বিছানায় আর এক জন শুয়েছে। তখন কি সে আঁশ বটি তুলে নিয়ে খুড়ো কুটবে না?

এবার কিন্তু চলে যাওয়াই স্থির করল সে। চলে যাবে, ফিরে আসবে না। যদি না স্বামীর স্বভাব বদলায়। অথবা তার নিজের। স্বামীর প্রথম রিপু, নিজের দ্বিতীয় রিপু। চলে যাবে তার দিদির কাছে কলকাতায়। দিদির সাহায্যে অন্য কোনো পরিবারে শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিয়ে নেবে। ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াবে, সূচীশিল্প শেখাবে, খুব

যে ভালো লাগবে তা নয়, কিন্তু খুনজখম করে জেল খাটার চেয়ে ভালো।

চলে গেল স্মিতা। বাধা পেলো না।

কিন্তু দিদির বাড়ী পৌঁছেই বাধল অসুখ। বুকে ব্যথা। এ ব্যথা তার কোনো দিন ছিল না। এ কি দেহের, না, মনের, না, হৃদয়ের? চিকিৎসা চলল। ডাক্তার এলো, নার্স এলো। খরচ হলো দিদির। তার মানে, জামাইবাবুর। কী করে এ ঋণ শোধ করবে সে? কবে শোধ করবে? এ অসুখ নিয়ে কাজ করবে কার বাড়ীতে? পারবে কেন?

এসব কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে যাবার কথাই ফিরে ফিরে মনে এলো। কিন্তু ফিরে গিয়ে কি এক মুহূর্ত শান্তি পাবে? অশান্ত হৃদয় নিয়ে এক দিন কি আত্মহত্যা করবে না? অন্যথা নরহত্যা? কে জানে কোন্ নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকার মতো দুর্ঘটনাস্থলে!

এমন সময় তার হাতে পড়ল আমার রচনা। মনে হলো তার সঙ্গে কোথায় যেন অদৃশ্য মিল আছে আমার। ইচ্ছা করল আমাকে তার সব কথা জানাতে। তার পরে আমার পরামর্শ জানতে। আশা করেছিল, খুব সংক্ষেপে আমার দেখা পাবে। কল্পনা করেনি যে আমার দেখা পেতে এত দিন লাগবে। ইতিমধ্যে দু'টো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। আর একটা সিদ্ধান্ত বাকি, সেটাও নিতে যাচ্ছে, আমার পরামর্শ চায়। সামনে মহাসঙ্কট। কী যে আছে কপালে। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কে যে কখন উড়ে এসে জুড়ে বসে কে জানে।

ফিরে গিয়ে স্মিতা আমাকে চিঠি লিখল। জানতে চাইল ডায়েরী পড়ে আমার কী বক্তব্য। নিজের সম্বন্ধে জানাল, সাধুরা কণ্টকশয্যায় শুয়ে তপস্যা করেন। সে কণ্টক সহ্য হয়। কিন্তু এ কণ্টক সহনাতীত। মনে মনে সন্ন্যাস নিয়েছি। তবু এক সঙ্গে একশো কাঁটা বিঁধছে। আবার পালাব কিনা ভাবছি। পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু কোথায়! তুমি কি হতভাগিনীকে আশ্রয় দেবে। তোমাদের সঙ্গে আমিও তো দেশের কাজে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারি। বলো তো বোমা ছুঁড়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে রাজী আছি।

স্মিতাকে আশ্রয় দিতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু সে ভাবে তার সমস্যার সমাধান হবে না। কয়েকদিন পরে সে আবার ফিরে যেতে চাইবে। না গেলে তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আর কেউ তার শয্যা অধিকার করবে। তার মন পড়ে আছে তার শয্যায়। হলোই বা কণ্টকশয্যা। বার বার চলে আসবে, বার বার ফিরে যাবে, এ খেলা সে খেলতে চায় তো একা খেলুক, আমাকে বা আমার সহকর্মীদেরকে তার খেলার সাথী করে তার কী লাভ! অমন করে কি দেশের কাজ হয়! বোমা ছুঁড়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে রাজী আছে এমন মেয়ে কি এই একটি! অনেক মেয়ের কাছে আমরা এ প্রস্তাব শুনেছি।

কিন্তু মেয়েদের আমরা বিপদের মুখে ফেলতে চাইনে। তাতে আমাদের পৌরুষ লজ্জা পায়। মরতে হয় আমরা মরব, মারতে হয় আমরা মারব! পুরুষের সঙ্গে পুরুষের সংগ্রাম। নারী কেন পুরুষের স্থান নেবে?

সত্যি, আমার কথাটা ভেবে দেখো! হেসে উড়িয়ে দিয়ো না। মহাত্মাজী তাঁর আন্দোলনে মেয়েদের ডাক দিয়েছেন, কারণ ওটা গণ-আন্দোলন, গণ বলতে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই বোঝায়। কিন্তু আমাদের ওটা আন্দোলন নয়—দ্বৈরথ। সবাইকে আমরা ডাকিনি, ডেকেছি বাছা বাছা জনকতক ছেলেকে। যাদের সঙ্গে ডুয়েল তারা পুরুষ। সুতরাং যারা ডুয়েল লড়বে তারাও পুরুষ। অপর পক্ষে যদি নারী থাকত, এ পক্ষেও থাকত। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওরা নারীর সাহায্য নেয়নি। আমরা কেন নেব? নিলে কাপুরুষতার পরিচয় দেওয়া হবে। আমি যত দিন সম্পাদক ছিলুম তত দিন এ বিষয়ে আমার রায় চূড়ান্ত ছিল। মেয়েদের আমরা আসতে দিয়েছি, কিন্তু ফ্রন্ট লাইনে নয়। ওদের যেমন টেলিফোন অপারেটর, আমাদের তেমনি চিঠিপত্র অপারেটর।

না, নারীকে পুরুষের স্থান দেওয়া হবে না। নারী যদি কোনো কারণে তার নিজের স্থান হারায় তবে তাকে স্বস্থানের জন্যে জীবনপণ করতে হবে। সুমিতাকে লিখলুম, আমাদের আনন্দমঠে শান্তি বা কল্যাণীর স্থান নেই। আশ্রয় এখানে হবে না। তোমার সংগ্রাম সব দেশের সব যুগের সব নারীর সংগ্রাম। সে সংগ্রামে ভঙ্গ দিয়ে কেন তুমি আসতে চাও বাংলা দেশের বর্তমান কালের মুষ্টিমেয় ক্ষত্রিয় যুবকের সংগ্রামে? তোমার সংগ্রামে তুমি আমাদের সহানুভূতি পাবে। আমাদের সংগ্রামে আমরাও পাব তোমার সহানুভূতি। কিন্তু কেউ কারো স্থান নেবে না। তুমি আমার মিতা, আমি তোমার মিতা। কিন্তু আমার স্থান তোমার নয়, তোমার স্থান আমার নয়। তোমাকে তোমার স্থানেই থাকতে হবে। তার মানে এ নয় যে, স্বামীর বাড়ীতেই থাকতে হবে। ইচ্ছা করলে দিদির বাড়ী যেতে পারো, কিন্তু উদ্দেশ্য হবে স্বস্থানের জন্যে সংগ্রাম। খোরপোশের মামলা চালাতে পারো, চালাতে পারো আইনত স্বতন্ত্র থাকার মামলা। এসব যদি পছন্দ না করো তা হলে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করো। প্রতিজ্ঞা করো যে স্বামীর অন্ন গ্রহণ করবে না। সন্ন্যাসের প্রতিজ্ঞা তো ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছ।

সুমিতা এর উত্তরে কী লিখল, জানো? লিখল, ওটা আমার প্রতিজ্ঞা নয়, ওটা আমার প্রতিক্রিয়া! তবে আত্মসমর্পণ করব না, এটা স্থির। তারপর স্বাবলম্বন সম্বন্ধে যা বলেছ, তার জবাব এই যে, স্বামীর বাড়ীতে থেকে স্বাবলম্বী হওয়া যায় না। স্বাবলম্বী হতে হলে অন্যত্র যেতে হয়। কিন্তু আমি যদি অন্যত্র যাই আমার জায়গা বেদখল হবে। অন্তত সেই কথা ভেবে মন খারাপ হবে। বুকের ব্যথায় কষ্ট পাব। তবে যদি দেশ আমাকে ডাক দেয় তার একটা উন্মাদনা আছে। উন্মাদ হয়ে ঝাঁপ দিতে পারি; বাঁচি

আর মরি ! সেইজন্তে তো এত করে বলছি, আমাকে তোমরা ডাক দাও। আমি দেশের কাজে ঝাঁপ দিই। ফাঁসিকাঠে ঝুলে আমার সকল যন্ত্রণা জুড়াক। আর যদি বেঁচে থাকি তো সেটা হবে বাঁচার মতো বাঁচা। তার স্বাদ পেলে কেউ কূলে ফিরে আসার কথা ভাবে না।

সত্যি তাই। আমি যদি সুমিতা হতুম আমিও তাই লিখতুম। তা বলে আমি তাকে ডাক দেবার কে ! আমি কি দেশ ! ফিরে যাবার পথ খোলা না থাকলে সে যে কোথায় তলিয়ে যাবে কে জানে ! ফাঁসিকাঠে ঝোলা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তার কপালে হয়তো আছে কারাবাস। কারাগার থেকে বেরিয়ে কোথায় দাঁড়াবে সে ? কে তাকে আশ্রয় দেবে ? স্বাবলম্বনের জন্তে কী করতে পারে সে ? মরবে তো হাসপাতালে যক্ষ্মায়। নয়তো আবার সেই স্বামীর ঘরে সতীনের ঝাঁটায়।

আমি বিশ্বাস করতুম সব সমস্থার সমাধান আছে ! খুঁজলে পাওয়া যায়। কিন্তু সুমিতার সমস্থার সমাধান কী ? খুঁজে তো পাইনে। আমার বিশ্বাসের মূলে ঘা লাগল। তবে কি এর কোনো সমাধান নেই ? না, আছে সমাধান। দেশ যদি ডাক দেয় তাহলে সে ঝাঁপ দিয়ে বাঁচবে। সেই যে জীবন তার মধ্যে মরণও আছে, আছে ব্যাধি, আছে জরা। তবু তা অমৃত। একবার যে তার স্বাদ পেয়েছে সে চিরকালের মতো সুখী হয়েছে, তৃপ্ত হয়েছে। কিন্তু আমি তো দেশ নই। আমি ডাক দেবার কে ! গল্প লিখতে লিখতে আমি হয়ে উঠেছি নীরস নীরেট গদাই লস্কর। তাই গদাই লস্করী ভাষায় লিখি, স্বাবলম্বিনী হতে চেষ্টা করো।

মোট কথা, সে চায় আত্মবিসর্জন। তার জন্তে আগেকার দিনের ব্যবস্থা ছিল ধর্মের ডাক শুনে সর্বস্ব ত্যাগ। মীরাবাঈ তার ক্লাসিক উদাহরণ। আজকের দিনে সে ব্যবস্থা নিষ্প্রভ। এখন চাই নতুন কোনো ব্যবস্থা। কে তার কথা ভাবছে ! আমি একা কত ভাবব।

বলতে বলতে প্রিয়দর্শনদা অন্যমনস্ক হলেন।

সুমিতার কাহিনী শুনতে শুনতে আমিও অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। আমার মতে এ সমস্থার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমাধান বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ। সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের মেয়েরা এ নিয়ে এত জলে পুড়ে মরে না। তারা স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায়। স্বামীর ভাত খায় না। তার পরে আর কাউকে সাঙা করে। সমাজ তা নিয়ে হৈ চৈ করে না। তাদের অসতী বলে না। যত কিছু ফ্যাসাদ আমাদের তথাকথিত উচ্চস্তরকে নিয়ে। আমাদের নীতিবোধ কেবল মেয়েদের বেলা সক্রিয়। তাই যত রকম উদ্ভট সমাধান উদ্ভাবন করতে হয়।

বললুম, 'দাদা, আপনার কতকগুলো প্রচ্ছন্ন সংস্কার আছে। সেইজন্তে আপনি

সরলকে জটিল করে নতুন নতুন ধাঁধা তৈরী করছেন। সুমিতার স্বামী আপনার চেয়ে সোজা মানুষ। সে তার স্ত্রীকে সোজা বলে দিয়েছে তুমি আর কারো সঙ্গে সুখী হতে পারো।'

দাদা ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'নিজে জাহান্নামে গেছে, তাই যথেষ্ট নয়, আর একজনকে জাহান্নামে পাঠাবে? না, না, না, না, না। তা কিছুতেই হবে না।'

'তা হলে আপনি অষ্টম এডওয়ার্ডকে নিয়ে কবিত্ব করতে যান কোন্ মুখে?'

'ও কথা,' দাদা মাথা চুলকে বললেন, 'অসাধারণদের বেলা খাটে। আমরা সাধারণ লোক। আমাদের বেলা অন্য নিয়ম।'

আমি হেসে বললুম, 'দাদা, প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখুন। সমগ্র প্রাণীজগতে ব্রহ্মচর্যের মতো অসাধারণ আর কী আছে? অথচ এই হলো আপনার ব্যবস্থা আভার মতো সুমিতার মতো সাধারণ মেয়ের জন্যে।'

দাদার চোখে জল দেখা দিল। তিনি ভারী গলায় বললেন, 'ভাই, আমি কি তা বুঝিনে? কিন্তু নারী যে তা হলে ছোট হয়ে যায় আমার চোখে। যে ছোট আমি কি তার বন্দনা গাইতে পারি। তুমি পারো?'

'আমার চোখে ছোট হয় না। তাই আমি পারি।' আমি বললুম।

দাদার কাহিনীর খেই হারিয়ে গেছল। খেই খুঁজে পেয়ে হাতে নিলেন।—

যা বলছিলুম। সুমিতা জেদ ধরল কলকাতায় আসবে, আমার সঙ্গে থাকবে, দেশের কাজে ঝাঁপ দেবে। কণ্টকশয্যা আর তার সহ্য হচ্ছে না। সারাক্ষণ হুল ফুটছে। আমি যদি 'না' বলি তা হলে সে রেল লাইনে মাথা পেতে দেবে। ভাবনায় পড়লুম।

আমার সহকর্মী সুকুমার ধরা পড়েছিল বলেছি বোধ হয়। তাকে ওরা মাণ্ডালে পাঠায়। আমার বিরুদ্ধে তেমন কোনো অভিযোগ ছিল না। ওরা আমাকে ধরল না, কিন্তু আমার কাগজের কাছে জামানত চাইল। জামানতের টাকা দিতে পারি এমন অবস্থা আমাদের নয়। কাগজ উঠে গেল। সম্পাদক তা হলে কিসের সম্পাদনা করবে। আমার প্রয়োজন ফুরোল। বন্ধুরা বলল, তুমি এবার চাকরির চেষ্টা দেখ। চাকরির জন্যে আমাকে চোখে সরষে ফুল দেখতে হলো। কিন্তু সেই যে কিছু দিন উত্তর বঙ্গে জমিদারি চালিয়েছিলুম। সেই থেকে আমার কিছু সুনাম হয়েছিল। উত্তর বঙ্গের আর এক জায়গায় কাজ জুটে গেল। জমিদারির কাজ।

কাজ নিয়ে যখন আমি কলকাতা ছাড়ি তখন সুমিতাকে লিখি, লোকনিন্দার ভয় আমার নেই। তোমার যদি না থাকে তুমি আমার সঙ্গে আমার মাসীমার সঙ্গে যত দিন খুশি থাকতে পারো। ছোটখাট একটা মেয়েদের স্কুল চালাবে। সেও দেশের কাজ। তবে তাতে খুনজখম ফাঁসি ইত্যাদি নেই। কেমন, রাজী?

সুমিতা এর কোনো উত্তর দিল না। বোঝা গেল, রাজী নয়। পরে তার সঙ্গে আমার আরো অনেক দিন চিঠি লেখালেখি চলেছিল। কিন্তু আমার কাছে আসতে চায়নি। আমিও বলিনি। ধীরে ধীরে পত্রবিনিময় বন্ধ হয়ে যায়। শেষ চিঠি কে লিখেছিল মনে নেই। হয়তো সুমিতা। সে সব চিঠি মনে রাখবার মতো নয়।

তুমি তো পাটনা যাচ্ছ। তার খবর নিতে পারো। দেখা করলেই বা ক্ষতি কী। হুঁ! তার স্বামী কী মনে করবে। ঠিক। তবু জানতে ইচ্ছা করে ও কেমন আছে। কী ভাবে ওর সমস্যার সমাধান হয়েছে। আশা করি আভাব মতো নয়!

এর দিন কয়েক পরে আমি পাটনা যাই। পাটনায় সুমিতার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি, কিন্তু তার খবর নিয়েছিলুম। শুনলুম তার স্বামীর সঙ্গে সে রোজ ক্লাবে যায়, টেনিস খেলে। বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে তারা সুখী দম্পতি নয়। বা তাদের সম্বন্ধ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নয়। তবে তাদের ছেলেমেয়ে হয় নি। এর থেকে দাদার অনুমান, সুমিতা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনি। আমার অনুমান, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়নি! মুরগী খায় না, কেন না, পায় না। দাদাকে এ কথা বলায় তিনি আমার উপর অগ্নিশর্মা।

'মেয়েদের প্রতি তোমার একটুও ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। তুমি নাইট নও।' তিনি জ্বলে উঠলেন।

আমি অনুযোগ করলুম। বললুম, 'আমি তো বহুবচন ব্যবহার করিনি। সুমিতার কথা হচ্ছিল। আর কারো কথা নয়।'

'তোমার মনোভাব দেখে মনে হয় তুমি তপস্বিনীদের প্রতি সশ্রদ্ধ নও। সেইজন্যে আমার ভরসা হয় না তোমার কাছে আর কারো কথা বলতে।' দাদা একটু নরম হলেন।

'আর কারো কথা বলতে ইচ্ছা করেন নাকি?' আমি কৌতূহলী হলুম।

দাদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'হায়! আমার হাতে যদি জরীন কলম থাকত আমি নিজেই লিখতুম সে সব কাহিনী। তোমার কাছে জরীন কলম আছে, কিন্তু তোমার মনে ভক্তিশ্রদ্ধা নেই, তুমি পরিহাস করতে পটু। উঃ, কী ভয়ানক কথা! মুরগি খায় না, কেননা পায় না। তোমার কি দয়ামায়া নেই! কত দুঃখ ঐ মেয়েটির। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়।'

'কই, সে কথা তো কেউ বলল না, বরং শুনলুম বেশ মোটা হয়েছে।'

'মোটা হয়েছে! থাক, থাক! আর ও প্রসঙ্গ নয়। আমি ওকে দয়া করি।'

আমি গম্ভীরভাবে বললুম, 'দাদা, মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি বলেই দয়া করিনে। যাকে দয়া করি তাকে শ্রদ্ধা করতে পারিনে। আমি যদি সুমিতা হতুম তা হলে অমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করতুম না, পালিয়ে গিয়ে আর কাউকে নিয়ে ঘর করতুম। তখন আমার

না

এক রাশ ছেলেমেয়ে হতো।' যোগ করলুম, 'তারা সত্যকুলজাত।'

প্রিয়দর্শনদা কানে আঙুল দিয়ে বললেন, 'না, না, অমন করলে নারী আমার চোখে ছোট হয়ে যাবে। কী করে তাকে বন্দনা করব!'

'ছোট হয়ে যাবে কী! ছোট হয়ে গেছে।' আমি নির্মমভাবে বললুম, 'স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ এমন নয় যে একজন বাইরে ভোজ খেয়ে বেড়াবে, আর একজন ঘরে খিল দিয়ে উপবাস করবে। কেউ যদি তা করে তা হলে সে শ্রদ্ধার পাত্রী নয়, করুণার পাত্রী। দাদা, আপনি তাকে দয়া করেন, দয়া করেন বলেই বন্দনা করতে পারেন না।'

'কী জানি!' দাদা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বললেন, 'যে মেয়ে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করল না, দিনের পর দিন প্রলোভন দমন করল, জয় করল প্রথম রিপুকে, দ্বিতীয় রিপুকেও, তাকে যদি শ্রদ্ধা না করি তো শ্রদ্ধা করব কাকে! হাঁ, দয়া করি, কিন্তু শ্রদ্ধাও করি।'

বাস্তবিক, এ কিছু সামান্য কাজ নয়, এই দিনের পর দিন আত্মরক্ষা ও আত্মসংবরণ। আমি নত হয়ে বললুম, 'তা ঠিক। সুমিতা অসাধ্য সাধন করেছে। কিন্তু নিরর্থক এ তপস্যা ঊর্ধ্ববাহুর মতো। এর চেয়ে কত না ভালো হতো যদি সে আর কারো সঙ্গে সুখী হতো! তখন তাকে আমি বন্দনা করতুম। বলতুম, এই তো পরিপূর্ণ নারী।'

দাদা মাথা নাড়লেন। বললেন, 'না, না, না।'

নারীত্বের আদর্শ নিয়ে প্রিয়দর্শনদার সঙ্গে আমার মতভেদ উভয়কে পীড়া দিল। নারী তেজস্বিনী হবে, অসম্মান সহ্য করবে না, অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে, এই পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু নারী তপস্বিনী হবে, অন্য পতি গ্রহণ করবে না, বন্ধ্যা হবে, তাঁর সঙ্গে এত দূর যেতে আমি নারাজ। অবশ্য যে ক্ষেত্রে প্রেম আছে সে ক্ষেত্রে প্রেমের আদর্শ নারীত্বের আদর্শকে অতিক্রম করবেই। পৌরুষের আদর্শকেও। কিন্তু যে ক্ষেত্রে তা নেই সে ক্ষেত্রে পুরুষকে তো কেউ তপস্বী হতে বলে না, অন্য বিবাহ করতে নিষেধ করে না, অপুত্রক হতে প্রশ্রয় দেয় না। তা হলে নারীর বেলা কেন ভিন্ন বিধান?

এর পরে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ কমে এলো। কিন্তু মনে হলো দাদার মন ভারাক্রান্ত। সেখানে মেঘের পর মেঘ জমেছে। বর্ষণের জন্যে উন্মুখ হয়েছে। অথচ আমার দিক থেকে আগ্রহ না দেখলে তিনি মনের ভার লাঘব করবেন না। সেই জন্যে এক দিন আমিই তাঁর ওখানে হাজির হলুম।

বললুম, 'উত্তর বঙ্গে আবার কাজ নিয়ে নতুন কোনো বিপদে পড়তে হয়নি আশা করি।'

'বিপদ!' তিনি চোখ বুজে বললেন, 'বিপদ আমার জীবনের পদে পদে। কিন্তু কোন ধরনের বিপদের কথা শুনতে চাও? যে রকম শুনেছ?'

আমি বললুম, 'আচ্ছা।'

তিনি যেন এরই অপেক্ষায় ছিলেন। দেখতে দেখতে শুরু করে দিলেন :

উত্তর বঙ্গের এবার যেখানে যাই সেখানে আমার জন্যে বাগানবাড়ী বরাদ্দ ছিল না। মালিক ছিলেন সাহা মহাজন থেকে হঠাৎ জমিদার। আগে তার নাম ছিল নিধুবনচন্দ্র সাহা। তার পর হয় নিধুবনচন্দ্র সাহা রায়। শেষ হলো নিধুবনচন্দ্র রায়। আমি যে সময় যাই সে সময় তিনি রায় বাহাদুর হবার সাধনা করছেন। রাজপুরুষদের সঙ্গে তার মহরম মহরম চলছে। তিন তিনটে গেস্ট হাউস খুলেছেন। একটা সাহেবদের জন্যে, একটা হিন্দুদের জন্যে, একটা মুসলমানদের জন্যে। কোনো রাজপুরুষের নামে ইস্কুল করে দিয়েছেন, কারো নামে ডাক্তারখানা। কালেক্টার সাহেবের মেমসাহেবের পদার্পণ চিরস্মরণীয় করতে একটা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলো। সেটা আমার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা। কেন বলছি।

আমার উপর ভার পড়ল শিক্ষয়িত্রী সন্ধান করবার। আমি চিঠি লিখলুম সুমিতাকে। সুমিতা জবাব দিল না। অগত্যা আমাকে বিজ্ঞাপন দিতে হলো কলকাতার সংবাদপত্রে। বিজ্ঞাপনের উত্তরে এলো খান কয়েক আবেদন। কিন্তু আবেদনকারিণী বলতে একজন কি দু'জন। আর সকলে আবেদনকারী। অদ্ভুত ব্যাপার। স্পষ্ট লেখা ছিল শিক্ষয়িত্রী চাই। অথচ আবেদন করছেন পুরুষ। একজন লিখলেন তিনি ও তাঁর স্ত্রী দু'জনে মিলে পড়াবেন। যদিও তাঁর স্ত্রী কোনো দিন স্কুলে পড়েননি। কমিটির সভ্যেরা বললেন শিক্ষিতা মহিলারা যখন চাকরি করতে রাজী নন বোঝা যাচ্ছে, তখন শিক্ষিত বেকার পুরুষদের একটা সুযোগ দেওয়া কর্তব্য, কেবল এইটুকু দেখলেই চলবে যে তাঁরা বিবাহিত। আমি বললুম তা হতে পারে না। মেয়েদের ইস্কুল মেয়েরাই চালাবেন। শিক্ষিতা মহিলারা যদি রাজী না হন তা হলে ইস্কুল ক্রিশ্চান মিশনারীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাঁরা যেমন করে হোক শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করবেন।

ভাবী রায় বাহাদুর আমার পরামর্শ অনুমোদন করলেন। কমিটির সভ্যেরা আমার উপর রুষ্ট হলেন। কিন্তু প্রাণ ধরে ক্রিশ্চান মিশনারীদের হাতে বিদ্যালয়টাকে সঁপে দেওয়া যায় না। সেইজন্যে আমার উপর ছেড়ে দিলেন যেমন করে হোক শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহের দায়িত্ব। আমি ব্রাহ্ম বন্ধুদের চিঠি লিখলুম। ক্রিশ্চান আলাপীদেরও চিঠি লিখতে ভুললুম না। হিন্দু বিধবাদের আশ্রম খুঁজেপেতে সেখানেও তদ্বির করলুম। ফল কিছু কিছু পাওয়া গেল। হেড মিসট্রেস হলেন এক ক্রিশ্চান মহিলা। কালেক্টার সাহেবের মেমসাহেব যাতে খুশি হয়ে সাহেবকে বলেন রায় বাবুকে রায় বাহাদুর করা কি খুব বেশি অন্যায় হবে?

শিক্ষয়িত্রীদের স্থান একে একে পূরণ করা হলো, শূন্য থাকল কেবল একটিমাত্র স্থান। তার জন্যে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আমাকে বলে রেখেছিলেন যে সামনের বছর

ভার্নাকুলার ট্রেনিং পাশ করলে তাঁর কন্যাকে যেন সেই পদে নিয়োগ করা হয়। আমিও মৌন থেকে সম্মতির লক্ষণ দেখিয়েছিলুম। এই তো অবস্থা। এমন সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বাড়ীতে এলো একটি মেয়ে। বয়স কম নয়। তিন ছেলেমেয়ের মা। হাঁ, হিন্দু।

মেয়েটি আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, 'দাদা, বড় বিপদে পড়ে আপনার শরণ নিতে এসেছি। শরণাগতাকে ফিরিয়ে দেবেন না।'

চাকরি চায়। কিন্তু পড়াশুনা উচ্চ প্রাথমিক পর্যন্ত। তবে বাড়ীতে ম্যাট্রিকের বই পড়েছে। প্রাইভেট ম্যাট্রিক দেবার ইচ্ছা আছে। আমার লেখার একজন ভক্ত। আমার পত্রিকাও নিয়মিত পড়ত। দূর থেকে আমাকে দাদা বলে পূজা করে এসেছে। কিন্তু এমন বিপদে পড়তে হবে ও বিপদে মধুসূদনের মতো বিপদে প্রিয়দর্শনের নাম নিতে হবে তা কি তখন জানত!

নীলনয়না তার নাম। কেউ ডাকে নীলা, কেউ ডাকে নয়না। একটু আধটু লেখার শখও আছে। পাঠিয়েছিল আমার কাগজে কয়েকটি কবিতা। ছাপা হয়নি, ফেরত গেছে। আমি নাকি লেখার নীচে লিখেছি, শুধু আন্তরিকতা থাকলে কী হবে, ধ্বনি থাকা চাই। আমার মন্তব্য তার কাছে আছে। বাঁধিয়ে রেখেছে। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছে। আপাতত কবিতার কথা ভাবছে না। সে জন্যে আসেনি। এসেছে চাকরির জন্যে। চাকরি না পেলে বাড়ী ফিরে যাবে না, বাড়ী আর তার বাড়ী নয়। যাবে নদীর জলে ডুব দিতে।

॥ নয় ॥

চাকরি করতে যারা চায় তাদের অবস্থা দেখে বোঝা যায় কেন চায়। কিন্তু নীলনয়নার দিকে তাকালে একথা মনে হয় না যে তার অবস্থা ভালো নয়। এক-গা গয়না, জমকালো শাড়ী, সিঁদুর জলজল করছে কপালে ও সিঁথিতে। কী এমন হয়েছে যে চাকরি করতে হবে এই লক্ষ্মীপ্রতিমাকে!

বললুম, 'বোন, চাকরি যদি তোমাকে দেওয়া হয় তা হলে গরীবের মেয়েরা যাবে কোথায়! বিধবাদের গতি কী হবে!'

এর উত্তরে সে যা বলল তা অনেক দুঃখ না পেলে কেউ কাউকে বলে না। অনেক দুঃখ আর গভীর দুঃখ। তার সঙ্গে কবিসুলভ বাচনরীতি।

'দাদা, অপমানের তীব্রতম বিষে আমি অনুক্ষণ জ্বলে পুড়ে মরছি, কিন্তু মৃত্যুর শীতলতা আমার জন্যে নয়। আর এ কাঙালপনা এই ভিক্ষুকের বৃত্তি আমার সহ্য হয় না। এই ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট গ্রহণের মতো হীন লজ্জায় ঘৃণায় আমার আত্মধিক্কারের শেষ নেই।

'আত্মীয় স্বজন চায় শুধু নিঃশব্দে সয়ে যাওয়া, যতটুকু পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট মনে করা। কিন্তু আমি সীতা সাবিত্রীর মতো আদর্শ নারী নই। আমার মর্যাদাবোধ আমাকে অনুক্ষণ গৃহত্যাগে প্রেরণা দিচ্ছে, কিন্তু আমি দুর্বলচিত্ত, সন্তানের জননী, তাই দুর্বল। তাই আজ আমি আপনার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি। আপনি যদি পারেন আমাকে একটি কি দুটি সন্তান নিয়ে কোথাও স্বাধীন ভাবে জীবিকা-অর্জনের সুবিধে করে দিন। কারুর অনুগ্রহপ্রার্থী হতে আমি চাইনে। নিজের ক্ষত-বিক্ষত পরিশ্রান্ত মন নিয়েই যতটুকু পারি খেটে খাব। স্বচ্ছন্দে না হোক, স্বাধীন ভাবে জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টি কোনো রকমে কাটিয়ে দেব, এই আমার ইচ্ছা। দুঃখ বেদনা আঘাত সমস্ত জীবন ভরে অনেক তো পেয়েছি, অপমান অমর্যাদা লাঞ্ছনা তাও তো কম সহ্য করিনি। বিশ্বাসের বদলে পেয়েছি প্রতারণা, আত্মসমর্পণের নামে পেয়েছি আত্মা হতে প্রিয়তরের কাছ থেকে ভিক্ষার ঝুলি। মেয়েদের জীবনে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আর হয় না।

'তার পরে অনভিজ্ঞা বালিকার সরল অকুণ্ঠিত মনের উপর মিথ্যার ছলনার বলে অধিকার স্থাপন করে তাকে সর্বহারা করা কত বড় কৃতঘ্নের কাজ। যাক, নিষ্প্রয়োজন তার সমালোচনা। আপনার অনেক প্রভাব, অনেক প্রতিষ্ঠা। কোথাও একটা ব্যবস্থা কি আমার করে দিতে পারেন না? আত্মীয় স্বজন আমার বিন্দুমাত্র বিদ্রোহও সহ্য করবে না। আমার দুঃখে বেদনায় বিচলিত হবে না। চিরদিনই বাঙালীর ঘরে অত্যাচারের অপমানের প্রতিকার আত্মহত্যা ছাড়া কোনো কিছু নেই। কিন্তু আমি যে তিনটি ছেলেমেয়ের মা। সন্তানজননী। বুকের মধ্যে বড় বোঝা, বড় হাহাকার, বড় যন্ত্রণা। দাদা, আশ্চর্য, মৃত্যু আমাদের জন্যে নয়। দীর্ঘ জীবন ধরে জ্বলে জ্বলে তবে তো অভিশপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই বিধির বিধান। সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বামী পুত্র নিয়ে সংসার, সব আজ ফাঁকি, সব আজ মিথ্যে। আমার চেয়ে ঐ ভিখারিণী, তারও সম্মান আছে—স্থান আছে। আমার কিছু নেই, দাদা কিছু নেই। অজস্র চোখের জলে ভেসে এই শিক্ষা লাভ করেছি।'

বলতে বলতে তার চোখে জল এসে গেছল। শুনতে শুনতে আমার চোখেও। কিন্তু এত কথা শোনবার পরও শুনতে বাকি ছিল, কী এমন হয়েছে যার জন্যে সে আমার সাহায্যপ্রার্থী। স্বামীর কাছে অপমান হওয়া এমন কিছু অঘটন নয়। চাকরি করলে হয়তো সে অপমান এড়ানো যাবে, কিন্তু নতুন মনিব যদি অপমান করে তা হলে কী

উপায়! আর একটা চাকরি জোটানো কি এতই সহজ। আবার তো সেই স্বামীর বাড়ী ফিরে যেতে হবে। কেন তবে একটি গরীবের মেয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে! হেড মিসট্রেস কি আমাকে ক্ষমা করবেন? মনটাকে আমি শক্ত করলুম। কিন্তু মুখ ফুটে বললুম না কিছু।

নীলনয়না কাঁদছিল আর বলছিল, 'আমার কিছু নেই দাদা, কেউ নেই! মা'র কাছে এক বছর ছিলুম। দেখলুম মা'র অন্ত রূপ। তিনি তাঁর জামাইকে অন্যায় করতে দেবেন, কেন না, জামাই বড়মানুষ। আর এক্ষেত্রে জামাই তো পর হয়ে যাচ্ছেন না, জামাই হয়েই থাকছেন।'

ইঙ্গিতটা খুব সূক্ষ্ম। আমি ঠিক ধরতে পারলুম না, জানতে চাইলুম, 'তার অর্থ!'

সে লজ্জায় আরক্ত হয়ে বলল, 'আরো খুলে বলতে হবে?'

তখনো আমার মাথায় ঢুকছিল না যে আঘাতটা কেবল স্বামীর কাছ থেকে আসেনি, এসেছে আর এক জনের কাছ থেকেও, সেইজন্যে এত লাগছে।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নীলা এক সময় বলে ফেলল, 'আপনার জানা নেই সেই ছড়াটা?

নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্তে, বোন-সতীনের ঘর।'

এতক্ষণে আমার খেয়াল হলো যে, এ মেয়ের সব চেয়ে যারা বিশ্বাসী ছিল সব চেয়ে তারা অবিশ্বাসী। তড়িৎস্পৃষ্টের মতো বলে উঠলুম, 'ওঃ!' মনে হলো মূর্চ্ছা যাব। দু'হাতে চেপে ধরলুম চেয়ারের হাতল।

মা ধরণী! মা ধরণী! কত সহ্য করবে তুমি! কত সহ্য করবে পাপ তাপ বিশ্বাস-ঘাতকতা। তুমি দ্বিধা হও, আমরা সকলে তলিয়ে যাই। অভিশপ্ত এই মানবজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাক। বেঁচে থাকাটাই একটা মহা দুর্ভোগ। অথচ আত্মহত্যা করাটাও তো অপরাধ!

করুণ স্বরে বললুম, 'নীলা, বোন আমার।'

আমার সমবেদনার স্পর্শ লেগে তার সঙ্কোচের তুষার গলে গেল। সে যা বলে গেল তা গুছিয়ে বললে এই রকম দাঁড়ায়। শিশু বয়স থেকে শিবপূজা করে সে যেমন বর চেয়েছিল তেমনটি পেয়েছিল। তেমনি রূপবান গুণবান বিদ্বান। উপরন্তু ধনবানও বটে, পুরুষানুক্রমে সাহেব বাড়ীর বেনিয়ান। এমন স্বামী বহু ভাগ্যে মেলে। কী করে যে তাকে ওদের পছন্দ হলো সেটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়। তার বাবা ছিলেন মস্তবড় কুলীন! তা না হলে এমন যোগাযোগ সচরাচর ঘটে না।

রোজ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তার প্রথম কাজ ছিল স্বামীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে

প্রণাম করা। স্বামীর কল্যাণে সারাদিন আনন্দে কেটে যেত। এত সুখ কেউ কোনো দিন পায়নি। এমন সৌভাগ্য আর কোনো মেয়ের হয়নি। তার ইচ্ছা করত সবাইকে ডেকে এনে দেখাতে তার স্বামীকে, তার দেবতাকে, তার সৌভাগ্যকে। বালিকা বয়স, সরল মন। জানত না যে যারা তার সুখ দেখতে আসত তারাও সুখের ভাগ চাইত। তার আপন মায়ের পেটের বোন মীনময়না ছিল তাদের একজন।

মীনার বিয়ের কথা হচ্ছিল এক জায়গায়। দেখা গেল মীনা তাতে রাজী নয়। তার জামাইবাবুও নানা রকম আপত্তি তুললেন। মীনাকে ভালো করে লেখাপড়া শেখাতে হবে। তার নাকি প্রতিভা আছে। অল্প বয়সে বিয়ে দিলে তার প্রতিভার ক্ষতি হবে। একদিন তার জামাইবাবু নিজে উদ্যোগী হয়ে তাকে লোরেটোতে দিয়ে এলেন। তাদের সংসারে জামাইবাবুর যা প্রতিপত্তি তাঁর কথার উপর কথা বলে কার সাধ্যি!

এমনি করেই বিষবৃক্ষের রোপণ হলো। তখন কেউ বুঝতে পারেনি এর পিছনে কী আছে। মীনার পড়াশুনা শেষ হলে তারও এমনি সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে এই কথাই তখন সকলের মাথায় ঘুরছিল। এমনি বড় ঘরে। এমনি সৌভাগ্যবতী হবে সে।

মীনা মাঝে মাঝে আসত ও দিদির কাছে থাকত। সে সময় জামাইবাবু তার সঙ্গে সম্বন্ধের সুযোগ নিয়ে রসালাপ করতেন। নীলা সরল মানুষ। সে তাতে দোষের কিছু দেখত না। কোনোদিন সন্দেহ করেনি যে সেটা নির্দোষ রসালাপ নয়। কিন্তু একদিন তাদের দু'জনকে ছাদে বসে থাকতে দেখে তার বুকটা কেমন করে উঠল। সে বোনকে শাসন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তা হলে স্বামী ভাবতেন তার মনটা বড় ছোট। তার মহত্বের জন্যে ইতিমধ্যে সে অনেকের কাছে প্রশংসা পেয়েছিল। তার স্বামী বলতেন সে তার জা-দের চেয়ে মহৎ। হবে না কেন, কত বড় কুলীন পরিবারের মেয়ে!

বোনকে শাসন করতে পারে না, স্বামীকে অনুযোগ জানাতে পারে না। তা হলে সে বেচারি করে কী! করে ঠাকুরঘরে ঢুকে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা। করে একবেলা উপবাস। কানাকানি থেকে জানাজানি হয়ে যায় কেন হঠাৎ এই ধর্মে মতি। তার পরে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয় মীনাকে। চলে সে যেতই, কিন্তু এমন লজ্জার সঙ্গে নয়। তার চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে আর একজন চললেন। স্বামী চললেন জার্মানী। সেখানে তিনি এক কারখানায় কাজ শিখবেন ও ফিরে এসে কারখানা খুলবেন। নীলা খুব কান্নাকাটি করল। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। তিনি বললেন, 'দুটো বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তুমি কি তোমার স্বামীর সার্থকতার পথে অন্তরায় হবে? এই যে এরা রইল গোপাল আর নান্টু, তুমি এদের মানুষ করবে, এই তোমার কাজ। আর আমার কাজ হবে আত্মসম্মানের সঙ্গে জীবন যাপনের উপায় সন্ধান করা। এদের যেন ইংরেজের বেনিয়ান হতে না হয়।'

দুটো বছর দেখতে দেখতে নয়, বেশ টিকতে টিকতে কাটল। স্বামী ফিরলেন না। লিখলেন আরো এক বছর লাগবে। সে বছরটাও কাটল কোনো গতিকে। তার পরেও তিনি ফেরেন না। লেখেন আরো দেরি হবে। বেচারি নীলা অতি কষ্টে ধৈর্য ধরে। তার বিরহপারাবারের যেন পার নেই। কোলের ছেলেদুটিকে নিয়ে থাকে। তারা যদি না থাকত তা হলে সে বোধ হয় বাঁচত না।

সাড়ে চার বছর পরে স্বামী ফিরলেন। তখন তাঁর অন্য রকম চেহারা। ভীষণ কাজের লোক। আর দস্তুরমতো সাহেব। যাদবপুরে কারখানা খুললেন। নতুন বাড়ী করলেন বালিগঞ্জে। বাড়ীতে তাঁর বিদেশফের্তা বন্ধু ও বন্ধুপত্নীরা আসেন। আসেন খাস বিদেশী সাহেব-মেম। তাঁদের পার্টি দেওয়া, তাঁদের পার্টিতে যাওয়া হয়ে উঠল নীলার অন্যতম কাজ। কিন্তু সে তো এসব জানে না, বোঝে না। তার বিদ্যাবুদ্ধিও সামান্য। সে যদি একটু ভুল করে উনি দারুণ রাগ করেন। যেন কী একটা মহাপাতক ঘটেছে। অমুককে ডানদিকে বসানোর কথা। কেন বাঁদিকে বসানো হলো—দাও এর কৈফিয়ৎ। দিতে না পারলে কথাবার্তা বন্ধ। বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস তাদের বাক্যালাপ বর্জন।

একদিন নীলার হঠাৎ জর এলো। জরটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো টাইফয়েডে। ভুগতে হলো মাস খানেক। তার পরে দুর্বলতা কাটাতে আরো মাস দুয়েক। ইতিমধ্যে তার একটি খুকু হয়েছিল। খুকুকে সামলাবার জন্যে ছুটে এলো মীনা। তখন সে কলেজ শেষ করে বাড়ীতে বসে আছে। মীনাকে পেয়ে নীলা বর্তে গেল। মাসীকে পেয়ে খুকুও খুব খুশি। মীনা যে কেবল বেবীর ভার নিল তা নয়, ধীরে ধীরে গোপাল ও নান্টুর ভার নিল। নীলা তা জানতে পেরে নিশ্চিন্ত হলো। তার পরে একে একে আরো অনেক কিছুর ভার নিল মীনা। পার্টিতে যাওয়া, পার্টি দেওয়া, কিছুই বাদ গেল না তার বা তার জামাইবাবুর। সংসার যেমন চলছিল তেমনি চলল, হয়তো আরো ভালো চলল, শুধু এক কোণে পড়ে রইল সংসারের অধিষ্ঠাত্রী।

নীলা যখন সেরে উঠল তখন অবাক হয়ে লক্ষ্য করল যে, মীনা যেন এ বাড়ীর গৃহিণী, সে নিজে যেন গৃহিণীর দিদি। চাকরবাকরদের ব্যবহারও যেন বদলে গেছে, তারাও যেন ও কথা সমঝেছে। স্বামীর দিকে তাকালে মনে হয় না যে স্ত্রীর প্রতি তাঁর একটুও ভালবাসা আছে। যা আছে তা কর্তব্যবোধ। আর শ্যালিকার প্রতি আছে সীমাহীন নির্ভরতা, অনুরাগ ও আকর্ষণ। নীলার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগল। ভগবানের কাছে সে নালিশ জানাল এই বলে, কেন তাকে মরতে দেওয়া হলো না, কেন বাঁচিয়ে রাখা হলো? তা কি এই দৃশ্য দেখবার জন্যে।

মীনাকে সে বিদায় দিতে পারল না। দিলে সংসার চালাতে পারত না। তা ছাড়া

মহত্ত্বের প্রশ্ন ছিল। তার মতো মহীয়সী নারী কেমন করে নিজের বোনকে সন্দেহ করবে, নিজের স্বামীকে সন্দেহ করবে। মীনা তার জন্যে যা করেছে তার জন্যে কোথায় কৃতজ্ঞ হবে, না অকৃতজ্ঞের মতো ঝগড়াঝাটি করে তাড়িয়ে দেবে? তার পর তার স্বামী কি তাকে ক্ষমা করবেন? অমন করে কি দেবতার মন পাওয়া যায়? আর তিনি যদি দেবতা না হয়ে থাকেন, তা হলে কি মানুষের মন পাওয়া আরো কঠিন নয়?

আবার সেই কৃচ্ছ্রসাধনা আরম্ভ হলো। এক বেলা উপবাস। খাট থেকে নেমে গিয়ে মেজের উপর শোয়। ঘুম আসে না। চোখের জলে ভাসে। সৌভাগ্যবতী বলে একদিন সে কত গর্ব বোধ করত! এখন তার মতো হতভাগিনী কে আছে। তার বাড়ীর ঝি-রাও তার চেয়ে সুখী। তারা সকলে সে কথা জানে। তাদের সামনে মুখ দেখাতে লজ্জা করে। হায়, এত বড় অপমান ছিল তার কপালে। সে মরে গেল না কেন? আত্মহত্যা করে না কেন?

কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে কারুর কোনো পরিবর্তন হলো না, স্বামীর তো নয়ই, মীনারও না। মাঝখান থেকে সে নিজেই আরো দুর্বল হয়ে পড়ল। ডাক্তার দেখে বলে গেল অমন করলে ছেলেমেয়েরা মাতৃহীন হবে। কথাটা তার প্রাণে বিঁধল। তাই তো। ছেলেমেয়েদের মাতৃহীন হতে দেওয়া কি ভালো? কী তাদের অপরাধ? কেন তারা এত কম বয়সে মাতৃহীন হবে? মা-হারা বাছাদের কেউ কি একটু ভালোবাসবে, আদর করবে? মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ তো জানাই আছে। বাপের দরদের কথা বলে কাজ নেই। তার ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে তাকে বাঁচতে হবে, তাকে সবল হতে হবে। তার নিজের জীবন না হয় ব্যর্থ হয়েছে। তা বলে তার সন্তানদের কচি প্রাণগুলি কেন কুঁড়িতে শুকিয়ে যাবে?

শরীরে কিছু বল পেতেই সে চলল তার বাপের বাড়ী। বাপকে তো এসব কথা বলা যায় না। বলল মাকে। মা শুনে কাঁদলেন। মীনাকে ডাকিয়ে এনে বকলেন। মীনা বলল গান্ধর্ব মতে তার বিয়ে হয়ে গেছে, সে তার স্বামীর ঘরে আছে। বয়ঃপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট মেয়ের সঙ্গে তর্ক করবে কে? মা বললেন, 'এবার আমার মরণ হলে বাঁচি।' বাপ বললেন, 'আমারও।' লজ্জায় ঘৃণায় নীলার ইচ্ছা করছিল ছাদ থেকে লাফ দিয়ে সব যন্ত্রণা জুড়াতে। কিন্তু সে যে মা। অসহায় শিশু তিনটিকে মাতৃহীন করে কার হাতে দিয়ে যাবে? ঐ ডাইনী মাসীর হাতে।

একে একে উদ্‌ঘাটিত হলো, লোরেটোতে পড়বার সময় পড়ার সমস্ত খরচ যোগাতেন জামাইবাবু। তার পর কলেজে পড়বার সময় জার্মানী থেকে আসত পড়াশুনার খরচ জামাইবাবুর কাছ থেকে। মা'র ধারণা ছিল নীলা এসব জানে। সেইজন্যে তাকে জানানো হয়নি। জামাইবাবু যে কেন এতটা করছেন তখন এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য

করেনি। সকলে জানত তিনি নীলাকে ভালোবাসেন। নীলার বোনকে পড়ানো সেই ভালোবাসার অঙ্গ। আগে জানলে কি কেউ তার সাহায্য নিত?

নীলা আশা করেছিল যে, মা বাবা মীনার দোষ ধরবেন, মীনাকে ও বাড়ীতে যেতে দেবেন না, তার গান্ধর্ব বিবাহকে অস্বীকার করবেন, অন্য কোনোখানে তার প্রাজাপত্য বিবাহের নির্বন্ধ করবেন। কিন্তু তাঁরা তেমন কিছু করলেন না। বললেন, 'এ তোমাদের মামলা। তোমরা যেমন করে পারো মেটাও।'

মা বাপের কাছে এমন ব্যবহার কেউ কি কখনো দেখেছে? তা দেখার পরও নীলা তাঁদের বাড়ীতে ছিল, থাকতে বাধ্য হয়েছিল। কোথায় একটু সহানুভূতি পাবে, না সমালোচনা শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মীনাকে ও-বাড়ীতে প্রথম নিয়ে গেল কে? বোনকে নিজের কাছে নিয়ে যাবার দরকারটা কী ছিল? তাকে দিনের পর দিন হপ্তার পর হপ্তা জামাইবাবুর সঙ্গে মিশতে দেওয়া হলো কেন? নিজে কি চোখের মাথা খেয়েছিল? পুরুষ মানুষের মনে কী আছে তা যদি তার স্ত্রী বুঝতে না পারে তবে আর কে বুঝবে? মীনাকে দোষ দেওয়া বৃথা। সে তখন ছেলেমানুষ কিসে কী হয় জানত না, বুঝত না। নীলার উচিত ছিল তাকে শেখানো, সমঝানো।

হায়, নীলাই বা তখন কত বড়! চোদ্দ বছরের বালিকা। স্বামী-গরবে গরবিনী। গর্বের দ্বারা অন্ধ। তা ছাড়া, এমনিতে সে সরল মানুষ। সবাইকে বিশ্বাস করে, কাউকে সন্দেহ করে না। নিজের স্বামীকে সন্দেহ করবে! সন্দেহ করবে মায়ের পেটের বোনকে। ওরা তার স্বভাব সরলতার সুযোগ নিয়েছে, বিশ্বাসপরায়ণতার সুযোগ নিয়ে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। দোষ নীলার নয়, দোষ ওদের দু'জনের। বিশেষ করে স্বামীর।

বছর খানেক বাপের বাড়ী থেকে নীলা হাঁপিয়ে উঠল। কী একটা তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মার সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। তখন সে চলল তার শ্বশুরবাড়ী। বালিগঞ্জের বাড়ী নয়, তালতলার বাড়ী। যে বাড়ীতে সে বৌ হয়ে যায়। শাশুড়ী তাকে আদর করে নিলেন, শ্বশুর বললেন দোষ তার নয়, দোষ তাঁর ছেলের। ছেলেকে তিনি ত্যাজ্য পুত্র করবেন। এসব কথা নীলার কানে সুধা বর্ষণ করল। এতদিন পরে বেচারি একটু সহানুভূতি পেলো। সমালোচনা শুনতে হলো না। মনে হলো, নিজের রাজত্বে ফিরে এসেছে। এখানে সে, সুখে না হোক, সোয়াস্তিতে থাকবে।

কিছুদিন পরে অনুভব করল যে, শ্বশুরবাড়ী আর স্বামীর বাড়ী নয়। এককালে এ বাড়ীতে স্ত্রীর অধিকার নিয়ে বাস করেছে। এখন যদি কোনো অধিকার থাকে তবে তা স্ত্রীর অধিকার নয়, হতভাগিনী পুত্রবধূর অধিকার। প্রতিবেশিনীরা এসে করুণা জানিয়ে যান, অভ্যাগতাদের কণ্ঠে কারুণ্য ধ্বনিয়ে ওঠে। শাশুড়ী-ননদ-জা—সকলের মুখে সমবেদনার বাণী। এমন কি, বাড়ীর ঝি-চাকর পর্যন্ত হায় হায় করে। কয়েক মাস পরে

নীলার অসহ্য বোধ হলো। কেন? এত দয়া কিসের? সে কি বিধবা, না, পতিপরিত্যক্তা? সে স্বেচ্ছায় পতিগৃহ থেকে চলে এসেছে, ইচ্ছা করলে আবার সেখানে যেতে পারে। কেউ তাকে বারণ করেনি যেতে। ফিরে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে কেন এত অনুকম্পা?

এর পরে তার আর ভালো লাগল না শ্বশুরের অন্ন খেতে। মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ইচ্ছা করল একবার সেই লোকটির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে, যে তাকে অগ্নি সাক্ষী করে বিবাহ করেছিল। একদিন কাউকে কিছু না বলে হাজির হলো বালিগঞ্জের বাড়ীতে। হঠাৎ তাকে দেখে মীনার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা খসে পড়ল! মীনা উঠে গিয়ে শোবার ঘরের ভিতর ঢুকে খিল দিল। যেন শোবার ঘর বেদখল হতে যাচ্ছে! নীলার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে এসেছিল স্বামীর সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলতে। স্বামীকে একা পেয়ে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল সেই আগের মতো। বলল, 'দেবতার মতো তোমাকে পূজা করতুম। তার কি এই পরিণাম? কেন তুমি আমাকে বঞ্চনা করলে?'

স্বামী এর উত্তরে আমতা আমতা করলেন। যা বললেন তার থেকে বোঝা গেল তিনি মীনার জন্যে চিন্তিত। মীনা যদি ঘরে খিল দিয়ে আত্মহত্যা করে তা হলে কী সর্বনাশ হবে! এই বলে তিনি উঠে গিয়ে দরজায় কান পাতলেন। নীলাও গেল তাঁর সঙ্গে। কান পেতে শুনতে পেল মীনা কাঁদছে। তার বেশি কিছু নয়। স্বামী কিন্তু তাইতেই ব্যাকুল। দরজায় ঘা দিয়ে বললেন, 'মীনা, লক্ষ্মীটি। খুলে দাও। তোমার দিদি তোমাকে দেখেই চলে যাবে। খুলে দাও।' মীনা তা শুনে আরো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। দরজা খুলল না।

নীলা বলল, 'আচ্ছা, কান্না কি ওর একচেটে? আমি কি কখনো কাঁদিনি? সাড়ে চার বছর তুমি জার্মানীতে ছিলে। প্রতিদিন সারা রাত কাঁদিনি আমি? এখনো কাঁদছিনে? কেন তা হলে তুমি এত আকুল হচ্ছ? এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

কথাবার্তা জমল না। স্বামী সমস্তক্ষণ অন্যমনস্ক। নীলা তাঁকে অভয় দিল যে মীনা আত্মহত্যা করবে না। সে এমন মেয়ে নয় যে দিদির জন্যে আত্মঘাতী হবে। তাতেও যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন না, তখন বলল, 'আচ্ছা দাঁড়াও। তোমার মীনাকে দিয়ে এখুনি দোর খোলাচ্ছি। ...মীনা, আমি চললুম রে। গোপালের বাবাকেও নিয়ে যাচ্ছি।'

সত্যি সত্যি দ্বার খুলল। মীনা ছুটে বেরিয়ে এলো।

তার পরে যা ঘটল তা অপরিকল্পিত। কী যে ভূত চাপল তার ঘাড়ে, নীলা ঠাস ঠাস করে দুই চড় কষিয়ে দিল মীনার দুই গালে। বলল, 'পোড়ারমুখী, এত পড়াশুনা করে

তোর এই বুদ্ধি! তিনটি ছোট ছোট নিরীহ শিশু, তাদের কাছ থেকে তাদের বাপকে কেড়ে রাখবি!'

মীনার গায়ে এমন কিছু লাগেনি। কিন্তু মনে লেগেছিল খুব। সে আছাড় খেয়ে পড়ল ও বোধ হয় মূর্ছা গেল। স্বামী তা দেখে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে 'ডাক্তার' 'ডাক্তার' বলে ছুটোছুটি বাধিয়ে দিলেন। নীলা যেই মীনার মুখে চোখে জল দিতে গেল অমনি তাকে হটিয়ে দিয়ে বললেন, 'গেট আউট!' একঘর চাকরবাকরের সামনে সে যে কী অপমান, কী লজ্জা, তা ভোলবার নয়। নীলা আর কী করে, স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করার বিন্দুমাত্র আশা নেই দেখে সুড়সুড় করে সরে পড়ে।

স্বামীর বাড়ীর পথ রুদ্ধ। এই ঘটনার পর আর সেখানে ফিরে যাবার কথা ভাবা যায় না। শ্বশুরবাড়ীতে যত দিন ইচ্ছা থাকা যায়। তাঁরা গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবেন না। গোপালের জন্যে, নান্টুর জন্যে, বেবীর জন্যে একটা আয়া রাখতে যত খরচ তার চেয়ে কম খরচ করলে যখন মা পাওয়া যায়। হাঁ, তার চেয়ে কম খরচে। তাঁদের খরচের হাত ক্রমশ কমে আসছিল।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে বিনা অধিকারে আয়ার মতো কত দিন থাকা যায়। এত দিন তার মনে অভিমান ছিল, আর যাই হোক, সে স্বামীপরিত্যক্তা নয়, সে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে। কিন্তু এবার তো সে কথা বলা যায় না! একঘর মানুষের সামনে তার স্বামী তাকে 'গেট আউট' বলে তাড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ কী তার অপরাধ? সে কি তবে তার নিজের বোনকে শাসন করতে পারবে না? হায়, যদি সময় থাকতে শাসন করত!

এর পরে সে অনেক ভেবেছে। ভেবে কোনো কূল কিনারা পায়নি। স্বামীসুখ তার অদৃষ্টে যতটুকু ছিল ততটুকু। তার বেশি নেই। বোনের অমঙ্গল কামনা করেও ফল নেই। মীনা মারা গেলে লোকটা হয়তো আর কাউকে বিয়ে করবে। আর কোনো বিদুষীকে, যে ডান হাতে ছুরি ও বাঁ হাতে কাঁটা ধরতে জানে, যে অসভ্যের মতো শব্দ করে খায় না। মীনার মঙ্গল হোক, সে আয়ুষ্মতী হোক, স্বামীসোহাগিনী হোক। প্রাজাপত্য বিবাহের পর সন্তানবতী হোক। মীনার সুখে তার আপত্তি নেই। কিন্তু তার নিজের সুখের কী হবে! চিরটা কাল কি সে গোপাল নান্টুর বেবীর আয়া হয়েই কাটাবে! আর কোনো সার্থকতা নেই তার বিড়ম্বিত জীবনে?

তার এই জিজ্ঞাসার উত্তর কেউ তাকে দেয় না। বই পড়তে পড়তে আপনি উত্তর পায়। সে স্বাবলম্বী হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। নিজের জীবন নিজের মতো করে কাটাবে। বিবাহে সুখী হয়নি বলে জীবনে সুখী হবে না কেন? জীবন কি আরো বড় নয়?

॥ দশ ॥

বলতে বলতে প্রিয়দর্শনদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, 'শুনলে তো নীলনয়নার প্রশ্ন? বিবাহে সুখী হয়নি বলে জীবনে সুখী হবে না কেন? কবে সেই বৈদিক যুগে এমনি এক প্রশ্ন করেছিলেন মৈত্রেয়ী। তারপর পাঁচ হাজার বছর কেটে গেছে। ভারতের মেয়েরা চুপ করে সহ্য করতে শিখেছে। মুখ ফুটে প্রশ্ন করতে সাহস পায়নি। পঞ্চাশ শতাব্দীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করল এই মেয়ে।'

আমি স্মরণ করতে চেষ্টা করলুম আর কোনো মেয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন করেছে কি না। কই, মনে তো পড়ল না।

দাদা বলতে লাগলেন—

'অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন ছিল না বলে ওরা ওকে ইস্কুলের চাকরি দিতে নারাজ। বলে, ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস নামঞ্জুর করবেন। আমি গিয়ে ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেসের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমার নাম শুনেছিলেন। নীলার ইতিহাস শুনে সহানুভূতি জানালেন। বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বাধা যদি আসে ডিপার্টমেণ্টের দিক থেকে আসবে না। আসবে সমাজের দিক থেকে। তখন হয়তো বেচারির চাকরি যাবে।'

হলোও তাই। নীলা চাকরি পেলো, উপরওয়ালারা অনুমোদন করলেন, স্বয়ং হেড মিস্‌ট্রেস তার পড়ানোর প্রশংসা করলেন। আমরা তো ভাবলুম বিপদ কেটে গেছে। এমন সময় চিঠি এলো শাশুড়ীর অসুখ। নাতনিকে দেখতে চান। পত্রপাঠ তাকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

নীলার সঙ্গে ছিল তার মেয়ে বেবী। কোলের মেয়ে বলে ওরা তাকে এত দিন নীলার সঙ্গে থাকতে দিয়েছে। গোপালের জন্যে, নান্টুর জন্যে যখন মন খারাপ হয় তখন বেবীকে কোলে চেপে ধরে সে সান্ত্বনা পায়। বলতে গেলে সেই তার একমাত্র সান্ত্বনা। বেবী যদি চলে যায় তা হলে সে কাকে নিয়ে থাকবে? কী নিয়ে থাকবে? চাকরি কি এতই সুখের।

এলো আমার কাছে পরামর্শ চাইতে। সে লাবণ্য, সে দীপ্তি আর নেই। একটি দিনের একটুখানি ফুঁ লেগে নিবে গেছে। কোথায় জীবনের সুখ। সমস্ত দিন পরের মেয়েদের পড়িয়ে দু'বেলা স্বহস্তে পাক করে কতটুকু সময় পায় নিজের মেয়ের সঙ্গে বসবার। সেটুকুও আর পাবে না খুকু যদি চলে যায়। একবার গেলে কি আর ফিরে আসবে? ছাড়বে ওরা তাকে?

আমার পা জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ডুকরে কাঁদল। যেন আমি সর্বশক্তিমান! যেন

রাজা ক্যানিউটের মতো সমুদ্রকে হুকুম করতে পারি, সমুদ্র, তুমি হটে যাও। শ্বশুরবাড়ী, তোমার হাত সরিয়ে নাও। বেবীকে তুমি ছুঁয়ো না! বেবী শুধু তার মা'র।

বললুম, নীলা, বোন আমার। সন্তান কি তোমার একার? তার ওপর কি তার পিতৃকুলের অধিকার নেই? ওঁরা দেখতে চান। ভালোয় ভালোয় দিয়ে এসো। কিছুদিন পরে ভালোয় ভালোয় নিয়ে এসো। আইন ওঁদের পক্ষে। ঝগড়া করে পারবে কেন?

ঝগড়া করতে ওর একটুও ইচ্ছা নেই। কিন্তু ওর প্রাণে ভয়, ওরা ওর খুকুকে ফিরে আসতে দেবে না। তা ছাড়া খুকুকে পাঠাবে কার সঙ্গে? মাকে ছেড়ে খুকু কার সঙ্গে যাবে? নীলাকেই তা হলে যেতে হয় স্বয়ং। কিন্তু যাবে কোন্ মুখে? ওঁরা তো তাকে যেতে বলেননি। কই, চিঠির কোনোখানে কি অমন কথা আছে?

বাস্তবিক, চিঠিতে অমন কোনো কথা ছিল না। আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম, যে, শাশুড়ীর যখন অসুখ তখন তারও তো একটা কর্তব্য আছে। শাশুড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক তো চুকে যায় নি। একবার গিয়ে দেখে আসা উচিত নয় কি?

হেডমিসট্রেসও সেই পরামর্শ দিলেন। নীলা তার মেয়েকে নিয়ে কলকাতা গেল। গিয়ে দেখল যা ভেবেছিল তাই। শাশুড়ীর অসুখের খবর মিথ্যে। নাতনীকে দেখতে চাওয়া একটা ফাঁদ। আসলে উনি ওকে রাখতে চান নিজের কাছে। ইতিমধ্যে গোপালকে ও নান্টুকে ওদের বাপ এসে নিয়ে গেছে বালিগঞ্জের বাড়ীতে। ঠাকুমা ঠাকুরদা তাই চান আর একটি খেলার সাথী। সেইজন্যে তলব করেছেন নাতনীকে। নীলার যদি মেয়েকে ছেড়ে থাকতে ভালো না লাগে তা হলে সেও এসে মেয়ের কাছে থাকুক তালতলার বাড়ীতে। মফঃস্বলে চাকরি করবার এমন কী কারণ ঘটেছে? মিছিমিছি সকলের মাথা হেঁট।

শাশুড়ী নীলাকে ভালোবাসতেন। মীনাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। নীলা যদি তাঁর কাছে থাকত তা হলে তিনি একবার চেষ্টা করে দেখতেন তাঁর ছেলে তালতলার বাড়ীতে ফিরে আসে কি না। মীনাকে বালিগঞ্জের বাড়ীতে রেখে আসে কি না। বেশির ভাগ সময় নীলার সঙ্গে ও মাঝে মাঝে মীনার সঙ্গে বাস করে কি না। কিন্তু এই মর্মে আপস করতে নীলার রুচি ছিল না। সেকালের মেয়েরা স্বামীকে বেশির ভাগ সময় কাছে পেলে বাকী সময়টা সতীনের কাছে যেতে দিত। কিন্তু নীলা হচ্ছে একালের মেয়ে। সে ষোলো আনা পাবে কিংবা ষোলো আনা হারাবে। 'আমার স্বামী' যদি বলতে না পারে 'আমার স্বামী নয়' বলবে। কিন্তু 'আমাদের স্বামী' বলবে না।

স্বামী যদি তার না হয়ে থাকে শাশুড়ীও তার নন। তাঁর কাছে থাকার প্রস্তাবে নীলা রাজী হতে পারল না। কর্মস্থলে ফিরে এলো। কিন্তু বেবীকে রেখে আসতে বাধ্য

হলো। সেবার গোপালকে ও নান্টুকে। এবার বেবীকেও। এ যে কী দুঃখ তা কাউকে বোঝানো যায় না, কেউ বুঝবে না। বিধবার একমাত্র সন্তান মারা গেলে যে দুঃখ এ কি তার চেয়ে কিছু কম! হায়, তার জীবনে সুখ কোথায়!

নীলা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত এ কথা আমার জানা ছিল। কিন্তু সে যে হঠাৎ একদিন মূর্চ্ছা যাবে এতদূর আমি কল্পনা করিনি। একজন শিক্ষয়িত্রীকে সঙ্গে দিয়ে তাকে কলকাতা পাঠাতে হলো। এবার গেল বাপের বাড়ী। আর ফিরে এলো না।

তার স্বাবলম্বনের পরীক্ষা ব্যর্থ হলো। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে গলগ্রহ হতে হবে, হয় বাপের বাড়ীতে, নয় শ্বশুরবাড়ীতে। বাপের বাড়ীতে কেউ তাকে চায় না, তার চেয়ে বরং মীনার আদর বেশি, কারণ মীনা মাঝে মাঝে উপহার পাঠায়। ইতিমধ্যে মীনার বিয়ে হয়ে গেছে। তার কলঙ্কের দাগ মুছে গেছে। তার পরিচয় দিতে কেউ লজ্জিত নয়। লজ্জা যা কিছু তা নীলার জন্যে। সে যে পতিপরিত্যাগিনী বা পতি-পরিত্যক্তা। উঠতে বসতে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে তার উপযুক্ত স্থান হয় বালিগঞ্জ, নয় তালতলা। বেলেঘাটায় তার স্থানাভাব।

এই যখন তার বাপের বাড়ীর অবস্থা তখন শ্বশুরবাড়ী থেকে ডাক এলো শ্বশুরের সেবা করতে। এবার সত্যি সত্যি বাধ এসে পড়েছে। ভদ্রলোক বহুদিন রক্তের চাপ থেকে ভুগছিলেন। এবার কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে। নীলা গেল সেবিকা হয়ে। মীনাও এলো। কিন্তু সেবিকা হয়ে নয়। সেবার ব্যবস্থা দেখতে। স্বামী এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা দেখলেন। নীলার সঙ্গে তাঁদের দু'জনের চোখাচোখি ঘটল। কিন্তু কথাবার্তা হলো না।

শ্বশুরকে বাঁচানো গেল না। তাঁর মৃত্যুর পর শাশুড়ী ধরে বসলেন নীলাকে তাঁর কাছে থাকতে হবে। নীলা এবার 'না' বলতে পারল না। সে জানত না যে তার স্বামীকেও বলা হয়েছে তালতলার বাড়ীতে বেশির ভাগ সময় কাটাতে। তিনি বেশির ভাগ নয়, কিছু সময় কাটাতে রাজী হয়েছেন। তার চেয়ে বড় কথা, গোপালকে নান্টুকে ফেরত দিতে তাঁর অমত নেই। নীলা যদি স্বয়ং তাদের ভার নেয়।

তিনটি ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে পেয়ে তার মুখে আবার হাসি ফুটল, গান গেয়ে উঠল তার মন। পারে কখনো কেউ এদের ছেড়ে বেঁচে থাকতে! এতদিন বেঁচে আছে কী করে! মনে হলো, ওটা একটা দুঃস্বপ্ন — ওই যে নিঃসঙ্গ নিঃসন্তান জীবন। আনন্দে আছে, এমন সময় একদিন তার স্বামী এসে হাজির। তিনি নিজের থেকে তার কাছে মাফ চাইলেন। বললেন, দোষ আমার নয়, দোষ তোমারি। কেন তুমি অন্যান্য স্ত্রীদের মতো হিংসুটে হলে না, কেন আমাকে পাহারা দিলে না, কেন আসতে দিলে আমার কাছে তোমার বোনকে! তুমি মহৎ, সেইজন্যে তোমার এ দুর্ভাগ্য! এখন আমার কর্তব্য কী আমাকে বলো।

এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। এই দুর্বলস্থতির জন্যে। তার সাধারণ জ্ঞান লোপ পেলো। সে স্বামীর কোলে সারা রাত কাটালো। যখন ভোর হলো তখন খেয়াল হলো যে এ মানুষ থাকতে আসেনি, এ মানুষ পুরুত ঠাকুরের মতো আর এক জায়গায় গিয়ে আর এক মন্ত্র আওড়াবে।

তারপর এও তার খেয়াল হলো যে, এরকম যদি চলতে থাকে তা হলে আবার একটি খোকা বা খুকী হবে। কিছুতেই তা হতে দেওয়া উচিত নয়। যে লোকটি তাকে এত দুঃখ দিয়েছে তার জন্যে সে আবার গর্ভযন্ত্রণা সইবে। মীনার উচ্ছিষ্ট ভোজন করে এমন কী সুখ যার জন্যে সে আর একটি শিশুকে সংসারে আনার ও মানুষ করার দায়িত্ব বহন করবে। কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়।

পরের বার তার স্বামী যখন এলেন তখন সে নিজের জন্যে মাদুর পাতল মেজেতে। তিনি অবাক হলেন, কেননা তার ধারণা ছিল নীলারই আগ্রহ বেশি। সে যেন তাঁকে লুট করে নিতে চেয়েছিল মীনার কাছ থেকে। হঠাৎ কী হলো তিনি বুঝতে পারলেন না। অপেক্ষা করলেন বৃথা অপেক্ষা। নীলা তার মন স্থির করে ফেলেছিল চিরকালের মতো। সে তার স্বামীকে বরাবরের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে তার বোনকে। স্বামীর উপর তার কোনো স্বত্ব অবশিষ্ট নেই। উনি তার বোনের স্বামী, তার নন।

এসব কথা তাকে মুখ ফুটে বলতে ইচ্ছা ছিল না। বলতে হলো যখন তিনি পরের বার পীড়াপীড়ি করলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর ব্যবহার বদলে গেল। তিনি বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দিলেন। ভয় দেখালেন যে আবার নিয়ে যাবেন গোপালকে ও নান্টুকে। বেবীকেও। এককালে যাঁকে দেবতার মতো পূজা করেছে তাঁর মূর্তি দেখে তার ভক্তি চটে গেল। সে বলল, তোমার ছেলেমেয়েদের তুমি নিয়ে যাবে, এর জন্যে আমার অনুমতির দরকার করে না। কিন্তু এই দেহটা তোমার নয়, আমার। আমার গায়ে হাত দেবার আগে আমার অনুমতি নিতে হবে। সে অনুমতি তুমি ইহজন্মে পাবে না। এই আমার শেষ কথা।

এতবড় সাহস তার হবে, কোনোদিন সে কল্পনাও করেনি। কোন্ অদৃশ্য উৎস থেকে এলো এ সাহস। স্বামীর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। কী যে এর পরিণাম একবার চিন্তা করল না। সত্যি কি সে পারবে তার নান্টু, গোপালকে ছেড়ে তার খুকুকে ছেড়ে বাঁচতে! আত্মহত্যা! আত্মহত্যাই আছে তার কপালে। তাই যদি হয় বিধাতার লিখন তবে তাই হবে। কিন্তু মীনার স্বামীকে সে আর নিজের স্বামী বলে স্বীকার করবে না।

এই ঘটনার পর প্রত্যেক দিন সে প্রত্যাশা করছিল এখনি নান্টু, গোপালকে নিতে গাড়ী আসবে। বেবীকে নিয়ে যেতে লোক আসবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। তার কারণ তখন জানতে পারেনি, পরে জানতে পেলো। মীনা ওদিক থেকে বাধা দিচ্ছিল

নীলার ছেলেমেয়েদের ভার নেবার প্রস্তাবে। মীনা মা হতে যাচ্ছে, নিজের সন্তানের কথা ভাববে, না, পরের সন্তানের জন্তে ভেবে মরবে! স্বামী আর কী করেন, নীলার কাছে হার মানলেন। মুখে নয়, মনে। নীলা শ্বশুরবাড়ীতেই রয়ে গেল।

এর পরে তার স্বামী নতুন একটা ব্যবস্থা করলেন। সকাল আর সন্ধ্যা কাটালেন তালতলায়, দিনের বেলাটা কারখানায়, রাত্তিরটা বালিগঞ্জে। আট ঘণ্টা, আট ঘণ্টা, আট ঘণ্টা। ছেলেমেয়েরা বাপের সঙ্গ পেয়ে মানুষ হবে, এই জন্তে তালতলায় সকাল সন্ধ্যা কাটানো। নীলার খাতিরে নয়! নীলা তা বুঝতে পেরেছিল, সানন্দে সায় দিয়েছিল। নীলার উপর তাঁর কোনো অন্যায় দাবী-দাওয়া ছিল না। তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে নীলার উপর জোরজুলুম খাটবে না। প্রয়োজনও ছিল না। যা ছিল তার নাম পুরুষালি জেদ। আত্মাভিমান।

নীলার সেই প্রশ্ন কিন্তু সমস্তক্ষণ উত্তর অন্বেষণ করছিল। সে বিবাহে সুখী হয়নি বলে কি জীবনে সুখী হবে না? এই কি জীবনের সুখ? শ্বশুরের ভিটায় মাথা গুঁজে পড়ে থাকা, ছেলেমেয়েদের নাওয়ানো খাওয়ানো ইস্কুলে পাঠানো, স্বামীর সঙ্গে দুটো সংসারের কথা বলা ও জমাখরচের খাতা নিয়ে বসা, শাশুড়ীকে সেবা যত্ন করা। এভাবে জীবন যাপন করতে ভালো লাগে না। মনে হয়, এর মধ্যে বিকাশের পরিসর নেই। বিকাশ যদি চায় তবে বাইরে যেতে হবে। গেছল যেমন একদিন।

সব চেয়ে তার খারাপ লাগত রাত সাড়ে নয়টার সময় খাওয়াদাওয়া শেষ করে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে স্বামী যখন চলে যেতেন বালিগঞ্জ। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ফিরে আসতেন। ওরা ঘুম থেকে জেগে দেখত বাবা আছেন বাড়ীতেই। এ অভিনয় ক'দিন চলতে পারে! মীনারও তো খোকা হবে। সেও তো তার বাপকে চাইবে ঘুম থেকে জেগে দেখতে। আর গোপালেরও তো বোঝবার বয়স হয়েছে। সে কি বোঝে না, ভাবছ? বোঝে বলেই তো দিন দিন কেমনতর হয়ে যাচ্ছে।

তারপর নীলা যাই বলুক না কেন, তার ভিতরকার নারী কোনো দিন ক্ষমা করেনি। কার স্বামী রোজ রাত সাড়ে নয়টার সময় অন্যত্র যায়, ভোর সাড়ে পাঁচটার আগে ফেরে না! যাদের নাইট ডিউটি তাদেরও সারা মাসটা সারা বছরটা নাইট ডিউটি নয়। একটা রাতও কি কামাই করবার জো নেই! নীলা অবশ্য ধরাছোঁয়া দিত না। তার অসিধার ব্রত। তবু একসঙ্গে শুয়ে শুয়ে গল্প করা যেত। ছেলেদের সম্বন্ধে গল্প। দেশবিদেশের গল্প।

নীলা ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মীনার ছেলে হবার পর স্বামীর স্নেহ যেন মীনার ছেলের উপর পড়ল বেশি। তিনি সকালবেলাটা মীনার ওখানেই কাটাতে লাগলেন। রাতটাও। সন্ধ্যাবেলা এসে গোপাল নান্টুর পড়াশুনা তদারক করে যান। বেবীর সঙ্গে খেলা করে যান। নীলাকে দিয়ে যান টাকা। ব্যস্, তা হলেই কর্তব্য করা হয়ে গেল।

কিন্তু কেউ কি এর ফলে সুখী হলো ?

এমন সময় এলো সমুদ্রের ডাক। নদী, উপনদী, শাখানদী, যে যেখানে ছিল শুনতে পেলো ডাক। আমি শুনতে পেলুম উত্তর বঙ্গে, নীলা শুনতে পেল কলকাতায়। কেউ কারো পরামর্শের জন্যে অপেক্ষা করলুম না। ছুটে বেরিয়ে পড়লুম সমুদ্রের পানে। গান্ধীজী চললেন ডাণ্ডী। আমি চললুম মহিষাবাথান। নীলা চলল ডায়মণ্ড হারবার। লবণ প্রস্তুত করা একটা উপলক্ষ্য। আমাদের সকলের লক্ষ্য বৃহত্তর জীবন, স্বাধীন জীবন। আমরা চাই জীবনের সুখ। দিগন্তবিসারী নিঃসীম নীল সাগর, তুমি দেবে জীবনের স্বাদ। সুখ তোমাতেই।

গুলির জন্যে, লাঠির জন্যে তৈরী ছিলুম আমরা। তুচ্ছ হাতকড়া পরে তেমন কোনো সুখ হলো না। দারোগাকে বললুম, কোমরে দড়ি নেই কেন ? নিয়ে আসুন দড়ি। শক্ত করে বাঁধুন। দারোগার চোখে জল। ধন্য গান্ধী, হিরণ্যকশিপুকেও কাঁদালে। আমার বিচার করলেন যে ম্যাজিস্ট্রেট আমি তাঁকে হাত জোড় করে বললুম, আমাকে চরম দণ্ড দিন। অন্তত দু'বছর। পরাধীন দেশে আমি ফিরে আসতে চাইনে। ফিরলে ফিরবো স্বাধীন ভারতে। তিনি আমাকে একবছর সাজা দিলেন। লক্ষ্য করলুম তিনি উত্তেজনায় কাঁপছেন। যেন তাঁরই বিচার হলো, আমার নয়। হাঁ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সেদিন আমরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করলুম।

আমি জানতুম না যে নীলাও যোগ দিয়েছে, তারও জেল হয়েছে। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর একটা জনসভায় দেখি কে একটি মেয়ে সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে চুক্তির বিরুদ্ধে বলছে। চিনতে পারলুম। নীলা। বিস্ময়ে বিমূঢ় হলুম তাকে দেখে, তার উক্তি শুনে। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল সে যখন বলল, গান্ধীজী তাঁর সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। দেখলুম, একপাল ছেলেমেয়ে তাকে বাহবা দিচ্ছে। তাতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু দেখলুম তার কয়েকজন দাদা জুটেছেন। তাঁরাই তার কানে মন্ত্র দিচ্ছেন। নইলে নীলা কখনো গান্ধী-নিন্দা করত না।

আমার একটুও রুচি ছিল না তার সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে। চলে যাচ্ছিলুম, পিছন থেকে একটি ছেলে এসে আমার হাতে একখানা চিরকুট দিল। নীলা আমাকে ডেকেছে। গেলুম ফিরে। তার দাদাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। দাঁতে দাঁত চেপে নমস্কার জানালুম। তারপর এক সময় বলল, তুমি যেয়ো না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

শ্বশুরবাড়ী থেকে সে ডায়মণ্ড হারবার যায়। সেখান থেকে যায় জেলে। জেল থেকে ফিরে আজ এ দাদার বাড়ী, কাল ও দাদার বাড়ী, পরশু এ দিদির বাড়ী, তরশু ও দিদির বাড়ী ঘুরছে। গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছে এই আশায় যে, পুলিশে তাকে আবার ধরবে,

তখন কিছুদিনের জন্যে বাসস্থানের অভাব হবে না। গান্ধীজী যদি চুক্তি না করতেন তা হলে সে আরো কিছুকাল শ্রীঘর বাস করত। তাকে অকালে নিরাশ্রয় করেছেন বলেই সে গান্ধীজীর নিন্দা করছে। আমি তার দশা দেখে দুঃখিত হলুম। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের জন্য নিত্য ভাবে। তাদের সঙ্গে কচিৎ দেখা হয়। মনকে বোঝায়, দেশের জন্যে কতো মেয়ে ঘর-সংসার ছেড়ে সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছে। সেও তাদের একজন। হয়তো তাকে একদিন প্রাণ দিতে হবে। তখন কি সে ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে পেছপাও হবে? তাদের এমন কিছু অযত্ন হচ্ছে না। ক্ষতি যা হচ্ছে শরীরের নয়, মনের। তার জন্যে দায়ী তাদের বাপ। তাদের মা দেশের জন্যে লড়াই করছে বলে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। নইলে তাদের কালো মুখ তারা কাকে দেখিয়ে বেড়াত! একদিক থেকে দেখতে গেলে নীলা তাদের ক্ষতিপূরণ করছে।

সেই আমাদের শেষ দেখা। তার আরো একডজন দাদা জুটেছে। আমাকে তার কিসের প্রয়োজন! আমি বললুম, নীলা, তুমি যা ভালো মনে করো তা করে যাও। আমার সমর্থনের জন্য অপেক্ষা করো না। যদি কোনো দিন বিপদে পড আমার সাহায্য চাইলেই পাবে—যদি আমার সাধ্য থাকে।

আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। চিঠিপত্র পেয়েছি। নীলা আবার জেলে যায়, কিন্তু হঠাৎ বেবীর গুরুতর অসুখ শুনে মুচলেকা দিয়ে বাড়ী আসে। তারপরে বেবী তাকে ধরে রাখে। তখন থেকে সে শ্বশুরবাড়ীতেই আছে। রাজনীতি করে না। তবে সেই যে তার বাইরে ঘোরার অভ্যাস হয়েছে সে অভ্যাস যায়নি। বারো মাসে তের পার্বণের মতো দেশের জন্যে চাঁদা তোলার বিচিত্র উপলক্ষ্য রয়েছে। চ্যারিটির নামে টিকিট বিক্রী করতে হলে নীলার ডাক পড়ে। ওতেই ওর জীবনের সুখ। কখনো বিশেষ কোনো বিপদে পড়েনি। যদি পড়ে আমাকে জানাবে। তবে আমার মনে হয় না যে ওর স্বামীর দিক থেকে আর কোনো বিপদ আসতে পারে।

এই বলে দাদা শেষ করলেন।

আমি কিছু মন্তব্য করব কি-না ভাবছি এমন সময় দাদা আপনা থেকেই বললেন, 'নীলার চেয়ে নীলার প্রশ্ন আরো মূল্যবান। নীলাকে একদিন ভুলে যাব। ভুলব না তার প্রশ্ন। বিবাহে যদি সুখী না হই, জীবনে সুখী হব না কেন? তুমি হলে এর কী উত্তর দিতে?'

ভেবে বললুম, 'এর উত্তর বিবাহে যদি সুখী না হই, জীবনে সুখী হতে চেষ্টা করব। কিন্তু সে চেষ্টা যদি সফল না হয় তা হলে আশ্চর্য হব না। ছেলেমেয়ে যদি থাকে তারাই সে চেষ্টা বিফল করবে।'

একথা শুনে দাদা বললেন, 'এই নিয়ে আর একটি মেয়ে আমাকে আর একটি প্রশ্ন করেছিল। শুনে চমকে উঠেছিলুম। দুঃসাহসিকতায় নীলার প্রশ্নকেও ছাড়িয়ে যায়।

বাস্তবিক, পঞ্চাশ শতকের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ভারতের মেয়েরা এখন সবাক হয়েছে।'

তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বললেন, 'এমন প্রশ্ন কেউ কোনো দিন করেনি। শুনবে? এর পরে তিনি যা বললেন আপাতত তা অপ্রকাশ্য।

আমি হেসে বললুম, 'অবাক হবার পালা এখন ভারতের ছেলেদের।'

দাদা গম্ভীরভাবে বললেন, 'অবাক হতে পারি, কিন্তু অস্বীকার করতে পারিনে যে এসব প্রশ্ন হাজার হাজার বছরের পুরানো প্রশ্ন। এতকাল অবদমিত অবস্থায় ছিল। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না বলে এতকাল যাদের গুণগান করা হয়েছে তাদেরই এক আধজন এখন অবদমনের প্রভাব কাটিয়ে উঠছে।'

এই গৌরচন্দ্রিকার পর আরম্ভ হলো রানীর গল্প। রানী তাঁর নাম নয়, তাঁর পরিচয়। তাঁর স্বামীকে লোকে রাজা বলে। আসলে জমিদার। জেল থেকে ঘুরে এসে প্রিয়দর্শনদা চাকরির খোঁজে ছিলেন। নিপুবাবু ইতিমধ্যে রায়বাহাদুর হয়েছিলেন, দাদার চিঠির জবাব দিলেন না। আরো কয়েক জায়গায় চিঠি লেখালেখির পর রাজার কাছ থেকে নিয়োগপত্র এলো। তিনি ছিলেন সাহিত্য-যশপ্রার্থী; দাদাকে দিয়ে তাঁর সাহিত্যের কাজ করিয়ে নেবেন বলে প্যালেস সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত করলেন। প্রিয়দর্শন হলেন পরিদর্শনসচিব।

রাজবাড়ীতেই তাঁর বসবাসের আয়োজন হলো। মাসীর জন্য হলো অন্য বন্দোবস্ত। জীবনে তিনি এমন আরাম পাননি। রাজবাড়ীর ভৃত্যবাহিনী সর্বদা তাঁর ভয়ে তটস্থ। একটা করতে বললে দশটা করে দেয়। খাবার জন্যে ডাক পড়ে খোদ রাজা বাহাদুরের সঙ্গে। পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের কয়েকটি পদ স্বয়ং রানীমার হাতের তৈরী। রানীর হাতের রান্না ক'জনের ভাগ্যে জোটে? প্রিয়দর্শন বোধ হয় এদেশের একমাত্র কবি যিনি এক আধ দিন নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এবেলা ওবেলা রানীর হাতে খেয়েছেন। এর জন্যে তিনি গর্বিত।

এর জন্যে তাকে অবশ্য দাম দিতে হয়েছে। রাজার নামে যে সব কবিতা মাসিক পত্রে বেরিয়েছে তার অধিকাংশই প্রিয়দর্শনের রচনা। কয়েকটা রানীর খসড়া, প্রিয়দর্শনদার যোজনা। হাতের লেখাটা রাজহস্তের। রাজার স্বকীয়তা এই পর্যন্ত। এই দামটা না দিলে এই সৌভাগ্যটা হতো না। এর জন্যে দাদা লজ্জিত।

রানীর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হতে বহুকাল লাগল। রাজবাড়ীতে নয় অবশ্য। কিন্তু সে কথা পরে। তবে প্রতিদিন রান্না খেতে খেতে, রান্নার তারিফ করতে করতে, নিজের বিশেষ প্রিয় ব্যঞ্জনের ফরমাস করতে করতে রানীর সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক গড়ে উঠল সেটা রাঁধুনির সঙ্গে খাইয়ের সম্পর্ক নয়। দাদার সঙ্গে বোনের সম্পর্ক বললে বোধ হয় ভুল হয় না, তবে ঠিকও হয় না। এটা একটা অনির্দেশ্য সম্পর্ক। কোথাও এর কোনো তুলনা নেই।

॥ এগারো ॥

প্রিয়দর্শনদার মনে রং লেগেছিল। সেটা গোপন করতে গিয়ে তাঁর গালেও রং লাগল। একটু থিতিয়ে নিয়ে বললেন, 'তখন কি ছাই জানতুম! পরে জানতে পেলুম রানীর জীবনে ওটা একটা চরম মুহূর্ত। ততদিনে যা হবার হয়ে গেছে।'

আমি কৌতূহল চেপে রাখতে পারলুম না। সুধালুম, 'তার মানে?'

'তা হলে বলি শোনো।' এই বলে তিনি জমিয়ে বসলেন। বললেন :

আমার জীবনে এই নিয়ে চার বার হলো। নারী বিপন্ন। নাইটের সহায়তা চায়। যেন আমার অদৃষ্টে আর কিছু লেখেনি। হাসিও পায়, রাগও ধরে। যেমন জন্তুদের বন্ধু নন্তুবাবু, তেমনি নারীদের বন্ধু প্যারীবাবু। হিন্দুস্থানী দারোয়ানেরা আমাকে প্যারেবাবু বলে ডাকত।

রাজবাড়ীতে বেশ আনন্দে আছি, লিখছি পড়ছি, লেখা সংশোধন করছি, হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি এলো অন্দর থেকে। একটা সাহিত্যিক রচনার ভিতর গোঁজা। রানীর হাতের লেখা। 'বিপদে পড়ে আপনার কাছে হাত পাতছি। যদি দয়া করেন। আমার ভাই নীপু আমার সর্বনাশ করতে বসেছে। কথা শুনছে না। যদি তাকে বুঝিয়ে বলেন। একমাত্র আপনাকেই সে যা শ্রদ্ধা করে।'

ইচ্ছা করল লিখি, আচ্ছা, আমার যথাসাধ্য করব, তাতে যদি আপনার বিপদ কাটে। কিন্তু রানীর সঙ্গে আমার চিঠি চলাচল হচ্ছে এ কথা যদি কেউ রাজার কানে তোলে—তুলবেই—তা হলেই হয়েছে আমার চাকরি। চাকরি তো যাবেই, মান নিয়ে টানাটানি। শুধু কি মান নিয়ে! প্রাণ নিয়ে কি না তাই বা কে বলবে! কারণ রাজা লোকটা যেমন ভালো তেমনি খারাপ। মনিব হিসাবে চমৎকার, বন্ধুর মতো ব্যবহার করে। কিন্তু মানুষ হিসাবে আর পাঁচজন জমিদারের মতো অত্যাচারী, লম্পট। শোনা যায়, একজন শবিককে মেরে তার মৃতদেহ বাড়ীতেই পুঁতে রেখেছে। কিন্তু প্রমাণ নেই। থাকলেও তার চেয়ে জবর জিনিস আছে। নগদ টাকা। টাকায় রাতকে দিন করতে পারে। সুতরাং কাজ কী লোকটাকে চটিয়ে!

চিঠির জবাব দেওয়া হলো না। জবাব না পেয়ে রানী কী মনে করলেন জানিনে। দ্বিতীয় বার অনুরোধ এলো না। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে ধরে নিলুম যে ভাইবোনের ঝগড়া মিটে গেছে। বিপদ কেটে গেছে।

ভাইটাকে আমি দেখেছি। কলকাতায় থাকে। মাঝে মাঝে আসে, দু-পাঁচ দিন হৈ হৈ করে যায়। উদ্দামতার অবতার। বনের পাখী থেকে ঘরের বৌ-ঝি কেউ তার

নেকনজর এড়ায় না। শিকারী স্বভাব। আমাকে কিন্তু দূর থেকে নমস্কার করে। কেন বুঝতে পারিনে। অথচ রাজাকে ভয় করে না। বরং রাজাই তার ভয়ে তটস্থ।

কিছু দিন পরে শুনি রানী কলকাতা গেছেন। বাপের বাড়ী। বেশ ভালো। সেইখানেই ভাইবোনের ঝগড়া মিটুক। আমি কেন এর মধ্যে মাথা গলাতে যাই? তবে মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে। জীবনে এমন ঘটনা ক'বার ঘটে? রানী আমার কাছে উপযাচিকা। নিশ্চয় ঘোরতর বিপদ। নইলে কি তিনি আমার কাছে হাত পাততেন?

তারপর তিনি আর ফিরে আসেন না। এক মাস যায়, দু'মাস যায়। রাজাকেও খুব খুশি মনে হলো না। বাড়ীতে মেয়েমানুষ আনতে তাঁর সাহসে কুলোয়নি, মা বেঁচে আছেন, ছেলেমেয়েরাও বোঝে। কিন্তু শিকারের নাম করে বাইরে যেতে বারণ করবে কে? শিকারে গেলে তিনি শিবিরে রাত কাটান, সঙ্গিনীর অভাব হয় না, নিত্য নতুনের পরশ পান। কাজেই রানী না থাকলে তাঁর খুশি হবার কথা। তবু দেখা গেল তিনি ভাবনায় পড়েছেন।

যাক, আমাকে তো আর বলবেন না। আমার কী! আমি চুপচাপ থাকি। কেবল বায়াটা মুখরোচক হয় না। তফাৎ বুঝতে পারি। সাহিত্যিক রচনা আসে না সংশোধনের জন্যে। সেটাও একটা মনে রাখবার মতো তফাৎ। দু'জনের মধ্যে একটা সাহচর্যের ভাব গড়ে উঠেছিল। দু'জনে মিলে বই লিখলে যেমন হয়। সেটা বাধা পেলো। বইখানা অসমাপ্ত থাকতে যেমন লাগে তেমনি লাগল।

একদিন নীপু এসে হাজির হলো। তাকে দেখে চেনা যায় না। একদম নিবে গেছে। রাজার সঙ্গে তার কথাবার্তার টুকরোটাকরা আমার কানে এলো। রানী পাগল হয়ে গেছেন। তাঁকে কারো সঙ্গে মিশতে দেওয়া হচ্ছে না। মানুষ দেখলে তাঁর পাগলামি বেড়ে যায়। এমন কি নিজের সন্তানকে দেখলে তাঁর মাথায় খুন চাপে। রাজাকে দেখলে আস্ত রাখবেন না। রাজা যেন তাঁর ত্রিসীমানায় না যান।

আমার মনে বিষম আঘাত লাগল। হায়! তখন যদি জানতুম তাঁর কী বিপদ! তা হলে কি তাঁর চিঠির উত্তর না দিয়ে পারতুম! পাগল হয়ে গেলেন রানী! পাগল হয়ে গেলেন! এর জন্যে কি আমার কোনো দায়িত্ব নেই! নিজের উপর আমার রাগ ধরে গেল। নীপুর উপর আরো বেশি। সর্বনেশে ছোকরা কী যে করেছে কে জানে!

কিন্তু যতই তাকে এড়াতে যাই ততই তার দিকে ঝুঁকি। কী যে করেছে কে জানে! ইচ্ছা করে জানতে। তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, কিন্তু নিজের ভাবান্তর লক্ষ্য করে আমি নিজেই চমকে উঠলুম। যেন নীপুর সঙ্গে কথা না বলে আমার সোয়াস্তি নেই। সেই একমাত্র লোক যে বলতে পারে কী হয়েছে। লজ্জার মাথা খেয়ে কী করে কথাটা পাড়ি এই ভেবে হিমশিম খাচ্ছি এমন সময় সে নিজের থেকে আমার সঙ্গে

আলাপ করতে এলো।

বাঁচা গেল। গম্ভীর ভাবে শুনে গেলুম তার কথা। যেন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার। নীপু বলল, 'আপনার কাছে একটু কাজে এসেছি। দয়া করে যদি আমার কথা শোনেন।'

'নিশ্চয় শুনব। আপনি নির্ভয়ে বলে যান।'

'আমাকে 'আপনি' কেন? 'তুমি' বললেই আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করব। আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মতো। দিদি তো আপনাকে দেবতার মতো ভক্তি করত। কিন্তু আমার ওসব সাহিত্য টাহিত্য আসে না। যেন আমাকে কেল করাবার জন্যে ওসবের সৃষ্টি; নাটক ছাড়া আর কিছু আমি বুঝিনে, বুঝতে পারিনে। উপন্যাসও না। গল্পও না, কবিতা তো নয়ই। অথচ মজা দেখুন, চিনির বলদের মতো আমারই ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল ওসব। বলেছিল তোর কাছে এগুলো রাখিস। দেখতে দিসনে কাউকে; খবরদার, খবরদার, জামাইবাবুকে দিস্‌নে দেখতে। দেখলে সর্বনাশ হবে।'

এবার আমি গম্ভীর ভাবে জানতে চাইলুম, 'কেন?'

'কে জানে কেন!' নীপু অজ্ঞতার ভান করল।

কিন্তু আমার অভিনয় তার চেয়ে এক কাটি সরেস। আমি বোকামির ভান করলুম। নীপু যখন বুঝতে পারল যে আমার মতো নীরেট এ জগতে বেশি নেই তখন আশ্বস্ত হলো। বলল, 'জামাইবাবুর উপর আপনার অসীম প্রভাব। যদি দয়া করে তাঁকে শান্ত করার ভার নেন তা হলে কৃতজ্ঞ হব। তিনি হয়তো এখনি কলকাতা যেতে চাইবেন। কিন্তু গেলে কি দিদিকে দেখতে পাবেন?'

আমি বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। নীপু আমাকে বিশ্বাস করে কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'দিদি থাকলে তো দিদিকে দেখতে পাবেন?'

'য়্যাঁ!' আমি আঁতকে উঠলুম। রানী নেই? মারা গেছেন তা হলে? হায়, হায়! কেন তাঁর চিঠির উত্তর দিইনি তখন।

'আপনি যা ভয় করেছেন তা নয়।' নীপু কুণ্ঠিত হাসি হাসল। 'দিদি বেঁচে আছে ঠিক। কিন্তু কলকাতায় নেই। কোথায় আছে তা কেউ জানে না। আশা করছি ফিরে আসবে দু'দিন বাদে। ততদিন জামাইবাবুকে ভুলিয়ে রাখতে হবে। বাচ্চাদের ভুলিয়ে রাখার ভার আমরাই নিয়েছি।'

তাজ্জব ব্যাপার। রানী গৃহত্যাগিনী! কিন্তু কেন?

আমার মতো গাধা নীপু কখনো দেখেনি। তাই আমাকে বিশ্বাস করে বলল আরো গোপন কথা। আসলে হয়েছিল এই যে, নীপু একজনের প্রেমে পড়েছিল। সেই একজন আর কেউ নয়, তার দিদির জা। মেয়েটিও তাকে ভালোবাসত। কিন্তু কড়া পর্দা। কী

করে দেখা হবে দু'জনের ? দিদির ঘরে। দিদি প্রথমে রাজী হননি। কিন্তু নীপুর হাতে দিদির সেই সব রচনা ছিল। নীপু যদি সেগুলো তার জামাইবাবুকে দেখায় তা হ'লে সর্বনাশ হবে। কেননা তাতে প্রেমের কথা আছে!

তার পর শুধু দেখা পেয়ে সে সন্তুষ্ট হবে না। আরো নিকট করে চাইবে। তাতে দিদির প্রবল আপত্তি। কিন্তু নীপুর যেন নেশা চেপে গেছে। দিদিকে বলে, যাই, লেখাগুলো জামাইবাবুকে দেখতে দিই।

রানী বলেন, তুমি আমার লেখা ফেরৎ দাও। নীপু বলে, তুমি আমাদের মিলন ঘটিয়ে দাও।···কেউ কারো কথা শোনে না।

এই যখন পরিস্থিতি তখন রানী চলে যান বাপের বাড়ী। তার পরে যা ঘটে তা বিশ্বাস করা কঠিন। নীপুর এক বন্ধু ছিল তার নাম কঙ্ক। তাকেই তিনি ডেকে পাঠালেন নীপুর অসাক্ষাতে। কঙ্ক তার পর থেকে নীপুকে দিক করতে থাকল। নীপু আমল দিল না। তখন কঙ্ক একদিন তালা ভেঙে নীপুর ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে খিল দিয়ে নীপুর বাক্স খুলে লেখাগুলো মেজের উপর স্তূপাকার করে আগুন ধরিয়ে দেয়। কে একজন গিয়ে নীপুকে ডাকে। নীপু পাগলের মতো ছুটে গিয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে ও কঙ্ককে খুন করতে যায়। কঙ্ক আর সে যাত্রা প্রাণে বাঁচত না, যদি না দিদি ছুটে এসে মাঝখানে পড়তেন। মারের চোট যা লাগল তা দিদির গায়ে।

এর পর থেকে দিদির উপর নীপুর রাগ বাগ মানল না। আর কঙ্ককে তো সে খুঁজে বেড়াতে লাগল মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে। শুনতে পেতো রানীর সঙ্গে কঙ্ক লুকিয়ে দেখা করে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে। কিন্তু সেখানে তো তাকে আক্রমণ করা যায় না। নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলতে থাকে নীপু। ওদিকে যে ওরা পালাবার প্ল্যান আঁটছে এ খবর তার জানা ছিল না। গুপ্তচরের মুখে যখন জানতে পেলো তখন খুব দেরি হয়ে গেছে। ততক্ষণে ওরা বম্বে মেলে উঠে বসেছে ও ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

ই. আই. আর. বম্বে মেল। তার থেকে বোঝা যায় না কোন্ দিকে গেল। বম্বে না জব্বলপুর, না এলাহাবাদ না আর কোথাও। জাহাজে চড়ে বিলেত গেল কি না কে জানে। কঙ্ক বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। রানীর চেয়ে বয়স তার কম। এখনো বিয়ে হয়নি। বিলেত যাবার আশা রাখে। কিন্তু সে যে শেষকালে এই কর্ম করবে তা কি কেউ কোনো দিন ভেবেছে। এই লজ্জার কথা নীপু কাউকে জানায়নি। কঙ্কদের বাড়ীর লোক জানে সে চাকরির চেষ্টায় বেরিয়েছে। আর নীপুদের বাড়ীর লোক যেটুকু জানে সেটুকু এই যে দিদি একাই নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

নীপুর এখন জীবনে ধিক্কার এসে গেছে। নিজের উপরেই তার রাগ হয়। না হবেই বা কেন! যাকে সে কামনা করেছিল তাকেও তো আর কোনো দিন পাবে না। পর্দার

অন্তরালে চিরকালের মতো হারিয়েছে। তাই তার মন খারাপ। দিদির কথা শুনলে আর কিছু না হোক চোখের দেখাটুকু হতো। এখন এখানে এসে দেওয়ানার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদি দৈবাৎ চার চোখ এক হয়। না, তা হবার নয়। শাশুড়ী বুড়ী অন্দরে ঢুকতে দেবে না। দিদির বড় মেয়েকে দেখতে চাইলে দেখতে দেবে না।

নীপুর কাহিনী আর আমার ভালো লাগছিল না শুনতে। ভাবছিলুম তখন যদি রানীর চিঠির জবাব দিতুম, যদি জানাতুম, ভয় কী! আমি আছি। তা হলে কি এত দূর গড়াত। হায়, মানুষ তো সর্বজ্ঞ নয়। রানীকে দোষ দেওয়া সোজা। রানীকে বলি কেন, নারীকে দোষ দেওয়া সোজা। কিন্তু নারীর বিপদের দিনে মাথা দিতে পারে ক'জন! আমি তো পারিনি। কেমন করে দোষ দিই তা হলে। না, আমি দোষ দেব না।

এখন থেকে আরো একটি মানুষ ভাবনায় পড়ল। সে প্রিয়দর্শন ভদ্র। রানী আমার কে! কেন তা হলে আমি ভাবি! ভাবি এই জন্যে যে কঙ্ক নামক একটি ভেলা অবলম্বন করে রানী নামের একটি মেয়ে অকূলে ভেসেছে। দুনিয়া যে কেমনতর জায়গা সে জ্ঞান তো নেই। ঐ কঙ্কই হয়তো একদিন শুঙ্কক হবে। কিংবা আর কেউ হবে যে কঙ্ককে দেবে ভাগিয়ে। হয়তো এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচবে। হয়তো নিয়ে তুলবে বেশ্যালয়ে। হা-ভগবান!

কেন চিঠির উত্তর দিইনি বলে নিজের উপর আমি দিন দিন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলুম। এখন বুঝতে পারছি ওটা অহেতুক। বাস্তবিক আমার কিছু করবার ছিল না। কিন্তু তখনকার দিনে হৃদয়টা ছিল কোমল। কোথাও কোন নারী বিপদে পড়েছে শুনলে আমার ভিতরকার নাইট লাফ দিয়ে উঠত। ইসলাম বিপন্ন শুনলে যেমন মুসলমান সেটা গায়ে পেতে নেয়, নারী বিপন্ন শুনলে তেমনি নাইট সেটা নিজের করে নেয়। আমি থাকতে এত বড একটা অন্যায় অনুষ্ঠিত হবে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব! না, না, না। আমাকে ঝাঁপ দিতেই হবে আগুনে, অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। পৌরুষের অগ্নিপরীক্ষায়।

রাজার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম। ই. আই. আর. বম্বে মেল হাওড়া থেকে আমাকে নিয়ে চলল পশ্চিমে। ব্রেক জার্নি করতে করতে চললুম। কে জানে যদি হঠাৎ সন্ধান পেয়ে যাই। কয়েকটা ভুল সন্ধান পেয়ে বিভ্রান্ত হলুম। অবশেষে পৌঁছে গেলুম ভোপাল রাজ্যে।

হাঁ। ভোপালেই তারা ছিল। ছিল এক বাঙালী মুসলমান পরিবারে। শফিয়ান সাহেব ভোপাল সরকারে কাজ করেন। কঙ্ককে আগে থেকে চিনতেন। কঙ্ক তাঁকে ছোট বেলা থেকে চাচা বলে ডাকত। হিন্দুর পক্ষে হঠাৎ কাজ পাওয়া মুখের কথা নয়।

তিনি চেষ্টা করছেন। কঙ্ক আবার মুসলমান হবে বলে ক্ষেপেছে। তাতে তাঁর আপত্তি। রানীকে মুসলমানী করে মুসলমান মতে বিয়ে করতে চায় কঙ্ক। তাতেও তিনি নারাজ। সাহস থাকে তো হিন্দু সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম করুক ওরা। সাহস না থাকে তো যে যার ঘরে ফিরে যাক। হিন্দুসমাজের সমস্যা থেকে পালাবার পথ নয় ইসলাম।

সুফিয়ান সাহেব আমার নাম শুনেছিলেন। আমার পরিচয় পেয়ে উৎফুল্ল হলেন। তখন তিনি মুসলমান নন, আমি হিন্দু নই। আমরা দু'জনে বাঙালী। প্রবাসী বাঙালীরা বাঙালী দেখলে বর্তে যায়। মুসলমান না হিন্দু—এ প্রশ্ন ওঠে পরে। আর এর জন্যে কিছু আসে যায় না। সুফিয়ান সাহেব সহজেই আমার কাছে মন খুললেন। বললেন, মেয়েটি কে তা আমি জানিনে, জানতে চাইনে। আপনি তাঁর আত্মীয়, তাঁর খোঁজে এত দূর এসেছেন। আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে আমি তাঁর হিতৈষীর কাজ করেছি। এর জন্যে তিনি আমার উপর অভিমান করেছেন, হয়তো ভাবছেন আমার মতলব ভালো নয়, হয়তো আমিই তাঁর অনিষ্ট করব। কিন্তু আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন যে সমস্যা যেখানে সমাধানও সেইখানে। চাই মনের জোর! আমাদের মুসলমান সমাজে কি এ ধরনের ঘটনা ঘটছে না? তা বলে ক্রিশ্চান হতে যায় কেউ?

সত্যি তাই। মুসলমান কখনো সমাজের বাইরে গিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজে না। হিন্দু কেন তবে তা খোঁজে? রানীর সঙ্গে যখন আড়ালে দেখা হলো আমি বললুম, বোন, তোমার দুঃখ আমি বুঝি। আর কেউ যদি তোমাকে আশ্রয় না দেয় আমি দেব আশ্রয়, নিঃস্বার্থ ভাবেই দেব। মনে কোরো না আমার কোনো অভিসন্ধি আছে। কিন্তু লড়তে হবে হিন্দু সমাজের সঙ্গে। পালিয়ে গিয়ে বোরখায় মুখ ঢাকলে চলবে না।

রানী আমার সঙ্গে কথা বলতে কুণ্ঠিত হলেন। ধরা পড়ে গেছেন বলে লজ্জিত ও বিব্রত। কিন্তু আমি যে তাঁর দাদা এটুকু স্বীকার করে নিলেন। বললেন, দাদা, ভালো আছেন তো?

তাঁকে কথা কওয়ানো সে দিন সম্ভব হলো না। দেখলুম তাঁর ও আমার মাঝখানে একটা অদৃশ্য ব্যবধান খাড়া রয়েছে। তিনি রানী। আমি প্যালেস সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট। না হয় সাহিত্যিক। কিন্তু আপনার লোক নই।

পরোপকার করতে গেলে এই রকমই হয়ে থাকে। যদি বিপদের দিন সাহায্য করতুম তা হলে আমার কথা তাঁর কানে সুধাবর্ষণ করত। আমাকে অত কথা বলতেও হতো না। কিন্তু তা যখন করিনি তখন আমার কথা তাঁর প্রাণে পুলক সঞ্চার করবে কেন?

কঙ্ক আমাকে দেখে খুশি হলো আমি বাঙালী বলে। কিন্তু সন্দিগ্ধ হলো আমার কথাবার্তা শুনে। রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন রানীকে নিয়ে যেতে বা রানীর সন্ধান

নিতে। আমি রামের আজ্ঞাবহ হনুমান। আমার নিজের যেটা বক্তব্য সেটা একটা ছল। জমিদারের কর্মচারী আমি, মনিবের স্বার্থই আমার স্বার্থ। হায় পরোপকারী।

কী করে তাদের বোঝাই যে আমি নিজের খরচে নিজের খেয়ালে এত দূর এসেছি শুধু একটু উপকার করতে! কে বিশ্বাস করবে আমি একজন নাইট! ভাবলুম যাই চলে। যা করবার তা গুকিয়ান সাহেবই করবেন। তাঁর মতো মুরুব্বি থাকতে অহিত হবে না। কিন্তু ভোপাল রাজ্যে মোল্লা মৌলবীর তো অভাব নেই। চাকরির আশা দিয়ে কে যে কখন কলমা পড়ায় তার ঠিক কী!

উঠেছিলুম সেখানকার ডাক বাংলায়। বেশি দিন থাকার উপায় ছিল না। চিঠি লিখলুম দু'জনকে দু'খানা। লিখলুম, আমি শত্রুপক্ষের লোক নই। আমার দ্বারা তাদের ক্ষতি হবে না। রানীর বিপদের দিন সহায় হইনি বলে আমার মনে খেদ ছিল। সেই খেদ আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে এতটা পথ। কেউ জানে না যে আমি এসেছি। কেউ জানবেও না যে আমি এসেছিলুম। তারা যদি বিয়ে করতে চায় করবে। আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমার বুকে বাজবে তাদের সমাজত্যাগ। গৃহত্যাগ আমাকে তেমন বিচলিত করে না সমাজত্যাগ যেমন করে। তবু ভালো যে তারা অপর একটি সমাজের আশ্রয়ে বাস করবে, একেবারে নিরাশ্রয় হবে না! অসামাজিক হবে না। সে যে আরো ভয়ানক। আমি অন্তত এই কথা মনে করে নিশ্চিন্ত হব যে তারা অকূলে ভাসবে না।

আমি আশা করিনি যে আমার চিঠি পেয়ে তাদের মনের ধারা বদলে যাবে। কিন্তু যে বাণী অন্তর থেকে উঠেছে তাকে অবিশ্বাস করা শক্ত। কঙ্ক ও রানী দু'জনেই এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। কঙ্ক বলল, আপনি আমাদের কী করতে বলেন? আমি তৎক্ষণাৎ এর কোনো উত্তর দিতে পারলুম না। তাই তো। কী করবে এরা? ফিরে যাবে? ফিরে গিয়ে তার পরে কী করবে? আমি সময় চেয়ে নিলুম ভাবতে। কঙ্ক বলল, আচ্ছা, আমি বাইরে বসছি। আপনি ততক্ষণ এঁর সঙ্গে কথা বলুন। ইনি আপনাকে সমস্ত ঘটনা গোড়া থেকে বলবেন।

নির্জন ঘরে আমরা দুটি মানুষ মুখোমুখি বসে। রানী আর আমি। ভাই-বোন বলে আমাদের পরিচয়। কিন্তু আমরা ঠিক তা নই। আমরা একই লেখার দুই লেখক, দু'জনে মিলে লিখি। সেই সূত্রে অন্তরঙ্গ সহচর।

বয়স তাঁর কত হবে! সাতাশ-আটাশ। বয়সের অনুপাতে আরো তরুণ দেখায়। হাঁ, সুন্দরী। তন্বী। গায়ের রং জুঁই ফুলের মতো সাদা ও তাজা।

বললেন, আমার বিয়ে হয় এগারো বছর বয়সে। রাজপুত্তুরের সঙ্গে বিয়ে হবে এমন ভাগ্য কল্পনা করিনি। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে জন্ম। কী দেখে ওদের পছন্দ হলো জানিনে। বোধ হয় আমার রূপ। ছেলেবেলা থেকে যার কাহিনী শুনে এসেছি এই

সেই রাজপুত্র। রাজকন্যা নই, তবু রাজপুত্র আমাকে বিয়ে করেছে। আমার মতো সৌভাগ্যবতী কে?

এ কথা ভেবে আমার মাটিতে পা পড়ত না। দিন কেটে যেত আত্মগৌরবে। কিন্তু এটা যেমন আমার আত্মগৌরব তেমনি আর এক রকম আত্মগৌরব ছিল আমার স্বামীর। ছি ছি, সেসব কথা মুখে ধরবার নয়। তবু আপনাকে বলতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। নইলে আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন।

অনেক রাত করে বাড়ী আসত। আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে নিজের কীর্তিকলাপ শোনাত। আজ অমুক রূপসীকে ভোগ করে এলুম। আজ অমুক অমুকের সঙ্গে রাসলীলা হলো। আজ শিকার ফসকে গেল, কাল আবার ফাঁদ পাততে হবে। অবশ্য নেশার ঘোরে বলত। এমনিতে বেশ মুখ মিষ্টি।

এগারো বারো বছর বয়স। কোন্ কথার কী অর্থ তাই ভালো জানা ছিল না। বড় ননদের বিয়ে হয়েছে। তার কাছে বললে সে হেসে কুটি কুটি হতো। জ্ঞান যতই হতে লাগল ততই অসহ্য বোধ হতে লাগল। ভেবেছিলুম ছেলেমেয়ের বাপ হলে আর ওসব করবে না। কিন্তু চার বছর পরে দুই ছেলেমেয়ের মা হয়েও আমাকে শুনতে হতো পতিদেবতার লীলাপ্রসঙ্গ।

শাশুড়ী দোষ ধরতেন আমার। আমি আমার স্বামীকে সামলাতে জানিনে। মেয়েমানুষ বেঁধে রাখতে না জানলে পুরুষমানুষ তো উড়বেই। একেই বলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। আমার পড়াশুনা অল্প। বুদ্ধি তার চেয়েও কম। কী করে স্বামীকে সামলাতে হয় তা কেমন করে জানব। নাপতিনীর কাছে পরামর্শ চাইলুম। চাইলুম ধোপানীর কাছে। গয়লানীর কাছে। ময়রানীর কাছে। এরা আমাকে যেসব পরামর্শ দিল সেসব অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দেখলুম। বশীকরণের কোনো কলা বাকি রইল না। ষোলো কলা পূর্ণ হলো। পুরো পাঁচ বছর কাল এই সমস্ত করে ফল হলো আরো দুটি সন্তান। কিন্তু স্বামীর চরিত্র যথাপূর্ব।

এই বার এ বাড়ীতে এলো আর একটি বৌ। আমার জা। নিয়ে এলো নতুন জীবনের স্বাদ। এক রাশ বাংলা বই ও মাসিকপত্র। এত দিন ওসব চোখে দেখিনি। স্বামী দেখতে দিতেন না। নভেল পড়লে মেয়েরা খারাপ হয়ে যায় এই ছিল তাঁর ধারণা। আর মাসিকপত্র কেনা তো বাজে খরচ। আমার জা কিন্তু ওতে ডুবে থাকত। আমার দেওর বারণ করত না।

॥ বারো ॥

রানী তাঁর নুতন জীবনের বর্ণনা দিয়ে বললেন, এবার আর রাজপুত্রের স্বপ্ন নয়। এবার কাল্পনিক নায়কের ধ্যান। যে আমাকে ভালবাসবে। যে আমাকে জাগাবে। মা হয়েছি বটে, কিন্তু প্রিয়া তো এখনো জাগেনি। যে নারী মা হয়েছে সে কি কোনো দিন প্রিয়া হবার আনন্দ পাবে না?

কল্পলোকের গল্প ভাবি। ভাবতে ভাবতে সাধ যায় লিখতে। অশিক্ষিত হাতের লেখা। ইচ্ছা করে পড়ে শোনাতে, প্রকাশ করতে। সাহস হয় না। স্বামী জানতে পেলে আস্ত রাখবে না। বিয়ের আগে নাকি একজন শরিককে মেরে কি লুপ্ত করে দিয়েছে। লাশ নাকি বাড়ীতেই পোঁতা। স্ত্রীকে নিঃশেষ করা তার চেয়েও সোজা।

লিখি, লিখে আমার ভাই নীপুকে দিই লুকিয়ে রাখতে। পরে একসময় অন্য নামে প্রকাশ করা যাবে। নীপুর উপর আমার অসীম বিশ্বাস। তার আর যাই দোষ থাক সে বিশ্বাসঘাতক নয়। কিন্তু এমন দিন এলো, যেদিন দেখা গেল, সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, যদি না আমি তার হীরা মালিনী হই। বিদ্যা হচ্ছে আমার জা। সুন্দর হচ্ছে আমার ভাই। বুঝতে পেরেছেন?

আমার ঘরে হঠাৎ এক বার এক মিনিটের জন্যে তাদের দেখা হয়ে যায়। সেই থেকে তাদের ভাব। আমার জা আমাকে মুখ ফুটে বলতে পারে না। কিন্তু তার মনের কথাও তো আমি আঁচতে পারি। তার স্বামী তাকে ফেলে কলকাতায় থাকে। ফুর্তি করে। তার ছেলেমেয়ে হয়নি। হাতে কাজ নেই। বসে বসে বই পড়ে আর হা-হুতাশ করে। স্বামীর কাছে আদর যত্ন না পেলে শুধু বই পড়ে তো আর মন ভরে না।

তা বলে নীপুকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারিনে। আমার স্বামী জানতে পেলে রক্ষা থাকবে না। ভাই-বোন দু'জনকেই মাথায় ঘোল ঢেলে উলটো গাধায় চাপাবে। আর শাশুড়ী বুড়ীই বা কম কী! নিজের মহলে বসে সব খবর রাখেন। নীপুকে আমি সাবধান করে দিই, কিন্তু সে কি কথা শোনে! সে বলে, তোমার লেখা আমি জামাই-বাবুকে দেখাবই দেখাব, যদি না তুমি তোমার জাকে আর একটি বার দেখাও। নীপুকে তো দেখেছেন! অমন গোঁয়ার গোবিন্দ কি দুটি আছে। সে সব পারে। তাই ভয়ে ভয়ে আবার তাদের চোখাচোখি ঘটতে দিই। তার পরে আবার। আবার। আবার।

তাতেও তারা সন্তুষ্ট নয়। এক সঙ্গে বসে আলাপ করবে। গল্প করবে। আমাকে সারাক্ষণ পাহারা দিতে হবে। কখন কে এসে পড়ে। দেখতে পায়। আমার তো আর কোনো কাজ নেই। পাহারা দেওয়াই আমার একমাত্র কাজ। ভাগ্যিস ছেলেমেয়েরা

বাইরে খেলা করে। কেবল বড় মেয়েকে নিয়ে ভাবনা। তাকে ভুলিয়ে ঠাকুর ঘরে আটক রাখি। মালা গাঁথতে দিই।

এক দিন চোখে পড়ে গেল নীপু ওর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। দেখে আমার সর্বাঙ্গ জলে গেল। এতটা ভালো নয়। আমি বললুম, নীপু, বেরিয়ে যাও। নীপু বেরিয়ে গেল, কিন্তু যাবার সময় আগুন বর্ষণ করে গেল। বুঝতে পারলুম এবার আমার পরিত্রাণ নেই। আমার লেখা আমার স্বামীর দরবারে পেশ হবে। কাল্পনিক নায়কের সঙ্গে কাল্পনিক প্রেমালাপকে তিনি সত্যিকার নায়কের সঙ্গে সত্যিকার প্রেমালাপ বলে বিশ্বাস করবেন। কাল্পনিক অভিসার, কাল্পনিক বিহার এসব তাঁর কাছে সত্য মনে হবে। আর কী। এবার তৈরী হতে হবে কবরের জন্যে। শয়নমন্দির হবে আমার সমাধিমন্দির। গলা টিপে মারলে কি কেউ টের পাবে!

আপনাকে যখন চিঠি লিখি তখন এই ছিল আমার মনের অবস্থা। আমার ভাই আমাকে চরমপত্র দিয়েছিল, হয় মিলন ঘটিয়ে দাও, নয়, প্রাণের মায়া ছাড়ো। যে ডুবতে বসেছে সে হাতের কাছে যা পায় তাই চেপে ধরে। আপনি ছিলেন আমার হাতের কাছের খড়কুটো। জানতুম আপনার ক্ষমতা নেই। তবু একবার হাতটা বাড়িয়ে দিলুম। আহা, আপনি যদি সেদিন আমাকে একটু আশ্বাস দিতেন! তা হলে আমার জীবনের গতি অন্য রকম হতো। এ যা হলো, এ কী আমি ভেবেছিলুম!

আপনার উত্তর না পেয়ে আমি চার দিক অন্ধকার দেখি। হঠাৎ বিদ্যুতের মতো মাথায় খেলে যায়, বাপের বাড়ী পালিয়ে যাই না কেন? তা হলে নীপু আমার উপর চাপ দেবার চেষ্টা তখনকার মতো ছেড়ে দেবে। দাঁতে ভয়ানক যন্ত্রণা, কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার দেখানো দরকার, এই অছিলায় অনুমতি পাই স্বামীর! আমার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নীপুও চলে যেতে বাধ্য হয়।

আমাদের কলকাতার বাড়ীতে নীপুর আলাদা একটা ঘর ছিল, সেটার দরজা সব সময় বন্ধ। হয় ভিতর থেকে, নয় বাইরে থেকে। চাবি নীপুর কাছে। আমার লেখাগুলো তার কোনো একটা বাক্সয় লুকোনো থাকত। কী করে সেগুলো হাত করি এই হলো আমার দিবারাত্র চিন্তা। নিজে তো পারব না। আর কেউ পারে কি না ভাবতে ভাবতে নীপুর বন্ধু কঙ্কর কথা মনে এলো।

কঙ্ক আমার চেয়ে বয়সে বছর তিনেকের ছোট। ছেলেবেলায় আমার খেলার সাথী ছিল। বিয়ের পরে ওর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হতো না। কদাচ কখনো বাপের বাড়ী এলে দৈবাৎ দেখা হয়ে যেত। ও যে আমাকে দূর থেকে পূজা করত তা কোনো দিন বলেনি। আমিও অনুমান করিনি। তবে ওর উপর আমার একটা নির্ভরতার ভাব ছিল। মনে হতো যদি কখনো বিপাকে পড়ি, কঙ্ক আমার জন্যে যথাসাধ্য করবে। তবে নীপুর

বিশ্বাসঘাতকতার পর থেকে মানুষমাত্রেরই উপর আমার আস্থা টলেছে। কঙ্ক তার ব্যতিক্রম নয়।

একদিন আমার ছোট ছেলেমেয়েদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখাতে নিয়ে যাই। কঙ্ক যায় আমাদের প্রদর্শক হয়ে। সেই অবকাশে খুলে বলি সব কথা। নীপু যদি আমার লেখাগুলো আমার স্বামীকে দেয় তা হলে আমার মরণ ডেকে আনবে, কঙ্ক যেন দয়া করে এটা তাকে বোঝায়। সে যদি বোঝে তা হলে বাঁচা গেল, নয়তো লেখাগুলো যেমন করে হোক তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে। এর জন্যে যদি তাকে ঘুষ দিতে হয় তো দেওয়া যাবে। গয়না বিক্রীর ভার কঙ্কর উপরে। যদি কিছুতেই কিছু না হয় তা হলে লেখাগুলো তার বাক্স থেকে চুরি করতে হবে। ধরা পড়লে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কঙ্ক যদি এটা পারে তা হলে আমি তার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব। সে আমার প্রাণ রক্ষা করবে।

কঙ্ক এক কথায় রাজী হয়ে গেল। সে বেশি কথার লোক নয়। চিরকালই চাপা। তার দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন আমার কাজে লাগতে পারবে ভেবে ধন্য বোধ করছে।

তার পরে সে নীপুকে কী বলেছিল, কিছু বলেছিল কি না, জানিনে। একদিন দেখি নীপুর ঘর খোলা। বাক্স খোলা। কাগজপত্র পুড়ছে। নীপু তাড়া করছে কঙ্ককে। নীপুর হাতে পেনসিলকাটা ছুরি। কঙ্ক পালাবার পথ পাচ্ছে না। নীপুর সাঙ্গোপাঙ্গ দরজায় খাড়া। আমি যদি মাঝখানে গিয়ে না পড়তুম তা হলে কঙ্ক সাংঘাতিক জখম হতো। হয়তো মারা যেত। আমারই হাত গেল কেটে। রক্তে ঘর ভেসে গেল। কঙ্ক তা দেখে নিজের প্রাণ বাঁচাবে কী, আমার সেবা করতে লেগে গেল। নীপু লজ্জা পেয়ে সরে পড়ল।

সরে পড়ল বটে, কিন্তু লেগে রইল পেছনে। কঙ্ককে খুন না করে সে ছাড়বে না। কঙ্ক তাকে তার বাঞ্ছিতা থেকে বঞ্চিত করেছে। অতৃপ্ত কামনা যে কী ভয়ঙ্কর জিনিস তা প্রত্যক্ষ করি নিজের ভাইয়ের হিংস্র নিষ্ঠুর চোখে। তখন থেকে আমার ব্রত হলো কঙ্ককে বাঁচানো। সে আমার প্রাণরক্ষা করেছে, আমি তার প্রাণরক্ষা করব।

এর পরে যা ঘটল তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না। এটা আমার জীবনের সব চেয়ে বড় বিস্ময়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কঙ্ক আমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করত। একদিন সে আমার দিকে এমন করে তাকালো যে আমি বিনা কথায় বুঝতে পারলুম সে আমাকে ভালোবাসে। শুধু তাই নয়, সে আমাকে ছেলেবেলা থেকে ভালোবেসে আসছে। আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল বলে দেখতে পাইনি। এখন আমার দৃষ্টি খুলে গেছে। আমি যেন আত্মহারা হয়ে গেলুম। এ কী কখনো সম্ভব যে কেউ আমাকে ভালোবাসে! আমার তো ধারণা ছিল, কেউ ভালোবাসে না আমাকে। নিতান্ত

প্রেমহীন জীবন আমার। লোকে বলে রানী, কিন্তু আমি তো জানি আমি ভিখারিণী। স্বামীর কাছে আমার দেহের কিছু দাম আছে। কিন্তু আমার হৃদয়ের দাম সিকি পয়সাও নয়। কঙ্ক আমাকে জাগালো। আমি প্রিয়া, আমি বহু সাধনার ধন। আমার জন্যে একজন নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছে।

কঙ্ক আমাকে ভালোবাসে, কঙ্ক আমার প্রাণরক্ষা করেছে, কঙ্কর প্রাণ বিপন্ন। কেমন করে তাকে ফেলে স্বামীর কাছে ফিরে যাই! এই হলো আমার প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্তের প্রশ্ন। তার সঙ্গে যোগ দিল আর এক জিজ্ঞাসা। লজ্জা করে আপনার কাছে মুখ ফুটে বলতে। বলতুম না যদি না জানতুম যে আপনি আমার দাদার চেয়েও আপন। আপনি যে আমার কী সে বুঝতে পারি, কিন্তু বোঝাতে পারিনে।

কাউকে বলিনি, আপনাকে বলছি। যে নারী প্রিয়া হয়নি, মা হয়েছে, সে কি তা বলে প্রিয়া হবার আনন্দ পাবে না? মাতৃত্বের মহিমা আমি মানি। তার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হলে আমি ক্ষুণ্ণ হব। কিন্তু ওই কি সব? আর কোনো সার্থকতা, আর কোনো উপলব্ধি নেই মানবীর জীবনে? আমি তো দেবী নই, দেবীর অভিনয় করে তৃপ্তি পাব কী করে?

আমি ফিরে গেলুম না, মনে হলো ফিরে যাবার পথ নেই। প্রেমহীন সার্থকতাহীন নিষ্ফল জীবনে ফিরে যেতে চাওয়া মরণকামনা ছাড়া আর কী! তার চেয়ে অচেনা অজানা কোনো দেশে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করা শ্রেয়। কঙ্ককে বললুম, চল বেরিয়ে পড়ি। প্রস্তাবটা আমারই। ওর নয়।

তার পর আমরা কয়েক দিন ধরে কত রকম জল্পনা কল্পনা করলুম। কোথায় যাব, কী করব, এই সব। আইন-কানুন আমি জানিনে বুঝিনে। কঙ্ক বলল, হিন্দু মতে আমাদের বিয়ে হতে পারে না। মুসলমান মতে হতে পারে। তাতে কি তোমার রুচি হবে! আমি বললুম, কিছুতেই আমার অরুচি নেই। ক্রিশ্চান হতেও আমি রাজী। তবে তোমার কী দশা হবে তাই ভাবি। কঙ্ক বলল, আমার কপালে আছে ত্যাজ্য পুত্র হওয়া। চাকরিই করতে হবে আমাকে। লক্ষ্মী যখন সদয় হয়েছেন তখন জীবিকাও জুটে যাবে। তুমিই আমার লক্ষ্মী। আমি বললুম, শুধু লক্ষ্মীর মতো চঞ্চলা নই। দেখবে সারা জীবন জগদ্দল পাথরের মতো অচলা হয়ে থাকব।

দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই মনে হতে লাগল আমার ছেলেমেয়েদের কার কাছে রেখে যাব? তাদের কী দশা হবে? তাদের কী অপরাধ? কেন তাদের ফেলে যাব? মা কোথায় বলে তারা যখন কান্না জুড়ে দেবে তখন কে তাদের শান্ত করবে? কী তাদের সান্ত্বনা? রাতের পর রাত তাদের কোলে চেপে ধরে কেঁদেছি। তাদের জন্যে প্রার্থনা করেছি। আমার সাধ্য থাকলে আমি তাদের মা হয়ে তাদের কাছেই থেকে যেতুম। কিন্তু মৃত্যুর মতো প্রবল এক শক্তি আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল

কঙ্কব কাছে তার প্রিয়া হতে। আমার মনে হলো আমি মরে গেছি। মৃত্যুর পরে কে কার মা, কে কার ছেলেমেয়ে!

শেষ পর্যন্ত নিজের উপর বিশ্বাস ছিল না যে চলে আসতে পারব। পারলুম কিন্তু। এব পবেব ঘটনা আপনি জানেন।

রানীর কথা অবাক হয়ে শুনছিলুম। শোনা শেষ হলেও নির্বাক হয়ে রইলুম। স্বভাবত আমি আবেগপ্রবণ। আবেগে আমার কণ্ঠরোধ হয়েছিল। তা ছাড়া, বলবার আমাব কী ছিল! ধর্মত্যাগ কবা উচিত নয়। সমাজত্যাগ কবা উচিত নয়। কিন্তু গৃহত্যাগ কবা উচিত কি অনুচিত আমি বিচার করবার কে? পারতপক্ষে কি কোনো মেয়ে গৃহত্যাগ কবে? বিশেষত যে মেয়ে মা হয়েছে। আর এ তো শুধু গৃহত্যাগ নয়, রাজত্ব ত্যাগ। রাজরানী হয়েও যে গৃহত্যাগ করতে পারে তাকে আমি ঘৃণা করব, না শ্রদ্ধা কবব? আমাব চোখে জল এলো।

রানী তা লক্ষ্য করলেন। বললেন, আশীর্বাদ করুন যেন দৃঢ় থাকি। যেন ভেঙে না পড়ি। দিন দিন ভয় আমার বাড়ছে মানুষেব স্বরূপ দেখে। কঙ্ক মহৎ, তার কথা আলাদা। কিন্তু পথে ঘাটে যাদেব দেখেছি ও দেখছি তাদের সম্বন্ধে আতঙ্ক আমার বদ্ধমূল। সুফিয়ান সাহেব যে ক'দিন আমাদেব আশ্রয় দেবেন তাও জানিনে। জীবিকাব সুবাহা এখনো হলো না। গয়না বেচার টাকা ফুরিয়ে আসছে। ঝি হতে আমি রাজী আছি। কিন্তু কঙ্ক তা হলে আত্মহত্যা কববে।

আমার দু'চোখ দিয়ে শ্রাবণেব ধাবা ঝবতে থাকল। হায়! আমার যদি ক্ষমতা থাকত আমিই দিতুম একটা চাকরি। কিন্তু আপনি খেতে পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। আমি দু-এক বার মুখ ফুটে কিছু বলতে চেষ্টা কবলুম। বেরোল কয়েকটা অর্থহীন ধ্বনি। ভাব থাকলে তো ব্যক্ত হবে। ভাবেব ঘবে শূন্য।

চাকরিব জন্যে সুফিয়ানকে অনুবোধ উপরোধ করে আমি বাংলাদেশে ফিবে আসি। আবাব নিজের কাজে যোগ দিই। রাজা তত দিনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এমন কী পাগলামি যে তাঁর স্ত্রীকে তিনি দেখতে পাবেন না! দেখলেই পাগলী খুনোখুনি বাধাবে! এমন কী পাগলামি যে ছেলেমেয়েরাও মা'র কাছে যেতে পাবে না! গেলে কামড়ে দেবে!

আমার অবস্থা হেবম্ব মৈত্র মশায়ের মতো। জানি, কিন্তু বলব না। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করি। তবে সমবেদনা জানাতে ভুলিনে। হোক না পাষণ্ড, মানুষ তো!

আরো মাস খানেক পরে রাজা আর বাগ মানলেন না। চললেন কলকাতা। আমি প্রমাদ গণলুম। রানীকে যদি ওরা দেখতে না দেয় উনি জোর করে দেখতে চাইবেন। দেখতে না পেলে অনর্থ বাধাবেন। বাতাসে একটা থমথমে ভাব ছিল। ঝড়ের আগে

যেমন হয়। কোন্ দিন খবর আসবে কী একটা ট্রাজেডী ঘটেছে। ভাবতে গেলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

হলো কী শুনবে? শুনে অবাক হবে যে রাজা ফিরলেন রানীকে সঙ্গে নিয়ে। হাঁ, আসল রানী। নীপু এসেছিল, আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি আমরা। ঠিক তিন দিন আগে দিদিকে ধরে এনে বন্দী করেছিলুম চিলেকোঠায়। কী করে তার সন্ধান পেলুম, ভাবছেন? দিদি চিঠি লিখেছিল তার সইকে। জানতে চেয়েছিল তার ছেলেমেয়ের কুশল। সই তার ঠিকানা ফাঁস করে দেয় তার ছেলেমেয়েদের দেখতে এসে। তক্ষুনি আমি ভোপাল রওনা হয়ে যাই। সঙ্গে ছিল সেখানকার পুলিশ কমিশনারের নামে একখানা চিঠি। স্বফিয়ানকে সেটা দেখাতেই চিচিং ফাঁক। হারেম থেকে বেরিয়ে এলো দিদি। চলো আমার সঙ্গে। এই বলে আমি তাকে গ্রেপ্তার করলুম। বেচারির গায়ে জোর থাকলে তো বাধা দেবে! শুকিয়ে আধমরা হয়ে গেছে। কঙ্ক সেখানে ছিল না। শুনলুম তার একটা চাকরি জুটেছে। সে আপিসে গেছে। তার নামে একটা চিঠি রেখে এলুম। না, বিয়ে হয়নি।

তাজ্জব ব্যাপার! আমি একটি কথাও বললুম না। যদি টের পায় যে আমিই চাকরির জন্যে বলে কয়ে এসেছিলুম। বিয়ে যে হয়নি তাতেও আমার হাত ছিল।

এর পরে প্রায়ই শোনা যেত নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। মনে হতো রাজা রানীকে মারধোর করছে। বিশ্রী লাগত। ইচ্ছা করত ইস্তফা দিয়ে চলে যাই। একদিন কথাটা ভয়ে ভয়ে রাজার কাছে পাড়লুম। রাজা শশব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে ছি ছি! আমি কি তেমন লোক। আমি কি বুঝিনে যে পাগলকে মেরে কোন ফল নেই! তাতে পাগলামি সারে না। তবে তাকে চব্বিশ ঘণ্টা তালা বন্ধ করে রাখতে হয়। নয়তো কখন কাকে কামড়ে দেবে। কাচ্চা বাচ্চাদের তার ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। জানলা দিয়ে তারা উঁকি মেরে দেখে। চিড়িয়াখানার বাঘ দেখার মতো। আমি তো শত হস্ত দূরে থাকি। তবু আপনাদের ধারণা আমি মারধোর করি! ছি ছি ছি!

শুনে আমার চক্ষুস্থির। এর চেয়ে দু'টো চড় চাপড় ভালো। কিন্তু সে কথা বলতে পারিনে। বলতে পারিনে যে রানী পাগল নন। ওটা একটা অপবাদ। অথচ বলা উচিত। জানি, কিন্তু বলব না, নীতি হিসেবে এটা সব সময় খাটে না।

চাকরিটা বড় ভাল লেগেছিল হে। ছাড়তে চাইনি। তাই মুখ বুজে সহ্য করেছি নারীর উপর অবিচার ও অত্যাচার। কিন্তু ছাড়তেই হলো।

এক দিন সন্ধ্যা বেলা নিজের ঘরে বসে লিখছি। রাজা গেছেন শিকারে। এমন সময় সামনে চেয়ে দেখি স্বয়ং রানী। ভূত দেখলেও আমি অতটা চমকে উঠতুম না। চেহারাটা প্রায় ভূতের মতো হয়ে এসেছে। হাতগুলো সরু সরু, মুখটা ধবধবে সাদা।

বসতে আসন দিয়ে নিজে হাত জোড় করে দাঁড়ালুম। তিনি রানী, আমি প্যালেস সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। অন্দর থেকে কোনো দিন তাঁকে বাইরে আসতে দেখিনি। এ অঘটন ঘটল কী করে তাই ভাবছিলুম।

তিনি বোধ হয় তা আন্দাজ করেছিলেন। মুচকি হেসে বললেন, ভুলে যাচ্ছেন, আমি যে পাগল। পাগলের সাত খুন মাফ।

বুঝতে পেরে বললুম, হাঁ, হাঁ, পাগল বইকি। বদ্ধ পাগল।

রানী কেঁদে ফেললেন।

আমারও চোখের পাতা শুকনো ছিল না। ভাবছিলুম বাইরে কেউ নেই তো? মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলুম। না, কেউ নেই।

রানী আমাকে বসতে বললেন। বসলুম বটে, কিন্তু না বসারই সামিল। সমস্ত ক্ষণ উসখুস করতে থাকলুম। যদি হঠাৎ কেউ এসে পড়ে। রানীর কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। পাগল হবার ঐ এক সুবিধা।

বললেন, আপনি কি চান না যে আমি বাঁচি?

বললুম, নিশ্চয় চাই। আমাকে বিশ্বাস করুন।

তা হলে আমাকে বাঁচাবার জন্যে কী করছেন, বলুন? কঙ্ক কোথায়? কঙ্ককে আমার কাছে এনে দিন। নয়তো আমাকেই নিয়ে যান তার কাছে।

আমি—আমি—

হাঁ, আপনি। আপনি পারেন, যদি ইচ্ছা করেন। চাকরিটা যাবে, তা যাক। আবার হবে। বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। আসুন, আজকেই আমরা পালাই। এই দণ্ডে, এই মুহূর্তে।

না, না! তা কি হয়? আমি যে—

কেন, কিসের এত ভয়? কী করতে পারে রাজা আপনার? আসুন, বেরিয়ে পড়া যাক। যেখানে কঙ্ক আছে সেখানে আমাকে নিয়ে চলুন। আমাকে তার হাতে ধরে দিয়ে তার পর আপনার ছুটি। আপনিও আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন। আপনার তো বৌ নেই। বাধা দিচ্ছে কে?

আমার মনে খটকা লাগছিল। এ মেয়ে সত্যি পাগল হয়নি তো? চুপ করে থাকলুম। পাগলের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে কী হবে? কথায় কথা বাড়ে।

রানী বললেন, দাদা, আপনি আমার শেষ আশা ভরসা। আপনি সহায় না হলে আমি একা পালাতে পারব না। সহজেই ধরা পড়ব। আপনি কি আমাকে বাঁচবার সুযোগ দেবেন না? আপনি কি পাষাণ? না, না, আপনি হৃদয়বান। আসুন—

আমার তখন দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরছে। হায়, আমি যদি সত্যিকারের

মাইট হয়ে থাকতুম তা হলে কি আমাকে এত বার সাধতে হতো ? আমি হাত বাড়িয়ে দিতুম। ভেবে দেখতুম না কী আছে আমার ভাগ্যে। জেল না খুন না কলঙ্ক।

হাত জোড় করে বললুম, দিদি, পারব না।

রানী যেমন চুপিসারে এসেছিলেন তেমনি চুপিসারে চলে গেলেন। আমি সেদিন রাত জেগে আমার তল্পিতল্পা গুটিয়ে তার পরের দিন ভোর হতে না হতে ফেরার হলুম। রেখে গেলুম রাজার নামে একখানা ইস্তফাপত্র। কোনো কৈফিয়ৎ দিলুম না।

কলকাতা পৌঁছে প্রথম কাজ হলো নীপুর সঙ্গে দেখা করা। তাকে বললুম, তোমরা যে পাগলামির অপবাদ রটিয়েছ তার পরিণাম কী হয়েছে জানো ? দিদিকে যদি বাঁচাতে চাও এখান থেকে ডাক্তার নিয়ে যাও। ডাক্তার তাঁকে দেখে বলুক যে পাগলামি সেরে গেছে। নইলে যা হবে তা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। সেইজন্যে ইস্তফা দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

নীপু বলল, আচ্ছা, আমি চেষ্টা করছি।

নীপুর কাছেই শুনলুম, শুনে আশ্চর্য হলুম যে কঙ্ককেও ধরে আনা হয়েছে। কঙ্ক কিন্তু সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে। এবং তার পাগলামির সুযোগ নিয়ে তার গুরুজন তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। নইলে হয়তো সে কোনো দিন বিয়ে করত না, সেরে উঠে আবার উধাও হতো।

উঃ! ইচ্ছা করল বুকটা চেপে ধরে বসে পড়ি। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছিল। এত দুঃখ আছে এ জগতে! মানুষই তার স্রষ্টা। বৃথা বিধাতাকে দোষ দিই আমরা। বাব্বা, এ জাতের চরণে প্রণাম।

আমারও মন কেমন করছিল। শুধু শুনতে চাইলুম, রানী বেঁচে আছেন তো ?

আছেন।

আর কঙ্কর পাগলামি সেরে গেছে তো ?

গেছে।

তার পর ?

তার পর আর কী! মরে যাওয়াটা ট্রাজেডী নয়, বেঁচে থাকাটাই ট্রাজেডী। পাগল হওয়াটা ট্রাজেডী নয়, না হওয়াটাই ট্রাজেডী। যদিও লোকে ভাবে ঠিক উলটো।

প্রিয়দর্শনদার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। মিহিজামেই শেষ দেখা। রাজশাহী বদলি হয়েছি শুনে তিনি হৃষ্ট হয়েছিলেন। উত্তর বঙ্গে যাচ্ছি, নিশ্চয় সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু ছিলুম মাত্র সাত-আট মাস। যোগাযোগ ঘটেনি। তার পরে অনেক দূরে চলে যাই।

চট্টগ্রাম।

বিদায়ের আগে সেখানকার বন্ধুদের একটা ভোজ দিই। প্রিয়দর্শনদাও ছিলেন। বার বার বললেন, পুনর্দর্শনায় চ। আমি বললুম, পুনর্দর্শনের দিন হয়তো আপনি দেখবেন আমাকে যা লিখতে দিয়েছেন তা আমি লিখেছি। তখন খুশি হবেন তো ?

নিশ্চয় খুশি হব, ভাই। নিশ্চয় খুশি হব। জীবন মানুষকে খুশি করে না সব সময়। আর্ট তা করে। পুনর্দর্শনায় চ। পুনর্দর্শনায় চ।

প্রিয়দর্শনদা, এত দিন পরে লিখে উঠতে পারলুম। কিন্তু আজ আপনি কোথায়! আজ পয়লা অগ্রহায়ণ তেরো শ' আটান্ন। লেখা শেষ করে ভাবছি কাকে পড়ে শোনাব! কে খুশি হবে।

(১৯৫০-৫১)

কন্যা

ভূমিকা

বিশ বছর আগে খেয়াল হয়েছিল বড়দা মেজদা সেজদা ও ছোড়দা এই চার দাদার কাহিনী লিখব। বইখানির নাম রাখব দাদাকাহিনী। বড়দার অংশটা আরম্ভ করে দিয়েছিলুম। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারিনি।

পরে এক সময় নতুন একটা খেয়াল চাপে। সৌন্দর্যের অন্বেষণে বাহির হবে চার বন্ধু। তাদের অন্বেষণের কাহিনী হবে রূপাভিসার। কিন্তু এটাও খাতার রাজ্যে পড়ে থাকে। যেখানে অসংখ্য টুকিটাকি, টুকরো কথা।

আবার এক খেয়াল এলো। ছড়া লিখছি, রূপকথা কেন নয়? বড়দের রূপকথা। রাজকন্যা। রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র, কোটালপুত্র।

রাজকন্যা লিখব শুনে গৃহিণী বললেন, রাজকন্যা নয়। শুধু কন্যা। আমি ভেবে দেখলুম সেই ভালো। মনে পড়ে গেল একটি প্রিয় ছড়া—

যাদু, এ তো বড় রঙ্গ! যাদু, এ তো বড় রঙ্গ!
চার কালো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
কাক কালো কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ।

১৬ই আশ্বিন, ১৩৬০ — অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচী

অন্বেষণের পূর্বাহ্ণ ১২৫
যাত্রারম্ভ ১৩৪
কলাবতীর অন্বেষণ ১৪৪
রূপমতীর অন্বেষণ ১৫২
পদ্মাবতীর অন্বেষণ ১৫৯
কান্তিমতীর অন্বেষণ ১৬৭
অন্বেষণের মধ্যাহ্ন ১৭৫
তন্ময় ও রূপমতী ১৮২
সুজন ও কলাবতী ১৯০
অনুত্তম ও পদ্মাবতী ১৯৭
কান্তি ও কান্তিমতী ২০৫
অন্বেষণের অপরাহ্ণ ২১৩

অন্বেষণের পূর্বাহ্ণ

১৯২৪ সালের গ্রীষ্মকালটা যাঁরা পুরীতে কাটিয়েছিলেন তাঁদের কারো কারো হয়তো মনে আছে, লাটসাহেবের বাড়ীর কাছে বালুর উপর একটা নৌকোর ছায়ায় একসঙ্গে বসে থাকতে বা হেলান দিয়ে শুয়ে থাকতে প্রায়ই দেখা যেত চারজন তরুণকে। কী সকাল কী সন্ধ্যা কী দিন কী রাত।

ওই যার পরণে পট্টবস্ত্র আর ফিনফিনে রেশমী পিরাণ তার নাম কান্তি। গৌরবরণ সুপুরুষ। মাথায় বাবরি চুল, সুঠাম সুমিত গড়ন, প্রাণের চাঞ্চল্য প্রতি অঙ্গে। চলে যখন, চরণপাতের ছন্দে নাচের লহর ওঠে। ও যেন রূপকথার রাজপুত্র। হাতে চাঁদ কপালে সুয্যি।

আর ওই যার পোশাক শাদা জিনের ট্রাউজার্স, শাদা টেনিস শার্ট, অথচ গায়ের রঙ শামলা তার নাম তন্ময়। তন্ময়কে বোধ হয় সুপুরুষ বলতে বাধে, কিন্তু পুরুষোচিত চেহারা বটে ওই ছ'ফুট লম্বা চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি নওজোয়ানের। তন্ময় না হয়ে বিনোদ যদি হতো তার নাম তা হলেই মানাত। একটা বিনোদ-বিনোদ ভাব ছিল তার চোখে মুখে চালচলনে। কান্তিকে রাজপুত্র বললে তন্ময়কে বলতে হয় কোটালপুত্র।

ন'হাত খদ্দরের ধুতি খদ্দরের ফতুয়া যার গায়ে তার নাম অনুত্তম। দিন নেই রাত নেই সব সময় একজোড়া নীল চশমা তার চোখে। ইস্পাতের মতো কঠিন উজ্জ্বল ধারালো তার মুখ। পদক্ষেপে দৃঢ়তা। কাঁধ থেকে পৈতের মতো ঝোলানো থাকে একটা খদ্দরের ঝোলা। তাতে তকলি পাঁজ ও লাটাই। যখন খেয়াল হয় সুতো কাটে। বলা যাক মন্ত্রীপুত্র।

আর একজনের হাতে কালো ছাতা। বেলা পড়ে গেছে, মাথায় রোদ লাগছে না, সুজন তবু ছাতা বন্ধ করবে না। যেন ওটা ছাতা নয়, ঘোমটা কি বোরখা। মানুষটি মুখচোরা, লাজুক। নয়ানসুকের পাঞ্জাবী ও মিহি শান্তিপুরী ধুতি পরে। গোলগাল নরম নধর নন্দদুলালকে সওদাগরপুত্র বলব না তো বলব কাকে! অবশ্য রূপকথার সওদাগরপুত্র। সত্যিকারের নয়।

বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে চার বন্ধু এসেছিল হাওয়াবদল করতে। হাওয়াবদলটা উপলক্ষ। আসলে ওরা এসেছিল ওদের জীবনের একটা চৌমাথায়। কয়েকটা মাস

একসঙ্গে কাটিয়ে চারজন চার দিকে যাত্রা করবে। কান্তি বেরিয়ে পড়বে নাচ শিখতে, মণিপুরী দক্ষিণী গুজরাতী উত্তরভারতী। নাচের দলে যোগ দিয়ে দেশবিদেশ ঘুরবে। নিজের দল গড়বে। তন্ময় তো বিলেতফের্তা ক'ভাইয়ের ন' ভাই। বিলেত না গেলে তার জাত যাবে। অক্‌স্‌ফোর্ডে তার জন্যে জায়গা পাওয়া গেছে। জাহাজেও। টেনিস ব্লু হতে তার শখ। জীবিকার পক্ষে ওর উপযোগিতা নেই বলে কষ্ট করে পড়াশুনাও করতে হবে। অনুত্তম ফিরে যাবে জেলে। গান্ধীজী সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। খুব সম্ভব তিনি কর্মীদের ডাক দেবেন গণ-সত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হতে। অনুত্তম আবার পড়া বন্ধ করবে অনির্দিষ্টকাল। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সেও স্বাধীন নয়। জীবিকার জন্যে তৈরি হবার স্বাধীনতা তার নেই। সুজন ফিরে যাবে কলকাতা। এম. এ. পড়বে। তার পরে হবে সম্পাদক ও সাহিত্যিক। তার ধারণা সংসার চালানোর পক্ষে ঐ যথেষ্ট। নিজের লেখনীর 'পর অসীম বিশ্বাস। কলম নাকি তলোয়ারের চেয়ে জোরালো।

বিদায়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল ততই তাদের চার জনের মন কেমন করছিল চার জনের জন্যে। ততই যেন তারা পরস্পরকে কাছে টানছিল চার জোড়া হাত দিয়ে চার গুণ করে। কেউ কাউকে ছেড়ে একদণ্ড থাকবে না, একজন অনুপস্থিত হলে বাকী তিন জন অস্থির হয়ে ছুটবে তার সন্ধানে। তন্ময় উঠেছে এক ইউরোপীয় হোটেলে। কান্তি তার মাসিমার বাড়ী। অনুত্তম ও সুজন ধর্মশালায়। বলা বাহুল্য তাদের দুজনের অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়। সুজন পড়ে স্কলারশিপের টাকায়। আর অনুত্তম চালায় ছেলে পড়িয়ে। একসঙ্গে থাকতে পারে না বলে তাদের চার জনের মনে খেদ আছে। ধর্মশালাতেই চারজনে উঠত, কিন্তু তন্ময়রা ব্রাহ্ম, আর কান্তির মাসির বাড়ী থাকতে সে কী করে ধর্মশালায় ওঠে! সম্ভব হলে সে-ই বরং তার মাসির ওখানে সদলবলে উঠত। কিন্তু হপ্তার পর হপ্তা মাসের পর মাস দলবল নিয়ে থাকলে মাসির উপর উৎপাত করা হয়। এক ধর্মশালা থেকে আর এক ধর্মশালায় বদলি হতে হতে চললে তিন-চার মাস কাউকে কষ্ট না দিয়ে দিব্যি কাটানো যায়। অনুত্তম জেল খাটিয়ে মানুষ। নিজে কষ্ট পেতে জানে ও চায়। ওটা তার প্রস্তুতির অঙ্গ। কিন্তু সুজনের হয়েছে মুশকিল। সে একটু যত্ন আত্তি ভালোবাসে। একটি মাসি কি পিসি কি দিদি পেলে সে বর্তে যায়। অথচ এমন মুখচোরা যে যাঁদের সঙ্গে তার পরিচয় তাঁদের কাউকে মুখ ফুটে একবার মাসিমা কি দিদি বলে ডাকবে না।

আর কান্তি? কান্তি ঠিক তার বিপরীত। ওই যে মাসিমা উনি কি তার আপন মাসিমা নাকি? আদে না। পাতানো মাসিমা। কবে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এই পুরীতেই। তার পর যতবার পুরী এসেছে প্রত্যেক বার তাঁর ওখানে উঠেছে, তিনিও তাকে অন্যত্র উঠতে দেননি। হোটেলের খাওয়া তার মুখে রোচে না। ধর্মশালায় থেকে

মন্দিরের প্রসাদ খেয়ে বেশ এক রকম তৃপ্তি পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে রোজ নতুন লোক আসছে রোজ নতুন লোক যাচ্ছে সেখানে বেশি দিন থাকতে মন লাগে না, মন চায় ওদের সঙ্গে পালাতে। কিংবা ওদের সঙ্গ এড়াতে। কান্তি সেইজন্যে মাসিমা পিসিমার খোঁজে থাকে। পেয়েও যায়। তার আলাপ করার পদ্ধতি হলো এই। হঠাৎ দেখতে পেলো মন্দিরের পথ দিয়ে কে একজন মহিলা যাচ্ছেন। সঙ্গে একটি ছোট ছেলে কি মেয়ে। পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'এই যে মাসিমা। কবে এলেন? আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি কান্তি।' আশ্চয্যি! দশটা ঢিল ছুঁড়লে একটা লেগে যায়। মহিলাটিও বলে ওঠেন, 'অ! কান্তি! কবে এলি?' দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে। আত্মীয়তা হয়ে যায়।

জীবনের একটা চৌমাথায় এসে পৌঁছেছে তারা চার বন্ধু। যেমন পৌঁছেছিল রূপকথার রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র, কোটালপুত্র। তেপান্তরের মাঠের সীমায় চার দিকে চার পথ। চার পথে চার ঘোড়া ছুটবে। আর কত দেরি? প্রত্যেকে অধীর। কেবল সুজন অধীর নয়। সে ধীর স্থির আত্মস্থ প্রকৃতির মানুষ। তার জীবনযাত্রা দু'দিন পরে বদলে যাচ্ছে না, বদলে যাক এটাও সে চায় না। চলতে চলতে যেটুকু বদলাবে সেটুকুর জন্যে সে প্রস্তুত। কিন্তু তার জন্যে তাকে কলকাতা ছাড়তে হবে না। এমন কি, তাকে তার ট্যামার লেনের বাসা ছাড়তে হবে না। তার পথ কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাসিকপত্রের অফিসে। সেই পথে ছুটবে তার ঘোড়া। ছুটবে, কিন্তু কদম চালে নয়, দুলকি চালে।

চার ঘোড়া চার দিকে ছুটবে, দিগ্বলয়ে মিলিয়ে যাবে তাদের ছায়া। কেউ কি কাউকে দেখতে পাবে আর এ জীবনে! একজনের সঙ্গে একজনের দেখা হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু সকলের সঙ্গে সকলের দেখা হওয়া একটা অর্ধোদয়যোগ কি চূড়ামণি-যোগ বিশেষ। হবে না তা নয়। হবে, কিন্তু কবে? হয়তো বিশ বছর বাদে। হয়তো শেষ জীবনে। তখনকার সেই চৌমাথায় পৌঁছে গাছতলায় ঘোড়া বাঁধবে চার কুমার। গল্প করবে সারা রাত। কে কী হয়েছে, কে কী পেয়েছে, কে কী করেছে, তার গল্প। আবার চার জনে একসঙ্গে বাস করবে, একসঙ্গে বেড়াবে বসবে ও শোবে। সে তাদের দ্বিতীয় যৌবন। দ্বিতীয় যৌবনে উপনীত হয়ে প্রথম যৌবনের দিকে ফিরে তাকাবে তারা। কিন্তু তার আগে নয়। তার আগে ফিরে তাকাতে মানা।

তন্ময় বলল, 'ভাই, আবার আমরা এক জায়গায় মিলব তা আমি জানি। কিন্তু তার আগে আমাদের কৃতী হতে হবে সফল হতে হবে। জীবনটা তো হেলাফেলার জন্যে নয়। আর জীবনের সেরা সময় তো এই প্রথম যৌবন।'

কান্তি বলল, 'সত্যি। আবার যখন আমরা মিলব তার আগে যেন যে যার পরিকল্পনা

অনুযায়ী কাজ করে থাকি। তখন যেন বলতে না হয় যে পরিকল্পনায় খুঁৎ ছিল।'

অনুত্তম বলল, 'না, পরিকল্পনায় খুঁৎ নেই। চিন্তা করতে করতে, আলোচনা করতে করতে রাতকে দিন করে দিয়েছি দিনকে রাত করে দিয়েছি, মাসের পর মাস। খুঁৎ থাকলে নিশ্চয় ধরা পড়ত। হয়তো কাজ করতে করতে ধরা পড়বে। তার জন্যে ফাঁক রাখতে হবে।'

সুজন বলল, 'ফাঁক রাখতে হবে না। ফাঁক আপনি রয়ে গেছে।'

বিস্মিত হয়ে কান্তি বলল, 'সে কী!' তন্ময় বলল, 'সে কী!' অনুত্তম বলল, 'তার মানে?' কেবল বিস্মিত নয়, বিরক্ত। কেবল বিরক্ত নয়, ক্ষুব্ধ। যাবার বেলা পিছু ডাকলে যেমন বিশ্রী লাগে। অযাত্রা ঘটে গেল।

সুজন বলল, 'কী করে বোঝাব! কিসের একটা অভাব বোধ করছি কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না। তোরা যদি বোধ না করিস্ তোরা এগিয়ে যা।'

স্তম্ভিত হলো তন্ময় কান্তি অনুত্তম। এই যদি তার মনে ছিল এত দিন খুলে বলল না কেন সুজন? এখন ওরা করে কী! জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা কি ঢেলে সাজতে হবে? তার সময় কোথায়!

সুজনকে যদি বিশ্বাস করতে না পারি তবে কান্তিকে বিশ্বাস কী। তাই ভেবে তন্ময় সুধালো কান্তিকে, 'তুইও কি কিসের একটা অভাব বোধ করিস্?'

কান্তি এর উত্তর না দিয়ে পাল্টা সুধালো তন্ময়কে, 'তুইও কি—'

অনুত্তম অন্যমনস্ক ছিল। ঠাওরালো তাকেই প্রশ্ন করা হয়েছে। বলল, 'হাঁ, আমিও।'

বিচলিত হলো তন্ময় ও কান্তি। সামলে নিয়ে তন্ময় বলল, 'আমারও তাই মনে হয়।'

তখন কান্তি পড়ে গেল একলা। অভিভূত হয়ে বলল, 'তা হলে তাই হবে।'

সকলেই বুঝতে পেরেছিল এর পরে কী আসছে। এর পরে পরিকল্পনা রদ বদল। তাতে সুজনের তেমন কিছু আসে যায় না। কিন্তু বাকী তিনজনের যাত্রাভঙ্গ। উহ্! কী পাষণ্ড এই সুজনটা! অভাব বোধ করিস্ তো কর্ না, বাপু। বলতে যাস্ কেন?

অনুত্তম ওদের মধ্যে বয়সে বড়। নীল চশমা চোখে থাকায় তাকে প্রবীণের মতো দেখায়। পরামর্শের জন্যে অন্যেরা তার দিকে তাকাচ্ছে দেখে সে একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ভয় আমাদের এই যে চরম মুহূর্তে আমাদের জীবনের পরিকল্পনা বুঝি ভেস্তে যায়। কিন্তু পরিকল্পনা তো আমাদের তাসের কেল্লা নয়। কত কাল ধরে আমরা জীবনের মূলসূত্রগুলো নিয়ে অবিশ্রান্ত আলোচনা করেছি। কোনোখানে এতটুকু কাঁচা রাখিনি। ভিৎ আমাদের পাথরের মতো পাকা। তারই উপর দাঁড়িয়েছে আমাদের

পরিকল্পনা। গড়তে গেলে অদল বদল হয়েই থাকে। গড়ছি তো আমরাই। তবে এত ভাবনা কিসের ?'

তন্ময় বলল, 'ভাবনা কিসের তা কি তুই জানিস্‌নে ? যে অভাববোধ একদিন আগেও ছিল না সে যে অনাহূত অতিথির মতো এসে উপস্থিত হয়েছে। এসে বলছে আমার জন্যে কী ব্যবস্থা করেছ দেখি। ব্যবস্থা করা কি এতই সহজ যে জীবনটা যেমন ভাবে কাটাব স্থির করেছিলুম তেমনি ভাবে কাটাতে পারব বলে ভরসা হয় ?'

কান্তি বলল, 'না, ভরসা হয় না। তবে জীবনের মূলসূত্রগুলোর উপর একবার হাত বুলিয়ে যাওয়া যাক অর্গ্যানের কীবোর্ডের মতো। প্রাণের কানে ঠিক বাজে কি না পরখ করা যাক।'

এবার ওরা তাকালো সুজনের দিকে। সুজন যেন জীবনের কীবোর্ডের উপর আঙুল বুলিয়ে বলে দিতে পারে কোন চাবিটা বাজছে, কোনটা বেসুর, কোনটা অসাড়। বন্ধুদের দশা দেখে সে দুঃখিত হয়েছিল। সে তো ইচ্ছা করে তাদের এ দশা ঘটায়নি। উদ্ধারের পন্থা যদি জানত তবে নিশ্চয় জানাত। কান্তি যা করতে বলছে তাই করে দেখা যাক। জীবনের মূলসূত্রগুলো স্থির আছে না অবোধ্য এবং অভাববোধের টানে বিপর্যস্ত হয়েছে।

সুজন তখন ধ্যান করতে বসল। চোখ মেলে।

ধ্যানযোগে উপলব্ধি করল, করতে করতে বলতে লাগল, 'আদি নেই, অন্ত নেই এ বিশ্বজগতের। কেউ যে কোনো দিন একে সৃষ্টি করেছে বা কোনো দিন একে ধ্বংস করবে আমাদের তা বিশ্বাস হয় না। নাস্তি থেকে এ আসেনি, নাস্তিতে ফিরে যাবে না। এর সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। নিঃসংশয় হতে পারছিনে কেবল আমাদের নিজেদের বেলা। আমরাও কি এসেছি অস্তি থেকে অস্তিতে, ফিরে যাব অস্তিতে ? আমাদের ইনটেলেকট্ বলছে, কী জানি ! কিন্তু ইনটুইশন বলছে, হাঁ। আমরা অস্তি থেকে অস্তিতে এসেছি, অস্তিতে রয়েছি, অস্তিতেই অস্ত যাব সন্ধ্যারবির মতো। এক্ষেত্রে আমরা ইনটুইশনের উক্তি বিশ্বাস করব। বহির্জগতের মতো অন্তর্জগৎও সত্য। বহির্জগতের নিয়মকানুন বুঝে নেবার জন্যে ইনটেলেকট্, আর অন্তর্জগতের তল পাবার জন্যে ইনটুইশন। অন্তর্জগতের দিকে যখন তাকাই তখন দেখতে পাই তারও আদি নেই, অন্ত নেই। যখন তাতে ডুব দিই তখন দেখি জরা নেই, মৃত্যু নেই, বিকার নেই, বিচ্ছেদ নেই, নিত্য বসন্ত, নিত্য যৌবন। বহির্জগতের সমস্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও অন্তর্জগতের বা অন্তর্জীবনের আধি নেই, ব্যাধি নেই, ভয় নেই, উদ্বেগ নেই, কিছুই সেখানে হারায় না, ফুরোয় না, পালায় না, জরে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেখি অমৃতময় দেবতা। দর্শন করি তাঁর মহিমা। দীনের মধ্যে দেখি লক্ষ্মীশ্রী, হীনের মধ্যে নারায়ণ। পীড়িতের মধ্যে,

আর্তের মধ্যে শান্তম্ শিবম্। বিপন্নের মধ্যে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। সবাইকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। সেই আমাদের দেবপূজা। আমাদের পূজা আমাদেরই কাছে ফিরে আসে। আমরাও পূজা পাই। হাঁ, আমরাও দেবতা। আমাদের কিসের অভাব! আমরা কি—'

'এই বার ধরা পড়ে গেছে সুজন।' কান্তি বলল স্মিত হেসে। 'কে যেন বলছিল কিসের একটা অভাব বোধ করছে! সুজন নয় তো!'

তন্ময় হো হো করে হেসে উঠল। 'মূলসূত্র শিকেয় তোলা থাক। এখন বল্, তোর কিসের অভাব। এই, সুজন।'

'ডুবে ডুবে জল খেতে কবে শিখলি রে!' বলল অনুত্তম। 'তোর কিসের অভাব তা আগে থেকে জানতে দিলি নে কেন!'

মূলসূত্রের খেই ছিঁড়ে গেল। সুজন বেচারি করে কী! চুপ করে সহ্য করল হাসি মস্করা। তার দশা দেখে কান্তি বলল, 'থাক, ওকে আর ঘাঁটিয়ে কী হবে। অভাব নেই সে কথা ঠিক। অভাব আছে এ কথাও বেঠিক নয়। ইনটুইশন তো সব সময় খাটে না। ইনস্টিংক্ট যখন বলে খিদে পাচ্ছে তখন খিদেটাই সত্য। সাপ দেখলে সুজনও ভয় পায়।'

হাসির হররা উঠল। কিন্তু তাতে সুজন যোগ দিল না। লক্ষ করে নিরস্ত হলো কান্তি। বলল, 'থাক, সুজনের কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। আমার একটা প্রস্তাব আছে। অবধান করো তো নিবেদন করি।'

অনুত্তম বলল, 'উত্তম!'

'কাল চিঠি পেয়েছি,' কান্তি বলল, 'অধ্যাপক জীবনমোহন আসছেন এখানে। তাঁর হোটেলের ঠিকানা দিয়েছেন। সকলের তিনি অধ্যাপক, আমাদের তিনি সখা, দার্শনিক ও দিশারী। তিনি এলে পরে একদিন তাঁর ওখানে গিয়ে দেখা করতে হবে, খুলে বলতে হবে, কার মনে কী আছে। যা আমাদের একজনের কাছেও স্পষ্ট নয় তা হয়তো তাঁর কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কেমন? রাজী?'

তন্ময় বলল, 'নিশ্চয়।' অনুত্তম বলল, 'আচ্ছা।' সুজন বলল, 'দেখি।'

জীবনমোহন তাঁর অর্ধেক জীবন দেশ দেশান্তরে কাটিয়ে অল্প দিন হলো অধ্যাপনার কাজ নিয়েছেন। ক'দিন টিকতে পারবেন বলা যায় না। ছাত্ররা সাক্ষাৎ করতে গেলে তাদের সিগারেট অফার করেন। এই নিয়ে কথা উঠলে বলেন, 'কেন, আমিও তো ছাত্র।' কর্তারা তাঁর অধ্যাপনায় সন্তুষ্ট, কিন্তু তাঁর বেহায়াপনায় রুষ্ট। ছাত্ররাও প্রসন্ন নয়। কারণ তিনি পলিটিক্সের ধার ধারেন না, ধর্মের ধার দিয়ে যান না। অনুযোগ করলে বলেন, 'মদ আমি খাইনে, অহিফেন ছুঁইনে।'

বয়স চল্লিশের ওপারে। বিয়ের ফুল ফুটল না এখনো। মাথার মাঝখানে টাক।

দু'দিকের কেশ কাঁচাপাকা। জবাহরলালের মতো সাজপোশাক। তেমনি তরুণ দেখায়। তবে টুপিটা আরো শৌখীন। চাউনিতে এমন কিছু আছে যার থেকে মনে হয় তিনি অনেক দূরের মানুষ। কে জানে কোন সুদূর মানস সরোবরের হংস।

জীবনমোহনের হোটেলে দেখা করতে গেল চার বন্ধু। তিনি তাদের ডেকে নিয়ে গেলেন ছাদের উপরে। সেখানে বেশ নিরিবিলি। পায়ের তলায় সাগরের ঢেউ ফেনায় ফেনায় ফেটে পড়ছে, ছুটে আসছে, লুটিয়ে যাচ্ছে। আবার পা টিপে টিপে পিছু হটছে। ঝাঁপ দেবার আগে দম নিচ্ছে। দম নেবার সময় মুখে শব্দ নেই, ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় তর্জন গর্জন, ফিরে যাবার সময় সে কী মধুর মর্মর !

যত দূর দৃষ্টি যায় অসীম নীল। তার সঙ্গে মিশে গেছে অসীম কালো। অন্ধকার রাত। কিন্তু অন্ধকারও ফেনিয়ে উঠছে, ফেটে পড়ছে, ভেঙে যাচ্ছে মুঠো মুঠো তারায়, ফোঁটা ফোঁটা তারায়। তবে তার মুখে বোল নেই। থাকলেও শোনা যায় না, এত অস্ফুট ধ্বনি।

জীবনমোহন হাত জোড় করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারা বলে যেতে লাগল যা বলতে এসেছিল। বলল প্রধানত কান্তি। মাঝে মাঝে তন্ময়। কচিৎ অনুত্তম। একবারও না সুজন। তবে তার নীরবতাও বাঙ্‌ময়।

এর পরে যখন জীবনমোহনের পালা এলো তিনি ছোট খাটো ছুটো একটা প্রশ্ন করতে করতে কখন এক সময় শুরু করে দিলেন তাঁর বক্তব্য। বললেন কথাবার্তার মতো করে। সহজ ভাবে। বিনা আড়ম্বরে।

বললেন, 'বিশ্বাস করবে কি না জানিনে. তোমাদের বয়সে আমারও মনে হতো কিসের যেন অভাব। সব কিছু থেকেও কী যেন নেই। কী যেন না হলে সব কিছু বিস্বাদ। পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের কোনোটাতে নেই লবণ। আমারও একজন অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপকের অধিক। তাঁর কাছে গেলুম উপদেশ চাইতে। তিনি বললেন, জীবনমোহন, রত্ন কারো অন্বেষণ করে না। রত্নেরই অন্বেষণ করতে হয়। যাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না, যা সুদূর, তোমার জীবনকে করো সেই সুদূরের অন্বেষণ। জানতে চাইলুম, কী সে নিধি ? কী তার নাম ? তিনি বললেন, খুঁজতে খুঁজতে আপনি জানতে পাবে।'

সমস্ত মন দিয়ে শুনছিল তারা চারজন। জীবনমোহন আর কিছু বলবেন ভেবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু তিনি উচ্চবাচ্য করলেন না।

তখন তন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'যদি আপত্তি না থাকে তবে জানতে পারি কি, সার, কী সে নিধি !'

'না, আপত্তি কিসের ?' তিনি একটু থামলেন। একটু ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, '**The Eternal Feminine.**'

চমক লাগল তাদের চার বন্ধুর। আনন্দের হিল্লোল খেলে গেল তাদের বুকে ও মুখে। দেখতে পেলো না কেউ।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন স্বয়ং জীবনমোহন। বললেন, 'তোমরা হয়তো ভাবছ এটা এমন কী অসামান্য কথা, কী এমন বিশেষত্ব আছে এটার। অসামান্য এইজন্যে যে এর সন্ধান রাখে এমন লোক 'লাখে না মিলল এক'। বিশেষত্ব এইখানে যে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে এমন দু' পাঁচজন তরুণ পাওয়া গেছে যারা এ অন্বেষণ বরণ করেছে, এ অন্বেষণে বাহির হয়েছে। তারা সিদ্ধার্থ হয়েছে এ কথা বলতে পারলে সুখী হতুম। কিন্তু একেবারে ব্যর্থ হয়েছে এ কথাও বলব না। তারা আর কিছু পারুক না পারুক আদিকাল থেকে চলে আসতে থাকা একটা অন্বেষণের ধারাকে আজ অবধি বহমান রাখতে পেরেছে।'

অভিভূত হয়েছিল চারজনেই। উচ্ছ্বসিত স্বরে কান্তি বলে উঠল, 'এ অন্বেষণ আমি বরণ করব। আমি বাহির হব। আমি ব্যর্থ হতেও প্রস্তুত।'

আবেগভরে তন্ময় বলে বসল, 'ব্যর্থ হব জেনেও আমি তৈরি।'

মুখচোরা সুজন, সেও মুখর হলো। 'ব্যর্থতাই আমার শ্রেয়।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল অনুত্তম। 'হায়! আমি যে স্বাধীন নই। দেশ যতদিন না স্বাধীনতা পেয়েছে ততদিন আমার আর কোনো অন্বেষণ অঙ্গীকার করার স্বাধীনতা নেই।'

তার ব্যথায় ব্যথী হয়ে জীবনমোহন বললেন, 'বেচারা অনুত্তম!' তাঁর প্রতিধ্বনি করে তন্ময় কান্তি সুজন এরাও বলল, 'বেচারা অনুত্তম!'

ফেরবার সময় দেখা গেল মাটিতে পা পড়ে না তাদের চার জনের। অনুত্তমেরও? হাঁ, অনুত্তমেরও। থাক, আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙ্‌ব না, শুধু এইটুকু ফাঁস করলে চলবে যে অনুত্তমের নীল চশমা সূর্যের ভয়ে নয়, বালুর ভয়ে নয়, ধরা পড়ার ভয়ে। সুজনের কালো ছাতাও তাই।

তন্ময় সারা পথটা 'আহ্‌' 'ওহ্‌' করে কাটাল। যেন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কিন্তু যন্ত্রণায় নয়। আনন্দে।

কান্তি বলল, 'এতদিন পরে জীবনের একটা তাৎপর্য মিলল। জীবনটা একটা অন্বেষণ। হয়তো নিষ্ফল অন্বেষণ। তবু নিষ্ফলতাও শ্রেয়।'

'অবিকল আমার কথা।' বলল সুজন।

'আমারও।' তন্ময় সায় দিল।

অনুত্তম বলল, 'মাটি করেছে দেশটা পরাধীন হয়ে। নইলে আমিও—'

কান্তি বলল, 'দেশ স্বাধীন হোক পরাধীন হোক, এ অন্বেষণ স্বীকার করতে ও একে

জীবনের কাজ করতে প্রতি জেনারেশনে দু'চার জন লোক থাকবে। নয়তো অন্বেষকদের পরম্পরা লোপ পাবে। আমাদের জেনারেশনে আমরাই সে দু'চার জন লোক। আমি আর তন্ময় আর সুজন।'

অনুত্তম অনুযোগ করে বলল, 'কেন? আমি কী দোষ করেছি? যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না? যে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করে সে কি শাশ্বতী নারীর ধ্যান করতে পারে না?'

কান্তি খুশি হয়ে বলল, 'এই তো চাই। তোকে বাদ দিতে চায় কে?'

তন্ময় বলল 'কেউ না।'

সুজন বলল, 'তোকে নিয়ে আমরা চতুরঙ্গ।'

পরের দিন আবার জীবনমোহনের সঙ্গে ছাদের উপর বৈঠক। আবার সন্ধ্যার পরে। অনুত্তমকে তিনি প্রত্যাশা করেননি। বিস্মিত ও সস্মিত হলেন। বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলুম তোমরা হবে থ্রী মাস্কেটীয়ার্স।'

কান্তি বলল, 'না, সার, আমরা থ্রী মাস্কেটীয়ার্স হব না। হব রূপকথার রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র, কোটালপুত্র। তবে যার অন্বেষণে যাব সে হবে রাজকন্যা।'

'যার নয়, যাদের। সে নয়, তারা।' সংশোধন করল অনুত্তম।

'তাদের একজনের নাম হবে রূপমতী।' তন্ময় বলল উত্তেজনা ভরে।

'আর একজনের নাম কলাবতী।' সুজন বলল মুখ নিচু করে।

'আর একজনের নাম', অনুত্তম বলল, 'পদ্মাবতী। পদ্মিনী।'

'হায়!' কপট দুঃখ প্রকট করল কান্তি। 'সব কটি ভালো ভালো নাম তোরাই লুটে পুটে নিলি। আমার জন্যে বাকী রইল কী! কান্তিমতী!'

'বা!' জীবনমোহন তারিফ করে বললেন, 'তোমাদের চার বন্ধুর প্রত্যেকের পছন্দ খাসা। কিন্তু চার জনের কোন জন রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র কোন জন, সওদাগরপুত্রটি কে, কোটালপুত্র কোনটি?'

এর উত্তরে ওরা চার জনেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে অনুত্তম আমতা আমতা করে বলল, 'সার, আমরা ঠিক জানিনে।'

জীবনমোহন হেসে বললেন, 'উত্তর দেবার দায় পরীক্ষকের 'পর চাপালে! কিন্তু উত্তর তো এক রকম দেওয়াই আছে। কান্তি, তোমার পছন্দ রাজপুত্রের মতো। আর অনুত্তম, তোমার পছন্দ মন্ত্রীতনয়ের যোগ্য। আর সুজন, তোমার পছন্দ সওদাগরসুতের উপযুক্ত। আর তন্ময়, তোমার পছন্দ কোটালনন্দনের অনুরূপ। তা বলে তোমরা কেউ কারো চেয়ে খাটো নও। তোমাদের কন্যারাও সকলে সকলের সমতুল।'

তাঁর আশঙ্কা ছিল অনুত্তম সুজন তন্ময়—বিশেষ করে তন্ময়—হয়তো আঘাত পাবে।

কিন্তু তন্ময় হলো স্পর্টস্‌ম্যান। সে কান্তির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'অভিনন্দন! কিন্তু একালের রাজপুত্রদের দৌড় কতটুকু। কোটালনন্দনদেরই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।'

'আর মন্ত্রীতনয়দের হাতেই আসল ক্ষমতা।' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল অনুত্তম।

'আর সওদাগরসুতদের হাতেই পুতুলনাচের অদৃশ্য তার।' সুজন বলল হাত বাড়িয়ে দিয়ে।

কান্তি কপট দুঃখে বিগলিত হয়ে বলল, 'তাই তো, আমি তো খুব ঠকে গেছি।'

জীবনমোহন উপভোগ করছিলেন তাদের অভিনয়। বললেন, 'কেউ ঠকে যায়নি। কেউ ঠকে যাবে না। এটা এমন একটা অন্বেষণ যে অন্বিষ্ট যদি না-ও মেলে, যদি মেলে কিন্তু মিলে হারিয়ে যায়, যদি মেলে কিন্তু ভুল মেলে, তা হলেও পরিতাপের কিছু নেই। এটা এমন একটা দিল্লীকা লাড্‌ডু যা খেলেও কেউ পশ্‌তায় না, না খেলেও কেউ পশ্‌তায় না।'

'তার পরে,' তিনি আরো বললেন, 'ক্ষমতার ক্ষেত্র এ নয়। ক্ষমতার কথা অপ্রাসঙ্গিক। তোমার হাজার ক্ষমতা থাকলেও তাকে তুমি পাবে না, অনুত্তম। তাকে অধিকার করতে গেলেই তাকে হারাবে, তন্ময়। সুজন, ইটার্নাল ফেমিনিন যাকে বলেছি তার অন্য নাম ইটার্নাল বিউটি। কান্তি, তুমি চিরসৌন্দর্যের অভিসারে চলেছ।'

চিরসৌন্দর্যের অভিসার। কী গুরুভার তাদের 'পর ন্যস্ত! শাশ্বতী নারীর অন্বেষণ! কী ক্ষুরধার পন্থা! জীবনমোহন তাদের কাছে যে অসাধ্যসাধন আশা করছেন সে কি তাদের সাধ্য! কেন তবে তারা ক্ষমতার কথা মুখে আনে। না, ক্ষমতা তাদের নেই। উদ্দীপ্ত অথচ বিনম্র বোধ করছিল চার বন্ধু। নিয়তি তাদের চার জনকেই মনোনয়ন করেছে তাদের যুগে ও দেশে। কী বিস্ময়কর সৌভাগ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে কী দুশ্চর ব্রত।

যাত্রারম্ভ

তারা স্থির করেছিল বেরিয়ে পড়বে, কিন্তু কিসের অভিমুখে তা স্থির ছিল না। তাদের লক্ষ্য স্থির করে দিলেন জীবনমোহন। অতি দূর সে লক্ষ্য। কোনো দিন সেখানে পৌঁছনো যাবে কি না সন্দেহ। স্বয়ং জীবনমোহন কি পৌঁছেছেন!

সে কথা কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু তন্ময় তাঁকে আপন মনে গুন গুন করতে শুনেছে, 'হায় কন্যা শামারোখ!'

শোনা অবধি কী যে হয়েছে তন্ময়ের, থেকে থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে, আর বলে,

'হায় কন্যা রূপমতী।'

এ নিয়ে পরিহাস করে কান্তি। বুক চাপড়ে বলে, হায় কন্যা কান্তিমতী।'

অনুত্তম তা শুনে বলে, 'এ আবার কী নতুন খেলা শুরু হলো। আমাকেও হাহুতাশ করে বলতে হবে নাকি, হায় কন্যা পদ্মাবতী, হায় কন্যা পদ্মিনী।'

মুখচোরা সুজন মুখ ফুটে কিছু বলবে না। নইলে তাকেও বলতে শোনা যেত, 'হায় কন্যা কলাবতী।'

কান্তি গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, 'তন্ময়কে তা বলে প্রশ্রয় দিতে পারিনে। একদিন তার মোহভঙ্গ হবে। কষ্ট পাবে।'

'কেন বল দেখি?' তন্ময় প্রশ্ন করে।

'কেন? কান্তি বলে যায়, 'চিরন্তনীকে কেউ কোনো দিন রূপের আধারে পায়নি। তুই পাবি কী করে? সে তো রূপে নেই, আছে রূপের ইঙ্গিতে। কোনো মেয়ের চাউনিতে, কারো হাসিতে, কারো কেশপাশে, কারো কণ্ঠস্বরে। রূপের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে, আভাস দিয়ে যায়, কারো ক্ষণিক পরশ, কারো ক্বচিৎ সঙ্গ। তুই আশা করছিস একজন কেউ আছে যে তিলোত্তমার মতো সুন্দরী। একজন কেউ আছে যাকে ধরা যায়, ঘরে রাখা যায়, দিনের পর দিন সারা বছর জীবনভর।

নিশ্চয়।' তন্ময়ের বচনে অবিচলিত প্রত্যয়। 'কেন আশা করব না? কতটুকু দেখেছি এই পৃথিবীর। সেইজন্যেই তো আমি দেখতে বেরিয়েছি দেশ বিদেশ। দেখতে বেরিয়েছি তাকে যার নাম দিয়েছি রূপমতী। সে আছে। এবং আমি তাকে ধরবই, ঘরে রাখবই, ঘরে ভরবই। তবে হাঁ, দশ বিশ বছর সময় লাগতে পারে। খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে আয়ু ফুরিয়ে আসবে হয়তো। সেইজন্যেই তো বলছি, হায় কন্যা রূপমতী। একবার দয়া করে ঠিকানাটা তোমার জানাও।'

হাসির কথা। কিন্তু হাসতে গিয়ে হাসি পায় না একজনেরও। তন্ময়ের ব্যাকুলতা তাদের অভিভূত করেছিল।

সুজন বলে, 'সে আছে বৈকি। তবে তার রূপ তার দেহের নয়, তার আত্মার, তার অন্তরের। কাঁচের আড়ালে যেমন আলো থাকে, সে আলো কাঁচের নয়, সে আলো শিখার এও তেমনি। আমি যার ধ্যান করি সে শুকতারার মতো প্রভাময়ী, তার প্রভা কোনো অদৃশ্য আলোকবর্তিকার। কিন্তু তাকে আমি কোনো দিন পাব এ আশা আমার নেই। এ যেন তারকার জন্যে পতঙ্গের তৃষা।'

এবার অনুত্তমের পালা। 'আমার পদ্মাবতী,' বলে অনুত্তম, 'ভরা পদ্মার মতো রূপসী। রূপ তার দেহে নয়, আত্মায় নয়, শতধার ইঙ্গিতে নয়, রূপ তার গতিবেগে, রূপ তার ক্রিয়ায়। আমি যার ধ্যান করি সে সুন্দরী নয়, কিন্তু কাজ তার সুন্দর। দেশের

জন্তে মাথার চুল কেটে দিতে পারে কে? পদ্মাবতী। আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে কে? পদ্মিনী। তাকে কি পাওয়া যায় যে আমি পাব। তবে সে আছে নিশ্চয়।'

চার জনের লক্ষ্য এক, কিন্তু ধ্যানরূপ বা রূপধ্যান চতুর্বিধ। এটা আরো স্পষ্ট হয় যখন তন্ময় বলে, 'চিরন্তনী নারী বলতে বোঝায় আগে নারী তার পরে চিরন্তনী। যে নারীই নয় সে চিরন্তনী হবে কী করে। আমি যাকে চাই সে আমার সঙ্গিনী, আমার জায়া, আমার সন্তানের জননী। সে আমাকে আনন্দ দেবে, তাকে নিয়ে আমি সুখী হব। এই সব কারণে তাকে আমার পাওয়া দরকার। ধরে রাখা দরকার। আমি চাই সহজ স্বাভাবিক জীবন যাকে বলে গার্হস্থ্য আশ্রম। কিন্তু এই সব নয়। এর উপরে চাই রূপলাবণ্য, যার বিকাশ দেহবৃন্তে। অনুপম রূপলাবণ্য, অসাধারণ সৌন্দর্য। যা কোনো দিন শুকিয়ে যাবে না, আশী বছরেও তাজা থাকবে।'

'হ্যাঁ। বলিস্ কী রে।' কান্তি তামাশা করে। 'কেবল রূপ নয়, যৌবন। তা পাঁচ দশ বছর নয় আশী বছর। ষোড়শী কোনো দিন জরতী হবে না। এই মাটির শরীরে এও তুই আশা করিস্'

'তন্ময় কিনা তন্ময়।' টিপ্পনী কাটে অনুত্তম।

সুজন অন্যমনস্ক ভাবে বলে, 'না, না। চিরন্তনী নারী বলতে বোঝায় আগে চিরন্তনী, তার পরে নারী। আগে অন্তর, তার পরে বাহির আগে আত্মা, তার পরে দেহ। আমি যার ধ্যান করি সে যদি আমার সঙ্গিনী না হয় তা হলেই বা কী আসে যায়। সে যেখানেই থাকুক, যত দূরেই থাকুক, তার কিরণ এসে আমার গায়ে পড়ছে। পড়তে থাকবে। তাকে বিয়ে করতে পারলে ধন্য হতুম। কিন্তু তা কি সম্ভব। আর কাউকে বিয়ে করে তার ধ্যান করাও সম্ভব নয়। কাজেই আর কাউকে বিয়ে করাও অসম্ভব।'

কান্তি আবার বন্ধ করতে যায়, কিন্তু অনুত্তম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'আমার মনে হয় সুজন জোর দিতে চায় চিরসৌন্দর্যের উপরে, শাশ্বত সুষমার উপরে, যা মূর্ত হয়েছে নারীতে, নারীর নারীত্বে। আর তন্ময় জোর দিতে চায় নারীত্বের উপরে নারীর রূপযৌবনের উপরে, যা পার্থিব হয়েও চিরন্তন। আমি বলি, চিরন্তনী নারী হচ্ছে সেই নারী যে প্রাত্যহিক জীবনে নিতান্ত সাধারণ অথচ সঙ্কট মুহূর্তে একান্ত অসাধারণ। যার ঘোমটা খসে যায়, মুখ দেখতে পাওয়া যায় ঝড়ের রাতে বিজলীর ঝিলিকের মতো। সে আর কতটুকু সময়ের জন্যে। সেইটুকু সময় যদি দীর্ঘতর সময়ে পরিণত করার মন্ত্র জানা থাকত তা হলে ঐ মন্ত্র পড়ে আমি তাকে বিয়ে করতুম। তা কি আমি জানি যে বিয়ের স্বপ্ন দেখব।'

'বিয়ে। বিয়ে।' কান্তি এবার বিরক্তির স্বরে বলে, 'ছেলেভোলানো ছড়া থেকে

বুড়োভোলানো কবিতা পর্যন্ত সব জায়গায় দেখি বিয়ে। আচ্ছা বিয়ে পাগলা দেশ যা হোক। আমি কিন্তু বিয়ের মহিমা বুঝিনে। বিয়ে আমি করব না। আশী বছরের আয়েষাকেও না, আসমানের শুকতারাকেও না, অচপল চপলাকেও না। কোনো মেয়েকেই না। আমার চিরন্তনী নারী এক আধারে নেই, সকলের মধ্যে আছে। তিলোত্তমা নয়, তিলে তিলে ছড়ানো।'

তারপর নিজেই নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে। 'একজনকে বিয়ে করলে আর পনেরো হাজার ন'শো নিরানব্বুই জনের উপর অবিচার করা হয়। আমি তো দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ নই যে ষোলো হাজার জনের উপর সুবিচার করব। আমি বৃন্দাবনের কানু, সুবিচারের ভয়ে সবাইকে ছেড়ে যাই, এমন কি রাধাকেও।'

তন্ময় ব্রাহ্ম পরিবারে মানুষ হয়েছে। এসব কথা তার সংস্কারে বাধে। প্রাণে বাজে। সে কানে আঙুল দিয়ে বলে, 'আমার জীবনের সূত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

সুজন ব্রাহ্ম না হলেও ব্রাহ্ম সমাজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পড়াশুনা করেছে, খেলাধুলা করেছে। ওদের উৎসবে যোগ দিয়েছে, উপাসনায় চোখ বুজেছে। সেও আঘাত পেয়ে বলে, 'আমি নিরাকারবাদী।'

অনুত্তম গান্ধীশিষ্য। পিউরিটান। সেও মর্মাহত হয়। বলে, 'কান্তি, তুই নাচতে যাচ্ছিস, এই যথেষ্ট স্বৈরাচার। আর বেশি দূর যাস্‌নে। গেলে পতন অবধারিত।'

'তোরা বড় বেশি সিরিয়াস। লীলা কাকে বলে জানিস্ নে। ভয়ের দিকটাই দেখিস। কিন্তু যারা নাচতে জানে তারা সাপের মাথায় ভেকেরে নাচায়। আমি সর্পজিহ্বা।' এই বলে কান্তি যবনিকা টেনে দেয়।

জীবনমোহন তখনো ছিলেন পুরীতে। তাদের চার বন্ধুর বিতর্ক তাঁর কানে পৌঁছল। তিনি মিষ্টি হেসে বললেন, 'নুনের পুতুল যখন সমুদ্র অন্বেষণে যায় তখন কী হয়? কী বলেছেন রামকৃষ্ণদেব? তোমরাও যাচ্ছ সাগরের মতো আকাশের মতো চিরন্তনের সন্ধানে। যদি কোনো দিন তাকে দেখতে পাও যা দেখবে তা তোমাদের কল্পনার অতীত। ধ্যানের অতীত। তাকে নিজের প্রতিমার ছাঁচে ঢালাই করতে চেয়ো না। চাইলে দেখবে সে রূপমতী বা কলাবতী নয়, পদ্মাবতী বা কান্তিমতী নয়। সে কে বলব? সে তন্ময়িনী বা সুজনিকা, কান্তিরুচি বা অনুত্তমা।'

তার পর হাসি ছেড়ে বললেন, 'তাকে পাওয়া না পাওয়ার চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। আকাশকে কেউ কোনো দিন ধরতে পেরেছে? ঘরে ভরতে পেরেছে? অথচ ঘর জুড়ে রয়েছে আকাশ নয় তো আর কে? পাব, এ কথা জোর করে বলতে নেই। পাব না, একথাও মনে করতে নেই।'

ওরা তাঁকে ঘিরে বসে শুনতে লাগল। তিনি বলতে লাগলেন, 'অনুত্তম, কান্তি,

তন্ময়, সুজন। এ অন্বেষণ সুখের অন্বেষণ নয়। একে যেন সুখের অন্বেষণ করে না তোল। সুখ যে কোনো দিন আসবে না তা নয়। আপনা হতে আসবে, আপনা হতে যাবে। তার আসাযাওয়ার দ্বার খোলা রেখো। অনুত্তম, তোমাকে এসব না বললেও চলত। বরং এর বিপরীতটাই বলা উচিত তোমাকে। না, এটা দুঃখের অন্বেষণও নয়। আর সুজন, তোমাকেও বলার দরকার ছিল না। তুমিও তো সুখের চেয়ে দুঃখের প্রতি প্রবণ। আর কান্তি, তোমাকে যা বলেছি তাই যথেষ্ট। শুধু, তন্ময়, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা। মনে রেখো, সুখের অন্বেষণ তোমার জন্যে নয়। তোমার জন্যে রূপের অন্বেষণ। তুমি তার জন্যে।'

ওরা চার জনে নত হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেল। তিনি বললেন, 'থাক, থাক, হয়েছে, হয়েছে। আমি এর পক্ষপাতী নই।' তার পর ওদের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।'

যাত্রা? যাত্রার জন্যে ওরা ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু ওদের ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল যে কেউ কারো সহযাত্রী হবে না। সেইজন্যে যাত্রার দিন বিনা বাক্যে পেছিয়ে দিচ্ছিল। ওদিকে ওদের পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছল। কাজেই কালহরণের তেমন কোনো অজুহাত ছিল না। সুজন ও তন্ময় পাশ করেছে, অনুত্তম ও কান্তি করেনি। এই রকমই হবে ওরা জানত। কান্তি তো ইচ্ছা করেই শূন্য খাতা দাখিল করেছিল কয়েকটা পেপারে। পাশ করলে পাছে তার গুরুজন তাকে যেতে না দেন গন্ধর্ব-বিদ্যা শিখতে গন্ধর্ব হতে। আর অনুত্তম সময় পেলো কখন যে পরীক্ষার পড়া করবে।

যাত্রার প্রসঙ্গে পরিকল্পনার প্রশ্ন উঠল আবার। কান্তি বলল, 'আমাদের পরিকল্পনায় সেই যে ফাঁক ছিল সেটা কি তেমনি আছে না ভরেছে? কিসের যেন অভাব বোধ করছিল কেউ কেউ? এখনো কি করে?'

অনুত্তম তাকালো তন্ময়ের দিকে, তন্ময় সুজনের দিকে। সুজন বললে, 'না, আমার তো আর অভাববোধ নেই। পেলেই যে অন্তর ভরে তা নয়। না পেলেও ভরে যদি জ্ঞাননেত্র খুলে যায়। জীবনমোহন আমাদের নেত্র উন্মীলন করেছেন। তিনি আমাদের গুরু।'

'আমারও অভাববোধ নেই,' স্বীকার করল তন্ময়। 'পেতে চাই। পাইনি। তবু আমার অন্তর পূর্ণ। যার অন্বেষণে যাচ্ছি সেই জুড়ে আছে অন্তর। জুড়ে থাকবেও।'

'আমি যে কাকে চাই তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। হয়তো এ জীবনে কোনো দিন তার দেখা পাব না, তবু আমার অভাববোধ থাকবে না।' বলল অনুত্তম।

কান্তি বলল, 'অভাবের কথা আর যেই তুলুক আমি তুলিনি। অভাব বোধ করা আমার স্বভাব নয়। কেমন করে যে আমার সব অভাব মিটে যায় আমিই কি তা বুঝি!

জীবন দেবতা সদয় ।'

তারপর তাদের কথাবার্তা আর একটু অন্তরঙ্গ পর্যায়ে উঠল। তন্ময় বলল, 'আমার পরিকল্পনা মোটের উপর তেমনি আছে। বিলেত যাব, বিলেত থেকে ফিরে একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নেব। বিয়ে করব, ঘর সংসার পাতব। তবে কাকে বিয়ে করব এখন তা ঠিক হয়ে গেছে। রূপমতীকে।'

'এটা জীবনমোহনের ঘটকালিতে।' এই বলে কান্তি হেসে আকুল হলো।

'এখন কেবল একটা নিমন্ত্রণপত্র বাকী।' টিপ্‌পনী কাটল অনুত্তম।

'তোদের কেবল হাসি, কেবল ঠাট্টা!' তন্ময় কপট রোষ প্রকট করল।

'তার পর, সুজন, তুই চুপ করে রইলি যে! বোধ হয় ভাবছিস কাকে বিয়ে করা উচিত তা ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু তার বাপের মত নেই আর সে নিজে পর্দার আড়ালে।' কান্তি পরিহাস করল।

'না, পর্দার আড়ালে সে নয়। ছাতার আড়ালে সুজন।' রহস্য করল অনুত্তম।

'তা হলে,' তন্ময় ফুর্তি করে বলল, 'আমাকেও হাটে হাঁড়ি ভাঙ্‌তে হচ্ছে। এই নীল চশমাটি কিসের জন্যে? বেড়াল চোখ বুজে দুধ খায় আর ভাবে কেউ টের পাচ্ছে না।'

সুজন শেষে মুখ ফুটে বলল, 'না, আমার পরিকল্পনায় বিয়ের জন্যে স্থান সংরক্ষিত নেই। বিয়ে যদি হয়ে যায় তো হয়ে যাবে একটা আকস্মিক ঘটনার মতো। আমিও আশ্চর্য হব। তোরাও হবি। আকস্মিকের জন্যে তখন জায়গা ছেড়ে দিতে হবে।'

কান্তি রসিয়ে রসিয়ে বলল, 'তার মানে, ছাড়া, খাবি? না হাত ধোব কোথায়?'

অনুত্তম গম্ভীর ভাবে বলল, 'ছাঁদনাতলায়।'

হেসে উঠল চার জনেই। সুজন স্বয়ং।

এর পরে এলো অনুত্তমের পালা। তন্ময় বলল, 'অনুত্তম যাই বলুক না কেন আমি বিশ্বাস করব না যে ও চিরকাল দেশের কাজ নিয়ে থাকবে।'

'কে বলল চিরকাল দেশের কাজ নিয়ে থাকব?' অনুত্তম প্রতিবাদের সুরে বলল, 'দেশ যতদিন পরাধীন ততদিন দেশের কাজ আমার পরিকল্পনার প্রধান অংশ নেবে। তার পরে যেমন সর্বত্র হয়ে থাকে তেমনি এখানেও হবে। সৈনিক ফিরে যাবে নিজের কাজে। আমি কেন ধরে নেব যে দেশ চিরদিন পরাধীন থাকবে? স্বাধীন ভারত আমাদেরই হাত দিয়ে হবে।'

'তার পরে তুই কী করবি? ঘরসংসার? বিয়ে?' প্রশ্ন করল তন্ময়।

'করতেও পারি', উত্তর দেয় অনুত্তম। 'করতে আমার অনিচ্ছা নেই যদি ঝড়ের রাতের চলবিদ্যুৎকে বাতিদানের স্থিরবিদ্যুতে পরিণত করার কৌশল জানি। কিন্তু

বিদ্যুৎ যদি তার বিদ্যুৎপনা হারায় তা হলে তাকে নিয়ে আমি কী করব। বিয়ে যারা করে তারা বিদ্যুৎকে করে না, খদ্যোতকে করে। বিদ্যুৎ আপনি খদ্যোত হয়ে যায়। সেইজন্যে আমি ও কথা ভাবতে চাইনে, তন্ময়।'

এর পরে কান্তি। 'কান্তি তো বিয়ে করবে না বলে ঘোষণা করেছে। ওকে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া উচিত নয়।' তন্ময় বলল বিজ্ঞ সমাজপতির মতো।

'বটে।' কান্তি খোশ মেজাজে বলল, 'মেয়েরা তা হলে মিশবে কার সঙ্গে? বিয়ে তো মাত্র একজনের সঙ্গে হয়। সেই একজন ছাড়া আর কারো সঙ্গে মিশতে পারবে না?'

তন্ময় সহসা উত্তর খুঁজে পেলো না। সুজনের দিকে তাকালো। সুজন বলল, 'কান্তির পরিকল্পনায় বিয়ের জন্যে স্থান নেই; আকস্মিকের জন্যেও সে জায়গা রাখেনি। কিন্তু নারীর জন্যে আসন আছে। তন্ময়ের এটা ভালো লাগছে না। অনুত্তম তো একে স্বৈরাচার বলেছে। আমি নীতিনিপুণ নই, তবু আমারও কী জানি কেন কোথায় যেন বাধছে। কান্তি, আমি তোকে বিচার করতে চাইনে। কিন্তু কথাটা একটু ভেবে দেখিস্।'

কান্তি ভাবুকের মতো মুখ করে বলল, 'তোদের তিন জনেরই মনের কথা এই যে নারী তোদের জন্যে নীড় বাঁধে। যে পাখী আকাশের সে হয় নীড়ের। উড়ে যার সুখ সে উড়তে ভুলে যায়। নারীর নিজের মনের কথা কিন্তু তা নয়।'

অনুত্তম মস্করা করে বলল, 'শোনো, শোনো।'

তন্ময় বলল, 'আচ্ছা, শুনি।'

কান্তি বলল, 'আমাদের চারজনের পরিকল্পনায় সঙ্গতি থাকলে খুশি হতুম আমিই সব চেয়ে বেশি। কিন্তু তা হবার নয়। তবে আমাদের চারজনেরই জীবনের মূলসূত্র এক। কী বলিস্, সুজন?'

সুজন কান্তিকে দুঃখ দিতে চাইল না। বলতে পারত, স্বৈরাচার তো মূলসূত্র-বিরোধী। বলল, 'মোটামুটি এক।'

'তবে আর কী!' কান্তি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বিদায়ের দিন এই কথাটাই মনে থাকবে আমাদের যে আমরা সব রকমে স্বাধীন, তবু একসূত্রে গাঁথা। সেই অদৃশ্য সূত্রই আবার আমাদের টেনে নিয়ে আসবে যেমন করে টেনে আনে আকাশ থেকে ঘুড়িকে।'

'হ্যাঁ, আবার আমরা মিলব।' বলল অনুত্তম।

'মিলব এক দিন না একদিন। হয়তো দশ বছর পরে।' বলল সুজন।

'হয়তো কেন?' তন্ময় বলল তার স্বভাবসিদ্ধ ঐকান্তিকতার সঙ্গে। এখন থেকে একটা দিন ফেলা যাক। এটা ১৯২৪ সাল। ঠিক এক দশক পরে ১৯৩৪ সালে আমরা

যে যেখানে থাকি এইখানে এসে মিলিত হব। এই সাগরতীরে। এই আষাঢ় পূর্ণিমায়।'

'সে কি সম্ভব?' অনুত্তম আপত্তি জানালো। 'যদি জেলে থাকি সে সময়?'

'তার আগেই' সুজন বলল প্রত্যয়ভরে, 'দেশ স্বাধীন হয়ে থাকবে।'

'বলা যায় না। যে শক্তির সঙ্গে আমাদের বিরোধ তার হাতে কেবল অস্ত্রবল আছে তা নয়, তার পাতে বিস্তর রুটির টুকরো মাছের কাঁটা। গোটাকয়েক ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিলে আমাদেরই মধ্যে কামড়া-কামড়ি বেধে যাবে। অনায়াসে আরো দশ বিশ বছর।'

'বেচারা অনুত্তম।' কান্তি দরদের সঙ্গে বলল, 'তোর জন্যে সত্যি খুব দুঃখ হয়। কেন যে তুই নামতে গেলি পাপচক্রে।'

'তা হলে এখন থেকে দিনক্ষণ স্থির করে ফল নেই,' তন্ময় বলল নিরাশার সুরে। তবে চেষ্টা করতে হবে দশ বছর পরে মিলতে। কেমন, রাজী?'

'রাজী।' বলল অনুত্তম, সুজন, কান্তি।

'তবে', কান্তি একটুকু জুড়ে দিল, 'তন্ময়ের তন্ময়িনী আর সুজনের সুজনিকা এঁদের আজ্ঞা'র উপর নির্ভর করছে আমাদের 'আস্থা'। কী বলিস্, অনুত্তম?'

'তুইও যেমন। ভেবেছিস এ জন্মে ওদের বৌ জুটবে?' অনুত্তম বলল সংশয়ের সুরে। 'জীবনমোহন যা ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন তার জের চলবে জীবনভোর। আমার আশঙ্কা হয় এ অন্বেষণ ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে আরো কঠিন, আরো সময়সাপেক্ষ।'

বেচারা তন্ময়। সে কী যেন বলতে চেয়েছিল, বলতে পারল না। গলায় পাথর চাপা।

তখন সুজন বলল,

'মরব না কেউ তন্ময়িনী সুজনিকার শোকে।
রূপমতী কলাবতী আছেন মর্ত্যলোকে।'

তা শুনে সকলে হেসে উঠল। এবার তন্ময় তার বাক্‌শক্তি ফিরে পেলো। বলল, এখন থেকে যে যার নিজের ইষ্টদেবীর ধ্যান করবে। কার কপালে কী আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। পুরুষস্য ভাগ্যম্। কে জানে হয়তো আমার রূপমতী পৃথিবীর ওপিঠে আছে। ওপিঠে গেলেই দেখতে পাব।'

'ওপারেতে সব সুখ।' অনুত্তম ব্যঙ্গ করল।

'থাক, থাক। ও প্রসঙ্গ আর নয়।' কান্তি ওদের থামিয়ে দিল। 'এখন থেকে আমরা স্বতন্ত্র। সত্যি কেউ কি জোর করে বলতে পারে কার বরাতে কী জুটবে—পূর্তা কি শূন্যতা কি মামুলি এক উকীল-দুহিতা, সঙ্গে বারো হাজার টাকা পণযৌতুক।'

আর এক দফা হাসির ঢেউ উঠল। 'তোর ভ্যালিউয়েশন বড় কম হয়েছে। তন্ময়

কখনো ব্যারিস্টারের নিচে নামবে না, যদি নামে তবে বত্রিশের কমে নয়। মানে বত্রিশ হাজারের।' বলল অনুত্তম।

'অনুত্তম', তন্ময় হাসতে হাসতে বলল, 'তুই তোর নিজের চরকায় তেল দে। ঐ চরকার দৌলতে যদি স্বরাজ হয় তা হলে স্বরাজের দৌলতে তোরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। বিনা পণে বিয়ে করবি সে আমি লিখে দিতে পারি। কিন্তু শ্বশুর নির্বাচনে কৃতিত্বের পরিচয় দিবি। কোনো এক সর্বত্যাগী দলপতি যার দুয়ারে বাঁধা হাতী।'

'এখন থেকে আমরা স্বতন্ত্র।' কান্তির এই উক্তির পুনরুক্তি করল সুজন। 'কাজেই ও প্রসঙ্গ থাক। তা ছাড়া জীবনমোহনের কাছে আমরা যে অঙ্গীকার করেছি তার সঙ্গে ও প্রসঙ্গ মানায় না। লক্ষ্য আমাদের উচ্চ। আমাদের উঠতে হবে সেই উচ্চতায়। আমি তো দেখছি আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যে দুঃখ আছে। এসব হালকা কথার দ্বারা কি দুঃখকে উড়িয়ে দেওয়া যায়! তার চেয়ে বল, আমরা দুঃখের জন্যে প্রস্তুত, কিন্তু আমরা রাজপুত্র। রাজকন্যা ভিন্ন আর কাউকে বিয়ে করব না, করতে পারিনে। তার অন্বেষণেই আমাদের যাত্রা। আর কারো অন্বেষণে নয়।'

তন্ময়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কোনো মতে বলল, 'সুজন, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোকে আমি মিস্ করব।'

'হে সুজন, শ্রীকান্তির লহ নমস্কার। আমাদের বাণীমূর্তি তুমি।' কান্তি তাকে হাত তুলে নমস্কার করল।

আর অনুত্তম? সে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'জীতা রহো।'

অবশেষে সেই রাতটি এলো যার পরের দিন তাদের যাত্রা। চার কুমার চারদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। কেউ কারো দিকে ফিরে তাকাবে না। পিছনে পড়ে থাকবে এই বৃক্ষ—এই পুরীর সিন্ধুতীর।

বার বার চোখে জল এসে পড়ে, গলা ভারী হয়ে যায়, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ওঠে। একজন আরেক জনের হাত চেপে ধরে, ছেড়ে দেয় না। উদাস কণ্ঠে বলে, 'আবার কবে আমাদের দেখা হবে? কবে? কোন অবস্থায়?'

'মনে রাখিস্। ভুলে যাস্নে।' তন্ময় বলল কান্তিকে। 'তোর যা ভোলা মন।'

'চিঠি লিখিস্, যেখানেই থাকিস্।' অনুত্তম বলল তন্ময়কে। 'তোর যা কুঁড়ে হাত।'

'লেখাটেখা কাগজে ছাপা হলে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিস্।' কান্তি বলল সুজনকে। 'তোর যা লাজুক স্বভাব।'

'এবার তো গান্ধী ফিরেছেন। গ্রামে গিয়ে কাজ করতে বলবেন। কলকাতায় এলে খবর দিস্।' সুজন বলল অনুত্তমকে। 'তোর যা অফুরান ব্যস্ততা।'

চার জনে চার জনকে কথা দিল, 'নিশ্চয়। নিশ্চয়। সে আর বলতে!'

কিন্তু কথা দিলে কী হবে! প্রত্যেকেই মনে মনে বুঝল যে কথা দেওয়া সহজ, কথা রাখা কঠিন। তারা যে ঘাটের নৌকা। ঘাট ছেড়ে ভাসতে শুরু করলে কে যে কোথায় ভেসে যাবে নিজেই জানে না। যোগাযোগ রাখবে কী! তবু বলতে হয়, 'নিশ্চয়। নিশ্চয়।'

পরিকল্পনাও কি ঠিক থাকবে? মূলসূত্র। তার কি কোন এদিক ওদিক হবে না? হরি! হরি! মানুষ করবে জীবনের উপর খোদকারী! তবু ওরা পরস্পরকে আশ্বাস দিল যে ওদের এত কালের জল্পনা কল্পনা আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হবে না। এত পরিশ্রম করে যে ভিত গড়া হয়েছে তার গাঁথুনি পাকা।

'কে কী পাবে না পাবে, করবে না করবে, হবে না হবে, কেউ জোর করে বলতে পারে না। কিন্তু আমরা বোধ হয় গর্ব করে বলতে পারি যে আমাদের জীবনের বনেদ কাঁচা নয়। কী বলিস্ রে, সুজন?'

'যা বলেছিস, অনুত্তম।'

'কান্তির কী মনে হয়?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তন্ময়?'

'আমিও সেই কথা বলি।'

চার জনে চার জনের হাতে রাখী বাঁধে। যদিও রাখীপূর্ণিমার দেরি আছে।

তার পরে উঠল যে কথা তাদের সকলের মন জুড়ে রয়েছে, অথচ একান্ত নিভৃতে। রাজকন্যার কথা।

'অতীত ব্যর্থ হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যৎ ব্যর্থ হবে,' বলল সুজন, 'যদি রাজকন্যার অন্বেষণ ছেড়ে অন্যের অন্বেষণ ধরি।'

'যেমন অন্নের অন্বেষণ।' কান্তি ইঙ্গিত করল।

'কিংবা ক্ষমতার।' তন্ময় মন্তব্য করল।

'কিংবা সুখের।' অনুত্তম সতর্ক করে দিল।

কথা যখন নিবে আসছে কথার সলতে উস্‌কে দেয় সুজন। 'যাকে আমরা খুঁজতে যাচ্ছি সে হয়তো হাতের কাছে। হয়তো পৃথিবীর ওপিঠে। আমি তাকে হাতের কাছেই খুঁজব। তন্ময় খুঁজবে দেশ-দেশান্তরে।'

'আর আমি খুঁজব', কান্তি বলে, 'রামধনুর রঙে। সব ক'টা রঙ এক ঠাঁই থাকে না। সব ঠাঁই মিলে এক ঠাঁই।'

'আর আমি খুঁজব সঙ্কটের সংঘাতের মধ্যে। দৈনন্দিনের মধ্যে নয়।' অনুত্তম বিপ্লবের আভাস দেয়।

আবার সুজন অগ্রণী হয়। 'লক্ষ্যের 'পর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। যেমন ছিল অর্জুনের দৃষ্টি। দ্রোণ যখন পরীক্ষা করলেন যুধিষ্ঠির বললেন, পাখী দেখছি। অর্জুন বললেন, পাখীর চোখ দেখছি। পাখী দেখতে পাচ্ছিনে। তেমনি আমরাও অনেক কিছু দেখতে পাব না। অনেক কিছু দেখলে আসল লক্ষ্যটাই ধোঁয়া হয়ে যাবে।'

'সেইটেই হলো ভয়ের কথা।' তন্ময় বলে কান্তির দিকে ফিরে।

'সত্যি তাই।' কান্তি কবুল করে।

'আমার সে ভয় নেই। কেননা আমি যে পরিস্থিতিতে তাকে দেখতে পাব সে পরিস্থিতির জন্যে দেশকে তৈরি করছি।' ইতি অনুত্তম।

রাত অনেক হয়েছিল। সমস্ত রাত জাগলেও কথা কি ফুরোয়? তন্ময় থাকে হোটেলে। তাকে গা তুলতে হলো। অগত্যা আর তিনজনকেও। এই তাদের শেষ রাত্রি, অনির্দিষ্ট কালের জন্যে। বিজয়ার দিন যেমন করে তেমনি কোলাকুলি করে তারা বিদায় নিল ও দিল।

'আবার দেখা হবে।' সকলের মুখে এক কথা। 'যেন সঙ্গে দেখি রূপমতী কলাবতী পদ্মাবতী কান্তিমতীকে।'

চারজনে চারখানা রুমাল ভাসিয়ে দিল সমুদ্রের জলে। 'এই বরুণ নিশান।' তার পরে চার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল

কলাবতীর অন্বেষণ

বন্ধুরা চলে গেল যে যার রাজকন্যার অন্বেষণে। কেউ দক্ষিণ ভারত, কেউ সাবরমতী, কেউ বিলেত। সুজন ফিরে গেল কলকাতা। তার রাজকন্যার অন্বেষণে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হতে হবে না। ট্যামার লেনের মাইল খানেক উত্তরে তার রাজকন্যার মায়াপুরী। মানে ছোট একখানা চাঁপা রঙের বাড়ী।

চাঁপা রঙের বাড়ীতে থাকে বকুল নামে মেয়ে। বেথুন কলেজে পড়ে। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় ব্রহ্মসঙ্গীত গায়। সুজনের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে আলাপ। সুজনকে ডাকে সুজনদা। সুজিদা। সুজি। সয়দা। ছোটবোনের মতো।

বকুল কিন্তু জানে না যে সুজন তাকে পূজা করে। বকুল জানে না, তন্ময় জানে না, অনুত্তম কান্তি এরাও জানে না। জানে কেবল পূজারী নিজে। জানলে কী হবে, তার নিজের মন নিজের কাছেও স্বচ্ছ নয়। কেমন স্বপ্নের মতো মনে হয় বকুলের সঙ্গ, বকুলের

কথা, বকুলের গান। সে কি কাছে না দূরে? যোজন যোজন দূরে। মাটিতে না আকাশে? সাঁঝের আকাশে। সে কি মানুষ না তারা? সন্ধ্যাতারা।

সুজন তার মনের কথা মনে চেপে রাখে। মুখ ফুটে জানায় না। কিন্তু চোখেরও তো ভাষা আছে। পড়তে জানলে চাউনি থেকেও বোঝা যায়। বকুল কি বোঝে না? কী জানি! হয়তো বোঝে, কিন্তু ভাবে না, ভাবতে চায় না। সে তার নিজের জগতে বাস করে। তার নিজের ভাবলোকে। সেখানে আছে গান আর গুঞ্জরণ আর স্বর-সাধনা। আছে বই পড়া আর পরীক্ষা পাশ করা। আছে সামাজিকতা আর পারিবারিক কর্তব্য।

আর পূজা কি তাকে ওই একজন করে!

সুজন জানে ওর আশা নেই। সেইজন্যে আরো জোরে রাশ টানে। চিত্তবৃত্তিকে অসম্ভবের অভিমুখে ছুটতে দেয় না। সে পূজা করেই ক্ষান্ত। প্রেম তার কাছে নিষিদ্ধ রাজ্য। ভালোবাসতে তার সাহস হয় না। দেবীকে ভালোবাসবার স্পর্ধা কোন পূজারীর আছে! সুজন একটু দূরে দূরেই থাকে। রবিবারে রবিবারে ব্রাহ্মসমাজে যায়। কোনো বার বকুলের নজরে পড়ে, কোনোবার পড়ে না। কিন্তু মাঘোৎসবে মিলেমিশে মন্দির সাজায়। সেই ছেলেবেলার মতো। তখন তো সুজনও গান করত।

পুরীতে চার বন্ধুর মিলিত হবার আগে এই ছিল সুজনের অন্তরের অবস্থা।

তার পর বন্ধুদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ফলে স্থির হয়ে গেল জীবনভোর সে এক-জনের অন্বেষণ করবে। তার নাম কলাবতী। জীবনে আর কারো অন্বেষণ নয়। কলাবতী কে? বকুল। বকুলের মধ্যেই কলাবতী আছে। খুঁজতে হবে সেই কলাবতীকে। সুজনের অন্বেষণ দেশ থেকে দেশান্তরে নয়। প্রতিমা থেকে প্রতিমার অভ্যন্তরে। পূজারী হবে ধ্যানী। হবে সাধক। দেবী হবে শাশ্বতী নারী। চিরসৌন্দর্যের প্রতীক।

পুরী থেকে যে ফিরে এলো সে আরেক সুজন। বাইরে থেকে বোঝা যায় না তফাৎ। বড় জোর এইটুকু বোঝা যায় যে তার ছাতাখানা হারিয়ে গেছে। এখন তাকে ছাতা মাথায় পথ চলতে দেখা যায় না। আগে তো ছাতা মাথায় ছবিও তোলাত। সারা কলেজে সে ছিল একচ্ছত্র। সে সব দিন গেছে। তন্ময়ও নেই, কান্তিও নেই, অনুপমও নেই। সুজন এখন একা। নতুন কোনো বন্ধুও জুটছে না তার। অবশ্য আলাপীর লেখাজোখা নেই।

মাঝে মাঝে জীবনমোহনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। মুখ ফুটে বলতে পারে না কী ভাবছে, কী অনুভব করছে। বলতে হয় না। তিনি বুঝতে পারেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পান। উৎসাহ দেন।

'তুমি যাকে খুঁজছ', জীবনমোহন বলেন, 'সে তোমার হাতের কাছে। কেন তুমি তীর্থ

করতে যাবে, কেন যাবে হিমালয়ে ! তোমার বন্ধুরা গেছে, যাক। তাদের জন্যে ভেবো না। তাদের তুলনায় নিজেকে ভাগ্যহীন মনে কোরো না। কার্তিক তো ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এলো। এসে দেখল গণেশ তার আগে পৌঁছে গেছে। অথচ গণেশকে কোথাও যেতে হয়নি। কেবল মা'র চার দিকে একবার পাক দিয়ে আসতে হয়েছে।'

সুজন বল পায়। মনে মনে জপ করে, এই মানুষেই আছে সেই মানুষ। এই নারীতেই আছে সেই নারী। তার সন্ধান জানতে হবে।

সন্ধানের জন্যে সে রাজ্যের বই পড়ল। দেশী বিদেশী কোনো সাহিত্য বাদ গেল না। শুধু সাহিত্য নয়, দর্শন। শুধু দর্শন নয়, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সেকালের ও একালের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। তার পর রাজ্যের ছবি দেখল। মূর্তি দেখল। স্টুডিওতে স্টুডিওতে ঘুরল। অবনী ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়ের ওখানে হানা দিল। তার পর গান বাজনার আসরে ও জলসায়, ইউরোপীয় সঙ্গীতের রিসাইটাল-এ হাজির হলো। রাজ্যের গ্রামো-ফোন রেকর্ড কিনে শেষ কপর্দকটি খরচ করল।

আর বকুল ? বকুল জানত না যে সুজন তার জন্যে দুশ্চর তপস্যা করছে। সে তপস্যা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসনে বসে নয়, চোখ কান প্রাণ মন খোলা রেখে যোগা-যোগ স্থাপন করে। বকুলের সঙ্গে দেখাশোনা সাত দিন অন্তর হতো, যেমন হচ্ছিল। কিন্তু উপাসনার পর আলাপ বড একটা হতো না। দু'জনেই অন্যমনস্ক।

দু'জনেই ? হাঁ। ওদিকে বকুলেরও অন্য ভাবনা ছিল। বি. এ. পাশ করার পর তার আর পড়াশুনায় আগ্রহ ছিল না। সে চায় সঙ্গীত নিয়ে থাকতে। কিন্তু তার গুরু-জনের সায় নেই। তাকে হয় মাস্টারি করতে হবে, নয় বিয়ে করতে হবে। দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে সময় লাগে। সে সময় নিচ্ছিল। তার হাতে সময় ছিল। তার সময়ের সুযোগ নিচ্ছিল সুজনের সমবয়সী উদ্যোগী যুবকরা। কেউ সন্ধ্যাবেলা গিয়ে গান শুনতে বসত। কেউ দুপুরবেলা গিয়ে স্বরলিপি লিখে দিত। সুজন এদের এড়িয়ে একা বকুলের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কি দেখা পেতো ? দু' একবার চেষ্টা করে দেখেছে, এদের দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছে। বাক্যবাণেও। নির্দোষ পরিহাসকেও সে ব্যক্তিগত আক্রমণ মনে করে সঙ্কুচিত হতো।

সুজন একদিন শুনতে চেয়েছিল অতুলপ্রসাদের 'আ মরি বাংলা ভাষা।' বকুল মুখ খোলবার আগেই একজন শুরু করে দিল, 'মোদের খোরাক মোদের পুঁজি আ মরি ময়দা সুজি।' বেচারা সুজন তা শুনে অপমানে রাঙা হয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

সুজন যদি একটু কম লাজুক হতো, যদি একখানা চিঠি লিখে একটুখানি আভাস দিত তা হলে কী হতো বলা যায় না। কিন্তু বকুলের জীবনের সন্ধিক্ষণে সুজনের এই আত্মগোপন দু'জনের একজনেরও পক্ষে কল্যাণকর হলো না। বকুল শেষপর্যন্ত বিয়ের

দিকেই খুঁকল। তবে এখন নয়, এখন বাগ্‌দান। ছেলেটি বিলেত যাচ্ছিল, বকুলের আঙুলে আংটি পরিয়ে দিয়ে গেল। একদিন সুজনের চোখে পড়ল সে আংটি। বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে এলো, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুজন সেখান থেকে সরে গেল।

কিন্তু তার তপস্যায় ছেদ পড়ল না। বিয়ে? বিয়ে এমন কী বাধা যে তার দরুন অন্বেষণ ব্যর্থ হবে? বিয়ের পরেও বকুল বকুলই থাকবে, কলাবতী কলাবতীই থাকবে। বিয়ে না করলেও যা বিয়ে করলেও তাই। সুজন গভীর আঘাত পেলো, কিন্তু আঘাতকে উপেক্ষা করল। মনে মনে জপ করল, 'আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।'

বাগ্‌দানের পর বকুল চলে গেল শান্তিনিকেতন। সেখানে সঙ্গীতচর্চা করতে। এটা তার ভাবী পরিণেতার ইচ্ছায়। সুজনের সঙ্গে দেখা হলো না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল। তবু সুজনের তপস্যায় ছেদ পড়ল না। অদর্শন? অদর্শন এমন কী বাধা যে তার জন্যে অন্বেষণ বন্ধ হবে? দৃষ্টির অন্তরালেই বকুল বকুলই থাকবে, কলাবতী কলাবতীই থাকবে। সুজন কি দিনের বেলা সন্ধ্যাতারা দেখতে পায়? তা বলে কি সন্ধ্যাতারা সন্ধ্যাতারা নয়? সুজন গভীর আঘাত পেলো, কিন্তু কাতর হলো না। মনে মনে জপ করল, 'এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায় সেই কথা বলিয়ো।'

পূজার বন্ধে বকুল বাড়ী এলো। ব্রাহ্মসমাজেও তাকে আবার দেখা গেল। সুজন তাকে দেখে স্বর্গ হাতে পেলো। চোখের দেখাও যে মস্ত বড় পাওয়া। এ কি উড়িয়ে দেওয়া যায়। কলাবতী কি কেবল ধ্যানগোচর? চক্ষুগোচর নয়? দেবতা কি কেবল নিরাকার? সাকার নন? আত্মপরীক্ষা করে সুজন হৃদয়ঙ্গম করল যে নিরাকার উপাসনার মতো সাকার উপাসনাও চাই। নইলে এত লোক দর্শন করতে যেত না।

বকুল আবার অদর্শন হলো। এমনি চলতে থাকল কয়েক বছর। এম. এ. পাশ করে সুজন হলো একখানা বিখ্যাত মাসিকপত্রের সহকারী সম্পাদক। তার তপস্যা তাতে আরো জোর পেলো। এত দিন যাকে পড়তে পড়তে দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে খুঁজছিল এখন থেকে তাঁকে খুঁজতে লাগল লিখতে লিখতে। ঠিক যে এখন থেকে তা নয়। আগেও তো সে লিখত। তবু এখন থেকেই। কেননা এই পরিমাণ দায়িত্ব নিয়ে লেখেনি এর আগে।

বকুল কেমন করে টের পেলো তার জন্যে একজন সাধনা করছে। বোধ হয় দেবতারা যেমন করে টের পান যে মর্ত্যে তাঁদের ভক্তরা তাঁদের এক মনে ডাকছে। এক দিন খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। বকুলের দিদি পারুল ডেকে পাঠালেন সুজনকে। পারুলদির ওখানে সে বকুলকে দেখবে আশা করেনি। গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেল। পারুলদি কখন এক সময় উঠে গেলেন তাদের দু'জনকে একা রেখে। বেশ কিছুক্ষণ একা ছিল তারা।

এই সুযোগই তো এক দিন অভীষ্ট ছিল সুজনের। অবশেষে জুটল। কিন্তু জুটল যদি, মুখ ফুটল না। বোবার মতো, বোকার মতো বসে রইল সুজন। একটি বার বলতে পারল না, 'ভালোবাসি।' সুধাতে পারল না, 'তুমি আমার হবে?' বকুল যেন নিঃশ্বাস রোধ করে মিনিট গুনছিল, সেকেণ্ড গুনছিল। আজ তার জীবনের একটা দিন। বাগ্‌দান ভঙ্গ করা অন্যায়। কিন্তু বকুলকে যারা চেনে যারা জানে তারা তাকে ক্ষমা না করে পারত না। এমন কি স্বয়ং মোহিত ক্ষমা করত তাকে। বকুল এমন মেয়ে যে তার উপর রাগ করে থাকা যায় না।

সুন্দরী? হাঁ, সুন্দরী বটে। কিন্তু রূপ তার দেহের নয় ততটা, অন্তরের যতটা। মুখে চোখে আলো ঝলমল করছে। সে আলো কোন অদৃশ্য উৎস থেকে আসছে কত লক্ষ কোটি যোজন দূর থেকে। মাঝে মাঝে তার উপর ছায়া পড়ছে। সামাজিকতার ছায়া। তখন মনে হচ্ছে এই বকুল কি সেই বকুল! ছায়া সরে যাচ্ছে। গান আসছে তার কণ্ঠে। তখন মনে হচ্ছে, এই তো আমাদের চির দিনের বকুল। এই অচেনাকে চেনার শিকলে কে বাঁধবে! বকুল, তুমি স্বর্গের দ্যুতি! তুমি দিব্য।

সুজন তাকে বিনা বাক্যে বন্দনা করল। কিন্তু কোনো মতেই বলতে পারল না যে সে যেন সুজনের হয়। অন্যের বাগ্‌দত্তা না হলে কথা ছিল। কিন্তু আজ বাদে কাল যার বিয়ে সে কি বর পরিবর্তন করতে রাজী হবে! তা ছাড়া আছেই বা কী সুজনের! অবস্থা ভালো নয়। হবেও না কোনো দিন। সে সাহিত্য সৃষ্টি করেই জীবন কাটিয়ে দেবে শত অভাবের মধ্যে। বিয়ে তার জন্যে নয়। তাকে বিয়ে করা মানে দারিদ্র্যকে বিয়ে করা। বকুলের কেন তাতে রুচি হবে। বকুল, তোমাকে যেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই। এর বেশি আশা করিনে। করতে নেই।

ওরা দু'জনে এত কাছাকাছি বসেছিল যে একজনের নিঃশ্বাস পড়লে আরেকজন শুনতে পায়। নিঃশ্বাস পড়ছিল অনেকক্ষণ বিরতির পর। সে বিরতি উৎকণ্ঠায় ভরা। আগে কথা বলার পালা সুজনের, কিন্তু সুজন যখন কিছুতেই মুখ খুলবে না তখন বকুলকেই অগ্রণী হতে হবে।

'তার পর, সুজিদা,' বকুল বলল সকৌতুকে, 'তুমি নাকি কার জন্যে তপস্যা করছ।'

'কে, আমি?' সুজন বলল চমকে উঠে। 'তপস্যা করছি! কই, না!'

'হাঁ, সেই রকমই তো মালুম হচ্ছে।' হেসে বলল বকুল, 'কিন্তু কোন দেবতার জন্যে? কোথায় তিনি থাকেন? স্বর্গে না মর্ত্যে? মর্ত্যেই যদি থাকেন তবে তো এক-খানা চিঠিপত্তর দিতে পারতে। বিল্বপত্তর, তুলসীপত্তর দিয়ে কী হবে?'

সুজন এর উত্তরে কী বলবে ভেবে পেলো না। বকুলের সঙ্গে তার যা সুবাদ তাতে একখানা কেন দশখানা চিঠি দেওয়া চলে। কিন্তু কী লিখবে চিঠিতে? লিখতে হাত

কাঁপে। অথচ এই সুজনেরই লেখায় মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা পূর্ণ।

'দিয়ো। বুঝলে ?' বকুল একটু পরে বলল।

এই ঘটনার কয়েক মাস বাদে আর একটা ঘটনা ঘটে। তবে সেটা খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়। বকুলের বিয়ে। মোহিত বিলেত থেকে ফিরে কলম্বোতে চাকরি পেয়ে কলকাতা এসে বকুলকে বিয়ে করে। কন্যাযাত্রীদের দলে সুজনকে দেখা যায়। তার বুক ফেটে যাচ্ছিল, ঠিকই। যদিও মুখ দেখে বোঝবার জো ছিল না।

এমন একজনও বন্ধু ছিল না যে তার মনের ভিতরটা দেখতে পায় বা যাকে সে তার মনের মণিকোঠার দ্বার খুলে দেখাতে পারে। কান্না ঠেলে উঠছে বুক থেকে চোখে, তবু তার চোখের কোণে জল নেই। আর পাঁচ জনের মতো সেও সুখী যে বকুলের বেশ ভালো বিয়ে হয়েছে। বকুল সুখী হবেই। না হয়ে পারে না। সুজনের সঙ্গে বিয়ে হলে কি পাঁচ জনে সুখী হতো? বরং এই ভেবে অসুখী হতো যে মেয়েটা কী ভুলই না করেছে।

বকুলের মা বাবা ভাই বোন সকলেই সুখী। কেবল পাকলদির ব্যবহার একটু কেমনতরো। শান্ত শিষ্ট সরল মানুষটি কেমন যেন থ' হয়ে গেছেন। বোধ হয় ভাবছেন এটা কি ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে বকুলের ? সে কি সত্যি পারবে সারা জীবন মোহিতের ঘর করতে ? মোহিতের ছেলেমেয়ের মা হতে ? পারবে না কেন ? তবে খুশি হয়ে না দায়ে পড়ে ? পাকলদি বার বার সুজনের দিকে তাকান আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

আর বকুল ? সে চিরদিন যেমন আজও তেমনি সপ্রতিভ। এটা যে একটা বিশেষ দিন, যাকে বলে জীবনে একটা দিন, এর জন্যে সে বিশেষ সুখী বা বিশেষ অসুখী বলে মনে হয় না। তার ভাবখানা যেন—বিয়ে হচ্ছে নাকি ? আচ্ছা, হোক।

সে যেন সাক্ষী। নিষ্ক্রিয় সাক্ষী।

বকুলবা কলম্বো চলে যাবার পর সুজনের জীবনযাত্রায় তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না। কলাবতীর অন্বেষণ সমানে চলল। কলাবিদ্যায় বিদ্বান হয়ে উঠল সুজন। তার রচনায় মাধুর্য এলো, এলো প্রসাদগুণ, এলো ফোটা ফুলের সুষমা। আর অতি সূক্ষ্ম সুগন্ধ। পালিয়ে যাওয়া, মিলিয়ে যাওয়া, অ-ধরাছোঁয়া সুগন্ধ। যারা পড়ে তারা হাতড়ে বেড়ায়, হাতে পায় না। বার বার পড়ে। মুগ্ধ হয়। চিঠি লিখে সুজনকে জানায় ধন্যতা।

চিঠি লেখে মেয়েরাও। সমবয়সী, অসমবয়সী, বিবাহিতা, অবিবাহিতা, দূরস্থিতা, অদূরস্থিতা। কেউ কেউ দেখা করতে চায়। দেখা করেও। অটোগ্রাফের ছলে। তর্ক-বিতর্কের ছলে। সুজন উত্তর দেয় বৈকি। উত্তর দেয় দু'চার কথায়। কিন্তু হৃদয় ভেঙে দেখায় না। দেখাতে পারেও না।

বকুলকে, কলাবতীকে কেউ আচ্ছন্ন করবে না। সন্ধ্যাতারা ঢাকা পড়বে না কোনো

নীলনয়নার কালো কেশপাশে। শাশ্বত সৌন্দর্য হতে ভ্রষ্ট হবে না ভ্রমর। বিয়ে করবে না সুজন। আজীবন? হাঁ, যত দূর দৃষ্টি যায়, আজীবন।

জীবন এমন কিছু দীর্ঘ নয়। তার মা বেঁচেছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। সেও হয়তো তেমনি বছর পঁয়ত্রিশ বাঁচবে। তার বাবা জীবিত। মেদিনীপুরে কাজ করেন। সামনেই তাঁর অবসরগ্রহণ। কলকাতার বাসায় সুজন থাকে ছোট ভাইবোনদের নিয়ে। তারা পড়াশুনা করে। অভাবের সংসার। বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছে না কেউ।

কলম্বোতে বকুল কেমন আছে কে জানে। খবর নেয়নি সুজন। চিঠি লিখতে পারত, কিন্তু কী লিখবে? বকুলও চিঠি লেখে না। কেনই বা লিখবে? ইচ্ছা করে পারুলদিকে জিজ্ঞাসা করতে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে গেলে তো। পূর্বের মতো ধর্মভাব নেই, কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে।

জীবনমোহনের কাছে যায়। তিনিই তার ধর্মযাজক। রবিবারেই সুবিধা। সন্ধ্যার দিকে বাড়ী থাকেন। সুজনকে সঙ্গ দেন। ধর্মের ধার দিয়ে যান না। অবশ্য লৌকিক অর্থে। কিন্তু যা নিয়ে আলোচনা করেন তা ধর্ম নয় তো কী।

'সুজন, তোমার কবিতায় রং লেগেছে।' বলেন জীবনমোহন। 'লিখে যাও, দোস্ত। তুমি হবে বাংলার হাফিজ।'

সুজন তা শুনে সঙ্কোচ বোধ করে। কতটুকু তার অনুভূতির ঐশ্বর্য। সামান্য পুঁজি নিয়ে কারবারে নামা। তাও যদি ভাষায় ব্যক্ত করতে জানত। পনেরো আনাই অব্যক্ত থেকে যায়। নিজের অক্ষমতায় সে নিজেই লজ্জিত। সমালোচকরা বেশি কী লজ্জা দেবে। কিন্তু কেউ সুখ্যাতি করলে সে সঙ্কোচে মাটিতে মিশে যায়। বিশেষত জীবন-মোহনের মতো জীবনরসিক।

'এ তোমার বুকের রক্ত। পাকা রং।' বলেন জীবনমোহন।

পারিবারিক পেষণে বাধ্য হয়ে সুজনকে মাসিকপত্রের কাজ ছেড়ে কলেজের চাকরি নিতে হলো। এ রকম তো কথা ছিল না। এটা তার পরিকল্পনার বাইরে। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। যা ভয় করেছিল তাই। পড়া আর পড়ানো, খাতা দেখা আর প্রিন্সিপালের ফাইফরমাস খাটা, এই করে দিন কেটে যায়। রাতও। সৃষ্টি করবে কখন? ছুটির সময়ও ছুটি মেলে না। এগজামিন। বা অন্য কিছু। সুজনের লেখা কমে এলো, কমতে কমতে প্রায় বন্ধ হতে বসল। হাতও খারাপ হয়ে গেল পাঠ্যপুস্তক লিখে।

বিপদ কখনো একা আসে না। ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। চাকরি হতে না হতেই আসতে লাগল বিয়ের সম্বন্ধ। একটার পর একটা সম্বন্ধ উল্টিয়ে দেবার ফলে বাপের সঙ্গে বাধল খিটিমিটি। তিনি পেনসন নিয়ে বেকার বসে আছেন। হাতে কাজ নেই। নিষ্কর্মা হলে যা হয়। প্রত্যেকের প্রত্যেকটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চাই। কেন তুমি

বিয়ে করবে না ? লেখাপড়ায় ভালো, গৃহকর্মে নিপুণ, সুশ্রী, সচ্চরিত্র, ভদ্রলোকের মেয়ে। তার উপর কিছু পণযৌতুকও আছে। কেন তা হলে তোমার অমত ? তোমরা ক'ভাই যদি বিয়ে না করো, যদি পারিবারিক তহবিলে কিছু আমদানি না হয় তা হলে ছোট বোনগুলির বিয়ে দেবে কী করে ? ইতিমধ্যে যে রপ্তানিটা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ হবে কী উপায়ে ?

এ যুক্তি খণ্ডন করা শক্ত। সুজন পারতপক্ষে বাপের ছায়া মাড়ায় না। বাবা আসছেন শুনলে চোঁচাঁ দৌড় দেয়। যঃ পলায়তি স জীবতি।

শেষ কালে তিনি তাকে ফাঁপরে ফেললেন। কোথায় একটি মেয়ে দেখতে গিয়ে কথা দিয়ে এলেন। সুজনকে জানতেও দিলেন না যে তার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। ছাপাখানায় গিয়ে শুনতে পেলো তার বিয়ের চিঠি ছাপা হচ্ছে। দেখে তার চক্ষুস্থির। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করবে তেমন বীরপুরুষ নয় সে। বাপের সামনে মুখ তুলে কথা কইতে জানে না। তা হলে কি বিয়েই করতে হবে তাকে ? কলাবতীকে ভুলতে হবে ?

কদাচ নয়। সেই দিনই সুজন তার প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করে পাঠ্যপুস্তকগুলোর কপিরাইট বেচে দিল। তার পর রাতারাতি পাসপোর্ট জোগাড় করে চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ ধরল লণ্ডনের। জাহাজ যাবে কলম্বো হয়ে। চিঠি লিখল বকুলকে।

কলম্বোর জাহাজঘাটে অপেক্ষা করছিল বকুল ও তার স্বামী। সুজনকে বলল, 'চলো আমাদের সঙ্গে। জাহাজ ছাড়তে দেরি আছে।'

আবার যখন জাহাজে উঠল ততক্ষণে মোহিতের সঙ্গে সুজনের খুব জমে গেছে। বিলেতে কোথায় উঠবে, কী পরবে, কী খাবে, এই রকম একশো রকমের টুকিটাকি নিয়ে আলাপ। বকুল আশা করেছিল সুজন তার দিকে একটু মনোযোগ দেবে। কিন্তু যে জেগে ঘুমোয় তাকে জাগাবে কে ? সুজন অমনোযোগের ভাণ করল। কিন্তু লক্ষ্য করল যে বকুলকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

এ সৌন্দর্য সাজপোশাকের নয়, প্রসাধনের নয়, দেহচর্চার তো নয়ই, রূপচর্যার নয়। এ কি তবে গন্ধর্ববিদ্যা অনুশীলনের ফল ? কোনখানে এর উৎপত্তি ? সঙ্গীতলোকে ? যে সঙ্গীত আকাশে আকাশে, গ্রহতারায়, আলোকে আগুনে, বিশ্বসৃষ্টিতে ? প্রাচীনরা যাকে বলতেন দ্যুলোকের সঙ্গীত ?

অথবা এর মূল বিশুদ্ধ নির্মল মানবাত্মায় ? যার আভা সব আবরণ ভেদ করে ফুটে বেরোয় ? অক্ষয় অব্যয় অব্রণ। এ কি তবে অনির্বচনীয় আত্মিক সৌন্দর্য।

সুজন ভাবে, শেলী যাকে বলেছেন ইনটেলেকচুয়াল বিউটি সে কি এই নয় ?

জাহাজ যখন ছাড়ি ছাড়ি করছে, জাহাজ থেকে দর্শকদের নামবার সময় হয়েছে, তখন বকুল বলল, 'সুজিদা, মনে রেখো।' ইংরেজী করে বলল, 'ফরগেট মি নট।'

কী যে ব্যাকুল বোধ করল সুজন। মনে হলো আর দেখা হবে না হয়তো। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল জাহাজ থেকে, জাহাজঘাটের দিকে। ধীরে ধীরে আড়াল হয়ে গেল সব। ফুটে উঠল শুধু একখানি মুখ। সাঁঝের তারার মতো।

এই সেই কলাবতী, যার ধ্যান করে এসেছে সুজন। চিরন্তনী নারী। এর সৌন্দর্য যে উৎস থেকে আসছে তার নাম চিরন্তন নারীত্ব। পৃথিবীতে যখন একটিও নারী ছিল না, যখন পৃথিবীই ছিল না, তখনো তা ছিল। বিশ্ব যখন থাকবে না তখনো তা থাকবে।

সুজনের জাহাজ লণ্ডনে পৌঁছল। সেখানে সে একটা কাজ জুটিয়ে নিল। স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিস্ নামক প্রতিষ্ঠানে। সঙ্গে সঙ্গে পি. এইচ. ডি.র জন্যে থীসিস লিখতে উদ্যোগী হলো। দেশে ফিরতে তাড়া ছিল না। ইচ্ছাও ছিল না। ফিরে এলে আবার তো সেই বিয়ের জন্যে ঝোলাঝুলি শুরু হবে। বাপের সঙ্গে ঝগড়া।

সেই সুদূর প্রবাসের শূন্য মন্দিরে মনে পড়ে একখানি মুখ। চিরন্তনী নারী। শাশ্বত সৌন্দর্য। অমনি আর সকল মুখ মায়া হয়ে যায়। ইংরেজ মেয়ের মুখ, ফরাসী মেয়ের মুখ প্রবাসিনী বাঙালী মেয়ের মুখ, কাশ্মীরী মেয়ের মুখ ছায়া হয়ে যায়, মায়া হয়ে যায়। সুজন মেশে তাদের সঙ্গে, মিশবে না এমন কোনো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নেই তার। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে আড়াল হতে দেয় না তার সন্ধ্যাতারাকে, তার বকুলকে। সে যে কলাবতীর অন্বেষণে বেরিয়েছে। আর কারো সন্ধানে নয়।

সুজন যখন ইংলণ্ডে যায় তার আগে তন্ময় সেখান থেকে চলে এসেছে। দুই বন্ধুর দেখা হলো না। শুনতে পেলো তন্ময় নাকি বিয়ে করেছে। কিন্তু কাকে, কবে, কোথায়, কী বৃত্তান্ত কেউ সঠিক বলতে পারে না। তন্ময়ের ঠিকানায় চিঠি লিখবে ভাবল। কিন্তু আর দশটা ভাবনার তলায় সে ভাবনা চাপা পড়ে থাকল।

রূপমতীর অন্বেষণ

বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে জীবনমোহনকে প্রণাম করে তন্ময় যাত্রা করল পশ্চিমমুখে। কানে বাজতে থাকল তাঁর শেষ উক্তি, 'উত্তমা নায়িকার সাক্ষাৎ লাভ করো। জীবনে যা কিছু শেখবার যোগ্য সে-ই তোমাকে শেখাবে। অন্য গুরুর আবশ্যক হবে না।'

ইংলণ্ডে গিয়ে দেখল অক্সফোর্ডে তার জন্যে আসন রাখা হয়েছে। সুবিখ্যাত ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ। সেখানকার সে আবাসিক ছাত্র। খেলোয়াড় সর্বত্র পূজ্যতে। দেখতে দেখতে তার এনগেজমেন্ট ডায়েরি ভরে গেল আমন্ত্রণে আহ্বানে। টেনিস খুলে দিল

বনেদী সমাজের দ্বার। যে দ্বার বিদ্বানের কাছেও বন্ধ থাকে।

যার দরুন তার এত খ্যাতির সেই খেলার উপর জোর দিতে গিয়ে অন্য কিছু হয় না। হয় না উত্তমা নায়িকার অন্বেষণ। অনায়াসে যাদের সঙ্গে ভাব হয় তাদের সঙ্গ তাকে ক্ষণকালের জন্যে আবিষ্ট করে। তার পরে রেখে যায় তীব্রতর তৃষা। কোথায় তার রূপমতী, কোথায় সেই একমাত্র নারী, যে ছাড়া আর কোনো নারী নেই ভুবনে।

এমনি করে বছর ঘুরে গেল। কেম্ব্রিজকে খেলায় হারিয়ে দিয়ে নাম কিনল যারা তন্ময় তাদের একজন। পক্ষপাতীদের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে হাতে ব্যথা ধরে গেল তার। র‍্যাকেটখানা বগলে চেপে স্কার্ফ গলায় ঘুরিয়ে বেঁধে ক্রীম রঙের ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স পরা ছ ফুট লম্বা দোহারা গড়নের নওজোয়ান বিশ্রাম করতে চলল প্যারিসে।

বিশ্রামের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা বটে প্যারিস। সেখানেও খেলার জন্যে আহ্বান, আহারের জন্যে আমন্ত্রণ। খেলোয়াড়দের না চেনে কে। ছোট ছেলেরা পর্যন্ত তাদের ছবি কেটে রাখে। যেই রাস্তায় বেরোয় অমনি কেউ না কেউ দু'তিন বার তাকায়, একটুখানি কাশে, তারপর কাছে এসে মাফ চায় ও বলে, আপনি কি সেই বিখ্যাত—?

মিথ্যে বলতে পারে না। স্বীকার করে। তখন কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় খেলোয়াড়রা এসে হাতে হাত মেলায় আর বলে যুদ্ধং দেহি। হাতে ব্যথা শুনেও কি কেউ ছাড়ে! এনগেজমেন্ট ডায়েরি আবার ভরে যায়। এবার শুধু টেনিস কোর্ট ও ক্লাব নয়। কাফে রেস্তোরাঁ পানাগার নাচঘর। ব্যথা ধরে যায় কোমরে ও পায়ে।

বনেদী ঘরের না হোক, ঘরের না হোক, কত স্তরের কত রকম রঙ্গিণীর সঙ্গে পরিচয় হলো তার। রূপের ঝলক, লাবণ্যের ঝিলিক, লাস্যের ঝলসানি লাগল তার নয়নে, তার অঙ্গে, তার মানসে, তার স্বপ্নে। কিন্তু কই, রূপমতী কোথায়! কোথায় সেই একমাত্র নারী, যে সূর্যের মতো প্রতিবিম্বিত হচ্ছে এই সব শিশিরবিন্দুতে, ঝিকিমিকি করছে এই সব মণিকণিকায়! এরা নয়, এরা কেউ নয়।

বিশ্রামের হাত থেকে বিশ্রাম নেবার জন্যে তাকে দৌড় দিতে হলো দক্ষিণ ফ্রান্সের রিভিয়েরায়। নীসের কাছে ছোট একটি না-শহর না-গ্রাম। সেখানকার সমুদ্রের গাঢ় নীল তার চোখে নীলাঞ্জন মাখিয়ে দিল। আর সে কী হাওয়া! একেবারে ঘুমের দেশে নিয়ে যায়। ঘুমপাড়ানী গেয়ে শোনায় পাইন বন, জলপাই বন। শুয়ে শুয়েই কেটে যায় দিন। একটু কষ্ট করে খেতে বসতে হয়। এই যা কষ্ট।

ছুটি ফুরিয়ে যাবার পরেও তন্ময় ফিরে যাবার নাম করে না ইংলণ্ডে। অকারণে শুয়ে শুয়ে কাটায় রিভিয়েরায়। একজন ডাক্তারও পাওয়া যায় যে তাকে শুয়ে থাকতে পরামর্শ দেয়। যাতে তার ব্যথা সারে। মন বলে, সময় নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মনের অতল থেকে ধ্বনি আসে, স্থির হয়ে থাকো। ঘুমন্ত পুরীর রাজপুত্রের মতো নিষ্কম্প, অতন্দ্র।

ঘুম পায়, তবু ঘুমোতে পারে না। শুয়ে থাকে, তবু ঘুমোয় না। এই ভাবে কত কাল কাটে। পাঁজির হিসাবে যা আড়াই মাস ঘুমন্ত পুরীর হিসাবে তা আড়াই বছর। জেগে থেকে তন্ময় যার ধ্যান করে সে কোন দেশের রাজকন্তা কে জানে! কোন যুগের তাও কি বলবার জো আছে! যুগনির্ণয়ের একটা সহজ উপায় বেশভূষা অঙ্গসজ্জা। কিন্তু তন্ময় যার ধ্যানে বিভোর সে দিগ্‌বসনা।

বড়দিন এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এলো এক ঝাঁক টুরিস্ট।

কেউ বা তাদের ফরাসী, কেউ ইংরেজ, কেউ আমেরিকান, জার্মান, ওলন্দাজ। এক দল ভারতীয় উঠল তন্ময়ের হোটেলে। দল ঠিক নয়, পরিবার। পাগড়ি আর দাড়ি দেখে মালুম হয় শিখ। বাপ আর ছেলে, মা আর দুই মেয়ে। এ ছাড়া একজন সেক্রেটারী ভদ্রলোক। ইনি বোধ হয় শিখ নন, তবে পাঞ্জাবী। যে টেবিলে তাঁদের বসতে দেওয়া হয়েছিল সেটি তন্ময়ের টেবিল থেকে বেশ কিছু দূরে। নানা ছলে সে তাঁদের লুকিয়ে দেখছিল। তাঁদের দৃষ্টি কিন্তু তার উপর পড়ছিল না। পড়লে কি সে খুশি হতো? না, সে লুকিয়ে থাকতেই চায়। এই প্রথম সে তার চেহারার জন্যে লজ্জিত হলো। এঁদের না দেখে কে তার দিকে তাকাবে!

সমুদ্রের ধারে যেখানে সাধারণত সে শুয়ে থাকত সেখানে যেতেও তার অরুচি। সেটা সকলের নজরে পড়ে। তা বলে তো ঘরে বন্ধ থাকা যায় না। তন্ময় তা হলে কী করবে? পালাবে? না, পালাতেও পা ওঠে না। ভাবল ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে আপনাকে গোপন করবে। কিন্তু শাদা মানুষের ভিড়ে কালো মানুষের মুখ ঢাকা পড়ে না। ভারী অস্বস্তি বোধ করছিল তন্ময়। কিন্তু তার চেয়েও অস্বস্তি বোধ করছিল তার টেবলের জনা কয়েক ভারতফের্তা শ্বেতাঙ্গ। তারাই তলে তলে ষড়যন্ত্র করে তাকে চালান করে দিল ভারতীয়দের টেবলে। হোটেলের ম্যানেজার স্বয়ং তাকে অনুরোধ জানালেন তার স্বদেশীয়দের সঙ্গ দিয়ে তাঁকে অনুগৃহীত করতে।

শিখ ভদ্রলোক তাকে বিপুল সমাদরে গ্রহণ করলেন ও পরিবার পরিজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমাদের মহারাজা ফরাসী সভ্যতার পরম ভক্ত। ফরাসীতে কথা বলেন, ফরাসীতে উত্তর শুনতে ভালোবাসেন। আমরা যাঁরা তাঁর আমীর ওমরাহ আমরাও ফরাসী কেতায় দুরস্ত। বছরে দু'বছরে এক বার করে এ দেশে আসি এদের চাল চলনের সঙ্গে তাল মেলাতে। আমার বড় মেয়ে 'রাজ' এই দেশেই মানুষ হয়েছে। ছোট মেয়ে 'সুরজ' এখন থেকে এ দেশে পড়বে। বড় মেয়ে আমাদের সঙ্গে ফিরে যাবে। কিন্তু একমাত্র পুত্র মাহীন্দরকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছি। সে চায় অক্‌স্‌ফোর্ডে বা কেম্‌ব্রিজে যেতে। কিন্তু মহারাজের অভিপ্রায় তা নয়।'

ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, 'ইংরেজ আমাদের পায়ের তলায় রেখেছে, সে

কথা কি আমরা এক দিনের জন্তেও ভুলতে পেরেছি! শিক্ষার জন্তে আর যেখানেই যাই, ইংলণ্ডে নয়। ফরাসীতে কথা বলে মহারাজা ইংরেজকে অপ্রতিভ করতে ভালো-বাসেন। ওরা তাঁকে ইংরেজীতে কথা বলাতে পারেনি। আমরা অবশ্য ইংরেজীও জানি ও বলি। সেটা তাঁর পছন্দ নয়।'

তন্ময় শোনবার ভাণ করছিল। কিন্তু শুনছিল না। তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল তার পার্শ্ববর্তিনীর প্রতি। পার্শ্ববর্তিনী বলেছি, বলা উচিত দক্ষিণ পার্শ্ববর্তিনী। কেননা বাম পাশে বসেছিলেন সরদার রানী। উঁহু। বলা উচিত সে বসেছিল সরদার রানীর ডান পাশে। আর তার ডান পাশে 'রাজ'।

কী চোখে যে দেখল তাকে তন্ময় তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই মনের ভিতর থেকে ধ্বনি উঠতে লাগল, যাকে এত দিন খুঁজছিলে, রাজপুত্র, এই সেই রাজকন্তা রূপমতী। সে ধ্বনি এতই স্পষ্ট যে হঠাৎ মনে হয় কাছে কোথাও সোনার শুক আছে, তারই কণ্ঠস্বর।

এই আমার রূপমতী। এই আমার অদৃষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হলো তন্ময়ের। আনন্দ করবে কী! বিষাদে ভরে গেল অন্তর। মনে পড়ল জীবনমোহনের আর একটি উক্তি, সুখের অন্বেষণ তোমার জন্তে নয়। তোমার জন্তে রূপের অন্বেষণ। তুমি তার জন্তে। সুখ যে কোনো দিন আসবে না তা নয়। আপনি আসবে, আপনি যাবে, তার আসা যাওয়ার দ্বার খোলা রেখো।

এই আমার অদৃষ্ট। অদৃষ্টের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থ' হয়ে গেল তন্ময়। একে পাব কি না জানিনে, পেলে ক'দিন ধরে রাখতে পারব, যদি আপনা থেকে ধরা না দেয়! অথচ এরই অনুসরণ করতে হবে চিরদিন ছায়ার মতো। এখন থেকে অনুসরণই অন্বেষণ। অন্বেষণের অন্য কোনো অর্থ নেই।

'রাজ' ফরাসী ভাষায় কী বলল তন্ময় বুঝতে পারল না। তখন ইংরেজীতে বলল, 'শুনতে পাই বাঙালীরা নাকি ভারতবর্ষের ফরাসী। সত্যি?'

'সেটা আপনাদের সৌজন্য।' তন্ময় বলল কৃতার্থ হয়ে। 'তবে পাঞ্জাবীদের কাছে কেউ লাগে না। তারা ভারতের খড়্‌গবাহু।'

সরদার সাহেব তা শুনে হো হো করে হাসলেন। 'তা হলে ভারত পরাধীন কেন?'

সরদার রানী মন্তব্য করলেন, 'বাংলার সঙ্গে পাঞ্জাবের যোগাযোগ ছিল না বলে।'

'তা হলে', সরদার বললেন, 'আজ থেকে যোগাযোগ স্থাপন করা হোক।' এই বলে বাংলাদেশের 'স্বাস্থ্য' পান করলেন।

এর উত্তরে পাঞ্জাবের 'স্বাস্থ্য' পান করতে হলো তন্ময়কে।

এমনি করে তাদের চেনাশোনা হলো। তন্ময়ের আর তার রূপমতীর। কথাবার্তার

স্রোত কত রকম খাত ধরে বইল। কখনো টেনিস, কখনো ঘোড়দৌড়, কখনো ভাগ্য পরীক্ষা ও জুয়োখেলা যার জন্যে বিভিয়েরা বিখ্যাত। কখনো শিকার, কখনো মাছ ধরা, কখনো বাচ খেলা যার জন্যে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিখ্যাত। কখনো দোকান বাজার, কখনো পোশাক পরিচ্ছদ, কখনো আমোদপ্রমোদ যার জন্যে প্যারিস বিখ্যাত।

বিকেলে ওরা একসঙ্গে বেড়াতে গেল। দু'জনে মিলে নয়, সবাই মিলে। তন্ময় বেশির ভাগ সময় মাহীন্দরের কাছাকাছি। রাজকে আর একটু ভালো করে দেখবার জন্যে দূরত্ব দরকার। যতই দেখছিল ততই বুঝতে পারছিল এ সৌন্দর্য হীরা জহরতের নয়, নয় নীল বসনের, নয় আঁকা ভুরুর, নয় রাঙানো গালের। মিলো দ্বীপের এ ভীনাস মানুষের হাতে গড়া নয়, প্রকৃতির কৃতি। কোনোখানে এতটুকু অনাবশ্যক মেদ নেই, অনাবশ্যক রেখা নেই, অনুপাতের ভুল নেই, সুষমতার খুঁৎ নেই। দীঘল গড়ন। দুধ বরণ। মিশ কালো চুল রাবরির মতো ছাঁটা। কাঁটা বা ক্লিপ বা ফিতে লাগে না। মিশ কালো চোখ ঘন পক্ষে ঢাকা। তাকায় যখন আসমানে তারা ফোটে। আর চলে যখন মাটিতে ঝরণা বয়ে যায়।

রূপসী? হাঁ, অনুপম রূপসী। লাবণ্যবতী? হাঁ, অমিত লাবণ্যবতী। এই আমার রূপমতী। আমার উত্তমা নায়িকা। আমার অদৃষ্ট। এরই অনুসরণ করতে হবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বছরের পর বছর। বিয়ের আগে তো বটেই, বিয়ের পরেও বটে। যদি বিয়ে হয়। হবে কি? কে জানে। তন্ময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। সব চেয়ে ভাবনার কথা রূপমতীর যদি আর কারো সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। যদি না হয় বাজ বাহাদুরের সঙ্গে। অশ্রুবাষ্পে অস্পষ্ট দেখতে পায় তন্ময়, তার কোলে তার রূপমতী আর তার ঘোড়ার পিঠে সে বাজ বাহাদুর। ঘোড়া ছুটছে বিজলীর মতো, বজ্রের মতো গর্জে উঠছে সরদার সাহেবের বন্দুক। পিছনে ধাওয়া করছে শিখ ঘোড়সওয়ার দল।

বর্ষশেষের রাত্রে ফ্যান্সী ড্রেস বল্ হলো হোটেলের বল্ রুমে। তন্ময় সেজেছিল বাজ বাহাদুর। কেউ জানত না কেন। আর রাজ সেজেছিল রাজপুতানী। সেটা তন্ময়ের ইঙ্গিতে। গ্র্যাণ্ড মোগল সেজে সরদার সাহেবের মেজাজ খুশ ছিল। আর সরদার রানীর হাসি ধরছিল না মমতাজ মহল সেজে। সে রাত্রের উৎসবে কে যে কার সঙ্গে নাচবে তার ঠিক ঠিকানা ছিল না, বাছ বিচার ছিল না। তন্ময় আর্জি পেশ করল, রাজ মঞ্জুর করল। বাপ মা কিছু মনে করলেন না। নাচে তন্ময়ের কিছু স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা ছিল। রাজ পছন্দ করল তাকেই বার বার। রাত বারোটা বাজল, নতুন বছর এলো, উল্লাস মুখরিত কক্ষে কেউ লক্ষ্য করল না এদের দু'জনের ঘোড়া ছুটেছে কোন অজ্ঞাত রাজ্যে, কোন দুর্গম দুর্গে, কোন নিভৃত কুঞ্জে। তন্ময় কানে কানে বলল, 'এই গল্পের শেষে কী? বিচ্ছেদ না মিলন?' রাজ কানে কানে বলল, 'যেটা তোমার খুশি।' তন্ময়ের বুক দুলে উঠল।

সে কাঁপতে কাঁপতে কোনো মতে বলতে পারল, 'জগতের সবচেয়ে সুখী পুরুষ আমি।' কিন্তু বলেই তার মনে হলো, 'তাই কি? এত রূপ নিয়ে কেউ কখনো সুখী হতে পারে?'

সরদার সাহেবরা এর পরে জেনেভায় চললেন। তন্ময় ফিরে গেল অক্সফোর্ডে। কিন্তু সেখানে তার একটুও মন লাগল না। খেলতে গিয়ে বার বার হারে, পড়তে গিয়ে আনমনা থাকে। কেউ ডাকলে যায় না, গেলে চুপ করে থাকে। ওদিকে চিঠি লেখালেখি শুরু হয়েছিল। ওরা জেনেভা থেকে প্যারিস হয়ে দেশে ফিরছে শুনে তন্ময় বুঝতে পারল এই তার শেষ সুযোগ। এখন যদি বিয়ের প্রস্তাব করে তা হলে হয়তো একটুখানি আশার আমেজ আছে। দেশের মাটিতে যেটা দিবাস্বপ্ন প্যারিসের আবহাওয়াতে সেটা সত্য হয়ে যেতেও পারে।

সুরজকে প্যারিসে রেখে মাহীন্দরকে জেনেভায় দিয়ে রাজকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে ফিরে যাচ্ছেন তাদের মা বাবা। তন্ময় গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করল। তাঁরা বললেন, তুমি ছেলেমানুষ। তুমি আমাদের ছেলে। তাই ছেলের মতো আবদার করছ। কিন্তু, বাবা, এমন আবদার করতে নেই। তোমার জানা উচিত যে আমাদের সমাজে এটা অচল। আর আমরা তো সত্যি ফরাসী নই, আমরা শিখ। তোমাকে আমরা কলকাতায় খুব ভালো ঘরে বিয়ে দেব। সেও খুব সুন্দরী হবে।'

'আমি যদি আপনাদের ছেলে হয়ে থাকি,' তন্ময় বলল বুদ্ধি খাটিয়ে, 'তা হলে আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন আপনাদের রাজ্যে। সেখানে একটা কাজকর্ম জুটিয়ে দেবেন। আপনাদের কাছাকাছি থাকব।'

'সে কী!' সরদার সাহেব অবাক হলেন, 'তুমি অক্সফোর্ডের পড়া শেষ না করেই সংসারে ঢুকবে! কোনো বাপ কোনো ছেলেকে এমন পাগলামি করতে দেয়!'

সরদার রানী বললেন, 'তোমার বাবা আমাদের ক্ষমা করবেন না, বাচ্চা!'

তন্ময় কিন্তু সত্যি সত্যিই তল্পি তল্পা গুটিয়ে তাঁদের সঙ্গে জাহাজে উঠে বসল। তার মন বলছিল এই তার শেষ সুযোগ, সুযোগভ্রষ্ট হয়ে অক্সফোর্ডে সময়পাত করা মূর্খতা। একটা পণ্ডিতমূর্খ হয়ে সে করবে কী! সবাই যা করে তাই? চাকরি, বিয়ে, বংশবৃদ্ধি? সেটা তো রূপবতীর অন্বেষণ নয়, সেটা রৌপ্যবতীর অন্বেষণ।

রাজ সুখী হয়েছিল তন্ময়ের নিষ্ঠায়। কিন্তু তার মা বাবার মুখ অন্ধকার। এ আপদ কবে বিদায় হবে কে জানে! এ যদি মেয়ের মন পায় তা হলে সে কি আর কাউকে বিয়ে করতে রাজী হবে? তন্ময় কল্পনা করেনি তাঁদের আরেক মূর্তি দেখবে। কথা বলবেন কি, লক্ষ্যই করেন না তাকে। আমলেই আনেন না তার অস্তিত্ব। সে যদি গায়ে পড়ে ভদ্রতা করতে যায় এমন সুরে ধন্যবাদ জানান যে মুর্দাবাদ বললে ওর চেয়ে মিষ্টি

শোনায়। বেচারা তন্ময়!

আত্মসম্মান যার আছে সে করাচীতেই সরে পড়ত, কিংবা বড় জোর লাহোর পর্যন্ত গিয়ে কেটে পড়ত। কিন্তু তন্ময়ের গায়ের চামড়া মোটা। সে মান অপমান গায়ে মাখল না। সরদার সাহেব তাকে নিয়ে করেন কী! অক্সফোর্ডফের্তা ভদ্রলোকের ছেলেকে তো সকলের সামনে ধমকাতে পারেন না। শুধু তাই নয়, সে নামকরা খেলোয়াড। খেলোয়াড়কে তিনি সমীহ করেন। ছেলেটি তো দেখতে শুনতে খারাপ নয়, গুণীও বটে। জাতে বাধে, নইলে মন্দ মানাত না মেয়ের সঙ্গে। গৃহিণীও সেই কথা বলেন।

চলল তন্ময় শিখ রাজ্যে। অতিথি হয়ে। তারপর মহারাজার খেলোয়াড় দলে টেনিসের 'কোচ' নিযুক্ত হয়ে সে হোটেলে জাঁকিয়ে বসল। তার খরচের হাত দরাজ। যা পায় ফুঁকে দেয় আদর আপ্যায়নে। খোশ গল্পে তার জুড়ি নেই। স্বয়ং মহারাজা তাকে ডেকে পাঠান তার 'কিস্সা' শুনতে। বাঙালীকে সেখানে বোমাক বলেই জানে পাঁচজনে। খাতিরটা ওর দৌলতেও জুটল। তবে পুলিশের খাতায় নাম উঠল।

ওদিকে যে জন্যে তার এতদূর আসা সে জন্যেও তার চেষ্টার অবধি ছিল না। রাজ আর কাউকে বিয়ে করবে না বলে ওকে বাক্য দিল। কিন্তু মা বাপের অমতে তাকেও বিয়ে করবে না বলে মাফ চাইল। তন্ময় দেখল এটা মন্দের ভালো। মেয়ে চিরকুমারী থাকে কোন বাপ মা'র প্রাণে সয়। এঁরাও মত না দিয়ে পারবেন না।

হলোও তাই। মহারাজার নির্বন্ধে বিয়ের অনুমতি পাওয়া গেল, কিন্তু ভাবতে নয় আবার যেতে হলো ফ্রান্সে। সেখানে বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম না করে। হানিমুনের জন্যে আবার গেল নীসের কাছে সেই না-শহর না-গ্রামে। আবার সেই হোটেল, সেই সমুদ্রতীর, সেই পাইন বন, জলপাই বন।

তন্ময়ের মতো সুখী কে? জগতের সুখীতম পুরুষ তার প্রিয়ার দিকে তাকায় আর মনে মনে জপ করে, এ কি থাকবে? এ কি যাবে? এ সুখ কি দুদিনের? এ কি সব দিনের? আসা যাওয়ার দ্বার খুলে রাখতে বলেছেন জীবনমোহন। খোলা রাখলে কি সুখ থাকে? আর রূপ? সেও কি শাশ্বত?

রাজ যদি এত সুন্দর না হতো তা হলে হয়তো তন্ময় চিরদিন সুখী হবার ভরসা রাখত। কিন্তু সে যে বড় বেশি সুন্দর। সৌন্দর্যের ডানা আছে, সেইজন্যে সেকালের লোক সুন্দরী আঁকতে চাইলে পরী আঁকত। পরীর অঙ্গে ডানা জুড়ে বোঝাতে চাইত, এ থাকবে না। উড়ে যাবে। একে ধরে রাখতে গেলে যা বা থাকত তাও থাকবে না।

রাজের অঙ্গে ডানা নেই, কিন্তু ডানার বদলে আছে মানা। তার গায়ে হাত দিতে সাহস হয় না। স্পষ্ট কোনো নিষেধ আছে তা নয়। মুখ ফুটে কোনো দিন সে 'না'

বলেনি। তবু তন্ময় জানে যে খেলার যা নিয়ম। এ খেলার নিয়ম হচ্ছে, দেখতে মানা নেই, ছুঁতে মানা। মিলো দ্বীপের ভীনাসের গায়ে কেউ হাত দিক দেখি? হৈ হৈ করে তেড়ে আসবে গোটা লুভ্‌র মিউজিয়াম। অথচ দেখতে পারো যতক্ষণ ইচ্ছা, যতবার ইচ্ছা। সুন্দরী নারীর স্বামীও একজন দর্শক মাত্র।

মধুমাসের পরে ওরা ইংলণ্ডে গেল। সেখানে তন্ময়ের জনকয়েক লাট বেলাট মুরুব্বি ছিলেন। তার খেলার সমজদার। তাঁদের সুপারিশে তার একটা চাকরি জুটে গেল ইণ্ডিয়ান আর্মির পুনা দপ্তরে। পুনায় ঘর বাঁধল তারা দুটিতে মিলে। অত বড় সৌভাগ্য দু'জনের একজনও প্রত্যাশা করেনি। রাজ খুশি হয়েছে দেখে তন্ময়ের খুশি দ্বিগুণ হলো। আফিসের মালিক আর ঘরের মালিক, দুই মালিকের মন জোগাতে গিয়ে মেহনতও হলো দ্বিগুণ।

বছর দুই তাদের শিস দিতে দিতে ছুটে চলল বম্বে মেলের মতো। তার পরে আর মেল ট্রেন নয়, প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পুনায় তন্ময়ের কাজ, কিন্তু রাজ থাকে বেশির ভাগ সময় বম্বেতে। সেখানে তাকে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে আর উইলিংডন ক্লাবে। তার বন্ধু বান্ধবীরা মিলে শখের নাটক করলে তাকে ধরে নিয়ে যায় অভিনয় করতে। অভিনয়ে তার সহজাত প্রতিভা ছিল। হিন্দ ফিল্ম স্টুডিও থেকে তার আহ্বান এলো। সে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যদি বারণ কর আমি যাব না।' তন্ময় বলল, 'আমি যদি বারণ না করি?' রাজ চোখ নামিয়ে বলল, 'থাক।'

তন্ময় বুঝতে পেরেছিল তার উত্তমা নায়িকা স্বাধীনা নায়িকা। ভালো বাসা না বাসা তার মর্জি। বিবাহ করেছে বলে কর্তব্যবোধ জন্মেছে, কর্তব্যের দাবী মানতে সে রাজী। কিন্তু তাতে তার মর্জির এদিক ওদিক হয়নি। সে দিক থেকে সে অবিবাহিতা, অবন্ধনা। কর্তব্য যদি মর্জিকে গ্রাস করতে যায় বিবাহের বেড়া ভাঙতে কতক্ষণ। তন্ময় শিউরে উঠল।

পদ্মাবতীর অন্বেষণ

সাবরমতী গিয়ে অহুত্তম দেখল আশ্রম তো নয় শিবির। সন্ন্যাসী তো নন সেনানায়ক। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উনপঞ্চাশ বায়ুর মতো ছুটে আসছে ছোট বড় সৈনিক। একই জ্বালা তাদের সকলের অন্তরে। পরাধীনতার জ্বালা, পরাজয়ের জ্বালা।

আবার কবে লড়াই শুরু হবে? কে জানে!

কত কাল আমরা অপেক্ষা করব ? কে জানে !

তত দিন আমরা কী করব ? গঠনের কাজ।

গঠনের কাজ কেন করব ? না করলে পরের বারের সংঘর্ষে হার হবে।

পার্লামেন্টারি কাজ কেন নয় ? তাতে জনগণের সঙ্গে সংযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে।

অনুত্তমের মনে সন্দেহ ছিল না যে গান্ধীজীর নির্দেশ অভ্রান্ত। কিন্তু তার সহকর্মীদের অনেকে পরিবর্তনের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। গঠনকর্মে তাদের মন নেই। তারা চায় পার্লামেন্টারি কর্মক্রম। নয়তো চিরাচরিত অস্ত্র। বন্দুক তলোয়ার বোমা বিভলভার। হিংসা।

জাতির জীবনে জোয়ার আছে, ভাঁটা আছে। জোয়ার আজ নেই বটে, কিন্তু কাল আবার আসবে। এ বিশ্বাস যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে তবে গোড়ায় গলদ। সে গলদ সারবে না নির্দেশ পরিবর্তনে। সারবে, যদি বিশ্বাস ফিরে আসে। তখন জোয়ারের জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্যের সঙ্গে পালন করতে হবে সেনানায়কের নির্দেশ। অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। না করলে পরের বারও পরাজয়।

তিন দিন অনুত্তম গান্ধীজীর সঙ্গে ছিল। লক্ষ্য করল তিনি যেমন জলছেন আর কেউ তেমন নয়। আর সকলের জ্বালা বাইরে বিকীর্ণ হয়ে জুড়িয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাঁর জ্বালা বাইরে আসতে পায় না, জলতে জলতে বাইরেটাকে খাক করে দেয়। বাইরের রূপ ভস্ম হয়ে গেছে, তাই তাঁকে সন্ন্যাসীর মতো দেখতে। আসলে তিনি সন্ন্যাসী নন, বীর। সীতা উদ্ধার করবেন বলে কৃতসংকল্প। তাই রামের মতো বল্কল পরিহিত কৌপীনবন্ত ফলাহারী জিতেন্দ্রিয়।

সাবরমতী থেকে অনুত্তম নতুন কোনো নির্দেশ নিয়ে ফিরল না, কিন্তু তার অন্তর্জ্বালা আরো তীব্র হলো। গান্ধীজী যেন তাকে আরো উজ্জ্বল করে জালিয়ে দিলেন। অথচ জলে ওঠা আগুন যাতে জুড়িয়ে না যায়, ফুরিয়ে না যায়, ধোঁয়ায় ঢেকে না যায়, সে সঙ্কেত শেখালেন। তাঁর পরামর্শে অনুত্তম পূর্ব বঙ্গে শিবির স্থাপন করল।

ও দিকে জীবনমোহনের কাছে সে যা শিখেছিল তাও ভুলে গেল না। ধ্যান করতে লাগল সেই বিদ্যুৎপ্রভার যাকে দেখতে পাওয়া যায় শুধু দুর্যোগের রাত্রে। অন্য সময় তার অন্বেষণ করে কী হবে ! পদ্মাবতীর অন্বেষণ দিনের পর দিন নয়। তার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয় ঝড় বাদলের। যে পটভূমিকায় বিদ্যুদ্‌বিকাশ হয়।

এই যে শিবির স্থাপন, এই যে গঠনের কাজ, এও তো সেই বিদ্যুৎপ্রভার জন্যে, তার স্ফুরণের উপযোগী পটভূমিকার জন্যে। এমনি করেই তো সে জনগণকে জাগাচ্ছে, আইন অমান্যের জন্যে তৈরি করছে, শাসকদের রাগাচ্ছে, ঝড়বাদলকে ডেকে আনছে। ঝড় যদি আসে বিজলী কি আসবে না ?

অনুত্তম বিশ্বাস করে যে তার সাধন ব্যর্থ হবে না। ঝড়ও ডাকবে, বিজলীও চমকাবে। সে প্রাণ ভরে দেখবে সেই দৃশ্য। তার দেখেই আনন্দ। আর কোনো আনন্দে কাজ নেই। বিদ্যুতের সঙ্গে ঘর করা কি সত্যি সত্যি সে চায় নাকি! বিদ্যুতের বিদ্যুৎপনা যদি মিলিয়ে যায় তা হলে তার সঙ্গে বাস করায় কী সুখ? আর যদি নিত্যকার হয় তা হলেও সুখ বলতে যা বোঝায় তা কি সম্ভবপর? সুখের স্বপ্ন অনুত্তমের জন্যে নয়। দাম্পত্য সুখের স্বপ্ন। তা বলে আনন্দ থাকবে না কেন জীবনে? থাকবে সাক্ষাতে পরিচয়ে সহযোগিতায়। থাকবে অশরীরী প্রেমে।

ত্যাগী কর্মী বলে অনুত্তমের যশ ছড়িয়ে পড়ল। সন্ন্যাসী বলে শ্রদ্ধা করল কত শত লোক। কিন্তু অন্তর্যামী জানলেন যে সে সাধু নয়, বীর। ত্যাগী নয়, প্রেমিক। কর্মী নয়, সৈনিক। তার জীবনদর্শনে নারীর স্থান আছে। সে নারী সামান্য মানবী নয়, চিরন্তনী নারী, সে কোথায় আছে কে জানে! কিন্তু আছে কোথাও! না থাকলে সব মিথ্যা। এই কর্মপ্রয়াস, এই বিষয়বিরাগ, এই পল্লী অঞ্চলে স্বেচ্ছানির্বাসন।

অনুত্তম সারা দিন খাটে আর সব আশ্রমিকের মতো। সন্ধ্যার পর যখন ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে, কেরোসিনের দাম জোটে না, তখন একে একে সকলের সুনিদ্রা হয়। তার হয় অনিদ্রা। রাত কেটে যায় আকাশের দিকে চেয়ে। প্রসন্ন আকাশ। শান্ত আকাশ। তারায় তারায় ধবল। এই এক দিন শাজল হবে মেঘে মেঘে। মেঘের কালো কষ্টিপাথরে সোনার আঁচড় লাগবে। বিজলীর সোনার। তখন চোখ ঝলসে যাবে, চাইতে পারবে না। তবু প্রাণ ভরে উঠবে অব্যক্ত আবেগে। বন্দে প্রিয়াং।

হায়! ১৯২৫ সালের আকাশে মেঘ কোথায়! কিংবা ১৯২৬ সালের আকাশে! অনুত্তমের মনে হলো ১৯২৭ সালের আকাশে মেঘ করে আসছে, কিন্তু সে কেবল বাক্যের ঘনঘটা। তার চরম দেখা গেল ১৯২৮-এর আকাশে। কলকাতা কংগ্রেসে তুমুল উত্তেজনার মধ্যে এক বছরের চরমপত্র দেওয়া হলো। এই এক বছর অনুত্তম অনুক্ষণ আকাশের দিকে চাতকের মতো তাকিয়ে কাটালো। হাঁ, মেঘ দেখা যাচ্ছে বটে। এবার হয়তো বিদ্যুৎ দেখা দেবে।

বছর যেন আর ফুরোয় না। চলল অনেক দিন ধরে শাসকদের মুখ চাওয়া, কী তাঁরা দেন না দেন। ইংলণ্ডে লেবার পার্টির জয় হলো। আশাবাদীরা আশা করলেন এইবার ভারতের কপালে শিকে ছিঁড়বে। কিন্তু যা হবার নয় তা হলো না। অনুত্তম হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে তো বিনা দ্বন্দ্বে স্বাধীনতা চায় না। চায় দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে। শুনতে চায় বজ্রের গর্জন, দেখতে চায় বিদ্যুতের ফণা। ইংলণ্ড যদি দয়া করে কিছু দেয় তা হলে তো সব মাটি। এত দিনের প্রতীক্ষা নিষ্ফল।

সেইজন্যে ৩১শে ডিসেম্বর রাত যখন পোহালো অনুত্তমের মুখ ভরে গেল হাসিতে।

বিদায় ১৯২৯ সাল। বিদায় শান্তি স্বস্তি আরাম। স্বাগত ১৯৩০। স্বাগত দ্বন্দ্ব দুঃখ পদ্মিনীর দর্শন। আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে। বজ্রের আর কত দেরি? বিদ্যুতের?

মার্চ মাসে গান্ধীজী দণ্ডী যাত্রা করলেন। লবণ সত্যাগ্রহ মানসে। অনুত্তম চুপ করে বসে থাকবার পাত্র নয়। আশ্রমিকদের তাড়া দিয়ে বলল, এত দিন আমরা জনগণের নুন খেয়েছি, নিমকের ঋণ শোধ করি চলো।

চলল তারা সদলবলে লবণ সত্যাগ্রহ করতে। কাছে কোথাও সমুদ্র ছিল না। যেতে হলো চট্টগ্রাম। অনেক দূরের পথ। পায়ে হেঁটে যেতে মাস খানেক লাগে। পথের শেষে পৌঁছবার আগে খবর এলো চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুট হয়েছে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরকারের সংগ্রাম চলছে। রোমাঞ্চকর বিবরণ। কেউ বলে, চট্টগ্রামের ইংরেজরা জাহাজে করে পালিয়ে গেছে। কেউ বলে, পালাবার পথ বন্ধ। বিদ্রোহীরা রেল স্টীমার টেলিগ্রাফ দখল করে ফেলেছে। ইংরেজরা এখন জেলে। কেউ বলে, একে একে কুমিল্লা নোয়াখালি সব বিদ্রোহীদের হাতে চলে যাবে। দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ!

অনুত্তম বিস্ময়ে হতবাক হলো। দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ? সিপাহীরা যোগ দেবে তা হলে? কই, এমন তো কথা ছিল না? গণ সত্যাগ্রহ কি তা হলে সিপাহী বিদ্রোহের অর্গল খুলে দিতে! কেন তবে অহিংসার উপর এত জোর দেওয়া? অনুত্তম ঘন ঘন রোমাঞ্চ বোধ করল। কী হবে লবণ আইন ভঙ্গ করে! সিপাহীদের বলো বিদ্রোহী হতে। ভারতময় যদি সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে, এক প্রান্তের ঢেউ চার প্রান্তে পৌঁছয় তা হলে তো দেশ স্বাধীন।

কিন্তু আশ্রমিকদের মধ্যে ভয় ঢুকল। চট্টগ্রামের দিকে কেউ এগোতে চায় না। গ্রামের লোক ভয়ে আশ্রয় দেয় না। ভিক্ষা দেয় না। পুলিশ আসছে শুনে তারা তটস্থ। অনুত্তম আশ্চর্য হলো তাদের মনোভাব দেখে। কেউ তারা বিশ্বাস করবে না যে বিদ্রোহীরা জিতবে, সরকার হারবে। ইংরেজ রাজত্ব কোনো দিন অস্ত যাবে এ তারা ভাবতেই পারে না দাদাবাবুরা যাই বলুন মহারানীর নাতি কখনো গদি ছাড়বে না, কারো সাধ্য নেই যে তাকে গদি থেকে হটায়।

আশ্রমিকরা একে একে আশ্রমে ফিরে গেল। সেখান থেকে আর কিছু করে জেলে যাবে। জেলে যাওয়াটাই যেন লক্ষ্য। কিন্তু অনুত্তমের মনে কাঁটা ফুটল। না, তা তো লক্ষ্য নয়। দেশ জয় করাটাই লক্ষ্য। আমাদের দেশ আমরা জিনে নেব। চট্টগ্রামের বিদ্রোহীরা দেখিয়ে দিয়েছে কেমন করে তা সম্ভব।

ভিতরে ভিতরে সে অধীর হয়ে উঠেছিল তার পদ্মাবতীর জন্যে। গণ সত্যাগ্রহ চলেছে চলুক। সঙ্গে সঙ্গে চলুক সশস্ত্র বিদ্রোহ। এমনি করে গগন সঘন হবে। হাওয়া উঠবে। তুফান আসবে। বাজ পড়বে। বিজলী ঝলকাবে। ভয় কিসের! এই তো

সুযোগ। শুভদৃষ্টি এমনি করেই ঘটবে। ঘটনা! ঘটনা! ঘটনার পর ঘটনা! ঘটনাই তার কাম্য।

অনুত্তম একা চট্টগ্রামের দিকে পা বাড়াল। কী ঘটছে সে নিজের চোখে দেখবে। সম্ভব হলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করবে।

কিন্তু তাকে বেশি দূর যেতে হলো না। খবর এলো বিদ্রোহীরা হেরে গেছে। রেল স্টীমার টেলিগ্রাফ সরকারের হাতে ফিরে গেছে। ইংরেজরা এখন বেড়াজাল দিয়ে বন্দী করছে যাকে পাচ্ছে তাকে। গ্রামকে গ্রাম তাঁবু দিয়ে ছাওয়া। সেখানে ইংরেজ সৈন্য, ইংরেজের পুলিশ। হা ভগবান! তারা আমাদেরই দেশের লোক।

অনুত্তম শুনল ইংরেজ দারুণ অত্যাচার করছে। করবেই তো। এবার তার হাতে চাবুক। তার দয়াধর্মের কাছে মায়াকান্না কেঁদে কী হবে! যারা দেশ জয় করে নেবার স্পর্ধা রাখে তারা অত সহজে কাকুতি মিনতি করে কেন? যারা যুদ্ধে নেমেছে তারা কি সব জেনেশুনে নামেনি? তা হলে কি বলতে হবে ঐ কয়টি মাথাপাগলা যুবক ভুল করছে?

চট্টগ্রামে পৌঁছে অনুত্তম দেখল সকলে প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে তারা এর মধ্যে নেই, তারা জানতই না যে এ রকম কিছু ঘটবে বা ঘটতে পারে, তারাও বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে। ইংরেজ সে কথা শুনবে কেন? তার বিশ্বাস ভেঙে চুরমার। হিন্দুকে সে আর বিশ্বাস করে না। মুসলমানই তার একমাত্র আশা ভরসা। ঐ বিদ্রোহের নিট ফল হলো হিন্দু মুসলমানে মন কষাকষি। কারণ এক জনের যাতে শাস্তি আরেক জনের তাতে পুরস্কার।

কী যে করবে অনুত্তম কিছুই বুঝতে পারল না। ব্যথায় তার বুক টন টন করছে, রক্ত ঝরছে কলিজা থেকে। ইচ্ছা করলেই কারাগারে গিয়ে শাস্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা হবে বিপদ থেকে পলায়ন। না, সে পালাবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে। চট্টগ্রামেই সে তার দাঁড়াবার জায়গা করে নিল। সন্ত্রস্তদের বলল, ভয় কী? আমি আছি।

রইল তার গণ সত্যাগ্রহ, রইল তার পদ্মাবতীর অন্বেষণ। একেবারে ভুলে গেল যে পদ্মাবতী বলে কেউ আছে ও তার দেখা পাওয়া যায় এমনি দুর্যোগে। তার বেলা দুর্যোগই সুযোগ।

সন্ধ্যার পরে বাইরে যাওয়া বারণ। 'কারফিউ' চলছে। অনুত্তম পারমিট চাইতে পারত, কিন্তু তাতে অপমানের মাত্রা বাড়ত। চুপচাপ বাড়ী বসে থাকতেও ভালো লাগে না, মনে হয় কী যেন একটা কর্তব্য ছিল বাইরে। অভ্যাসমতো তকলি নিয়ে বসে, সুতো কাটে। কিন্তু তাতেও আগের মতো আস্থা নেই। হায়! সে যদি গুলির সামনে বুক

পেতে দিয়ে মরতে পারত।

এই যখন তার মনের অবস্থা তখন তাকে ডাক দিল তার বন্ধু সরিৎ। সেও চট্টগ্রামে এসেছে আর একটা দল থেকে। সে পুলিশের মার্কামারা লোক, কাজেই গা ঢাকা দিয়েছে। কে জানে কী তার কাজ! অনুত্তম তার সঙ্গে দেখা করতেই সে বলল, 'তোর সাহায্য না পেলে চলছে না। খুশি মনে রাজী না হলে কিন্তু চাইনে। ভয়ানক ঝুঁকি। পদে পদে বিপদ।'

অনুত্তম তো মরতে পারলে বাঁচে। মরার চেয়ে কী এমন ঝুঁকি থাকতে পারে!

'হাঁ, তার চেয়েও ভয়ানক ঝুঁকি আছে। ধরা পড়লে ওরা এমন যাতনা দেবে যে পেটের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। তা হলে ধরা পড়বে আর সকলে। ধরা পড়লে তুই সায়ানাইড খেতে রাজী আছিস?'

অনুত্তম ক্ষণকাল অবাক হয়ে ভাবল। বলল, 'রাজী।'

'কী জানি, বাবা! তোরা অহিংসাবাদী। শেষ কালে বলে বসবি তোর বিবেকে বাধছে।'

অনুত্তম তাকে আশ্বাস দিল। ধরা পড়লে বেঁচে থাকতে তার রুচি ছিল না।

'তা হলে আজকেই তুই তৈরি হয়ে নে। কারফিউ অমান্য করেই তোকে আজ রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে সংকেতস্থানে। আমি তোর সঙ্গে একজনকে দেব। তাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে তোর ছুটি। কী করে পৌঁছে দিবি সেটা তোর মাথাব্যথা। আমার নয়। মনে রাখিস, ধরা পড়ার ঝুঁকি প্রতি পদে। গোয়েন্দায় ছেয়ে গেছে এ জেলা। আমি হলে মৌলবী সাহেব সাজতুম।'

অনুত্তম তার গুরু দায়িত্বের জন্যে অবিলম্বে প্রস্তুত হলো। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিল না। নিল পোটেসিয়াম সায়ানাইড। কয়েক বছর হলো সে দাড়ি কামানো ছেড়ে দিয়েছিল। তাই তাকে দেখাত মৌলবীর মতো। মুসলমানী পোশাক জোগাড় করে সে পুরোদস্তুর মৌলবী বনে গেল। চট্টগ্রামে প্রচলিত কেচ্ছা পুঁথি এক কালে তার পড়া ছিল। এক বস্তানি পুঁথি, একটা বদনা, একটা ব্যাগ ও তার সেই বিখ্যাত নীল চশমা তার সম্বল হলো। এই নিয়ে সে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল।

এতিমখানার কাছে একটি গাছের আড়ালে সরিৎ লুকিয়েছিল, তার সঙ্গে ছিল আরো একজন। অনুত্তম অন্ধকারেও নীল চশমা পরেছিল, তবু তার ঠাহর করতে এক লহমাও লাগল না যে ওই আর একজনটি মেয়ে। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মেয়ে। সন্ন্যাসী না হলেও তার সন্ন্যাসীসুলভ সংস্কার ছিল। তার সেই সংস্কার তাকে বলল, দেখছ কী! দৌড় দাও। দৌড়তে গিয়ে গুলি খেয়ে মরো, সেও ভালো। কিন্তু এ যে মেয়ে!

সরিৎ তার হাতে এক তাড়া নোট গুঁজে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মেয়েটির নাম পর্যন্ত বলে গেল না। পরিচয় দেওয়া দূরের কথা। এমন অদ্ভুত অবস্থা কেউ কখনো কল্পনা করেছে? অদ্বৃত্তম তো করেনি। তার কাজ তা হলে এই মেয়েটিকে পুলিশের নজর বাঁচিয়ে কলকাতা নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ও দিকে যে হিন্দুর মেয়েকে অপহরণ করার অভিযোগে মৌলবী সাহেবের কোমরে দড়ি আর হাতে হাতকড়া পড়বে। পা দুটো যে একটু একটু কাঁপছিল না তা নয়। কেন যে মরতে মৌলবী সেজে এলো!

অন্ধকারে অমন একটা জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে অদ্বৃত্তম বলল, 'আমার নাম শা মুহম্মদ ফকহুদ্দিন হায়দার এছলামাবাদী। আপনার নাম যদি কেউ পুছ করে জওয়াব দেবেন মুসম্মৎ রওশন জাহান। কেমন? বোঝলেন?'

মেয়েটি বলল, 'হাঁ'।

'হাঁ নয়। জী হাঁ।'

'জী হাঁ।'

এক অপরিচিতা নারী, বোরখায় তার সর্বাঙ্গ ঢাকা। ভিতর থেকে তার চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে আঁধার রাতে জোনাকির মতো। কে জানে তার বয়স কত! পনেরো না পঁচিশ না পঁয়ত্রিশ। তবে কথার স্বর থেকে অনুমান হয় একুশ বাইশ হবে। এতদিন কি কেউ অবিবাহিতা থাকে? হয়তো বিধবা। সধবা যে নয় তাই বা কী করে বোঝা যাবে?

তবু চলতে চলতে অদ্বৃত্তম বলল, 'কেউ পুছলে এ ভি বলবেন কি আমি আপনার খসম।'

'জী হাঁ'।

অনেক ঘুরে ফিরে মিলিটারি পেট্রোল এড়িয়ে ছিপে ছিপে ওরা চলল। চলল শহর ছাড়িয়ে, মাঠের আইল ধরে, গোরুর গাড়ীর হালট ধরে, গোপাট ধরে, গ্রামের লোককে না জাগিয়ে, চৌকিদারকে দূরে রেখে। অদ্বৃত্তম আগে আগে, রওশন তার পিছন পিছন।

রাত যখন পোহাল তখন ওরা চাটগাঁ ও সীতাকুণ্ডুর মাঝামাঝি একটা রেলস্টেশনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। অদ্বৃত্তম অন্যমনস্ক ছিল। রওশন বলল, 'দেখবেন সামনে জল।'

'সামনে জল নয়। ছামনে পানী।'

'জী হাঁ। ছামনে পানী।'

মেয়েদের ওয়েটিং রুমে রওশনকে বসিয়ে অদ্বৃত্তম গেল টিকিটের খোঁজে। ট্রেনের তদারকে। কলকাতার টিকিট চাইলে পাছে সন্দেহ করে সেই জন্যে বলল, কুমিল্লার টিকিট। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেদিকে যাবার ট্রেন পাওয়া গেল। তখন মেয়েদের

কামরায় বিবিকে উঠিয়ে দিয়ে মৌলবী সাহেব উঠলেন যেখানে সব চেয়ে বেশি ভিড়। বলা বাহুল্য থার্ড ক্লাসে।

ফেনীতে কিছু হেনস্তা হতে হলো বিবিকে দেখতে গিয়ে। এক চোট অন্যান্য বিবিদের হাতে, এক চোট তাদের খসমদের হাতে, শেষে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে। তওবা তওবা করে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে হলো। লাকসামে যখন গাড়ী দাঁড়াল অনুত্তম দেখল রওশনের কামরা খালি হয়ে যাচ্ছে। তার নিজের কামরাও। তখন সে চট করে বেরিয়ে গিয়ে ফরিদপুরের টিকিট কেটে নিয়ে এলো। রওশনকে বলল, 'শোনছেন? এ গাড়ী চাঁদপুর যাবে না। গাড়ী বদল করতে হবে।' আবার তারা দু'জনে দুই কামরায় উঠে বসল।

চাঁদপুরের স্টীমারে কিন্তু মেয়েদের কাঠরায় ঠাঁই হলো না। ডেকের এক কোণে মাথা গুঁজতে হলো রওশনকে আরো কয়েকজন বিবির সঙ্গে। পর্দা ছিল না। কাছেই ছিল অনুত্তম প্রভৃতি পুরুষ। মাঝখানে কোনো বেড়া ছিল না। শুধু ছিল বোরখা। বোরখাও ক্ষণে ক্ষণে খুলে যাচ্ছিল খেতে ও খাওয়াতে। শিশু ছিল সঙ্গে। এমনি এক অসতর্ক মুহূর্তে চার চোখ এক হলো। অনুত্তমের। রওশনের।

সে চোখে পাঞ্চালীর তেজ, পাঞ্চালীর রোষ, পাঞ্চালীর লাঞ্ছনা। অপমানে নীল হয়ে গেছে তার মুখ। নইলে এমনিতে বেশ ফরসা। এক রাশ কোঁকড়া কালো কেশ অবিন্যস্ত এলায়িত। যেন পাঞ্চালীর মতো প্রতিজ্ঞা করেছে দুঃশাসন বেঁচে থাকতে বেণী বাঁধবে না। ইস্পাতের ফলার মতো ছিপছিপে গড়ন। কাপড়ে আগুন লেগেছে। সে আগুন ধরে গেছে প্রতি অঙ্গে, ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে অঙ্গচালনায়, সাপ খেলিয়ে যাচ্ছে অঙ্গভঙ্গীতে। অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে তার সর্ব শরীর। জ্বলছে আর তাপ বিকীরণ করছে। তপ্ত হয়ে উঠছে আবহাওয়া।

এ কোন নতুন স্নেহলতা! কেন এমন করে আত্মহত্যা করছে। অনুত্তম ভুলে গেল যে সে নিজেও জ্বলছে, তার মতো জ্বলছে কত সোনার চাঁদ ছেলে, জ্বলবে না কেন সোনার প্রতিমা মেয়েরাও? বাংলাদেশের এই কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চালীরাও থাকবে পাণ্ডবদের জ্বালা জোগাতে, ভারতের এই নব রাজপুতানায় পদ্মিনীরাও থাকবে বীরদের প্রেরণা দিতে। মনে পড়ল অনুত্তমের।

মনে পড়ল আর মনে হলো এই সেই পদ্মাবতী যার ধ্যান করে এসেছে সে এতদিন। এই সেই বিপ্লবী নায়িকা, সেই চিরন্তনী নারী। কে জানে কী এর নাম, কিন্তু রওশন নামটাও সার্থক। রওশন রোশনি রোশনাই। তুমি যে আছো, তোমাকে যে দেখেছি, এই আমার অনেক। তোমার কাজে লাগতে পেরেছি, এই আমার ভাগ্য। আমি ধন্য যে আমি তোমার দু'দিনের দু'রাত্রির সহযাত্রী। এখনো বিপদ কাটেনি, ধরা পড়বার

সম্ভাবনা ফ্রী পদে। তবু ধন্ত, তবু আমি ধন্ত।

গোয়ালন্দে নেমে অনুত্তমরা ফরিদপুরের দিকে গেল না, কাটল নাটোরের টিকিট। আবার আলাদা আলাদা কামরায় ওঠা। দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ। তারপর পোড়াদায় নেমে কলকাতার টিকিট কেটে গাড়ী বদল করল। এবার আলাদা আলাদা কামরায় নয়, একত্র। সময় ছিল না অত খুঁজতে। ভয় নেই বলে মুখ খুলে রাখল রওশন। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে। বোরখা পরে কি মানুষ বাঁচে! অনুত্তমকে বলল, 'হুজুরের আপত্তি নেই তো?'

অনুত্তম কী যেন ভাবছিল। অন্য মনে বলল, 'না, আপত্তি কিসের?'

কলকাতায় নেমে ঘোড়ার গাড়ী করে ওরা শ্যামবাজার যায়। সেখানে ওদের ছাড়াছাড়ি। গাড়ীতে রওশন বলেছিল সে আত্মরক্ষার জন্যে পালিয়ে আসেনি, এসেছে পার্টির কাজে।

কান্তিমতীর অন্বেষণ

কান্তির যাত্রা দক্ষিণ মুখে। হাওড়া স্টেশনে মাদ্রাজ মেল দাঁড়িয়েছিল, তুলে দিতে এসেছিল অনুত্তম, সুজন, তন্ময়। বাড়ীর লোক কেউ আসেনি। তাদের অমত। তাই বাড়ী থেকেও কিছু আনা হয়নি। বন্ধুরা জোগাড় করে যা দিয়েছিল তাই তার সম্বল।

'এই ভালো।' কান্তি বলল ব্যথা চেপে, 'বোঝা আমার হাল্কা। যেমন ভ্রমণে তেমনি জীবনে। হৃদয় আমার ভারাক্রান্ত নয়। হবেও না।'

ট্রেন চলে গেল তাকে বহন করে দক্ষিণ ভারতে। সেখানে তার বছর আড়াই কেমন করে যে কেটে গেল তার হিসাব রাখে না সে নিজে। দক্ষিণী নৃত্যকলা মন্দিরকেন্দ্রিক। মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীদের নাচ দেখে গুরুস্থানীয়দের কাছে ভরতনাট্যম্ শিখে নৃত্য সম্বন্ধে তার ধারণার আমূল পরিবর্তন হলো। সে ভেবেছিল ওটা সামাজিক জীবনের অঙ্গ। তা নয়। ওটা দেবতার সঙ্গে কথোপকথনের ভাষা। এক প্রকার দেবভাষা বলতে পারো। তেমনি ব্যাকরণশুদ্ধ, সূত্রবদ্ধ। দেবতা স্বয়ং নর্তক। নটরাজ। রঙ্গনাথ। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে, গ্রহনক্ষত্রের নাটমন্দিরে তিনিও নৃত্যপর। সৃষ্টিকর। প্রলয়ঙ্কর।

ভরতনাট্যম্ কোনো রকমে আয়ত্ত করে কথাকলি শিখতে কোচিনে গেল কান্তি। কথাকলি মন্দিরকেন্দ্রিক নয়, গ্রামকেন্দ্রিক। তার জন্যে দল চাই, পৌরাণিক কাহিনী জানা চাই, পালায় বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর অভিনয়ের ভাষাও বিভিন্ন। সে ভাষা মুদ্রাময়।

কান্তি কিছু দিন দেখে ছেড়ে দিল। কারণ নর্তক তৈরি করা যেমন কঠিন তার চেয়েও কঠিন দর্শক তৈরি করা। দর্শক যদি মুদ্রার অর্থ না বোঝে তা হলে নর্তকের মনের কথাই বুঝল না।

কথাকলিতে ভঙ্গ দিয়ে কান্তি চলল উত্তর মুখে। গুজরাতের গরবা তার কাছে বেশ সহজ লাগল। তার প্রকৃতির সঙ্গে মিল ছিল বলে সহজ। মিল ছিল রাজস্থানের লোক-নৃত্যেরও। সেও যেন ব্রজের গোপগোপীদের একজন। সেও যেন আদিম ভীল উপজাতির মতো বন্য। মাস ছয়েক কাটিয়ে দিল কাঠিয়াবাড়ে, রাজপুতানায়। মথুরায়, বৃন্দাবনে। তার পরে উত্তর ভারতের নাগরিক বিলাসনৃত্যে গা ঢেলে দিল। বাঈ নাচ, কথক নাচ। হাস্য লাস্য বিলোল কটাক্ষ। শৌখীন, সম্ভ্রান্ত, ক্ষীয়মাণ, ক্ষয়িষ্ণু। অমন করে আপনাকে দুর্বল করা ক'দিন চলতে পারে? বছর ঘুরতে না ঘুরতে কান্তি কলকাতা ফিরে গেল। সেখান থেকে গেল মণিপুর।

মণিপুরে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে সব চেয়ে বড় সম্পদ। আনন্দ। হাঁ, এরই নাম কেলি, এরই নাম লীলা। দক্ষিণের মতো ক্লাসিকাল নয়, উত্তরের মতো নাগরিক নয়, পশ্চিমের মতো লোক নয়, পূর্ব প্রান্তের এই নৃত্যপদ্ধতি রসে ভরা নৈসর্গিক। এর ছন্দ ধরতে কান্তির মতো অভিজ্ঞের তিন চার মাস লাগার কথা, কিন্তু এর লালিত্য তার ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেল, ধরা দিল না বারো চোদ্দ মাসের আগে। রাসলীলার রাত্রে কৃষ্ণনৃত্য করে তার অঙ্গ শীতল হলো। মধুর, মধুর, অতি মধুর। কলামাত্রেরই সার কথা মাধুর্য। কান্তির মনে হলো সে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মধুরেণ সমাপয়েৎ। মণিপুর থেকে সে কলকাতা ফিরে এলো। কিন্তু স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকা তার ধাতে নেই। একটা বিদেশী নটসম্প্রদায়ের সঙ্গে ভারতব্যাপী সফরে বেরিয়ে সে তাদের পরিচালন কৌশল শিখে নিল। তাদের নৃত্যপ্রকরণের সঙ্গেও পরিচিত হলো। তাদের সঙ্গে ইউরোপে যাবার সুযোগ জুটছিল, কিন্তু পাখ পক্ষপাতী তাকে যেতে দিল না। তাকে নিয়ে তারা একটা সম্প্রদায় গড়ল বিদেশী ছাঁচে। দেশ ক্রমশ নৃত্যসচেতন হচ্ছিল। ভদ্রঘরের মহিলারাও যোগ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু নৃত্যকে তাঁদের সারাজীবনের সাধনা করতে তখনো প্রস্তুত হননি। সারাজীবনের জন্যে ঘর গৃহস্থালী। দু'দিনের জন্যে নৃত্য।

বম্বের ভাটিয়া পারসী গোয়ানীজ তরুণ তরুণীদের নিয়ে সেই যে সম্প্রদায় গঠিত হলো তার মূলধন ছিল উৎসাহ। তাই নিয়ে তারা শুরু করে দিল কথাকলি মণিপুর ও ভরতনাট্যমের সমাহার। নিন্দুকরা বলাবলি করল এটা পাশ্চাত্য ব্যালে'র অনুকরণ। তা শুনে নাচিয়েরা বলল, চল আমরা বিশ্বভ্রমণে যাই, পাশ্চাত্যের লোক দেখে বলুক এটা তাদের অনুকরণ কি না। এ পোড়া দেশে গুণের আদর নেই। এরা আমাদের

চিনবে না।

কিন্তু জহুরী যারা তারা চিনল ঠিকই। দেখতে দেখতে একটির পর একটি কন্যারত্নের বিবাহ হয়ে গেল। তাদের যারা নৃত্যসহচর তারা মাথায় হাত দিয়ে বসল। নেচে সুখ কী যদি একা নাচতে হয়। দক্ষিণ ভারতের যিনি নটরাজ তাঁর সঙ্গেও একটি পার্বতী দেওয়া হয়েছিল। উত্তর দক্ষিণ সমন্বয়। তিনি তো মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে গেলেন। আর নাচবেন না বললেন। ভাঙা দল নিয়ে কান্তি কী করে সাগর পাড়ি দেয়? মণিপুরী কৃষ্ণের সঙ্গে গুজরাতী রাধা সাজবে কে? সুমতি এখন বৌ হয়ে চলে গেছে সুরতে। সেখানকার এক তুলোর ব্যাপারীর কনিষ্ঠ পুত্রবধূ রূপে।

সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিল এ ধরনের দল টিকতে পারে না। ভদ্রঘরের তরুণীরা বিয়ে একদিন করবেই। গুরুজনের ইচ্ছা, নিজেদেরও অনিচ্ছা নেই। তখন তাদের নৃত্যসহচরদের নাচের তাল কেটে যাবে নতুন সহচরীর অভাব হবে না, কিন্তু তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে সময়ের অভাব হবে। ততদিন তাদের সঙ্গে 'চলি চলি পা পা' করতে করতে নিজেরাই নাচ ভুলে যাবে। পর তো ততদিন ধৈর্যই থাকবে না। তার বন্ধু শাপুরজী কিন্তু অবুঝ। বলে, 'বাঙালীরা একটুতেই হাল ছেড়ে দেয়। সমস্যা তো আছেই, তার মীমাংসাও আছে নিশ্চয়। ধীরে সুস্থে করো। প্রথম ধাক্কায় কাৎ হয়ে পড়ছ কেন?'

কান্তি ভারতে আরম্ভ করেছিল এসব নৃত্য দক্ষিণ ভারতে দেবদাসীরা উত্তর ভারতে বাঈজীরাই রক্ষা করে এসেছে প্রধানত। গড়তে হলে তাদের নিয়েই সম্প্রদায় গড়তে হবে। তারা বিয়ে করবে না, বিয়ে করবামাত্র নাচ ছেড়ে দেবে না। সারাজীবনের সাধনাকে তারা ঘর গৃহস্থালীর চেয়ে ভালোবাসে। শাপুরজী এ কথা শুনে লাল। 'তোমরা হিন্দুরা চিরকাল এই করে এসেছ এই করতে থাক চিরকাল। আমরা এর মধ্যে নেই। গোপনে যাই করি না কেন, প্রকাশ্যে একপাল বারবনিতা নিয়ে ঘুরতে পারব না। বিশ্বভ্রমণ দূরের কথা, ভারত ভ্রমণেরও দুঃসাহস নেই। পারসী থিয়েটার আজকাল চলে না কেন? লোকে ওসব পছন্দ করে না।'

তারপর ভট্টজী বললেন, 'আমরা সেকেলে মানুষ, আমরাও এটা কল্পনা করতে পারিনে। আমরা বাঈজীদেরও নাচতে দেখিনি ভদ্র পুরুষদের সঙ্গে। তুমি যদি ভদ্রাদের বাদ দিতে চাও ভদ্রদেরও বাদ দাও। নইলে ভদ্রদের মান ইজ্জৎ যাবে। ভারতীয় নৃত্যেরও পুনরুদয় হবে না।'

একেলে মানুষ মগনভাই বলল, 'কান্তি, তুমি নৃত্য নৃত্য করে বাউরা হলে। তাই আর একটা দিক তোমার নজরে পড়ছে না। ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে নাচলে আমরাও নিরাপদ থাকি। নইলে আমাদেরও একটির পর একটির পতন হতো। তোমারও।'

কান্তি বাধা দিয়ে বলল, 'না, আমার না।'

কেউ বিশ্বাস করতে চাইল না তার কথা। যেখানে মুনিদেরও মতিভ্রম সেখানে কান্তির মতি স্থির থাকবে! শোনো, শোনো।

দল ভেঙে গেল। কারণ কান্তিই ছিল তার প্রাণ। সে একদিন নিরুদ্দেশ হলো সঙ্গে কিছু না নিয়ে। বোঝা হাল্‌কা হলেই সে বাঁচে।

অন্য কারণে তার মন ভারী ছিল। সে কথা কাউকে বলতে পারে না। বলত মন্ত্রী-পুত্র কোটালপুত্র সওদাগরপুত্রদের। কিন্তু কোথায় তারা কে জানে! কে কার খোঁজ রাখে!

তার কান্তিমতীর অন্বেষণ ক্ষান্ত ছিল না। যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে, নৃত্যের সুযোগ হয়েছে তাদের সকলেই তো কান্তিমতী। কেই বা নয়! কারো কেশ ভালো লেগেছে, কারো বেশ ভালো লেগেছে, কারো চাউনি, কারো চলন। কারো হাসি ভালো লেগেছে, কারো কান্না ভালো লেগেছে, কারো কোপনতা, কারো শরম। কারো মুদ্রা ভালো লেগেছে, কারো ভঙ্গী ভালো লেগেছে, কারো পদপাত, কারো পরশ।

না, সে বলতে পারল না যে এরা কেউ কান্তিমতী নয়. কান্তিমতী হচ্ছে এক এবং অদ্বিতীয়। তার বহুচারী মন কোনোখানে স্থিতি পেলো না। যদিও ঠাঁই পেলো সবখানে। প্রীতিও পেলো কোনো কোনোখানে। এই তো সেদিন সুমতির কাছে। সুমতির বিয়ের খবর সে-ই জানত সকলের আগে। খবর দিয়েছিল সুমতি স্বয়ং। বলেছিল, 'এ বিয়ে আমি করতে চাইনে যদি আর একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়।'

'আর একজনটি কে?' প্রশ্ন করেছিল কান্তি।

'তুমি কি জানো না যে আমাকে লজ্জার মাথা খেয়ে জানাতে হবে? বাধাও তো নেই।'

'বাধা আছে। যে পাখী আকাশের তাকে আমি নীড়ে ভরতে গেলে আকাশ তো যাবেই, নীড়ও যাবে। আর আমাকেই বা সে নীড়ে ধরে রাখতে পারবে কেন? সুমতি, তুমি বিয়ে করতে চাও করো, কিন্তু বিয়ে না করলেই আমি সুখী হতুম।'

'বিয়ে না করেই সারাজীবন কাটবে, এ কি কখনো সম্ভব! জানো তো, রূপযৌবন দু'দিনে ঝরে যায়। তার পরে নাচবে কে? নাচ দেখবে কে? বাকী জীবন কী নিয়ে কাটবে? কাকে নিয়ে? বিয়ে তোমাকে করতেই হবে, কান্তি। আজ না হয়, বিশ বছর বাদে। ততদিন আমি কি তোমার সঙ্গে নাচতে পারব? রূপযৌবন থাকলে তো?'

সব সত্যি। তবু কান্তি বলেছিল, 'এখন তুমি বিয়ে না করলেই সুখী হতুম, সুমতি। হয়তো ততদিন অপেক্ষা করতে পারতে না, কিন্তু কিছুদিন অন্তত পারতে। তবে অপেক্ষা

করে ফল হতো না, ঠিক। বিয়ে আমি করতে চাইতুম না তখনো। করব না কোনো দিন। করব না কাউকেই।'

সুমতি বিশ্বাস করল না। মুচকি হেসে চলে গেল। বলল, 'আমি তো বাঙালীন নই।'

মধ্যভারতের এক মহারাজা তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নৃত্যবিদ্ আনিয়ে তাদের সহযোগিতায় তাঁর নিজের খেয়ালখুশি মতো পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। বাঈজী শ্রেণী থেকেই তাঁকে নর্তকী সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এঁরা যেমন তেমন বাঈজী নন, শিক্ষায় সহবতে সাধনায় ও পরিশ্রমে এক একটি নক্ষত্র। দরবার থেকে এঁদের বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং ইতরবৃত্তির প্রয়োজন ছিল না। তবে লোকে বলে রাজকীয় অতিথিদের সঙ্গে রানী না থাকলে এঁরাই রানীর মর্যাদা পেতেন।

কান্তির নাম ইতিমধ্যেই মহারাজের দরবারে পৌঁছেছিল। মানুষটিকে দেখে মহারাজ তৎক্ষণাৎ নিয়োগপত্র দিলেন। বললেন, 'তোমাকেই আমি খুঁজছিলুম। তুমি এলে, এখন অঙ্গহানি দূর হলো। মন দিয়ে লেগে যাও। কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।'

নৃত্যের স্টুডিও ছিল কান্তির স্বপ্ন। সুসজ্জিত স্টুডিওর অভাব সে পদে পদে বোধ করছিল। মহারাজের স্টুডিও নেই, যা আছে তাকে স্টেজ বলা যায়। কান্তি বলল, 'ইয়োর রয়াল হাইনেস, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি।'

'বলো, বলো, কী বলতে চাও বলেই ফেল।'

'জাঁহাপনা, এ যে স্টুডিও নয়। এ যে স্টেজ।'

'হাঁ, হাঁ, ইস্টেজ, ইস্টেজ। ইস্টুডিও ক্যা চীজ?'

'আমার কাছে ফোটো আছে। দেখাব। রাশিয়ান ব্যালে'র জন্যে ডিয়াগিলেফ যা ব্যবহার করতেন। নিজিনস্কী যেখানে অনুশীলন করতেন।'

'ডিয়াগিলেফ কৌন আদমী? নিজিনস্কী কৌন আওরৎ?' মহারাজ তাঁর সাঙ্গো-পাঙ্গদের দিকে তাকান আর দাড়ি চোমরান।

কেউ বলতে পারে না। কান্তিই বলে, 'নিজিনস্কী আওরৎ নন, পুরুষ। এ যুগের শ্রেষ্ঠ নর্তক। বোধ হয় পূর্বজন্মে গন্ধর্ব ছিলেন। ইদানীং পাগলা গারদে। আর ডিয়া-গিলেফ সম্প্রতি মারা গেছেন। তিনি ছিলেন রাশিয়ান ব্যালে'র পরিচালক।'

সাঙ্গোপাঙ্গরা ধরা পড়ে অপ্রতিভ হলেন। মহারাজ ফোটো দেখে তাজ্জব বনলেন। তারপর স্টুডিও নির্মাণের ফার্মান বার হলো। কান্তি যেমনটি চায়। তিন মাসের মধ্যে বাড়ী তৈরি। চার মাসের মধ্যে কাঠের মেজে। ছ'মাসের মধ্যে সাজ সরঞ্জাম। তার পরে শুরু হলো কান্তির পরিচালনায় নতুন ধরনের তালিম। সে কেবল শেখায় না, দেখায়। লালিত্যে ও মাধুর্যে সে রাজ্যে তার সমকক্ষ ছিল না। আগন্তুকদের মধ্যেও না।

তার নৃত্যসহচরী হলো লায়লা জান। রাজনর্তকী মেহের জান যার মা। লায়লার

সঙ্গে কোনো ভদ্র যুবক আর কখনো নাচেনি, লায়লা যেন কৃতার্থ হয়ে গেল, ধন্য হয়ে গেল। ধন্য হয়ে তার শ্রেষ্ঠ যা কিছু তাই এনে দিল নৃত্যবেদীতে। তার নটীর পূজার অর্ঘ। আর কান্তি আপনাকে ভাগ্যবান মনে করল সত্যিকারের একজন শিল্পীর সাহচর্য পেয়ে। যাকে পাখী পড়া করে শেখাতে হয় না, যার ভুল দেখে বিরক্ত হতে হয় না, যে কাঠের পুতুল নয় যে তার দিয়ে বেঁধে নাচাতে হবে। লায়লার তুলনায় সুমতি যেন মানুষের তুলনায় পুত্তলিকা।

একজন ভাগ্যবান, আর একজন ধন্য। নাচ যা জমল তা দেখে তৃপ্তি। লায়লার প্রখর বুদ্ধি। এক পদ্ধতির সঙ্গে অপর পদ্ধতির সংমিশ্রণে নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর নিতে সে কান্তির চেয়েও সুদক্ষ। বরং কান্তিকেই চাইতে হয় তার পরামর্শ, তার সমালোচনা। শ্রদ্ধায় কান্তির মাথা নুয়ে আসে। ভারতের বিভিন্ন ও বিচিত্র নৃত্যের সমন্বয় একটু এখান থেকে একটু ওখান থেকে নিয়ে জুড়ে জুড়ে হবে না। হবে একটি বিশেষ ঐতিহ্যকে ঘিরে, একটি বিশেষ পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে, তার চারদিকে আর সমস্তকে বিনুনির মতো বুনে।

কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা, লায়লার নৃত্যে এমন একটা দরদ ছিল যা হাজার তালিম সত্ত্বেও সুমতির নৃত্যে আসত না। হাজার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কান্তির নৃত্যে আসবে না। এটা সাধনলব্ধ নয়। কান্তি একদিন লায়লাকে জিজ্ঞাসা করল, 'লায়লী, এ তুমি কোথায় পেলে ?'

সে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। ধীরে ধীরে সজল হলো তার সুরমা-আঁকা আঁখি-পল্লব। ক্ষীণ স্বরে বলল, 'জীবনের কাছে।'

'তোমার জীবন কি—' কান্তি বলতে বলতে থেমে গেল।

'কান্তি', সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল, 'তুমিই একমাত্র পুরুষ যে আমাকে ঘৃণা করেনি, হীন জ্ঞান করেনি, মৌখিক ভদ্রতা জানায়নি, ক্ষুধা মেটাবার খাদ্য মনে করেনি। তোমার কাছে আমার গোপন করবার কী আছে ?'

কান্তির চোখে জল এলো। মুখে কথা জোগাল না। কান সজাগ হলো।

'বড় দুঃখের জীবন আমাদের। মহারাজার কখন কে অতিথি আসবেন, তার জন্যে আমরা বাঁধা। নিমক খাই, হারামি করতে পারি কি ?'

কান্তি যে জানত না তা নয়। কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল এটা একটা প্রথা। সইতে সইতে সব প্রথার মতো এটাও গা-সওয়া হয়ে যায়। নইলে নৃত্যকলা রক্ষা পাবে কী করে ? রক্ষিতারাই রক্ষা করে এসেছে। আবার রক্ষিতাদের রক্ষক হয়েছে রাজ্যের রাজা, মন্দিরের ব্রাহ্মণ। পাপ ? এর মধ্যে পাপ যদি থাকে তবে পাপের শোধন হয়ে যায় নটরাজের উপাসনায়, কলাদেবীর আরাধনায়।

কিন্তু লায়লা যা বলল, যেমন করে বলল, তাতে কান্তির বহুদিনের বদ্ধমূল ধারণার মর্মে আঘাত লাগল। হু হু করে উঠল তার হৃদয়। চোখের জলে মুখ ভেসে গেল। নারীর অপমানের উপর যার প্রতিষ্ঠা সে কিসের শিল্প, সে কিসের সাধনা! লায়লা কি নারী নয়? তার কি অপমানবোধ নেই? কান্তিমতী রাজকন্যা কি আর সব নারীতে আছে, লায়লাতে নেই?

আছে। আছে। এও সেই কান্তিমতী। কখনো রাধানৃত্যে, কখনো পার্বতীনৃত্যে, কখনো অপ্সরানৃত্যে সে তার চিরন্তন সৌন্দর্য উন্মোচন করে দেখিয়েছে। তখন মনে হয়েছে সে শাশ্বতী নারী। যে নারীর প্রতিরূপ ভারতের চেতনায় রাধা, গৌরী, উর্বশী। ইরানের চেতনায় লায়লা। গ্রীসের চেতনায় হেলেন। জুডিয়ার চেতনায় মেরী। ইতালীর চেতনায় ম্যাডোনা।

কান্তি বলল, 'তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি, লায়লী?'

'কিছুই না। সব আমার নসীব।' সে দার্শনিকের মতো শান্ত।

কিন্তু কান্তির জীবনের তাল কেটে গেল। তার নৃত্যেরও। একদিন সে কাউকে কিছু না বলে কারো কাছে বিদায় না নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। না, ভারতের নৃত্যকলার পুনরুদয় ও ভাবে হবে না। সমাধানের জন্যে অন্য উপায় দেখতে হবে। অতীতে যা কার্যকারী হয়েছে বর্তমানেই তার কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে, ভবিষ্যতে কি তা বৃদ্ধি পাবে? না। নারীকে পতিতা করে তার পতনের উপর যা দাঁড়িয়েছে তা মন্দিরই হোক আর প্রাসাদই হোক তা পতনোন্মুখ। কান্তি তার সঙ্গে আপন ভাগ্য যোগ করে পতিত হবে না। ভারতের নারী যদি নর্তকী হয়ে গ্লানি বোধ করে তবে নারীকে সে ডাকবে না সারাজীবনের জন্যে নৃত্যসাধনা করতে।

অশান্ত হৃদয় নিয়ে সে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালো, ভুলে গেল যে সে শিল্পী। ক্রমে বুঝতে পারল আদর্শ অবস্থার জন্যে অপেক্ষা করলে চলবে না। সুমতিদের নিয়ে, লায়লাদের নিয়ে কাজে লেগে যেতে হবে। পরে যারা আসবে তাদের জন্যে বসে থাকলে কাজ হবে না। আসবে তারা একদিন, আসবেই। যেমন এসেছে ইউরোপে আমেরিকায় তেমনি আসবে ভারতে। আধুনিক নারী। যে পতিতা নয়, যে শিল্পের খাতিরে অবিবাহিতা কিংবা বিবাহ করলেও শিল্পচর্চায় নিবেদিতা।

আবার সম্প্রদায় গঠন। এবার কলকাতায়। যা সে আশা করেনি তাই ঘটল। দলে যোগ দিল একটি দুটি করে বেশ কয়েকটি বিবাহিত মেয়ে, তাদের স্বামীরাও। এরা অবশ্য কিছুতেই লায়লার মতো মেয়েদের আসতে দেবে না। তা ছাড়া আর কোনো খেদ রইল না কান্তির মনে। কী করে লায়লাকে উদ্ধার করবে এ চিন্তা তাকে অনবরত পীড়া দিচ্ছিল।

এবার দেখা দিল নতুন এক সমস্যা। তার নৃত্যসহচরী হলো মীনাক্ষী। তাতে শ্যামলের আপত্তি। শ্যামল ওর স্বামী। বেচারার নাচতে শখ। কিন্তু নাচে নিজের খেয়ালে। আড়াই বছরের শিশু ভোলানাথের মতো। মীনাক্ষীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে এই তার নাচের যোগ্যতা। কান্তি তার নাচের দাবী নাকচ করায় সে দারুণ দুঃখ পেলো। কিন্তু তার বিয়ের দাবী নাকচ করা অত সহজ নয়। সে হলো স্বামী। স্বামী যদি অনুমতি না দেয় তা হলে স্ত্রী কেমন করে অপরের সঙ্গে নাচবে?

কান্তি তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলল, 'শ্যামল, তোমার মনে যে শঙ্কা জাগছে সেটা অমূলক। আমার নৃত্যসহচরী কোনো দিন নর্মসহচরী হবে না। কোনখানে লাইন টানতে হয় সে আমি জানি। যদি না জানতুম তা হলে এতদিন সব প্রলোভন তুচ্ছ করলুম কোন মন্ত্রবলে?'

শ্যামল অভিভূত হয়ে বলল, 'কান্তিদা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ঐ যে তোমার পণ—বিয়ে করবে না, ওর তাৎপর্য কী?'

এরূপ প্রশ্ন এই প্রথম। অবাক হলো কান্তি। তখন শ্যামল বলে চলল, 'ওর তাৎপর্য কি এই নয় যে তোমার জন্যে আমি বিয়ে করব, আর তুমি আমার বিয়ের সুযোগ নেবে?'

সর্বনাশ। মানুষের মনে কত ময়লা যে আছে! কান্তি কী উত্তর দেবে ভাবছে, শ্যামল আবার বলল, 'তুমিও বিয়ে করে ফেল, কান্তিদা। নইলে দল রাখতে পারবে না। তার পর তোমার যদি পছন্দ হয় তুমি মীনাক্ষীর সঙ্গে নাচবে, আর আমি নাচব বৌদি'র সঙ্গে। কেমন? অন্যায় বলেছি? এটা কি অন্যান্য স্বামীদেরও মনের কথা নয়?'

হা ভগবান। কান্তি একবার আকাশের দিকে তাকাল। একবার শ্যামলের দিকে। তারপর বলল, 'শ্যামল, আমাকে বিশ্বাস করো। আমি যখন যার সঙ্গে নাচি তখন তার সঙ্গে আমার নিষ্কাম সম্পর্ক। সৌন্দর্য ভিন্ন আর কিছু আমি দেখিনে। ফুল দেখে আমি আনন্দ পাই, ছিঁড়তে যাইনে। এর মধ্যে কোনো দুরভিসন্ধি নেই, চাতুরী নেই, শ্যামল। ভুল বুঝো না আমাকে।'

শ্যামল নিরস্ত হলো। কিন্তু কয়েক মাস পরে কান্তির নিজেরই টনক নড়ল। মীনাক্ষী তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যার অর্থ, যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

অন্বেষণের মধ্যাহ্ন

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর। বম্বে। অনুত্তম গেছে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সন্দেশ নিয়ে সরদার বল্লভভাই সকাশে। সুভাষের সঙ্গে নাকি কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের বনিবনা হচ্ছে না, মিটমাটের চেষ্টায় চরকীর মতো বনবন করছে অনুত্তম। চরকা গেছে চুলোয়। ঐ যে খদ্দরের ঝোলাটা ওর জায়গা নিয়েছে চামড়ার ব্রীফকেস। তাতে আছে রাজনৈতিক কাগজপত্র। একান্ত গোপনীয়। নীল চশমাটা তেমনি আছে। তবে তার ফ্রেমটা সোনা হয়ে গেছে। যে পরশপাথরের ছোঁয়া লেগেছে চশমার ফ্রেমে তারই ছোঁয়া লেগেছে সারা অঙ্গে। কটিবস্ত্র হয়েছে কোঁচানো ধুতী, তুলে না ধরলে ধুলোয় লুটোত। খালি পা ঢাকা পড়েছে শাদা পপেটায়, মাটির সঙ্গে তার সংযোগ ছিন্ন। খাটো কুর্তি এখন পুরো পাঞ্জাবী, তার উপর হাতকাটা জবাহর-কোট।

চেহারাটা কিন্তু খারাপের দিকে। রোদের তাতে পুড়ে বৃষ্টির জলে ভিজে ঝড়ের ঝাপটা সয়ে উইয়ের কামড় খেয়ে শুকনো ডালের যে দশা হয় অনুত্তমেরও তাই। ভাঙাচোরা কাঠখোট্টা হাড় বার-করা চুল-পাতলা। সন্ত্রাসবাদী বলে সন্দেহ বশত বাংলাদেশের সরকার তাকে প্রথমে কয়েদ করে, তারপরে অন্তরীন করে। পাঁচ ছ' বছর কেটে যায় বক্সায়, দেউলিতে, অজ পাড়াগাঁয়। পরে হাসপাতালে। অথচ সন্ত্রাসবাদী সে কোনো কালেই ছিল না। শুধু রওশনের জন্যে এ দুর্ভোগ। যাক, তার ফলে সুভাষের সুনজরে পড়েছে। 'আমি অনুত্তম, সুভাষদার কাছ থেকে আসছি,' যেখানে যায় সেখানে এই তার পরিচয়পত্র। ছাড়পত্রও বটে, কংগ্রেসশাসিত প্রদেশের পুলিশ একথা শুনলে 'নমস্তে' বলে হটে যায়। কেবল বাংলাদেশের ওরা আঠার মতো লেগে থাকে। সেই জন্যেই তো হাই কমাণ্ডের উপর তার অভিমান।

অনুত্তম মেরিন ড্রাইভ থেকে চৌপাটি হয়ে মালাবার পাহাড়ে যাচ্ছিল, একজন মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করতে। উল্টো দিক থেকে আসছিল আর একখানা মোটর। মুখোমুখি হতেই ও মোটরটা গেল থেমে। ড্রাইভারের সীট ছেড়ে বেরিয়ে এলো এক মিলিটারি সাহেব। হাত বাড়িয়ে দিয়ে অনুত্তমের ড্রাইভারকে ইশারা করল গাড়ী থামাতে। অনুত্তম তো রেগে বেগ্‌নী। কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে এই অনাচার! মন্ত্রীরা তা হলে করছে কী! দেখে নেব মুন্সীকে। গাড়ী থেকে নেমে পড়ে রাগত ভাবে বলল, 'আমি অনুত্তম, রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে আসছি।'

'আর আমি তন্ময়, পুনা থেকে আসছি।' বলে হো হো করে হেসে উঠল সাহেব।

ঝাঁকানি ও কোলাকুলির পর দুই বন্ধুর খেয়াল হলো যে রাস্তার মাঝখানে গাড়ী

দাঁড় করিয়ে রাখায় ট্রাফিক বন্ধ হতে বসেছে। তখন তন্ময় টেনে নিয়ে গেল অনুত্তমকে নিজের মোটরে, অপরটাকে বলল ঘুরিয়ে নিয়ে অনুসরণ করতে। ব্যালার্ড পীয়ার।

'খবর পেয়েছিস্ কি না জানিনে, স্বজন আসছে কলম্বো থেকে যে জাহাজে সেই জাহাজেই কান্তি রওনা হচ্ছে ইউরোপ। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান। ভাবছিলুম তিন জনের দেখা হবে, চার জনের হবে না। অনু ভাই যদি থাকত! ভাবতে না ভাবতে তোর সঙ্গে মুখোমুখি। অদ্ভুত! অদ্ভুত! জীবনটাই অদ্ভুত! আমি আজকাল অদৃষ্টবাদী হয়েছি। আর তুই?'

'আমি? আমার কথা থাক। হাঁ রে, তুই নাকি বিয়ে করেছিস? পেয়েছিস তা হলে তাকে? তোর রূপমতীকে?'

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে তন্ময় বলল, 'বিয়ে করেছি। এক বার নয়, দু'বার। পেয়েছি, পেয়ে হারিয়েছি। হেরে গেছি। দেখে বুঝতে পারছিস্ নে, আমি পরাজিত?'

অনুত্তম লক্ষ্য করল তন্ময়ের মাথার চুল কাঁচাপাকা। ষণ্ডা গুণ্ডা বলীবর্দের মতো আকার, কিন্তু অসহায়ের মতো মুখভাব। দু'চোখে কতকালের জমাট কান্না। তার হাসি যেন কান্নার রূপান্তর। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তার জীবনের সব শেষ হয়ে গেছে। তবু সে বেঁচে আছে, আবার বিয়ে করেছে, চাকরিতে ভালোই করেছে বলে মনে হয়। ছেলেমেয়ে?

'ছেলেমেয়ে দুটি। কিন্তু রূপমতীর নয়। সে আমার সন্তানের মা হলো না। আমি তার শুভকামনা করি। শুভকামনা করি আর একজনেরও। আমার কপালে যে সুখ সইল না তার কপালে যেন সয়। কিন্তু সইবে কি! আমার সমবেদনা তার প্রতি।'

অনুত্তম হাঁ করে শুনছিল। স্টীয়ারিং হুইলে ছিল তন্ময়ের হাত, নইলে তাকে ধাক্কা মেরে বলত, 'এসব কী, তনু ভাই। এ যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য! হাঁ রে, তুই কি পাগল হলি!'

তন্ময় ভারী গলায় বলে চলল, 'কোনটা ভালো? পেয়ে হারানো? না আদৌ না পাওয়া? এক এক সময়ে মনে হয় আমি ভাগ্যবান যে আমি তাকে চোখে দেখেছি, বুকে ধরেছি, ঘরে ভরেছি, কোলে রেখেছি। এক এক সময় মনে হয় আমি পরম হতভাগ্য। আমি অসীম কৃপার পাত্র। আমার বৌ চলে গেছে আমাকে ফেলে অন্যের অন্তঃপুরে।'

অনুত্তম আর সহ্য করতে পারছিল না। ঝুনো নারকেলের মতো মানুষটা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলছিল, 'ওঃ! ওঃ! ওঃ!'

তন্ময় ক্ষণকাল উদাস থেকে তার পর কখন এক সময় আবার বলতে লাগল, 'ইচ্ছা ছিল ওকে অনুসরণ করব। অনুসরণই তো অন্বেষণ। কে জানে হয়তো ওর মন ফিরবে।

তখন ঘরের বৌ ঘরে ফিরবে। কিন্তু ডিভোর্সের যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই দেখে ওর উকীল ওকে কুপরামর্শ দেয়। আর্জিতে লেখায় আমি নাকি সহবাসে অসমর্থ। তামাশা মন্দ নয়, প্রমাণের দায় চাপিয়ে দেওয়া হলো প্রতিবাদীর উপরে। লজ্জায়, ঘৃণায় আমি গরহাজির থাকলুম। একতরফা ডিক্রী পেয়ে সে মামলায় জিতল।'

অনুত্তম ততক্ষণে রাগে গরগর করছে। বলল, 'তুই ভুল দেখেছিস্। ও রূপমতী নয়। রূপমতী হলে এমন কাজ করত না।'

তন্ময় হেসে বলল, 'ঐখানে তোর সঙ্গে আমার মতভেদ। পদ্মাবতীর পরিচয়—করা না করায়। রূপমতীর পরিচয়—হওয়া না হওয়ায়। ও যে রূপমতী হয়েছে এটা জাগ্রত সত্য। কাজটা যদিও নিন্দনীয়। চরিত্রের ত্রুটি তো রূপের অপূর্ণতা নয়। তা সত্ত্বেও আমি ওকে ফিরে পেতে রাজী ছিলুম। ইচ্ছা ছিল না আর একটা বিয়ে করতে। কিন্তু যেখানে যাই সেখানে আমাকে দেখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে যায়। আমি যেন একটা সঙ্। টেনিসের ছোকরাগুলো পর্যন্ত ফিসফিস করে বলে, এ সাহেব মর্দানা নয়!'

'ওদের দোষ কী! আমি তোর বন্ধু না হলে ও ছাড়া আর কী বলতুম!'

'ক্লাব ছেড়ে দিলুম। মেসে যাইনে। কিন্তু টেনিস? টেনিস যে আমার প্রাণ। তা বলে রোজ রোজ ও কথা বরদাস্ত হয় কখনো? স্থির করলুম বিয়েই করব আরেকবার। বিধাতা বিমুখ না হলে প্রমাণও করব যে আমি অশক্ত নই। তার পর জীবনে দ্বিতীয় সুযোগ এলো। রূপবতী নয়, সাধ্বী সতী।'

অনুত্তম খুশি হয়ে বলল, 'সেই ভালো। সেই ভালো। কিন্তু এখন থাক। পরে শুনব সব বৃত্তান্ত। ঐ তো ব্যালার্ড পীয়ার দেখা যাচ্ছে। সুজনের সঙ্গে কান্তির সাক্ষাৎ হবে। আঃ! কী আনন্দ! কত কাল পরে, বল দেখি। চো-দ্দ ব-ছ-র। রামের বনবাস। ওঃ!'

ব্যালার্ড পীয়ারে জাহাজ ভিড়তে যাচ্ছে এমন সময় এরা পৌঁছয়। সুজনের মতো কে যেন ডেকের উপর দাঁড়িয়ে। হাত নাড়ল এরা। হাত নাড়ল সেও। তারপর জাহাজ যতই কাছে আসতে লাগল ততই পরিষ্কার মালুম হতে থাকল সে সুজনই বটে। মাথায় চকচকে টাক। ভুঁড়িটি তুলো ভরা তাকিয়ার মতো। কেবল মুখখানা তেমনি স্বপ্নবিভোর, তেমনি কোমল মধুর।

জাহাজ ভিড়তেই এরা দু' বন্ধু সোজা উঠে গেল গ্যাংওয়ে বেয়ে। জড়িয়ে ধরল ওকে।

'তন্ময় ভাই! অনুত্তম ভাই!'

'সুজন ভাই! সুজন ভাই!'

'তোরা কে কেমন আছিস, ভাই?'

'তুই কেমন আছিস, ভাই?'

'হবে, হবে সব কথা। কিন্তু কান্তি ভাই কোথায় ? তার খবর ?'

'কান্তি এইখানেই আছে। এই জাহাজেই রওনা হচ্ছে কন্টিনেন্টে।'

'চমৎকার। তা হলে চল নামা যাক।'

ভারতের মাটিতে পা ঠেকানোর জন্যে সুজন অধীর হয়ে উঠেছিল। আর সকলের কাছে মাটি, তার কাছে মৃণ্ময়ী মা। গুন গুন করে গান ধরল, 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' এবং সত্যি সত্যি মাটিতে পা ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে এক বার হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকালো। তার চোখে জল এসে গেল।

'তেমনি সেন্টিমেন্টাল আছিস্, দেখছি।' তন্ময় বলল স্নেহভরে।

'দেশের জন্যে দরদ কত!' অনুত্তম বলল খোঁচা দিয়ে। 'দমননীতির যুগটা বিদেশে গা-ঢাকা দিয়ে কাটালি। তার পর সিংহলে গেলি কোন দুঃখে।'

'কেন ? তোর কি মনে নেই যে আমি একজনের অন্বেষণের ভার নিয়েছিলুম ?'

'ওঃ! কলাবতীর অন্বেষণে লঙ্কায়। রাক্ষসের দেশে! হাঁ, রূপকথায় সেই রকমই লেখে বটে। রাক্ষসরাক্ষসীদের মেরে রাজকন্যাকে উদ্ধার করেছিস্, না প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিস্, তাই বল।'

'আরে না, সেসব কিছু নয়। বকুল আছে ওখানে, ওর সঙ্গে আট ন'বছর দেখা হয়নি। কবে আবার হবে এই ভেবে কলম্বো দিয়ে ফিরি। কথা ছিল সোজা মাদ্রাজ হয়ে কলকাতা যাব, কিন্তু যা দেখলুম তার পরে তন্ময়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাই প্রবল হলো। চলে এলুম বম্বে। জলপথই ভালো লাগে আমার।'

তন্ময় কৌতূহলী হয়েছিল। অনুত্তমও গম্ভীরভাবে কৌতূহল গোপন করছিল।

'বল, বল, কী দেখলি কী শুনলি।'

সুজন তার হাতে হাত রেখে কানে কানে বলল, 'তোর রূপমতীকে দেখলুম।'

তন্ময়ের মুখ শাদা হয়ে গেল। সে বোবার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে অনুত্তম বলল, 'কান্তির জন্যে কি ব্যালার্ড পীয়ারেই অপেক্ষা করা যাবে ?'

তন্ময় বলল, 'না, চল আমার ক্লাবে তোদের নিয়ে যাই। কান্তিকে টেলিফোন করলে সেও ওইখানে জুটবে। সুজন, তুই আমার সঙ্গে পুনা যাবি, দু'চার দিন থাকবি। আর অনুত্তম, তোর অবশ্য জরুরি কাজ আছে। তোকে পুনায় টানব না। কিন্তু ক্লাবে টানব।'

'ক্লাব!' অনুত্তম বলল ব্যঙ্গ করে, 'ক্লাবে যাচ্ছি জানলে একটা বোমা কি রিভলভার জোগাড় করতুম। ষাঁড়ের কাছে যেমন লাল ন্যাকড়া সন্ত্রাসবাদীদের কাছে তেমনি ক্লাব।'

তন্ময়ের ক্লাবের নাম ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া। সেখানে তার দারুণ খাতির।

তার মাথায় কিন্তু তখনো ঘুরছিল সুজন কী দেখেছে কী শুনেছে। কথায় কথায় আবার ঐ প্রসঙ্গ উঠল।

'আমি কি জানতুম যে ওই তোর রূপমতী? চোখ ঝলসানো রূপ দেখে ভাবছি কে এই অপ্সরা। শুনলুম বামায়ণের ফিল্ম হচ্ছে। তার শুটিং-এর জন্যে বম্বে থেকে এঁরা এসেছেন। বকুলের স্বামী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তা। সুযোগ সুবিধার জন্যে তাঁর সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎকার। তাঁর বাড়ী কলকাতায় শুনে রূপমতী আফসোস করলেন। তাঁরও তো স্বামীর বাড়ী কলকাতায়, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। স্বামীর নাম তন্ময়।'

সুজন আরো বলল, 'তোর ঠিকানা দিলেন তিনিই।'

অনুত্তম বলল, 'আর ও প্রসঙ্গ কেন? তন্ময় এখন অন্যের স্বামী, তিনিও এখন অন্যের স্ত্রী। পরপুরুষ আর পরস্ত্রীর আলোচনা কি নীতির দিক থেকে বাঞ্ছনীয়?'

কথাটা অনুত্তম সুজনকে কটাক্ষ করে বলেনি। কিন্তু সুজন ওটা গায়ে পেতে নিল। বলল, 'নীতির দিক থেকে বাঞ্ছনীয় কি না নীতিনিপুণরাই বুঝবেন। আমার তো মনে হয় সত্যের দিক থেকে বাঞ্ছনীয়। নইলে আমার নিজের কাহিনী অকথিত থেকে যায়।'

'ওঃ তাই নাকি?' চমকে উঠল অনুত্তম 'তোর নিজের কাহিনী—'

'ঐ নীল চশমাটা হলো নীতির চশমা। ওর ভিতর দিয়ে দুনিয়ার দিকে তাকালে ভালো মন্দ এই দুটো জিনিসই চোখে পড়ে। যা ভালোমন্দের অতীত তার জন্যে চাই মুক্ত দৃষ্টি। সেটা নীতিনিপুণদের নীল চশমার সাধ্য নয়।'

অনুত্তম আহত হয়ে বলল, 'তোর নিজের কাহিনী যদি অবাঞ্ছনীয় হয়ে থাকে তা হলেও আমি তা শুনব, ভাই সুজন। তা বলে আমাকে তুই দুঃখ দিস্ নে। এমনিতেই আমি দুঃখী।'

পুরাতন বন্ধুদের পুনর্মিলনে নিছক আনন্দ নেই, বেদনাও আছে। বেদনাটা এইজন্যে যে তাদের একজনের মত বা মতবাদ আরেক জনের থেকে এত বেশি ভিন্ন যে যতক্ষণ নীরব থাকা যায় ততক্ষণই শান্তি, অন্যথা অশান্তি। কবিগুরু গ্যয়টে পুরাতন বন্ধু বা প্রেমিকদের পুনর্দর্শন পছন্দ করতেন না। সুজনের ও কথা মনে পড়ে গেল।

তিন বন্ধুরই বাক্যালাপ আপনি বন্ধ হয়ে এসেছে, সিগারেট খাওয়া ছাড়া আর কিছুই যেন করবার নেই, এমন সময় হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকল কান্তি। উল্লাসে আহ্লাদে প্রাণের উচ্ছলতায় অরূপণ। এই একটা 'শো' দিচ্ছে তো এই একবার মহড়া দিচ্ছে। এই একজনের বাড়ী খেতে যাচ্ছে তো এই একজনের বাড়ী শুতে যাচ্ছে। এখানে ওর মাসিমা, ওখানে ওর পিসিমা, বাঙালী গুজরাতী সিন্ধী। রকমারি ভাষা শিখেছে কান্তি, কখনো উর্দু আওড়াচ্ছে, কখনো তামিল, কখনো ভাঙা ভাঙা ফ্রেঞ্চ। পারসী ও ভাটিয়া

বন্ধুরা চাঁদা করে পাথেয় দিচ্ছে, তাই নিয়ে প্যারিস যাচ্ছে সদলবলে।

'তোরা তিন জনে প্যাঁচার মতো বসে আছিস কেন রে? ওঠ। ফোটো তোলাতে হবে। নাজুকে বলে এসেছি তৈরি থাকতে। চল।' এই বলে কান্তি অনুত্তমের টুপিতে টান দিল, সুজনের টাকে চিমটি কাটল, তন্ময়ের পিঠে থাপ্পড় মারল।

ঘরের জমাট আবহাওয়া তরল হলো তার তারুণ্যের কিরণ লেগে। বয়সের চিহ্ন নেই তার শরীরে। তবে গভীরতার আভাস পাওয়া যায়।

'সুজনকে তো দেখছি। সুজনিকা কোথায়? বড় আশা করেছিলুম যে। নিরাশ হলুম। আর তন্ময়, তোর সঙ্গে এক বার দেখা হয়েছিল পুনায়, তোর তন্ময়িনীর সঙ্গেও। মনের মতো বৌ পেয়েছিস আর ভাবনা কিসের। অতীতের জন্যে হা হুতাশ করে জীবন অপচয় করিসনে। এই অনুত্তম, তোর দেশের ক জ কি কোনো দিন ফুরোবে না? ঘর সংসার করবিনে? বলিস্ তো একটি পাত্রী দেখি তোর জন্যে একটি অনুত্তমা।'

'তোর নিজের কথা বল, আমার কথা পরে হবে।' অনুত্তম তার কাছে সরে এলো।

'আমার কথা খুব সংক্ষিপ্ত নয়, কিন্তু আমার সময় সংক্ষিপ্ত। জাহাজ ধরতে হবে। তা তুইও চল না আমার সঙ্গে এক জাহাজে? তোরাই তো গভর্নমেন্ট। পাসপোর্ট পেতে আর ঘণ্টাও লাগবে না। প্যাসেজ আমি দেব।'

অনুত্তম মুচকি হাসল। কান্তি কী করে জানবে কার চিঠি রয়েছে তার ব্রীফকেসে। মহামান্য আগা খাঁর। দরকার হলে সে প্যারিসে উড়ে যেতে পারে তাঁর চিঠির জবাব দিয়ে আসতে।

'কান্তি, তোর বোধ হয় মনে পড়ছে না যে পুরীতে আমরা স্থির করেছিলুম আবার যখন চার জনে মিলিত হব তখন যে যার অন্বেষণের কাহিনী শোনাব। আমার কাহিনী তো সকলে তোরা জানিস, সময় থাকলে সমস্তটা শোনাতুম। এখন তোদের তিনজনের কাহিনী শোনা যাক। ফোটোর জন্যে আমিই ব্যবস্থা করছি। জাহাজঘাটেই ভালো হবে।' বলল তন্ময়।

'সুজন দেশে ফিরেছে, অনুত্তমও আর জেলে যাচ্ছে না, তন্ময় তো তার অন্বেষণ পর্ব শেষ করে দিয়েছে। আমি ইউরোপ থেকে ঘুরে আসি, তার পরে একটা দিন ফেলে আমরা চারজনে একত্র হব কোনো এক জায়গায়। তখন প্রাণ খুলে গল্প করার মতো অবসর জুটবে। আজকের এই মিলনটা বিদায়ের ছায়ায় মলিন। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে থেকে কি জীবনের রাগিণী বিস্তার করা যায়? এ যেন রেডিওতে গান গাওয়া। কাহিনী থাক, শুধু বলা যাক, কে কোথায় পৌঁছেছে।'

কান্তির এ প্রস্তাব সমর্থন করল সুজন। 'কে কোথায় পৌঁছেছে। তন্ময়, তুই শুরু কর।'

তন্ময় বলল, 'আমি একেবারে পৌঁছে গেছি। বুড়ি ছুঁয়েছি। আমার অন্বেষণের আর কোনো পর্যায় বাকী নেই। রূপমতীকে দেখেছি, চিনেছি, পেয়েছি, হারিয়েছি, হারানো সত্ত্বেও চিরকালের মতো পেয়েছি। মাত্র কয়েকটা বছরে যা অনুভব করেছি সারা জীবনেও তা হয় না। ঐ কয়েকটা বছরই আমার সারা জীবন। বাকীটা তার সম্প্রসারণ।'

'আমি', অনুত্তম বলল, 'এখনো পৌঁছইনি। আমার মনে হচ্ছে সামনে আর একটা সংঘাত আসছে। ইংরেজ তার আগে নড়বে না। তার জন্যে দেশকে তৈরি করা আমার কাজ। দেশ যখন তৈরি হবে তখন সেই ঘনঘটার মধ্যে আবার আমার পদ্মাবতীর সঙ্গে আমার শুভ দৃষ্টি ঘটবে। তুই ইউরোপ থেকে ফিরে দিন ফেলতে চাস্, কান্তি। দিনটা বোধ হয় পাঁচ বছরের আগে নয়। তার আগে আমি কোথাও পৌঁছব না।'

সুজন বলল, 'আমার অবস্থা তন্ময় ও অনুত্তম এ দু'জনের মাঝামাঝি। আমার কাহিনী এখনো সমাপ্ত হয়নি, কিন্তু তার সমাপ্তির জন্যে পাঁচ বছর অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। আমার জীবনটা যে এত দীর্ঘ হবে তা কি আমি ভেবেছি? ধরে নিয়েছি কাহিনীটা শেষ হবার আগে জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। তা যখন হলো না তখন কাহিনীটাই সংক্ষেপ করে আনব। আমার কলাবতীকে আমি কোনো দিনই পাব না, একশ' বছর বাঁচলেও পাব না। এ জন্মে নয়। এ বিশ্বাস দৃঢ় হলো এবার কলম্বো গিয়ে।'

বলতে বলতে সুজনের কণ্ঠস্বরে কারুণ্য এলো। 'আমার সাধ্যের সীমা কতদূর তার একটা আভাস পেয়েছি। সাধ্যের অতিরিক্ত করতে গেলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না, শুধু জীবন বৃথা যায়। তার চেয়ে পরাজয় বরণ করা শ্রেয়। আমি পরাজিত, একথা বলতে একদিন আমার আত্মাভিমানে বাধত। এখনো বাধছে। কিন্তু এমন দিন আসবে যেদিন আমি অসঙ্কোচে হার মানব।'

'যেমন আমি মেনেছি হার!' তন্ময় ক্ষীণ স্বরে বলল।

এবার কান্তির পালা। একটু আগে যে হৈ চৈ করছিল, খৈ ফুটছিল যার মুখে, সে একেবারে চুপ। নিথর নিঃস্পন্দ হয়ে বসেছিল ধ্যানীবুদ্ধের মতো। জাহাজ ধরতে হবে, তার জন্যে তাড়া নেই। বলবে না মনে করেছিল, কিন্তু না বলে উপায় নেই। কী বলবে? কতটুকু বলবে?

'অনুত্তম, সুজন, তন্ময়', ধীরে ধীরে বলতে লাগল কান্তি, 'তোদের অন্বেষণ আর আমার অন্বেষণ এক জাতের নয়। আমার কান্তিমতী সবঠাঁই রয়েছে। তাকে খুঁজে পাবার জন্যে কোথাও যেতে হবে না। তাই পৌঁছনোর প্রশ্ন ওঠে না। আমি গোড়া থেকেই পৌঁছে রয়েছি।'

'তা হলে', কান্তিই আবার বলল, 'কিসের অন্বেষণে আমি ঘুরছি? কবে সাঙ্গ হবে

অন্বেষণ ? আমিও নিজেকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করি। উত্তর পাই, কোথাও বাঁধা থাকব না, কারো সঙ্গে নীড় বাঁধব না, আকাশে আকাশে পাশাপাশি উড়ব। কিন্তু আরেকজন রাজী হলে তো। সে যদি বলে, আকাশে আকাশে পাশাপাশি নয়, বাঁধা নীড়ে পাশাপাশি, তাও এক বসন্তে নয়, প্রতি বসন্তে, সারাজীবনের সব ক'টা ঋতুতে। সে যদি বলে, সংসারী হও, সন্তানের ভার নাও, সমাজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে শান্তিতে থাক, তার পরে যদি সুযোগ হয় তবেই সৃষ্টি করবে, নয় তো নয়।'

বন্ধুরা সমব্যথী। কেউ কোনো মন্তব্য করে না। তখন কান্তি শুধু এইটুকু বলে শেষ করে দেয়, 'আমি অপরাজিত। অপরাজিতই থাকব।'

ঘরের আবহাওয়া আবার জমাট হয়ে আসছে দেখে তন্ময় হেসে বলল, 'যদি না মেলে অপরাজিতা।' বলে সুজনের সঙ্গে চোখাচোখি করল। কিন্তু সুজনের চোখে হাসি কোথায়! সে যেন আসন্ন পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনায় Stoic-এর মতো কঠোর। এ কোন নতুন সুজন!

অচ্যুতম উঠে বলল, 'আমাকে মাফ করিস্, ভাই কান্তি। তোকে জাহাজে তুলে দিয়ে আসতে চেষ্টা করব। কিন্তু আপাতত বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছি। রাজনীতি অতি নিষ্ঠুরা স্বামিনী। গিয়ে হয়তো শুনব আমারই দোষে মিটমাটের সুতো ছিঁড়ে গেছে।'

তন্ময় ও রূপমতী

বিয়ের দিনটা নিছক আনন্দের দিন। তন্ময় কিন্তু সেদিন অবিমিশ্র আনন্দ বোধ করেনি। বাসর রাত্রি জেগে কাটিয়েছে অপলক দৃষ্টিতে। তার বধূর দিকে চেয়ে। তার ঘুমন্ত রাজকন্যার দিকে। যে রাজকন্যা তার ঘরে, তার শয্যায়, তার বাহু উপাধানে, তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিঃশ্বাস মিশিয়ে প্রথম আত্মসমর্পণের পর পরম নির্ভরতার সঙ্গে প্রসুপ্ত।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। রমণীয় রূপ। বিকশিত যৌবন। সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধ। তনুসুরভি। এ কি কখনো স্থির থাকতে পারে এক রজনীর বাহুবন্ধনে! এ চলবে। এর পিছন পিছন চলতে হবে তন্ময়কেও। অনুসরণই অন্বেষণ। অন্বেষণে ক্লান্তি এলে ক্ষান্তি দিলে রূপমতী চলে যাবে দৃষ্টির আড়ালে। দাঁড়াবে না, পায়চারি করবে না, ফিরে আসবে না। তা হলে আমার সুখ!—তন্ময় ভাবে।

সুখের জন্যে বিয়ে করতে হলে করতে হয় তাকে যে থাকতে এসেছে। যে স্থির থাকবে। কিন্তু সে তো রূপমতী নয়। তার সঙ্গে ঘর করে সুখী হওয়া যায়, কিন্তু এর সঙ্গে

নিঃশ্বাস নিয়ে স্বর্গ ছুঁয়ে আসা যায়। ধন্য হয়েছি আমি, ধন্য একে পেয়ে।—তন্ময় ভাবে। কিন্তু কতক্ষণের জন্যে! এখন থেকে মিনিট গুনতে, ঘণ্টা গুনতে, দিন গুনতে হবে। গুনতে হবে সপ্তাহ আর মাস। বছর পুরবে কি না কে বলতে পারে! হাঁ, বছর পুরবে, বছরের পর বছর পুরবে, তন্ময় যদি ক্লান্ত না হয়। ক্ষান্ত না হয়। হাঁ, আয়ুকালও পুরবে তন্ময় যদি জীবনভর অনুসরণ করে, অন্বেষণ করে।

কিন্তু সুখ! সুখ কই তাতে? সেই অন্তহীন অনুসরণে? মন চায় স্থিতি। পরমা নিশ্চিতি। দেহ চায় বিশ্রাম। সবিশ্রাম সম্ভোগ। অনুসরণের জন্যে প্রতিনিয়ত প্রস্তুত কে? আত্মা? আত্মারও কি শান্তির আকিঞ্চন নেই? সেও কি এক দিন বিনতি করবে না, রূপমতী, দৃষ্টির আড়ালে চলে যেয়ো না, দাঁড়াও? রাজা সংবরণের মতো সূর্যকন্যাকে বলবে না, তপতি, আমি যে আর ছুটতে পারছিনে, থামো?

রাজ, প্রিয় রাজ, তুমি যদি দয়া করে ধরা না দাও আমার সাধ্য কী যে আমি তোমায় ধরি! এই যে তুমি ধরা দিয়েছ এ কি আমার সাধনায়! এ তোমার করুণায়। আমার সুখ আমার হাতে নয়। তোমার হাতে।—তন্ময় ভাবে। এক চোখে আনন্দ এক চোখে বিষাদ নিয়ে দু'চোখ ভরে দেখে। আহা, এই রাতটি যদি অশেষ হতো, যদি কোনো মায়াবীর মায়াদণ্ডের ছোঁওয়া লেগে অ-পোহান হতো, যদি হাজার বছর কোথা দিয়ে কেটে যেত কেউ হিসাব না রাখত, তা হলে রূপ আর সুখ এক অপরকে ঘরছাড়া করত না, এক সঙ্গে বাস করত অনন্ত কাল। এক বৃন্তে ফুটে থাকত রূপমতী নারী আর সুখীতম পুরুষ। কোনো দিন ঝরে পড়ত না।

রূপমতী নারী। চিরন্তনী নারী। এই নারীতে আছে সেই নারী। এ যদি একটি রাতও থাকে, তার পরে না থাকে, তা হলেও চিরন্তনের চিহ্ন রেখে যাবে তন্ময়ের জীবনে। পরশ পাথরের পরশ লেগে সোনা হয়ে যাবে তার অঙ্গ। সোনা হয়ে যাবে তার মন। তন্ময়ের এক রাত্রের অভিজ্ঞতা সারা জীবনের রূপান্তর ঘটাবে। পরবর্তী জীবন অন্যরূপ হবে। তাতে সুখ থাকবে না তা ঠিক, রূপমতী কোলে না থাকলে সুখ কোথায়, নিত্য অনুসরণে সুখ থাকতে পারে না। তবু সে ধন্য, সে সার্থক, সে অসাধারণ ও অসামান্য। তন্ময় তার বিয়ের রাতটিকে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করে। এক জীবনে এমন রাত্রি দু'বার আসে না। কাল বেঁচে থাকবে কি না তাই বা কেমন করে জানবে!

বাসরের পরে মধুমাস। মধুমাস যেন ফুরোতে চায় না। দু'জনে দু'জনের মুখে মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়ে কখন একসময়। উঠে দেখে বেলা হয়ে গেছে। মুখোমুখি বসে কফি খায়। তার পর যে যার সাজ পোশাক পরতে যায়। দিনের বেলা তাদের ছাড়াছাড়ির পরে আবার মিলজুল হয়। প্রথম আবিষ্কারের পুলক নিয়ে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়।

'তন্ময়। তন্ময়। কোথায় তুমি? এসো আমার কাছে।'

'রাজ। রাজ। এই যে তুমি। কত কাল পরে তোমায় দেখছি।'

'কেন? কত কাল কেন? এখনো তো একঘণ্টা হয়নি।'

'তোমার ঘড়িতে এক ঘণ্টা। আমার ঘড়িতে এক হাজার ঘণ্টা।'

'ও ডারলিং!'

'ও ডিয়ার!'

মধুমাসটা ফ্রান্সে কাটিয়ে ওরা ইংলণ্ড যায়। চাকরির চেষ্টায় একটু বেশি ছাড়াছাড়ি হয়, একটু কম মিলজুল। তাতে রাতগুলি আরো মধুর হয়। ঘুম পথ ছেড়ে দেয় চুম-কে। কাজ জুটল। ফিরল ওরা স্বদেশে। ঘর বাঁধল পুনায়। সংসার শুরু হলো। মধু, মধু, সব মধু। ধোপার খাতা, গয়লার হিসাব, দরজীর মাপ, তাসখেলার দেনা—মধু, মধু, সব মধু।

প্রথম বছরটা ওরা এমনি করে কাটিয়ে দেয় নিজেদের নিয়ে। মাটিতে পা পড়ে না। তন্ময় এমনিতেই বেশ সুপুরুষ। রাজের সঙ্গে যখন সে বেরোয় তখন তাকে আরো সুদর্শন দেখায়। টেনিস খেলতে যখন সে নামে তখন ভীড় দাঁড়িয়ে যায় তাকে দেখতে। তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে এগিয়ে আসেন রাজাবাজড়া সাহেবসুবো, হাত বাড়িয়ে দেন তাঁদের মহিলারা। আর রাজ তো সমাজের আলো। পার্টির প্রাণ। সে না থাকলে উৎসবের উৎসাহ নিবে যায়। ক্লাবে, মেসে, লাট-ভবনে, রেসকোর্সে রাজ একটি অনুপম আকর্ষণ।

তার পরে কবে কেমন করে মনোমালিন্য সঞ্চার হলো। পূর্ণিমার আকাশে ছোট এক টুকরো কালো মেঘ। রূপমতী তার রূপচর্চা নিয়ে থাকে, রূপচর্চার পরের অধ্যায় সামাজিকতা। সংসারের প্রতি নজর নেই। স্বামীর প্রতি নজর থাকলেও সেটা তেমন আন্তরিক নয়। সেটা যেন একটা কর্তব্য করে যাওয়া। তন্ময় বুঝতে পারে পার্থক্য। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে আর ভাবে, বিশ্বের হাত থেকে ওকে ছিনিয়ে রাখতে পারব সে ক্ষমতা কি আমার আছে! বল কষাকষি করতে গেলে দেখব আমি অবল।

তন্ময়ের অধিকার একে একে খর্ব হলো। যখন তখন গায়ে হাত দিতে পারবে না। বুকে হাত দেওয়া একেবারে বারণ। দু'জনের দুটো আলাদা বিছানা। এক বিছানা থেকে আরেক বিছানায় যেতে অনুমতি লাগে। রূপমতী সকাল সকাল শুতে যায়, যদি না কোনো নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ থাকে। ঘুমের মাঝখানে তাকে বিরক্ত করা চলবে না। তার নিদ্রা নিয়মিত, তার আহার পরিমিত, তার ব্যায়াম দৈনন্দিন, তার স্নান ও প্রসাধন অন্তহীন। তার গড়ন, তার ডৌল, তার সুমিতি, তার সৌষ্ঠব তার কাছে জীবন মরণের প্রশ্ন। তন্ময়ের যেমন চাকরি বজায় রাখা রূপমতীর তেমনি রূপলাবণ্য অটুট রাখা। সতীর সম্বল যেমন সতীত্ব, গায়িকার সম্বল যেমন গীতসিদ্ধি, রূপসীর সম্বল তেমনি রূপ।

লবণ যেমন লবণত্ব হারালে কোনো কাজে লাগে না, লাবণ্যবতী তেমনি লাবণ্য হারালে কারো কাছে আদর পায় না। সমাজের কাছে তো নয়ই, স্বামীর কাছেও না। তখন তার দর ভরিমাল হিসাবে। গিন্নীবান্নী বলে। তখন ধারে কাটে না, ভারে কাটে।

তারপর তন্ময় বুঝতে পারল রাজ কোনো দিন মা হবে না। মা হলে তার ফিগার খারাপ হয়ে যাবে। তা হলে সে আর রূপমতী থাকবে না। তন্ময় কি তখন তাকে পুছবে। পুরুষের ভালোবাসা রূপটুকুর জন্যে। রূপটুকু গেল তো ভ্রমর উড়ল। কথাটা স্পষ্ট করে খুলে না বললেও রাজ যা বলে তার ও ছাড়া আর কোনো অর্থ হয় না। তন্ময় অবশ্য অকালে বাপ হবার জন্যে লালায়িত নয়, কিন্তু কস্মিন্ কালে হবে না এ তো বড় বিষম কথা। অপত্যকামনা কোন পুরুষের নেই। কোন নারীর।

এমনি করে তাদের দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্যের সূচনা হলো, কিন্তু তন্ময় এ নিয়ে একটি কথাও বলল না। সংসারে নজর নেই তো কী হয়েছে। এতগুলো চাকর রয়েছে কী করতে। তারাই চালিয়ে নেবে। স্বামীর প্রতি নজর আন্তরিক নয় তো কী হয়েছে। স্বামী কি নিজের দেখাশোনা নিজে করতে পারবে না। আর সন্তান যদি না হয় তা হলেই বা কী এমন দুর্ভাগ্য। এই যে অমুক অমুক নিঃসন্তান। রোজ ওদের সঙ্গে দেখা হয় কই, দেখে তো মনে হয় না খুব অসুখী। সন্তান হয়ে, মশাই, অনেক ঝামেলা। বাঁচিয়ে রাখো রে মানুষ করো রে, সম্পত্তি দিয়ে যাও রে। কোথায় এত তালুক বা মুলুক। রোজগারের টাকা তো মাসকাবারের আগে হাওয়া হয়ে যায়। ও ভালোই হয়েছে ছেলে হয়নি বা হবে না। তবু যদি হতো।

হায় রে সুখের আশা। স্বামী স্ত্রী সন্তান নিয়ে একটি সম্পূর্ণ পরিবার। অল্পে সন্তুষ্ট একটি স্বাভাবিক জীবন। অথচ রূপমতী নারীর চিরনূতন সঙ্গ। চিরন্তনী নারীর রূপময় কাশ। দু'দিক রক্ষা হয় কী করে? তন্ময় চায় সুখ এবং রূপ এক বৃন্তে দুই ফুল। শুধু রূপ নিয়ে সে সুখী হবে না। শুধু সুখ নিয়ে থাকতে চাইলে রূপ চলে যাবে। তার সদা শঙ্কা, গঙ্গা যেমন চলে গেল শান্তনুকে ফেলে রাজ তেমনি চলে যাবে তন্ময়কে ছেড়ে, যদি একটি কথা বলে তন্ময়। গঙ্গা তার সন্তানকে নদীর জলে বিসর্জন দিয়েছিল। রাজ তার সন্তানকে গর্ভে আসতে দিল না।

রূপমতীর সৃষ্টি কারো সুখের জন্যে নয়। তন্ময় বলে একজন মানুষকে সুখ বলে একটা পদার্থ দেবার জন্যে সে পৃথিবীতে আসেনি। সে এসেছে অলোকসামান্য রূপ নিয়ে সর্বমানবের সৌন্দর্যতৃষা শীতল করতে। তন্ময়ের প্রতি তার অসীম অনুগ্রহ বলে সে তার ঘরনী হয়েছে। থাকুক যত দিন আছে।—ভাবে আর কাঁদে তন্ময়। কাঁদে। হাঁ, পুরুষের মতো পুরুষ বলে যার প্রসিদ্ধি সেই বিখ্যাত খেলোয়াড় মনের দুঃখে চোখের জল ঝরায়। কেউ দেখতে পায় না। ওদিকে তার মাথার চুলে শাদা নিশান ওড়ে।

জীবনদেবতার কাছে এমন কী বেশি প্রার্থনা করেছে তন্ময় ? কেন তা হলে তার কপালে সুখ নেই ?—সে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়, যাদের তিনি সুখ দিয়েছেন তাদের কেউ কি পেয়েছে উত্তমা নায়িকার সঙ্গ ? কেউ কি পেয়েছে রূপমতী নারীর স্পর্শ ? তার পর সুখ ? সুখ কাকে বলে ! এই যে ওরা দুটিতে মিলে একসঙ্গে আছে, দু'জনেই নিঃসন্তান, দুজনেই সংসারবিরাগী, এও কি সুখ নয় ? স্বার্থপরের মতো জনক হতে চাও তুমি, আরেক জন যে বন্ধ্যা হলো, তার বেলা ? তোমার চিহ্ন থাকবে না, তারও কি থাকবে ? আহা, যদি একটি মেয়ে হতো । এমনি রূপবতী ।

মোট কথা, কেবলমাত্র রূপ নিয়ে তন্ময় তৃপ্ত নয় । সে চায় সুখ । জীবনমোহন তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সে তা মনে রেখেছে, তবু তার মন মানে না । এটা সে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেও ধরা পড়ে যায় স্ত্রীর কাছে । রাজ জানে সবই, বোঝে তন্ময় কী পেলে তৃপ্ত হয় । কিন্তু তারও তো স্বধর্ম আছে । সৌন্দর্যের কাছে সুন্দরী নারীর দায়িত্ব কি প্রতিভার কাছে প্রতিভাবানের দায়িত্বের মতো নয় ? সেই সর্বগ্রাসী দায়িত্বের অর্ণব থেকে যেটুকু ব্যক্তিগত সুখ উদ্ধার করা যায় সেটুকু কি সে তন্ময়ের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করছে না ? সে কি নিজের জন্যে অতিরিক্ত সুখ দাবী করছে ? জগতে রূপের চেয়ে চপল আর কী আছে ? যা প্রতি মুহূর্তে পালিয়ে যাচ্ছে তাকে প্রতি মুহূর্তে ধরে রাখা কি সব চেয়ে কঠিন নয় ? রূপের সাধনায় লেশমাত্র অবহেলা সয় না, পরে হাজার মাথা খুঁড়লেও হারানো রূপ ফিরে আসবে না । রাজ এই নিয়ে বিব্রত ও বিমনা । তন্ময় যেন তাকে ভুল বুঝে দুঃখ না পায়, দুঃখের ভাগী না করে । সন্তান ! সন্তান কি সকলের হয় ? আর কারো সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে কি সন্তান নিশ্চিত হতো ? অতটা নিশ্চিন্ত যদি তো করো আর কাউকে বিয়ে, ছেড়ে দাও আমাকে ।—রাজ বলে আভাসে ইঙ্গিতে । টুকরো কথায় ।

তবু তো তারা একসঙ্গে ছিল । কিন্তু ক্রমে দেখা গেল রাজের মন পুনায় টিকছে না । সুযোগ পেলেই সে বম্বে বেড়াতে যায়, রাত কাটিয়ে ফেরে বান্ধবীদের বাড়ীতে । বলে, 'তোমাকে একা ফেলে যেতে কি আমার মন চায় ? কিন্তু আমি জানি তোমার যা কাজ তার থেকে তোমাকে টেনে বার করা যায় না । তা বলে কি আমি একটু তাজা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারব না ? এই পচা হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে মারা যাব ?'

তন্ময় একটা বদলির দরখাস্ত করে দিল । তাতে কোনো ফল হলো না । তার পরে করল লম্বা ছুটির দরখাস্ত । স্ত্রীকে নিয়ে ইউরোপে যাবার জন্যে । লম্বা ছুটি মঞ্জুর হলো না । কদাচ এক আধ দিন খুচরো ছুটি মেলে । তখন বম্বে যায় দু'জনে । কিংবা তন্ময় থাকে পুনায়, রাজ যায় বম্বে । গৃহিণী অনুপস্থিত থাকলে গৃহ বলে একটা কিছু থাকে যদিও, তবু তাকে গৃহ বলা চলে না । কারই বা ভালো লাগে তেমন গৃহে একা দিনপাত

করতে। দিন যদি বা কাটে রাত কাটতে চায় না। একা শোওয়ার অভ্যাস তার বহু দিন থেকে। সে জন্যে নয়। কিন্তু কাছাকাছি আর একজন যে নেই—যে উত্তমা নায়িকা, যার অস্তিত্ব তাকে পরমা তৃপ্তি দেয়, যেমন দেয় তার খোঁপার ফুলের গন্ধ। নেই, নেই, সব শূন্য।

যে থাকবে না তাকে ধরে রাখবে কোন মন্ত্রবলে? বিয়ের মন্ত্রে? বেঁধে রাখবে কোন বন্ধনে? সংসার বন্ধনে? অসহায় তন্ময়! এমন কাউকে জানে না যার কাছে বুদ্ধি ধার করতে পারে। জীবনমোহন যদি থাকতেন। কিন্তু বহু দিন তাঁর কোনো খোঁজ খবর নেই। অনুত্তম, সুজন, কান্তি যে যার নিজের ধান্দা নিয়ে কে কোথায় আছে। কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। একজনের সমস্যা আরেক জনের দুর্বোধ্য। তন্ময়ের সমস্যা তো এই যে সে তার রূপসীর অনুসরণে বম্বে যেতে পারছে না। যেতে হলে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়। তার পরে সংসার চলবে কী উপায়ে?

বম্বের বড়লোকদের তন্ময় বলত বোম্বেটে। বোম্বেটেরা তার বৌকে লুট করে নেবে, এ আশঙ্কা তার অবচেতনায় ছিল। লুট অবশ্য গায়ের জোরে নয়। দৌলতের জোরে, দহরম মহরমের জোরে। কোনো দিন কিন্তু কল্পনা করেনি যে রাজ অভিনয় করতে জানে। একটা শখের অভিনয়ে তাকে নামতে দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে যায়। শহরময় ছড়িয়ে পড়ে তার নাম। সে নিজে অতটা প্রত্যাশা করেনি। তার বান্ধবীরাও করেনি। আর একটা শখের অভিনয়ের মহড়া চলেছে এমন সময় এক হিন্দী ফিল্ম কোম্পানী থেকে প্রস্তাব এলো রাজ যদি নায়িকা সাজে তা হলে কোম্পানী তার সঙ্গে চুক্তি করতে রাজী। হোটেলের সুইট তারাই জোগাবে। বিল তারাই মেটাবে। তাদের মোটর থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন। এ ছাড়া মাসে দু'হাজার টাকা হাত খরচা।

তন্ময়ের অনুমতি না নিয়ে রাজ চুক্তি করতে নারাজ। তন্ময় বলল, 'তুমি যা ভালো মনে করবে তা করবে। আমি কি কোনো দিন কিছু বলেছি যে আজ বলব?'

'না, না, তুমি বলবে বই-কি। তুমি যদি বারণ কর আমি যাব না।'

'আমি যদি বারণ না করি?' তন্ময় বলল চোখে চোখ রেখে।

রাজ চোখ নামিয়ে বলল, 'থাক।'

তন্ময় বুঝতে পেরেছিল রাজ ক্রমেই তার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে। তাকে দাঁড়াতে বললে সে দাঁড়াবে না, থামতে বললে সে থামবে না, ফিরতে বললে সে ফিরবে না। একমাত্র পন্থা তার পিছু পিছু যাওয়া, তাকে সব প্রলোভন থেকে রক্ষা করা, সব সম্মোহন থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু তা হলে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। তার পরে কী করে চালাবে? স্ত্রীর হোটেলের সুইটে স্ত্রীর পোষ্য হয়ে কাটাবে? না স্ত্রীর সুপারিশে কোম্পানীর পোষ্য? কিছু দিন পরে যখন চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে তখন কি রাস্তায়

দাঁড়াবে ?

অনুসরণ করতে হলে যতটা ঝুঁকি নিতে হয় ততটা ঝুঁকি নিতে বিয়ের আগে সে তৈরি ছিল, বিয়ের পরে তৈরি নয় দেখা গেল। এখন সে একজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক, দস্তুরমতো পদস্থ সরকারী কর্মচারী। টেনিসের কল্যাণে স্বয়ং লাটসাহেবের প্রিয়পাত্র। মাঝে মাঝে তার ডাক পড়ে লাটসাহেবের সঙ্গে খেলতে। যখন তিনি পুনায় থাকেন। পুরুষ তার পৌরুষ বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীর অনুগত হয়ে জীবনপাত করবে ? রূপবতী রাজকন্যার এই কি শর্ত ? তার কাঁদতে ইচ্ছা করে। সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেও। দেখতে ইয়া জোয়ান। আসলে একটি অসহায় শিশু।

মাথার উপর শাদা নিশান উড়ল। তন্ময় তার স্ত্রীর সম্মানে মস্ত একটা পার্টি দিয়ে নিজের পরাভব উৎসবময় করল। অভিভূত দয়িতাকে বলল, 'রাজ, রাজার মতো জয়যাত্রায় যাও।'

রাজ বুঝতে পেরেছিল এটা তার বিদায় সম্বর্ধনা। তন্ময়ের কষ্ট দেখে তার কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু যে শক্তি তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সে শক্তির তুলনায় পিছুটান কিছু নয়। বলল, 'তোমার অনেক কাজ। নইলে তোমাকে আমি এখানে একা থাকতে দিতুম না, প্রিয়তম। আমার মন পড়ে থাকবে তোমার কাছে। আসব আমি যখনি ছাড়া পাব। লণ্ডন নয়, প্যারিস নয়, যাচ্ছি তো বম্বে। তিন ঘণ্টার যাত্রা। এটা কি একটা যাওয়া যে তুমি মন খারাপ করবে।'

রাজ সেদিন খোশ মেজাজে ছিল। তন্ময়ের কোলে আপনি এসে ধরা দিল। বলল, 'এ ধন তো তোমার রইলই। এ কোনো দিন চুরি যাবে না। আমি তোমার হয়ে পাহারা দেব। ভেবো না।' এই বলে তাকে সে রাত্রে আশাতীত সুখ দিল।

এটা কি একটা যাওয়া যে এই নিয়ে তন্ময় মন খারাপ করবে ? বলতে পারল না বেচারা যে পুনা থেকে বম্বে হলে মন খারাপ করত না, কিন্তু এ যে ঘরসংসার থেকে রঙ্গমঞ্চে, সমাজ থেকে অসমাজে। ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির পরপারে। এ একপ্রকার মৃত্যু। যদিও বলতে নেই।

যাত্রাকালে একান্ত নম্র নত বিনীত ভাবে সে তার পত্নীর করচুম্বন করল। বলল, 'পাছে তুমি চলে যাও সেই ভয়ে কোনো দিন তোমাকে কোনো কথা বলিনি। এখন তো তুমি আপনা হতে চললে। এখন আমার অন্তরে শুধু একটি কথা ঘুরে ফিরে আসছে।'

'সে কথাটি কী কথা ?'

'সে কথাটি—' বলবে কি বলবে না করে অবশেষে বলেই ফেলল তন্ময়, 'সে কথাটি এই কথা যে আমি তোমার কাছে কোনো অপরাধ করিনি। কেন তবে তুমি আমাকে ছেড়ে চললে ?' বলতে বলতে তন্ময়ের চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল।

'ওঃ নন্‌সেন্স।' রাজ তার কপালে গায়ে চিবুকে ঠোঁটে চুম্বনের পর চুম্বন এঁকে দিল।

'তোমাকেই যদি ছাড়ব তবে কার জন্যে বাপ মা জাত ধর্ম ছেড়ে এলুম? তুমি আমারই। আমি তোমারই। কেউ কোনো অপরাধ করেনি। করছে না। করবে না। স্থির হও।'

হিন্দী ফিল্মে নামবার সময় রাজ একটা ছদ্মনাম নিল বসন্তমঞ্জরী। তার আবির্ভাব চিত্রজগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি আনন্দের হিল্লোল তুলল। পুনায় যারা তাকে চিনত তারা এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেল তন্ময়কে। নিজের স্ত্রীকে পরের নায়িকারূপে অভিনয় করতে দেখা কি সামান্য সৌভাগ্য। দেখতে গিয়ে তন্ময় ঠিক আর সকলের মতো তন্ময় হতে পারল না মাঝখানে অন্যমনস্ক হলো। নায়ক নায়িকার প্রণয়দৃশ্য যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে দেখানো হয়েছিল। তবু এক ঘর লোক এমন ভাবে নিল যেন সব কিছু হতে যাচ্ছে। আর কী বিশ্রী নাগরালি ঐ নায়কটার।

তন্ময় আবার ছুটির দরখাস্ত করল। এবার তার ছুটির হুকুম এলো সে প্যারিসে যাবার আয়োজন করে রাজকে জানাল। রাজ বলল, 'এখন কী করে সম্ভব? ওরা আমাকে ছাড়লে তো? আমি যে একটা চুক্তি সই করেছি।'

চুক্তির খেলাপ করলে কিছু টাকা ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। তন্ময় রাজী ছিল ও টাকা দিতে। কিন্তু রাজ বলল, 'প্রশ্নটা টাকার নয়। দেশের লোক চায় আমাকে দেখতে। রূপ যদি ভগবান আমাকে দিয়ে থাকেন তবে আমার দেশবাসী তার থেকে বঞ্চিত হবে কেন? লোকে যখন তোমার টেনিস খেলা দেখতে চায় তখন তুমি কি পাহাড়ে চলে যাবার কথা ভাবতে পারো?'

বেচারার ছুটি নেওয়া হলো না। যথাকালে নতুন ফিল্ম দেখতে হলো। সেই নায়কটাই যেন মৌরসী পাট্টা নিয়েছে যেখানেই বসন্তমঞ্জরী সেখানেই কিষণচন্দর। তন্ময় শুনতে পেলো এটা যে কেবল স্টুডিওতে তাই নয়। হোটেলে রেসকোর্সে ক্লাবে। পার্টিতে। ওদের একসঙ্গে দেখতে দেখতে অপরিচিতরা ধরে নিয়েছে যে ওরা কেবল অভিনয় করে না। আর পরিচিতরা অবাক হয়ে ভাবছে তন্ময় কেন এতটা সহ্য করছে।

একদিন তন্ময়ের অনুযোগের উত্তরে রাজ বলল, 'ও আমার প্রোফেশনাল পার্টনার। তোমার যেমন টেনিস পার্টনার মিস উইলসন এতে দোষের কী আছে? আমাকে তোমার যদি এতই সন্দেহ তুমিও একটি মিসট্রেস নিলে পারো। আমি কিছু মনে করব না।'

শক্ পেয়ে স্তম্ভিত হলো তন্ময়। অনেকক্ষণ পরে বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়ে বলল, 'যে উত্তমা নায়িকার স্বাদ পেয়েছে সে কি অপরা নায়িকা আস্বাদন করতে পারে।'

সুজন ও কলাবতী

সুজনের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে তার পরমায়ু বেশি দিন নয়। যে ক'দিন বাঁচবে সে ক'দিন কলাবতীর অন্বেষণে কাটাবে। অন্বেষণ কিন্তু মিলনের অন্বেষণ নয়। বকুলের সঙ্গে মিলন কোনো দিন হবে না। কলাবতীর অন্বেষণ হচ্ছে কলাবিদ্যার অন্বেষণ, যে বিদ্যা অতি সাধারণ লেখককে অসাধারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তনীর অন্বেষণও বটে, যে নারী তারার মতো সুদূর, অথচ তারার মতো যার প্রভাব পড়ে জীবনের উপরে।

এর কিন্তু একটি প্রচ্ছন্ন শর্ত আছে। নিষ্ঠা রাখতে হবে কেবল কলাবিদ্যার প্রতি নয়, কলাবতীর প্রতিও। আর কাউকে বিয়ে করা চলবে না, আর কাউকে ভালোবাসা চলবে না। দ্বিচারিতা করলে অন্বেষণে ছেদ পড়বে। তারপর আর ক'টা দিনই বা সুজন বাঁচবে। কীই বা দিয়ে যাবে সাহিত্যে! স্বল্প যার পরমায়ু সে কি অমন করে আয়ুক্ষয় করতে পারে! বাবা যদি বুঝতেন তা হলে কি তার মতো দেশকাতুরে লোক দেশান্তরী হতো! তিনি অবুঝ বলেই না তাকে তার জীবনের পরিকল্পনা বদলাতে হলো। শান্ত শিষ্ট সুস্থির প্রকৃতির মানুষটি ধীরে সুস্থে কোঁচা তুলিয়ে কাছা ঝুলিয়ে ঢিলেঢালা জামা পরে থপ থপ করে কলকাতার রাস্তায় হাঁটত। আঁটসাট লাউঞ্জ স্যুট পরা ত্বরিতগতি করিৎকর্মা এ কোন পুরুষ তালে তালে পা তুলে পা ফেলে লণ্ডনের পথে ঘাটে চলেছে!

স্বপ্নবিলাসী বলে ভাবালু বলে তার বন্ধুরা তাকে খোঁচা দিত। 'ওঃ সুজন! ওকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। একটা টেলিগ্রাম কেমন করে পাঠাতে হয় তা ও জানে না।' এখন তাকে যেই দেখে সেই তারিফ করে জোগাড়ে বলে চটপটে বলে। দেশে থাকতে মিশনারীদের বাংলা রচনা ঘষামাজা করতে হয়েছিল কয়েক বার। তাঁদের একজন লণ্ডনে তাকে তাঁর ধর্মশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ পরিমার্জনের জন্যে দেন। সে তো কোনো রকম পারিশ্রমিক নেবে না। পাদ্রীসাহেব তাই তাকে চাকরি জুটিয়ে দিলেন সুপারিশ করে। বেতন এমন কিছু নয়, কিন্তু সুবাদ যথেষ্ট। সে বাংলার অধ্যাপক এই সুবাদে ব্যবসায়ী মহল থেকে অর্ডার পায় ইংরেজী বিজ্ঞাপন বাংলায় তর্জমার জন্যে। ওষুধের কৌটায় পথ্যের শিশিতে সুজনের কীর্তি তার দেশবাসীর গোচর হয়।

দু'চার জায়গায় ঘোরাঘুরির পর সুজন রাসেল স্কোয়ার অঞ্চলে গ্যারেট নেয়। রাত্রে শুতে আসে সেখানে। বাকী সময়টা বাইরে বাইরে কাটায়। বাইরেই খায়। খানাপিনায় তার বাছবিচার নেই। গোপালের মতো যা পায় তাই খায়। অথচ কী খুঁতখুঁতে ছিল

দেশে থাকতে। সারা দিন খেটে খুটে রোজ সন্ধ্যাবেলা থিয়েটারে হাজির হওয়া তার চাই। যেদিন থিয়েটারে যায় না সেদিন কনসার্টে যায়। যেদিন কনসার্টে যায় না সেদিন যায় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তৃতায়। লণ্ডনে বারো মাস ত্রিশ দিন এত রকম আকর্ষণ যে দেখে ক্লান্তি আসে না। শুনে শ্রান্তি আসে না। নিত্য নূতনের নেশায় মশগুল থাকে সুজন।

কেবল রবিবারটা বাদে। সেদিন সে রাতকাপড়ের উপর ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে আগুন পোহাতে পোহাতে দেশের চিঠি কাগজ পড়ে আর দেশের লোকের জন্যে প্রবন্ধ লেখে। তার ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়ে যায় বুড়ী ল্যাণ্ডলেডী মিসেস কনোলী। বিকেলের দিকে সুজন তার সেরা পোশাক গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সামাজিকতা করতে। যার জন্যে সময় পায়নি সপ্তাহের অন্য কোনো দিন। কয়েকটি বিশিষ্ট বাঙালী পরিবারে তার বাঁধা নিমন্ত্রণ। তাঁদের ওখানে গেলে এক ঝাঁক বাঙালী যুবক যুবতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। মনে হয় বাংলাদেশে ফিরে গেছি বিদেশী বেশবাসে। কথাবার্তা গল্প-গুজব সব কিছু বাংলায়। বাংলা গান বাংলা সুর। বাংলা খাবার। বাঙালীর রান্না।

মুখচোরা মানুষ। আলাপ করতে তার লজ্জাবতী লতার মতো সঙ্কোচ। এমন যে সুজন বিদেশে তার হঠাৎ মুখ খুলে যায়। অপরিচিতকে—অপরিচিতাকেও—হাত বাড়িয়ে দিয়ে শুধায়, 'এই যে। কেমন আছেন?' সাহিত্যিক বলে তার নাম অনেকে জানত। যারা জানত না তারাও অনুমান করত তার চেহারা ও কথাবার্তা থেকে। থিয়েটার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর রাখত বলে সহজেই তার চার দিকে ভিড় জমত। যেসব থিয়েটার পাবলিকের জন্যে নয়, যেখানে যেতে হলে মেম্বর হতে হয় বা মেম্বরের অতিথি হতে হয় সেখানেও তার গতিবিধি। কেবল অভিনয়ে নয়, মহড়ায়। সেসব গল্প শুনতে কার না আগ্রহ। কাজেই সুজনের আসাটা আরো অনেকের আসার কারণ ছিল। গৃহকর্ত্রীরা এটা জানতেন। কিন্তু রবিবার ভিন্ন আর কোনো দিন তার সময় হতো না। সেদিন পালা করে সে বিভিন্ন পরিবারে নিমন্ত্রণরক্ষা করত।

যা হয়ে থাকে। তরুণীরা তাকে একটু বেশি রকম পছন্দ করতেন। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ যেমন সুলভ ছিল অন্তরঙ্গতা ছিল তেমনি দুর্লভ। দুর্লভ না বলে অসম্ভব বললেও চলে। তার জীবনের গল্প সে কাউকে বলত না। প্রশ্ন করলে পাশ কাটাত। নারী-সংক্রান্ত কোনো রকম দুর্বলতা কেউ তার আচরণে লক্ষ্য করেনি। সে সকলের সঙ্গে সমানে মেশে, কিন্তু কোনো মেয়ের সঙ্গে বিশেষ করে মেশে না। যদি কেউ তার কাছে বিশেষ পক্ষপাত আশা করে তবে নিরাশ হতে বেশি দিন লাগে না। তার দিক থেকে সৌজন্যের অভাব নেই। সে যে সুজন। তার সৌজন্য ওষ্ঠগত নয়। সহৃদয়। কিন্তু যতই সহৃদয় হোক, ওটা সৌজন্যই। সৌজন্যের অধিক নয়। ভালোবাসা অন্য জিনিস। তার

প্রথম কথা পক্ষপাত। একজনের প্রতি পক্ষপাত।

লণ্ডনের অফুরন্ত কর্মপ্রবাহে দিন কেমন করে সপ্তাহ হয়ে যায়, সপ্তাহ কেমন করে মাস, মাস কেমন করে বছর। সুজন ধ্যানের অবকাশ পায় না। তবু যখনি একটু অবসর পায় বকুলের ধ্যান করে। তার কলাবতীর। তার একমাত্র নারীর। যে নারী বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্বেও ছিল, বিশ্বপ্রলয়ের পরেও থাকবে। যে নারীর স্থিতি দেহনিরপেক্ষ। যে নারী গৃহিণী হয়েও গৃহিণী নয়, জননী হয়েও জননী নয়। যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, বিশুদ্ধ জ্যোতি, তারায় তারায় দীপ্যমান। অন্ধকার যাকে আরো উজ্জ্বল করে ফোটায়। বিরহ যাকে আরো নিকট করে। বিরহের সাধনায় করতে হয় যার অন্বেষণ, মিলনের স্বপ্নে নয়।

সুজন মিলনের স্বপ্ন দেখে না। এ জন্মের মতো যা হবার হয়ে গেছে। ক'টা দিনেরই বা জীবন! দেখতে দেখতে সাঙ্গ হবে। বিরহেই কেটে যাবে দিন। বিরহেই ভরে উঠবে হৃদয়। উপচে পড়বে কবিতা। রচা হবে নব মেঘদূত। নতুন ডিভাইন কমেডি। মানবের মধুরতর গানগুলি মিলন থেকে আসেনি, এসেছে বিরহ থেকে। এই যে সুজন প্রেরণা পাচ্ছে লিখতে, সাত দিনে একদিন যদিও, এ কি মিলন থেকে না বিরহ থেকে? মিলন তাকে মূক করত মাধুর্যে, মূঢ় করত বিস্ময়ে। যার চার দিকে অন্ধকার নেই সেই সূর্যের দিকে তাকালে সে অন্ধ হয়ে যেত আনন্দে। এই সন্ধ্যাতারা তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করছে না, সে অপরের দিকে তাকাতে পারছে, আর দশ জন মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারছে, সৌজন্যের পাত্রী পেয়ে সুজন হতে পারছে। এই ভালো, এই ভালো।

দেশে তার লেখার আদর বাড়ছিল। বিদেশে যদিও লেখক বলে কেউ চিনত না তবু গোটা দুই লিটল থিয়েটারের অভিনয়ে মহড়ায় আড্ডায় হাজিরা দিতে দিতে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারে সে একজন নাট্যসমালোচক হয়ে উঠেছিল। অভিনেতা অভিনেত্রীরাও তার অভিমত জানতে চাইতেন। তার অভিমতকে যথেষ্ট ওজন দিতেন। জলহাওয়ার গুণে ওদিকে তার ওজনও বাড়ছিল বেশ। দেখে মনে হতো লোকটা কেবল সমজদার নয়, ওজনদারও বটে।

মনের অতলেও তার পরিবর্তন হচ্ছিল। এত গভীরে যে সে নিজে টের পাচ্ছিল কি না সন্দেহ। কলাবতীর প্রতি একনিষ্ঠতা, বকুলের প্রতি একনিষ্ঠতা তার মূলমন্ত্র কিন্তু একনিষ্ঠতা বলতে কাল যা বোঝাত আজও কি তাই বোঝায়? আজ যা বোঝায় কালও কি তাই বোঝাবে? সুজনের একনিষ্ঠতার ব্যাখ্যা বদলে যাচ্ছিল। এই যে এতগুলি মেয়ে এসেছে তার জীবনে এরা দু'দিন পরে এসেছে বলে কি এদের কারো সঙ্গে কোনো রকম সম্বন্ধ পাতানো যায় না? কেবল মেলামেশা পর্যন্ত দৌড়? সে গণ্ডী অতিক্রম করলে একনিষ্ঠতার মর্যাদা থাকে না?

সুজনের সঙ্গে যাদের পরিচয় তাদের মধ্যে তিনজনের সঙ্গে তার মেলামেশা ক্রমে

মন জানাজানির পর্যায়ে পৌঁছল। মন দেওয়া নেওয়া নয় কিন্তু। তার বেলা সুজন অতি সজাগ। ঊর্মিলা তাকে সোজাসুজি সুজন বলে ডাকত। বরাবর ইংলণ্ডে মানুষ হয়েছে। বাঙালীর মেয়েদের মতো দূরত্ব বজায় রেখে চলতে জানে না। সিলভিয়া তাকে আরো ছোট করে জন বলে ডাকে। সেও বলে সিল্‌ভি। ইংরেজের মেয়ে, কিন্তু বাংলাদেশে জন্ম। বেশ বাংলা বলে। অনেকটা বাঙালীর মেয়ের মতো হাবভাব। এরা দু'জনে কুমারী। আর ম্যাদলীন বিবাহিতা। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে থিয়েটারে দেখা হতো। ফরাসী মহিলা, বয়সে বড। ভদ্রতা করে সুজন তাঁকে তাঁর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিত ফেরবার পথে। তাঁর স্বামী দরজা খুলে দিতেন। তাঁর সঙ্গে এক পেয়ালা কালো কফি না খেলে তিনি ছাড়তেন না। তাঁর ধনুর্ভঙ্গ পণ তিনি ইংরেজী বুলি বলবেন না, আর কেউ বললে বুঝবেন না। অগত্যা সুজনকে ফরাসী শিখতে হয়।

ঊর্মিলা সিল্‌ভি ম্যাদলীন এদের কাছে তার জীবনকাহিনী অজানা ছিল না। তার কাছে এদের। যে অন্তরঙ্গতা সুজন অন্যের বেলা এড়াতে পেরেছে তা এদের বেলা পারেনি। এইটুকু বিশেষত্ব। এরা তার বন্ধু। যেমন বন্ধু কান্তি, তন্ময়, অনুত্তম। ছেলেদের সঙ্গে ছেলেদের বন্ধু সম্বন্ধ যেমন, ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের বন্ধু সম্বন্ধ তেমনি। এটা নর-নারী সম্বন্ধ নয়। সুতরাং একনিষ্ঠতার আদর্শে বাধে না। বকুল জানলে কিছু মনে করত না। করলে ভুল করত। সুজন বকুলকে চিঠিপত্র লেখে না, নয়তো নিজেই তাকে জানাত। বকুল ভিন্ন আর কোনো মেয়ের সঙ্গে তার আর কোনো রকম সম্বন্ধ থাকবে না, থাকলে একনিষ্ঠতায় চিড ধরবে, এটা স্বীকার করে নিতে তার আপত্তি ছিল। বরং তলিয়ে দেখলে এইটেই তার কুমার জীবনকে সহনীয় করেছে। এক দিকে যেমন বকুলের প্রতি আনুগত্য তাকে অক্ষত রেখেছে আর এক দিকে তেমনি ঊর্মিলা সিল্‌ভি ম্যাদলীনের সঙ্গে সৌহার্দ্য তাকে অক্ষত থাকতে সাহায্য করেছে। নইলে তার নিঃসঙ্গ জীবন দুর্বহ হতো। তার অন্বেষণে অবসাদ আসত। ভালোবাসা এ নয়। কারণ এতে মন দেওয়া নেওয়া নেই। সুজন একনিষ্ঠই রয়েছে।

তিন বছর পরে সে ডকটরেট পেলো। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির তুলনা করে সে একটি থীসিস লিখেছিল। সেটি প্রকাশ করতে আরো বছর খানেক লেগে গেল। এর পরে তার দেশে ফেরার কথা। দেশের জন্যে তার মন কেমন করছিল সেই প্রথম বছর থেকে। তার মতো দেশকাতুরে লোক যে এতদিন ধৈর্য ধরতে পেরেছে এই যথেষ্ট। ফিরে যাবার জন্যে প্যাসেজ কিনবে এমন সময় একখানা চিঠি এলো। লিখেছেন একজন হবু শ্বশুর। চিঠির সঙ্গে একখানি ফোটো ছিল। হবুমতীর। তার সঙ্গে ছিল কয়েক ছত্র উপদেশামৃত। ওটুকু সুজনের পিতার। ব্রহ্মচর্যের পরের ধাপ গার্হস্থ্য। বিবাহ না করে গৃহস্থ হওয়া যায় না। বিবাহকাল সমুপস্থিত। এখন কেবল দেখতে হবে উপযুক্ত কন্যা।

সহধর্মিণী কে ? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো আমি উত্তর দেব—হনুমতী। এমন কনে কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

কাজেই সুজনের দেশে ফেরা হলো না। লণ্ডন ছাড়ল সে ঠিকই। কিন্তু কলকাতার জন্যে নয়। নাটকের নেশা তখন তাকে পেয়ে বসেছে। চলল প্যারিসে। ইতিমধ্যে ফরাসী ভাষাটা তার উত্তম রূপে আয়ত্ত হয়েছিল। চাকরি জুটে গেল এক আমদানি রপ্তানির কারবারে। ইংরেজী থেকে ফরাসীতে, ফরাসী থেকে ইংরেজীতে দলিলপত্র ভাষান্তর করতে হয়। সাধারণ অনুবাদকের চেয়ে আর একটু বেশি দায়িত্বজ্ঞান দরকার। দেশে থাকতে সুজন আইন পড়েছিল। সেটা কাজে লাগল। মাইনে মন্দ দেয় না। **Place de la Republique** অঞ্চলে হোটেলে থাকা পোষায়। ফরাসী প্রযোজকদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজী জানতেন তাঁরা তার মুদ্রিত থীসিস উপহার পেয়ে তাকে ঢালা অনুমতি দিলেন। মঞ্চের আড়ালে তার অবাধ প্রবেশ। তার মন্তব্য শুনতে তাঁদের প্রচুর আগ্রহ।

লঙ্কায় গেলে নাকি রাবণ হয়। তা হলে লণ্ডনে গেলে হয় চটপটে জোগাড়ে ফিটফাট ছিমছাম। আর প্যারিসে গেলে ? প্যারিসে গেলে হয় রুচিমান চতুর বাক্‌পটু দিলখোলা। যাই বলো ইংরেজরা এখনো পিউরিটান প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। রঙ্গালয়েও না। ফরাসীদের ও বালাই নেই। খোলাখুলি আবহাওয়ায় সুজন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভণ্ডামির মুখোশ আঁটতে হলো না। বছরের পর বছর কাটে। দেশে ফেরার নাম করে না। দেশ থেকে অনুরোধ এলে লিখত, যেখানে দানাপানি সেখানে বীণাপাণি এখানে যতদিন চাকরি আছে ততদিন শিল্পসৃষ্টিও আছে। দেশে গেলে তো বেকার হতে হবে। কিংবা দরবার করতে হবে যত সব হঠাৎ নবাবের হঠাৎ মোড়লের কাছে। শিল্পসৃষ্টি শিকেয় তোলা থাকবে। আসল কথা বিয়ে করতে তার একটুও স্পৃহা ছিল না। বুড়ো বাপ বেঁচে আছেন শুধু ওইটুকুর জন্যে। কিন্তু কী করে তাঁকে বাধিত করা যায় ? একজনকে বিয়ে করবে, আর একজনের প্রতি অনুগত থাকবে, সার্কাসে দড়ির উপর দিয়ে হাঁটার চেয়েও এটা শক্ত। সুজনের বিচারে এটা দ্বিচারিতা, রাধার বিচারে যাই হোক।

এখনো কি সে বকুলের ধ্যান করে ? বকুলের মুখখানি মনে পড়ে তার ? তেমনি ভালোবাসে ? হাঁ, এখনো। বকুলকে আড়াল করেনি আর কারো মুখ। তবু তলে তলে পরিবর্তন চলছিল। একনিষ্ঠতার ব্যাখ্যা লণ্ডনে যেমন ছিল প্যারিসে তেমন ছিল না। মন জানাজানি থেকে মন দেওয়া নেওয়ায় পৌঁছেছিল। দেহ ও মনের মাঝখানে স্পষ্ট একটা বেড়া আছে, সকলের চোখে পড়ে। যেখানে দেহের ব্যাপার সেখানে সুজন সব সময় সতর্ক। কিন্তু বন্ধুর ভালোবাসা ও প্রেমিকের ভালোবাসার মাঝখানে পরিষ্কার কোনো ভেদরেখা নেই। যতই সজাগ থাকো না কেন সীমানার ওপারে গিয়ে পড়া

একান্ত স্বাভাবিক ও সহজ। প্যারিসে এসে এই অভিজ্ঞতা হলো। শুরু হয় বন্ধুতা রূপে। বকুলের প্রতি একনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রেখে। কিন্তু এমন এক সময় এলো যখন সুজন বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করল যে বন্ধুতার রাজ্য পিছনে পড়ে আছে, পায়ের তলায় প্রেমের রাজ্যের মাটি। মেয়েটির নাম সোনিয়া। হোয়াইট রাশিয়ান। অনেক দুঃখ পাওয়া অনেক পোড় খাওয়া বিদগ্ধ কলাবিৎ। বেহালা বাজিয়ে বেড়ায়। লণ্ডনে সুজন তার রিসাইটালে যেত। তখন আলাপ হয়নি। পরে আলাপ হলো প্যারিসে।

সোনিয়ার বিয়ে ভেঙে গেছে। সে আর বিয়ে করবে না। বিয়েকে তার ভয়। সুজনও বিয়ে করতে চায় না। বকুলের প্রতি দ্বিচারিতাকে তার ভয়। একনিষ্ঠতার আদর্শ এই এক জায়গায় অটল ছিল। কিন্তু সুজন যখন ধ্যান করতে বসে বকুলের রূপ ক্রমে সোনিয়ার রূপ হয়ে দাঁড়ায়। বিষণ্ণ বিদগ্ধ অনিকেত অনাথ সোনিয়া। দুনিয়ায় আপন বলতে কেউ তার নেই। ঘর নেই, দেশ নেই, ধন নেই, সঞ্চয় নেই। আছে ঐ বেহালাটি। আর আছে প্রতিভা। যেখানে যখন ডাক পড়ে সেখানে তখন যায়। সুজনকে বলে যায়, আবার দেখা হবে। সুজন বসে থাকে পথ চেয়ে। বিরহ বোধ করে। এ বিরহ বকুলের জন্যে নয়। এ বিরহে মিলনবাসনা মেশানো। মিলন অবশ্য চোখে দেখা, কাছে থাকা, হাতে হাত ধরা, দৈবাৎ ঠোঁটে ঠোঁটে ছোঁয়ানো। এও কি দ্বিচারিতা? সুজনের মন বলে, না। দ্বিচারিতা নয়। বরং তলিয়ে দেখলে এরই দ্বারা দ্বিচারিতা নিবারিত হচ্ছে। নয়তো তার কুমারজীবন অসহন হতো। বকুল এর কী বুঝবে! তার তো এ সমস্যা নেই। তবু তাকে বুঝিয়ে বললে সে বুঝত। কিন্তু বোঝাবে কী করে? চিঠি লেখালেখি নেই। শুধু বড়দিনের সময় কার্ড পাঠায়, কার্ড পায়। তাতে দু'এক ছত্র হাতের লেখা জুড়ে দেয় দু'জনেই।

দেহের সঙ্গে মনের সেই যে সুস্পষ্ট ব্যবধান সেটাও ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এলো। কোথায় দাঁড়ি টানবে? কী করে থামবে! সুজন বুঝতে পারল এবার যা আসছে তা বিয়ে নয়, তবু বিয়ের থেকে অভিন্ন। তার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা পালানো। তাকে প্যারিস ত্যাগ করতে হবে। তার মানে সোনিয়াকে ত্যাগ। বেচারি সোনিয়া! তার জীবনটা ত্যাগে ত্যাগে জর্জর। যেই তাকে ভালোবেসেছে সেই তাকে ত্যাগ করেছে। সুজনও এর ব্যতিক্রম নয়। ভাবতে সুজনের ব্যথা লাগে।

হাঁ, আছে বটে আর একটা উপায়। বাসনা কামনাকে বশ করা। ইন্দ্রিয়ের রাশ টেনে ধরা। দেহের প্রতি নির্মম হওয়া। সোনিয়া যখন ঠোঁট বাড়িয়ে দেবে সুজন তখন ঠোঁট বাড়িয়ে দেবে না, সুজন ঠোঁট সরিয়ে নেবে। খেলার ছলে নয়, সত্যি সত্যি। ত্যাগ না করার একমাত্র শর্ত ভোগ না করা। ভোগ করতে গেলেই ত্যাগ করতে হবে। এ বড় নিষ্ঠুর ন্যায়শাস্ত্র। সোনিয়া সব কথা শুনে বলল, 'বেশ, তাই হোক। তোমার শর্তে

আমি রাজী। তুমি যেয়ো না।' সুজন বেঁচে গেল। তাকে প্যারিস থেকে পালাতে হলো না। সোনিয়াকে ত্যাগ করার গ্লানি বহন করতে হলো না। কিন্তু নিত্য নিত্য সংগ্রাম করতে হলো নিজের বাসনাকামনার সঙ্গে। তার চেহারা বিশ্রী হয়ে গেল। মাথায় টাক পড়ল। ভুঁড়ি ফাঁপতে লাগল। আয়নায় নিজের মূর্তি দেখে সে আঁতকে উঠল। ওদিকে সোনিয়ার তেমন কোনো রূপান্তর ঘটল না কিন্তু।

দীর্ঘকাল ইউরোপে বাস করে সুজনের জীবনের প্রত্যাশা দীর্ঘতর হয়েছিল। বিয়ে যদি তাকে কোনো দিন করতে হয় তবে তত দিনে তার আকার ও আকৃতি হোঁদল-কুৎকুতের মতো হয়ে থাকবে বলে তার ভয়। কলাবতীর অন্বেষণ তাকে সুন্দর না করে অসুন্দর করবে এই বা কেমন কথা। চির সৌন্দর্যের ধ্যান থেকে আসবে চরম কুরূপ। কোথায় তা হলে সে ভুল করেছে? সাধনার কোন পদক্ষেপে? প্রকৃতি এ ভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে কেন? সুজন ভাবে আর ভাবে। হঠাৎ তার মনে হয় একনিষ্ঠতাকে সে একটা ফেটিশ করে তুলেছে বলে তার এই দশা। যেখানে প্রেম সর্বদা সক্রিয় সেখানে একনিষ্ঠতা আপনাআপনি আসে। বকুলের প্রতি তার প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো এখনো বিদ্যমান, কিন্তু বহতা নদীর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। একনিষ্ঠতা এ ক্ষেত্রে নিজেকে বঞ্চিত করা। প্রকৃতি কেন ক্ষমা করবে?

এমন সময় দেশ থেকে চিঠি এলো সুজনের বাবার শক্ত অসুখ বোধ হয় বেশি দিন বাঁচবেন না। ছেলেকে তিনি দেখতে চান। সোজা বাংলায়—যাবার আগে ছেলের বৌ দেখে যেতে চান। এবার সুজন বেঁকে বসল না। বরং এক প্রকার স্বস্তি বোধ করল। বিয়ে যদি হয় তবে মরণাপন্ন পিতার অন্তিম ইচ্ছায় হোক। তার নিজের ইচ্ছায় নয়। তার নিজের ইচ্ছা যে কী তাই সে জানে না ও বোঝে না। পরমায়ু যদি প্রকৃতই দীর্ঘ হয়ে থাকে তবে বকুলের প্রতি একনিষ্ঠতার খাতিরে সোনিয়ার প্রেম প্রত্যাখ্যান করেও অনবরত তাকে অন্তর্দ্বন্দ্ব চালিয়ে যেতে হবে অবশিষ্ট জীবন। হ্রস্ব পরমায়ু ছিল ভালো। তার যখন কোনো লক্ষণ নেই তখন পরাজয় বরণ না করে উপায় কী। কিন্তু তার আগে এক বার বকুলের সঙ্গে দেখা হলে ভালো হয়। কলম্বো হয়ে দেশে ফিরবে সুজন। যদি দেখে বকুল সুখে আছে তা হলে সে তার বুড়ো বাপকে শেষ ক'টা দিন সুখী করবে। আর যদি লক্ষ্য করে বকুলের মনে সুখ নেই তবে কোন প্রাণে সে নিজের সুখ বা তার পিতার সুখ খুঁজবে। না, তেমন হৃদয়হীন সে নয়। কোনো দিন হবেও না। বকুল যদি অসুখী হয়ে থাকে তবে তার জন্যেই হয়েছে, তারই কথা ভেবে। অসুখীকে আরো অসুখী করবে কে? সুজন? প্রাণ গেলেও না। প্রাণ থাকতে তো নয়ই!

সোনিয়ার কাছ থেকে চোখের জলে বিদায় নিয়ে কলম্বোগামী জাহাজে চড়ে বসল সুজন। সে কাউকে বঞ্চনা করেনি। নিজেকেই বঞ্চিত করেছে। কেউ যেন তার উপর

অভিমান পুষে না রাখে। সোনিয়া যেন না ভাবে সুজন তাকে ত্যাগ করেছে। সুখী হোক, সার্থক হোক সোনিয়া। এমন কেউ আসুক তার জীবনে যে তার সাথী হবে অনন্ত কাল। বিদায়, প্রিয়ে। বিদায়, সোনিয়া।

কলম্বোয় মোহিত তাকে নিতে এসেছিল জাহাজ থেকে বাড়ীতে। বকুল আসতে পারেনি কোলের ছেলে ফেলে। মোহিত তাকে পুরোনো বন্ধুর মতো জড়িয়ে ধরল। বিজয়ী প্রতিযোগীর মতো নয়। বকুল তার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। শুকতারার মতো উজ্জ্বল তার চোখ। প্রজ্ঞাপারমিতার মতো ভাস্বর তার মুখ। মা হয়ে বকুল আরো সুন্দর হয়েছে। যেটুকু বাকী ছিল তার সৌন্দর্যের সেটুকু ভরে গেছে। ভরন্ত গড়ন। রাজরানীর মতো চলন। এই আট নয় বছরে বকুল বিকশিত হয়েছে শতদলের মতো। আর সুজন? সুজন হয়েছে ক্ষতবিক্ষত বঞ্চিত বিদগ্ধ।

মোহিত আর বকুল দু'জনের অনুরোধে সুজনকে থেকে যেতে হলো সিংহলে দিনের পর দিন, পিতার জন্যে উদ্বেগ নিয়ে। তার ভালো লাগছিল থাকতে। বকুলকে তার জীবনের গল্প শোনাতে। তার ভবিষ্যতের কল্পনা জানাতে। কোনো কথা সে গোপন করল না, হাতে রাখল না। বকুলের জন্যে সে নিজের সুখ বিসর্জন দেবে যদি নিশ্চিত বুঝতে পারে যে বকুল এ বিবাহে সুখী হয়নি। নয়তো একজন সুখী হবে, আরেক জন অসুখী হবে, একেই কি বলে একনিষ্ঠতা? সুজন আশা করেছিল বকুল তার কাছে মন খুলবে। কোনো কথা গোপন করবে না, লুকিয়ে রাখবে না। তা কি হয়। বকুলের স্বামী আছে, স্বামীর ঘরে বসে কেমন করে স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা খুলে বলবে সে পরপুরুষকে!

বকুল বলল, 'আমি সুখী হয়েছি। এবার তুমি সুখী হলেই আমার আফসোস যায়। বিয়ে কোরো, সুজিদা। ভুলে যেয়ো আমাকে। ফরগেট মি, প্লীজ।'

অনুত্তম ও পদ্মাবতী

রওশন তার বোরখা খুলে ফেলেছিল। অন্ধকার রাত। ঘোড়ার গাড়ী। এক রাশ কালো চুল অনুত্তমের গায়ে এসে পড়ছিল। আহা! শিয়ালদা থেকে শ্যামবাজার যদি লক্ষ যোজন দূর হতো, যদি সহস্র বর্ষের পথ হতো।

দু'রাত দু'দিন তাদের চোখে পলক পড়েনি। কেবল কি পুলিশের ভয়ে, গোয়েন্দার ভয়ে? না পুনর্দর্শনের আশা নেই বলে? একজন আরেক জনের গায়ে ঢুলে পড়ছিল।

কেবল কি ঘুমের ঘোরে? না বিচ্ছেদ আসন্ন বলে? কেউ কারুর নামটা পর্যন্ত জানে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের সহযাত্রা শেষ হয়ে যাবে। শেষ যদি হয় তবে হোক না একটু দেরিতে। সেইজন্যে ওরা ট্যাক্‌সি নেয়নি।

বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে রওশন বলল, 'কাল আসবেন?'

অনুত্তম চিত্তচাঞ্চল্য দমন করে বলল, 'কখন?'

'দুপুরের দিকে। রওশন বললে কেউ চিনবে না। আমার নাম নয়নিকা।'

'নয়নিকা? কী মধুর নাম!'

'আপনার নাম যদি কেউ জানতে চায় তা হলে কী বলবেন?'

'অনুত্তম।'

'অনুত্তম! মনে রাখবার মতো নাম। মনে রাখবও।'

'আমিও কি ভুলব নাকি? নয়নিকা আমার নয়নে থাকবে। ধ্যাননেত্রে।'

'আবার তা হলে দেখা হবে?'

'নিশ্চয়। নিশ্চয় দেখা হবে।'

ঘোষ লেনের মোড়ে নয়নিকা নেমে গেল। অনুত্তম শুধু ঘোড়ার গাড়ীর দরজাটা খুলে ধরল। হিন্দু পাড়ায় মৌলবীর সাজ পরে নামতে তার সাহস ছিল না অত রাত্রে। বিশেষত নারী নিয়ে। ইচ্ছা থাকলেও নয়নিকা তেমন অনুরোধ করল না। বরং বোরখাটা ফেলে গেল গাড়ীতে।

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতালায় অনুত্তমের পুরোনো আস্তানা। বন্ধুদের অনেকের জেল হয়ে গেছে। যে দু'এক জন ছিল তাকে আশ্রয় দিল। ওদিকে কিন্তু গাড়োয়ান গিয়ে পুলিশের কানে তুলল যে চট্টগ্রাম মেল থেকে শিয়ালদায় নেমেছেন এক মৌলবী সাহেব ও তাঁর বিবি সাহেবা। বিবি উতরে গেলেন শ্যামবাজারের হিন্দু পাড়ায়, মৌলবী তশরিফ নিয়েছেন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতালায়।

রাত তখনো পোহায়নি, অনুত্তম সুখস্বপ্ন দেখছে, এমন সময় হানা দিল পুলিশ। বেচারার পরণে তখনো মৌলবীর পোশাক। বদলাবার অবকাশ পায়নি, কোনো মতে চারটি মুখে দিয়ে বিছানা নিয়েছে। হাতে নাতে ধরা পড়ে কবুল করতে বাধ্য হলো যে সে মুসলমান নয়, হিন্দু। নইলে ওরা হয়তো মুসলমানির লক্ষণ মিলিয়ে দেখত।

তার পর কলেজ স্ট্রীট থেকে লালবাজার। লালবাজার থেকে হরিণবাড়ী। হরিণবাড়ী থেকে বহরমপুর। বহরমপুর থেকে রাজশাহী। অদৃষ্ট পুরুষ তাকে নিয়ে পাশা খেলছিলেন। এক একটা দান পড়ে আর ঘুঁটি এগিয়ে চলে দু'ঘর চার ঘর। পৌঁছিয়েও যায়। একটা বড় দান পড়ল, দশ দুই বারো। রাজশাহী থেকে দেউলি। সে দান উলটে গেল। দেউলি থেকে রাজশাহী। এর পরে রাজশাহী থেকে বক্‌সা। বক্‌সা থেকে

আবার রাজশাহী। অবশেষে অন্তরীন।

অন্তরীন হয়ে তানোর, মান্দা, বদলগাছি, নন্দীগ্রাম, সিংড়া, লালপুর, চারঘাট এমনি সাত ঘাটের জল খেয়ে সে সত্যি সত্যি ছাড়া পেলো। কিন্তু ছাড়া পেলেও ছাড়ন নেই। টিকটিকি সঙ্গ নেয় যখনি যেখানে যায়। তবে বাংলাদেশের বাইরে গেলে রেহাই। সুভাষচন্দ্র তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্ণধার। তিনি রাষ্ট্রপতি হয়ে অনুত্তমকে পাঠালেন বাংলার বাইরে কূটনৈতিক কাজে। ডিপ্লোম্যাট হয়ে লোকটার চেহারা ও চালচলন গেল বদলে।

সাত বছর ধরে সে দুটি নারীর ধ্যান করেছে শয়নে স্বপনে জাগরণে। ভারতমাতা, যাঁর জপমন্ত্র বন্দে মাতরম্। পদ্মাবতী, যার তপোমন্ত্র বন্দে প্রিয়াম্। দু'জনের জন্যেই তার দুর্ভোগ। শুধু একজনের জন্যে নয়। তাই দু'জনের ধ্যানে তার দুর্ভোগ মধুর। হাঁ, আনন্দ আছে মায়ের জন্যে দুঃখ সয়ে, প্রিয়ার জন্যে দুঃখ পেয়ে। আরো তো কত রাজবন্দী সে দেখল। তাদের আনন্দ তার মতো ষোলো আনা নয়। ষোলো কলা নয়। তার আছে নয়নিকা, তাদের কে আছে?

'অনুত্তম? মনে রাখবার মতো নাম। মনে রাখবও।' বলেছিল তার নয়নিকা। একটি মেয়ে তাকে মনে রাখবে বলে কথা দিয়েছে। মনে রেখেছে নিশ্চয়। এইখানে তার জিৎ। তার সাথীদের উপরে জিৎ। তারা নিছক রাজবন্দী। সে রাজপুত্র। রাজকন্যা তাকে মনে রেখেছে। তার সাথীদের দিকে তাকায়, আর অনুকম্পায় ভরে ওঠে তার মন।

ছাড়া পেয়ে তার প্রথম কাজ হলো সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। দ্বিতীয় কাজ নয়নিকার অন্বেষণ। খোঁজ নিয়ে যা শুনল তার চেয়ে শক্তিশেল ছিল ভালো। নয়নিকার বিয়ে হয়ে গেছে। সে যে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে তা নয়। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে গিয়ে এত লোককে বিপদ্‌গ্রস্ত করে যে পার্টির কর্তারা প্রাণের দায়ে তার বিয়ের ফতোয়া দেন। পার্টির আদেশ লঙ্ঘন করলে সাজা আছে। অগত্যা বিয়ে করতে হয়। এক বিলেতফের্তা ডেন্‌টিস্ট তাকে বিনা পণে উদ্ধার করেন। তার গুরুজন তো বর্তে যান। পুলিশের দাপটে তাঁদের স্বস্তি ছিল না।

হায় কন্যা পদ্মাবতী! এই ছিল তোমার মনে! অনুত্তম বুকের ব্যথায় আকুলি বিকুলি করে। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। হলে যাকে দেখব সে তো আমার পদ্মাবতী নয়! আমার মতো হতভাগ্য কে! যাদের আমি অনুকম্পা করেছি তারা একে একে বিয়ে করছে, কর্পোরেশনে কাজ পাচ্ছে. আমিই তাদের অনুকম্পার পাত্র। তোমাকেই বা দোষ দিই কী করে! পার্টির আদেশ। গুরুজনের নির্বন্ধ। ক'জন পারে অগ্রাহ্য করতে!

অনুত্তম ভেবে দেখল, সে নিজেও যে বিয়ে করতে চেয়েছিল তা নয়। দেশ যত দিন না স্বাধীনতা পেয়েছে বিয়ে করার স্বাধীনতা তার নেই। তা বলে কি নয়নিকা তত দিন অপেক্ষা করত? বাংলাদেশের কুমারী মেয়ে বাপ মা'র অমতে ক'দিন একলা থাকবে? কে তাকে পুষবে যদি তাঁরা না পারেন? তাঁরা যদি তত দিন বেঁচে না থাকেন? নয়নিকা যা করেছে ঠিকই করেছে। সে এখন পরস্ত্রী। তার দিকে তাকাবার অধিকার অনুত্তমের আর নেই। এমন কি প্রেরণার জন্যেও না।

এইখানে সুজনের সঙ্গে তার তফাৎ। বম্বেতে সেদিন সুজনের সঙ্গে আবার দেখা হয়। কান্তিকে জাহাজে তুলে দিতে গিয়ে। দুই বন্ধুতে এ নিয়ে বোঝাপড়ার দরকার ছিল। হলো ফেরবার পথে। নয়নিকার বিয়ে হয়ে গেছে জানলে অনুত্তম তার ধ্যান করত না সাত বছর, যা করেছে তা ভুল ধারণা থেকে করেছে। বকুলের বিয়ে হয়ে গেছে জেনেও সুজন তার ধ্যান করেছে দশ বছর। দেশে থাকতে ও দেশের বাইরে। যা করেছে তা ঠিক ধারণা থেকে করেছে। দু'জনের বোঝাপড়া হলো, কিন্তু বনিবনা হলো না। সুজন কলকাতা চলে গেল, অনুত্তম থামল ওয়ার্ধায়।

ও দিকে বল্লভভাইয়ের সঙ্গে বনিবনা হয়নি, গান্ধীর সঙ্গেও হলো না। ব্যর্থ, ব্যর্থ, সব ব্যর্থ। তাঁদের অমতে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হলেন, কিন্তু তাঁদের সহযোগিতা পেলেন না। ইস্তফা দিলেন। তারপরে যেসব কেলেঙ্কারি ঘটল তাতে অনুত্তমের মন উঠে গেল দু'পক্ষের উপর থেকে। সে যোগ দিল কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলে। জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে। আর বাংলাদেশে ফিরল না। যুদ্ধের প্রথম দিকে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে, কিন্তু তার পরে দ্বিতীয় পদক্ষেপ নিতে গড়িমসি করে। ইতিমধ্যে জয়প্রকাশ ও অনুত্তম দু'জনেরই যুদ্ধবিরোধী ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়ে যায়। দু'জনেই গ্রেপ্তার হন।

জেলে তো আরো অনেক বার থেকেছে, কিন্তু এবারকার মতো অসহ্য বোধ হয়নি। এবার নিছক রাজবন্দী। এমন কোনো নারী নেই যে তাকে মনে রাখবে বলে কথা দিয়েছে, মনে রেখেছে। যে তার পদ্মাবতী। সে যার রাজপুত্র। হায় কন্যা পদ্মাবতী। কেমন করে তোমার ধ্যান করব।

ওদিকে কত বড় বড় ঘটনা ঘটছে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে। ধূমকেতুর পুচ্ছ লেগে ফ্রান্স পর্যন্ত টলে পড়েছে। ইংলণ্ড ক'দিন টাল সামলাবে। এর পরে আসছে রাশিয়ার পালা। সোভিয়েটের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে নাৎসী দানব। সোভিয়েট কি পাল্টা ঝাঁপ দেবে, না পিছু হটতে হটতে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে দানবকে তার গহ্বরে? আমেরিকা কী করবে? আর জাপান?

অনুত্তমের ভিতরে যে সৈনিক ছিল সে এক দণ্ড স্থির থাকতে পারছিল না। সে চায় যুদ্ধে যোগ দিতে। যোদ্ধা হতে। অস্ত্র ধরতে। অহিংসায় তার আস্থা ছিল না। ইতিহাসে

ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা চলছে অহিংস রণপদ্ধতির, এ বিশ্বাস তার অন্তর্হিত হয়েছিল। দুনিয়ার আর দশটা দেশের মতো হাতিয়ার হাতে যুদ্ধে নামতে হবে, মারতে হবে, মরতে হবে, এই হচ্ছে পুরুষার্থ। কিন্তু অধীনের মতো নয়। মিত্রের মতো। তা যদি না হয় তবে শত্রুর মতো।

সম্মানের সঙ্গে যা সে করতে পারে তা যুদ্ধে সহযোগিতা নয়, তা বিদ্রোহ, সশস্ত্র বিদ্রোহ। তা করতেই হবে। নইলে সে পুরুষ নয়। কেনই বা কোনো মেয়ে তাকে মনে রাখবে! আজকের বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো বসে থাকতে তার প্রবল অনিচ্ছা। জীবনটা কি কারাগারে কারাগারেই কেটে যাবে? অসহ্য! অসহ্য! অসম্ভব! খাঁচায় বন্ধ বাঘ যেমন খাঁচাটাকে ভেঙে চুরমার করতে পারলে বাঁচে, ভীষণ আক্রোশে গাঁক গাঁক করে গজরায় আর দারুণ নৈরাশ্যে গুমরায়, অনুত্তম তেমনি তার ইচ্ছাশক্তির ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায় জেলখানার দেয়াল, ক্ষেপে গিয়ে অনর্থ বাধায়, কাতর হয়ে মরার মতো পড়ে থাকে। কত বড় বড় ঘটনা ঘটছে বাইরে। সে কিনা সাক্ষীগোপাল।

জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনায় ভারতের নেতাদের সঙ্গে একটা মিটমাটের জন্যে ইংলণ্ড থেকে উড়ে এলেন ক্রিপ্‌স্। তার আগে নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁদের দলবলকেও। কিন্তু অনুত্তমদের নয়। সে আশা করেছিল ছাড়া পাবে। হতাশ হলো। হতাশা থেকে জাগল মরীয়াভাব। ওয়াপস যান ক্রিপ্‌স্। কে চায় আপস। আমরা চাই য়্যাকশন, আমরা চাই বিদ্রোহ। অনুত্তমের মনে হয়, এই হচ্ছে লগ্ন, বিদ্রোহের লগ্ন, বিপ্লবের লগ্ন। এমন লগ্ন ভ্রষ্ট হলে ভারত কোনো দিন স্বাধীন হবে না। এখনি, কিংবা কখনো নয়। বেঁচে থেকে হবে কী যদি এ জন্মে স্বাধীন ভারত দেখে যেতে না পারি!

মন পুড়ছিল। মনের আগুন লেগে দেহ পুড়ল। সিবিল সার্জন দেখে বললেন, সর্বনাশ। এ যে গ্যালপিং থাইসিস! একে হাসপাতালে সরানো উচিত। হাসপাতাল-গুলোতে তখন বর্মাফেরতের ভিড়। বেড খালি পেলে তো অনুত্তমকে সরাবে। অগত্যা খালাসের হুকুম হলো। অনুত্তম যা চেয়েছিল তাই। সে তার এক ডাক্তার বন্ধুর আমন্ত্রণে শোণ নদের ধারে তাঁর প্রতিবেশী হলো। শোণের হাওয়ায়, বন্ধুর যত্নে, বিপ্লবের প্রেরণায় অনুত্তমের দেহের আগুন নিবল। কিন্তু মনের আগুন?

ক্রিপ্‌স্ ততদিনে ওয়াপস গেছেন। আপস হয়নি। গান্ধীজী কী একটা করতে চান, কিন্তু জাপানী আক্রমণের মুখে ইংরেজের সঙ্গে লড়তে গেলে হিংসাপন্থীরা তার সুযোগ নেবে, তখন ইংরেজ বলবে এরা সকলে জাপানের পঞ্চম বাহিনী, বিশ্বময় বদনাম রটাবে, কুকুরকে বদনাম দিয়ে ফাঁসীতে লটকাবে। এই আশঙ্কায় তাঁর সহকর্মীরা ম্রিয়মাণ। তিনি কিন্তু বেপরোয়া। তিনি যদি নিষ্ক্রিয় থাকেন তা হলে কে জানে হয়তো বর্মায় যা

ঘটেছে ভারতেও তাই ঘটবে। মালিক বদল। পোড়ামাটি। কুরুক্ষেত্র। এর চেয়ে কিছু একটা করা ভালো। তাতে এমন কী ঝুঁকি! ইচ্ছা করলে বড়লাট তাঁকে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে পারেন।

প্রথমে জবাহরলাল তাঁর সঙ্গে একমত হলেন সাতদিন এক সঙ্গে থেকে। তার পরে আর সব নেতা। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গ্রহণ করল। গান্ধীজী লিনলিথগোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন, তার আগেই লিনলিথগো তাঁকে বন্দী করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সবাইকে। সংবাদ পেয়ে অনুত্তম মুহূর্তকাল কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হলো। তার পর বলল, 'নিষ্ক্রিয় আমরা থাকব না। জোর করে আমাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখবে এমন শক্তি কার আছে? চলো, একটা কিছু করি। নয়তো মরি।' তার ডাক্তার বন্ধু তার হাত চেপে ধরলেন, সে তাঁর হাত ছাড়িয়ে ছুটে চলল বাইরে।

কোন দিকে যাবে নিজেই জানত না। গেল যে দিকে দু' চোখ যায়। কে জানে কোনখান থেকে পেলো অমানুষিক তেজ। পায়ে হেঁটে পার হলো মাইলের পর মাইল। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই। নেই ব্যথাবোধ। দেখল হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ কাতারে কাতারে চলেছে। তারই মতো অবিকল। যেন বৃষ্টির জলের ঢল নেমেছে। ঢল দেখতে দেখতে স্রোত হলো। স্রোত দেখতে দেখতে নদী হলো। নদী দেখতে দেখতে সমুদ্র হলো। সমুদ্র গর্জে উঠল, 'রেল লাইন তোড় দো। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে।'

অনুত্তমকে কেউ সে অঞ্চলে চিনত না। কিন্তু বিপ্লবের দিন জনতা যেন রূপকথার রাজহস্তী। কী জানি কী দেখে চিনতে পারে, শুঁড় দিয়ে তুলে নিয়ে পিঠের হাওদায় বসায়। যে দেশে রাজা নেই সে দেশে রাজা চিনতে পারে রাজহস্তী। যে দেশে নেতা নেই সে দেশে নেতা চিনতে পারে জনতা। কখন এক সময় এক পাল লোক এসে অনুত্তমকে কাঁধে তুলে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। চিৎকার করে বলল, 'সজ্জনো, বঙ্গাল মুলুক আজাদ বন গিয়া। বোস বাবুনে আপকো ভেজ দিয়া। ছোটা বাবুকী জে।' অনুত্তম তো বিস্ময়ে হতবাক। কাঁধ থেকে মাথায়, মাথা থেকে আসমানে তুলে ওরা তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছে। জনতা দেখছে আর হাঁক ছাড়ছে, 'ছোটা বাবুকী জে!'

এই সব নয়। কেউ শোর করছে, 'ছোটা বাবুকা হুকুম। আগ লগাও।' কেউ গোল করছে, 'ছোটা বাবুকী বাত। ডব্বা লুট লেনা।' অনুত্তম তো হতভম্ব। আবার তেমনি নিষ্ক্রিয় সাক্ষী। যা ঘটবার তা ঘটে যাচ্ছে। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা রাখছে না। স্টেশন দাউ দাউ করে জ্বলছে। দুটো একটা মানুষও যে না জ্বলছে তা নয়। নেবাতে যাও দেখি, অমনি ঠেলা খেয়ে জ্বলবে। নেতা বলে কেউ রেয়াৎ করবে না। মালগাড়ী ভেঙে বস্তা বস্তা চিনি বয়ে নিয়ে পিঁপড়ের সার চলেছে। ঠেকাতে যাও

দেখি। অমনি বাড়ি খেয়ে মরবে। নেতা বলে কেউ কেয়ার করবে না।

খন্তা কোদাল শাবল গাঁইতি যার হাতে যা জুটেছে তাই দিয়ে লাইন ওপড়ানো হচ্ছে। স্লীপার পর্যন্ত উঠিয়ে দিচ্ছে। ছোটখাটো পুল একদম সাফ। বড় বড় পুলে বড় বড় ফাঁক। তবে রেল দুর্ঘটনা ঘটছে না। ড্রাইভার টের পেয়ে ইঞ্জিন থামিয়ে পিঠ-টান দিচ্ছে। যাত্রীরা নেমে পড়ছে। জনতা তাদের খেতে দিচ্ছে মালগাড়ি থেকে সরানো আটা ময়দা ঘি দিয়ে তৈরি পুরি কচৌরি। দাক্ষিণ্যের অভাব নেই। কার কী জাত, কার কোন ধর্ম, কেউ জানতে চায় না, কেউ মানতে চায় না। সকলে সকলের স্বজন। দুশমন শুধু সেই যে বিবেকের প্রশ্ন তোলে, যে বাধা দেয়।

কয়েকটা দিন যেন নেশার ঘোরে কেটে গেল। ট্রেন চলাচল বন্ধ। পুলিশের পাত্তা নেই। নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়েৎ গ্রাম শাসন করছে। সরকারী কর্মচারী দেখলে তারা আনুগত্য আদায় করে। নয়তো বন্দী করে। অনুত্তম যেখানেই যায় সেখানেই সম্বর্ধনা পায়। লোকে প্রশ্ন করে, ইংরেজ কি আছে না গেছে? আছে শুনলে জেরা করে, আছে যদি তো ফৌজ পাঠায় না কেন? পুলিশ পাঠায় না কেন? নেই শুনলে বলে, আর ভাবনা কিসের। আজাদী তো মিলে গেছে।

অনুত্তমের এখন একমাত্র ধ্যান বিপ্লবী নায়িকা। হায় কন্যা পদ্মাবতী। তুমি কোথায়? কবে তোমার দেখা পাব? এখন যদি না পাই? আর তুমি কী চাও? গুলি চালনা? রক্তপাত? বারুদের গন্ধ? হাহাকার? গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করা? গ্রামের লোকদের গাছে লটকানো? এসব না হলে কি তোমার আবির্ভাবের পূর্বলক্ষণ প্রকট হবে না? হায় কন্যা বীর্যশুল্কা। কে দেবে এই শুল্ক?

অনুত্তম যা আশঙ্কা করেছিল তাই হলো। ফৌজ এসে পড়ল। রেলপথ মোটরপথ না হয় নেই কিন্তু আকাশপথ তো আছে। টেলিগ্রাফের তার না হয় নেই। কিন্তু বেতার তো আছে। ইংরেজের মিলিটারি অফিসারদের হুকুমে গ্রামকে গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হলো। মানুষ মরল জাঁতায় পড়ে ইঁদুরের মতো। লোকের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে দেখে অনুত্তমের উদ্বেগ একশো পাঁচ ডিগ্রী উঠল। তার মনে হলো এ যাত্রা সে বাঁচবে না, যদি দেশের লোককে বাঁচাতে না পারে।

এমনি এক সঙ্কটক্ষণে তার দর্শন পায়। তার পদ্মাবতীর। নীল চশমা চিনতে ভুল করে না।

কাশ্মীরী মেয়ে তারা। কানপুর থেকে এসেছে। তারার মতো জ্বলজ্বল করছে তার চোখ। কিন্তু ধীর স্থির অচঞ্চল তার চাউনি। অনুত্তম অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে শুনে তারা এলো তাকে দেখতে। তার কপালে হাত রেখে শিয়রে বসে থাকল অনেকক্ষণ। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'অত উদ্বেগ কিসের! যে খেলার যা

নিয়ম। আমরা ওদের রাজত্ব ধ্বংস করতে গেছি। আর ওরা আমাদের গ্রাম ধ্বংস করবে না? আমরা ওদের যুদ্ধপ্রচেষ্টা তছনছ করেছি। ওরা আমাদের মুক্তি প্রচেষ্টা তছনছ করবে না? তা সত্ত্বেও আমরা জিতব। ইতিহাস আমাদের পক্ষে।'

ভারতের কোথায় কী ঘটছে অনুত্তম সব কথা জানত না। তারা জানত। একে একে জানাল। সিপাহী বিদ্রোহের পরে এত বড় বিদ্রোহ আর হয়নি। সারা ভারতের উপর দিয়ে যেন একটা সাইক্লোন বয়ে গেছে। ইংরেজ এখনো ছিন্নমূল হয়নি তা সত্য। কিন্তু তার মাজা ভেঙে গেছে। আরেকবার এ রকম একটা বিদ্রোহ ঘটবার আগেই সে সন্ধি করবে। এখন শুধু দেখতে হবে লোকে যাতে এলিয়ে না পড়ে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে না ফেলে। মহাত্মা যখন অনশন আরম্ভ করবেন তখন যেন আরেক বার ঝড় ডেকে যায়।

তারা যে কোথায় থাকে, কোথায় খায়, কোনখানে কাপড় ছাড়ে কিছুই ঠিক নেই। তার বেশ হরদম বদলায়। বাস হরদম বদলায়। এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে অনবরত ঘোরে, মিলিটারির নজর এড়ায়, অভয় দেয় মেয়েদের, প্রেরণা দেয় পুরুষদের। আর যখনি একটু নিরিবিলি পায় মানচিত্র নিয়ে বসে। তাতে ছোট ছোট পতাকা আঁটা তার একটা কাজ। ফৌজ কোন কোন গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে, কোনখানে তাদের সংখ্যা কত, কোন দিন কোন দিকে তাদের গতি, গতিপথে ক'খানা গ্রাম উজাড় হলো, ক'জন মানুষ সাবাড় হলো, এসব তথ্য তার নখদর্পণে। তার নিজের একটা চর বিভাগ আছে। খবর পায় সে রোজ সময়মতো।

তারাকে দেখলে মনে ভরসা ফিরে আসে। মরণাপন্নও বেঁচে ওঠে। যার দিকে একটিবার সে তাকায় তার অবসাদ কেটে যায়। অনুত্তম শয্যা ছেড়ে কাজে লেগে গেল। যে কোনো দিন মিলিটারির গুলিতে তার মরণ। প্রাণ হাতে করে ঘোরাফেরা। তবু নিরুদ্বেগ। কত কাল পরে সে পুনরায় ধ্যান করতে পারল। ধ্যান করল পদ্মাবতীর। বীর্যবতী নারীর। যে নারীর ভয় নেই, ভাবনা নেই, উদ্বেগ নেই, যে নারী সব সময় প্রস্তুত, সবকিছুর জন্যে প্রস্তুত, সব তথ্য যার আঙুলের ডগায়।

মাঝে মাঝে তাদের দু'জনের দুই পথ এক জায়গায় ছক কাটে। কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা। অনুত্তমের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারার চোখে দীপ্তি ফোটে। ওরা যেন এক অপরকে বলতে চায়, এই যে তুমি! ওঃ কতকাল পরে। আবার কবে!

ফেব্রুয়ারি মাস এলো। মহাত্মার অনশন শুরু হলো। এইবার আসছে আর একটা সাইক্লোন। সারা ভারত জুড়ে এব তাণ্ডব। অনুত্তম কান পেতে শোনে, শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ। কিন্তু ওটা ওর কল্পনা। বিদ্রোহ করবার মতো সামর্থ্য এত বড় দেশটার কোনো-খানেই এক রত্তি ছিল না। একটি একটি করে দিন যায়, মহাত্মার জন্যে দুর্ভাবনা বাড়তেই থাকে, এক এক সময় মনে হয় তিনি এ যাত্রা বাঁচবেন না, অথচ ইংরেজ

রাজত্ব বাঁচবে। তাঁরার সন্ধানে ছুটে যায়, বহু কষ্টে সাক্ষাৎ পায়। সেও তেমনি দিশা-হারা। কই, ঝড় তো উঠল না! মহাত্মার অনশন কি ব্যর্থ গেল।

চঞ্চল হয়ে ওঠে তারা। পাগলামিতে পায় তাকে। মহাত্মা মারা যেতে বসেছেন। তবু কেউ কিছু করবে না। সব চুপচাপ নিঃঝুম। ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট। কিছু একটা করতে বললে ওরা চোরের মতো লুকোয়। গ্রামের মোড়লরা ইতিমধ্যে সরকারের অনুগত প্রজা হয়েছেন। গণপঞ্চায়েৎ বসে না। ডাকলে কেউ আসে না। ঘরে ঘরে গিয়ে তারা ওদের পায়ে ধরে সাধে। করো, করো একটা কিছু মহাত্মার প্রাণরক্ষার জন্যে। ওরা বলে, আমাদের সাধ্য থাকলে তো করব। কেন তিনি অনশন করছেন। না করলেই পারতেন। ইংরেজ প্রবল। সে কি কোনো দিন নড়বে।

বেচারি তারা অনুত্তমের কাছে ছুটে আসে একটু সহানুভূতির জন্যে। আর কী বলবার আছে অনুত্তমের। অনশন তো ঝড়ের সংকেত হলো না। যা মনে করেছিল তা নয়। এটার অন্য উদ্দেশ্য। এ দিয়ে তিনি পৃথিবীকে জানালেন যে তিনি হিংসার জন্যে দায়ী নন। হিংসা-প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে তাঁর স্থিতি। অনুত্তম স্বীকার করল, সত্যি আমরা তার অহিংসার সুযোগ নিয়েছি। হিংসা থেকে এসেছে প্রতিহিংসা। তার থেকে জনগণের অক্ষমতা।

'এর চেয়ে জেলে যাওয়া ভালো।' তারা বলল কর্তব্য স্থির করে। অনুত্তম বলল, চলো একসঙ্গে জেলে যাই। ততদিনে ওরা বেশ একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

কান্তি ও কান্তিমতী

ইন্দ্রসভার নর্তক নর্তকীদেরও নাচতে নাচতে তাল কেটে যায়। ইন্দ্র তাদের শাপ দিয়ে বলেন, 'যাও, মানুষ হয়ে জন্মাও।' তখন স্বর্গ হতে বিদায়।

কিন্তু কেন তাল কেটে যায়? কারণ তাদের হৃদয় আছে। ঠিক মানুষের মতো। হৃদয় যদি বশ না থাকে চরণ কী করে বশ মানবে। তখন গন্ধর্বলোক থেকে নরলোকে অবতরণ।

কান্তির জীবনেও এমন দিন এলো যেদিন তার মনে হলো তার নৃত্যের তাল কেটে যাবে। যাবে মীনাক্ষীরও। এক ঘর দর্শকের সমুখে অপদস্থ হবে তারা দু'জনে। ধরা পড়বে সমজদারদের চোখে। একালের ইন্দ্ররাজ তেমন কোনো শাপ দেবেন না, তবু শাপভ্রষ্ট হবে তারা অন্য ভাবে। নাটবেদী থেকে অকালে অবসর নেবে। আর নৃত্য

করবে না।

মীনাক্ষী যদি অন্যপূর্বা না হতো তা হলেও কান্তি তাকে নিয়ে রাসমঞ্চ থেকে প্রস্থান করত না। কান্তির জীবনের পরিকল্পনায় নিত্য রাস। মীনাক্ষী যদি তার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিতে চায় তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তাল কেটে না যায়। মীনাক্ষীর কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নেই। সে মর্ত্যমুখী। শাপকেই সে বর মনে করে। সে অপ্সরা নয়, মানবী।

সঙ্কটে পড়ল কান্তি। অনান্তিকে বলল, 'মীনু, যারা নাচবে তারা ভালোবাসবে না। এই তার অলিখিত শর্ত।'

মীনাক্ষী লজ্জিত হলো। বলল, 'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?'

'কী জানি! আমার তো আশঙ্কা হয় একদিন তাল কেটে যাবে। তখন নৃত্য থেকে অপসরণ। কী নিয়ে আমি থাকব তার পরে! বিয়ে আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি। তা ছাড়া বিয়ে করতে চাইলেও দুস্তর বাধা।'

'কিন্তু তাল কেটে যাবেই বা কেন? যদি বা যায় তবে নৃত্য থেকে অপসরণ কেন? আর যে সব কথা বললে তার প্রশ্নই ওঠে না। ভালোবাসলেই বিয়ে করতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? আমি তো ভাবতেই পারিনে।'

কান্তির এত চিন্তা, কিন্তু মীনাক্ষীর একটুও নেই। তার জীবনে যেন বসন্ত এসেছে। দেখতে দেখতে তার তনুমন পল্লবিত মুকুলিত পুষ্পিত প্রস্ফুটিত হচ্ছে। তাল কেটে যাবে বলে তার পরোয়া নেই। ধরা পড়ার ভয়ে হৃৎকম্প নেই। নাটবেদী থেকে অবসর নিলে তার পরে কী নিয়ে থাকবে এ বিষয়ে হুঁশ নেই। তার জীবনের কোনো পরিকল্পনাই নেই। ফুল ফুটলে ঝরে পড়ে। সেও ঝরে পড়বে যখন বসন্ত ফুরোবে। যখন ভালোবাসা মিটবে।

ও দিকে কান্তির ভিতরে অবিরাম বোঝাপড়া চলছিল। দিনের পর দিন যায়। রাধাকৃষ্ণ সেজে নাচবে তাদের দু'জনের সম্বন্ধটা আসলে কী রকম হবে? শুধু মঞ্চের সম্বন্ধ! হৃদয়ের নয়? আত্মার নয়? তারা বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নিখুঁৎ আঙ্গিকে অভ্রান্ত পদক্ষেপে নাচবে, কিন্তু নাটবেদীর বাইরে বাঁচবে না, ভালোবাসবে না? সেখানে তারা পর? তারা পরকীয়?

নিতান্ত অপরিচিতাকেও যে মাসী পিসী দিদি বলে ডাকে, নেহাৎ নিঃসম্পর্কীয়ার সঙ্গে যে নানা বিচিত্র সম্পর্ক পাতায়, সেই কান্তি যদি বলে যে মীনাক্ষী তার কেউ নয়, ওর সঙ্গে সে কোনো রকম সম্পর্ক পাতায়নি, তা হলে বন্ধুরা পর্যন্ত অবিশ্বাস করবে। কেন? এই একটি মাত্র মেয়ের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক পাতায়নি কেন? বন্ধুরা শুধাবে।

বন্ধুরা হয়তো বলবে, ভাই বোন সম্পর্ক কী দোষ করল? ভাই বোন। কান্তি হেসে উড়িয়ে দেবে। না। ভাই বোন সম্পর্ক নয়। রাসনৃত্য ভাই বোনের নয়।

তা হলে স্বামী স্ত্রী? সর্বনাশ। মীনাক্ষীর যে জলজ্যান্ত স্বামী রয়েছে। না থাকলেও কান্তি ছাঁদনাতলায় যেত না। না। রাসলীলা স্বামী স্ত্রীর নয়।

তা হলে সখা সখী? কান্তি চিন্তা করবে। না। রাসরঙ্গ সখা সখীর নয়। তাদের জন্যে হোলি। পার্থক্য আছে।

তা হলে আর কী বাকী থাকে?

ভাবতে ভাবতে বাৎসল্যভাব মনে জাগে। কান্ত আর কান্তা।

কান্তি শিউরে ওঠে। মানুষের মন মানুষ নিজেই জানে না। জানতে পেলে চমকায়। কান্তি বার বার মাথা নাড়ে। না, না, কান্তাভাব নয়। আমি যে শ্যামলকে কথা দিয়েছি। আমি কি তাকে ধোঁকা দিতে পারি।

সব চেয়ে ভালো কোনোরূপ সম্পর্ক না পাতানো। ইন্দ্রসভার নর্তক নর্তকীর মতো। ওদের হৃদয়ের বালাই ছিল না। তাই ওদের তালভঙ্গ হতো না। কিন্তু মাঝে মাঝে হতো বই কি। তার থেকে বোঝা যায় ওরাও একেবারে নিঃসম্পর্কীয় ছিল না। হৃদয়-হীন ছিল না।

কান্তি ভেবে দেখল নৃত্য করে কে? অঙ্গ, না হৃদয়? হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করার জন্যে বা হৃদয়ের ভার থেকে মুক্ত হবার জন্যে কেউ লেখে কবিতা, কেউ আঁকে ছবি, কেউ গায় গান। ঘটলই বা ছন্দপতন। সেটাকে এত ভয় কেন? মোটের উপর একটা কিছু সৃষ্টি হয়ে উঠছে। বিশ্বসৃষ্টির মতো।

তা হলে মীনাক্ষীর সঙ্গে নাচলে ক্ষতি কী? ক্ষতি এই যে অজ্ঞের অলক্ষ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হয়তো নিজের অলক্ষ্যে। কান্ত আর কান্তা। শ্যামল ক্ষমা করবে না। শ্যামল যদি ভদ্রতা করে সরে যায় তা হলে মীনাক্ষীকে বিয়ে করার বাধ্যবাধকতা জন্মাবে, নইলে মীনাক্ষী ক্ষমা করবে না। একজনের সঙ্গে নাচতে গেলে যদি অবশেষে তাকে বিয়ে করতে হয় তা হলে তার সঙ্গে নাচতে চাইবে কোন মূঢ়। এ কী সঙ্কট, বলো দেখি।

কান্তি স্থির করল মীনাক্ষীর সঙ্গে আর নাচবে না। একই কারণে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে নাচবে না। নৃত্য বলতে এখন থেকে একক নৃত্য। কিন্তু সে নিজে চাইলে কী হবে, লোকে চায় না তার একার নাচ। তারা চায় রাধাকৃষ্ণের যুগল নৃত্য। হরপার্বতীর যুগ্ম নৃত্য। নরনারী উভয়ের সংযুক্ত পদক্ষেপ, সুসমঞ্জস পদক্ষেপ।

না, একক নৃত্য জমবে না। কান্তি ভেবে পায় না আর কী সমাধান আছে। আর কী সম্ভবপর। একপ স্থলে আগে যা করেছে এবারেও তাই করল। পলায়ন। দৌড়। এক দিন কাউকে কিছু না বলে এক বস্ত্রে একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়ল। যে দিকে দু'চোখ যায়।

স্টুডিও আর স্টেজ নিয়ে তন্ময় ছিল। জীবনের দিকে ফিরে তাকাবার ফাঁক

পায়নি। যাদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে তারা দর্শক। তারা যেন মানুষের একজোড়া চোখ, গোটা মানুষটা নয়। জীবনের বহমান স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে কান্তি সমগ্রতার স্বাদ পায়।

রসের সায়র। প্রতি দিন তাতে ডুব দিয়ে ওঠে আর নতুন হয়ে যায়। যাই দেখে তাই নতুন লাগে। যাকে দেখে সেই তার চোখে নতুন। পরম বিস্ময় নিয়ে কান্তি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। হাতের কাছে যে কাজ জোটে সে কাজ করে। বাড়ী তৈরী হচ্ছে, রাজমিস্ত্রীর সাগরেদ চাই। আচ্ছা, রাজী। কাঠ চেরাই হচ্ছে, করাতীর সাথী আসেনি, মদৎ চাই। আচ্ছা, রাজী। জাহাজ মেরামত হচ্ছে, রং করছে একদল লোক, কান্তি তাদের ওখানে হাজির।

পথে বিপথে বকমারি মেয়ের সঙ্গে দেখা। কেউ বা কোকেন চালান দেয়, কেউ চোরাই মাল পাচার করে। কেউ পান বেচে, কেউ জাহাজীদের সঙ্গে নিকা বসে। কেউ পরের ছেলে দেখিয়ে ভিখ মাগে। কেউ রং মেখে সঙ্ সেজে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের কার সঙ্গে কোন সম্পর্ক পাতাবে কান্তি। মানুষের অভিধানে কটাই বা শব্দ আছে! মানুষ আছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

বিয়ের জন্যে কেউ ঝোলাঝুলি করে না। বিয়ের কথা কেউ মুখে আনে না। বিয়ে একটা সমস্যাই নয়। সমস্যা হচ্ছে আত্মিক সম্বন্ধ। আত্মিক সম্বন্ধ স্থির না হলে কায়িক সম্বন্ধ শুরু হতে পারে না। কিন্তু তার আগেই কান্তি উধাও হয়। কাউকেই ধরা-ছোঁয়া দেয় না। কী জানি কী আছে তার ভিতরে নারীকে যা চুম্বকের মত টানে। কিন্তু কী বাবেই সে আপনাকে ছাড়িয়ে নেয়। সঞ্চারিণীর বন্ধনী এড়ায়।

পূর্বেই তার প্রত্যয় জন্মেছিল একজনের হওয়া মানে আর সবাইকে হারানো। এক দিন একজনের হলে আর সব দিন আর সব জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ। ক্রমে তার প্রত্যয় হলো মুক্ত থাকতে হলে শুদ্ধ থাকতে হয়। কে কতটা মুক্ত সেটা নির্ভর করে কে কতটা শুদ্ধ তার উপর। তা বলে জীবনের ধূলিকাদা থেকে সন্তর্পণে সরে থাকার নাম শুদ্ধি নয়।

এত কাল যত্ন করে সে নৃত্য শিখেছিল। কিন্তু জীবনের সঙ্গে তার যোগ ছিল না। রসের দীক্ষা তার হয়নি। এই বার ঘুরতে ঘুরতে তার রসের দীক্ষা হলো। যার কাছে হলো সে এক রঙ্গিনী নারী। ছইলা গোপিনী।

ছইলা তাকে শেখালো কেমন করে গাই দুইতে হয়, কেমন করে চিঁড়ে কোটে, মুড়ি ভাজে, কেমন করে ঘুঁটে দেয়, ঘর নিকায়। সারা দিন একটা না একটা কাজে হাত জোড়া থাকে ছইলার। তার সঙ্গে বসে গল্প করতে হলে তার হাতের কাজে হাত লাগাতে হয়। প্রথম প্রথম কান্তির লজ্জা করত। এসব যে মেয়েলি কাজ। কে কী মনে করবে! বলবে, বা রে পুরুষ! কিন্তু ধীরে ধীরে তার গায়ের চামড়া মোটা হলো।

কে কী বলে তার গায়ে বাজে না। সে মুচকি হাসে। আর কাজে মন দেয়। ছইলার কাজ হালকা করাই তার কাজ।

কয়েক মাস কাটলে পরে ছইলা বলল, 'ঠাকুরপো, তুমি যে এত কিছু করলে, বলো দেখি আমার কাছ থেকে কী পেলে।'

কান্তি বলল, 'সেকালের শিষ্যরা ঋষিদের গোরু বাছুর চরিয়ে যা পেতো তাই। ব্রহ্মবিদ্যা। ঠিক ব্রহ্মবিদ্যা নয়, তার কাছাকাছি। আত্মবিদ্যা।'

জ্যোৎস্নারাত্রে পাশাপাশি বসেছিল তারা, নদীর জলে পা ডুবিয়ে। কে দেখল, না দেখল, ভ্রূক্ষেপ নেই।

'বৌদি,' কান্তি বলল ইতস্তত করে, 'তোমার সঙ্গে থেকে আমি কী শিখেছি, বলব?'

'বলো।'

'শিখেছি, আমি পুরুষ নই।'

'ওমা, তবে তুমি কী?'

'আমি না-পুরুষ।'

ছইলা হেসে আকুল। বলল, 'আর আমি?'

'তুমি? তুমি নারী নও।'

'নারী নই? ঠিক জানো?'

'তুমি না-নারী।'

ছইলা হাসতে হাসতে দম আটকে মারা যাবে মনে হলো। হাসির চোটে জল এলো চোখে। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'প্রথম ভাগ শেষ করেছ। এখন আর কিছু দিন থেকে যাও।'

এর পরের কয়েক মাস ওরা দুধ দই বেচতে হাটে বাজারে পসরা মাথায় বাঁক কাঁধে ঘুরে বেড়ালো। লজ্জায় কান্তির মাথা কাটা যায়। লোকের চোখে চোখে টরে-টক্কা। ছইলার কী! সে তো সংসারের বা'র। তা ছাড়া সে মধ্যবয়সিনী। খেলবার বয়স নয়। খেলাবার বয়স।

'আর কিছু পেলে, ঠাকুরপো।' ছইলা শুধায় তারায় ভরা আকাশের তলে।

'পেয়েছি, বৌদি।' কান্তি বলে আত্মস্থ হয়ে। 'আমি পুরুষ নই, কিন্তু আমার পুরুষ ভাব।'

'আর আমি?'

'তুমি নারী নও, কিন্তু তোমার নারী ভাব।'

এবার ছইলা হাসল না। তার চোখে জল এলো কি না আঁধারে দেখা গেল না। স্নিগ্ধস্বরে বলল, 'আরো কিছু দিন থেকে গেলে হয় না?'

'কেন ?' এবার রহস্য করল কান্তি। 'তৃতীয় ভাগ পড়তে হবে ?'

ছুইলা উত্তর দিল না। কান্তি যাবার জন্যে ছটফট করছিল। সে নাচিয়ে মানুষ। কত কাল নাচ ছেড়ে থাকতে পারে! তবু তাকে থাকতেই হলো। কালিদাসকেও থাকতে হয়েছিল বিদ্যানগরের গয়লানীর ঘরে রসের পাঠ নিতে। কান্তির বিদ্যানগর উৎকলে।

ছুইলার সঙ্গে গরুর গাড়ীতে করে গেল কুটুমবাড়ী, নৌকায় করে গেল মেলায়। পরের ঘরে হলো ঘরের লোক। গাছতলার আস্তানায় আপন জন। মানুষের বুকে কত যে মধু, তার স্বাদ নিল। দু'দিনের চেনা। মনে হয় জন্মজন্মান্তরের। পাঁজির হিসাবে দুটিমাত্র দিন। হৃদয়ের হিসাবে চিরদিন। কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না, বিদায় নিতে গেলে কেঁদে ভাসায়।

মধু, মধু, মধু। মানুষ মধু, পৃথিবী মধু, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।

মাস কয়েক পরে ছুইলা বলল, 'আর কিছু পেলে কি ?'

কান্তি বলল, 'পেয়েছি, পেয়েছি।'

'কী পেয়েছ ?'

'রস'।

ছুইলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে নীরবে শুনে যেতে থাকল, কান্তি বলে যেতে লাগল, 'বন্ধনের ভয়ে কখনো কারো সঙ্গে রসের সম্পর্ক পাতাইনি। রসের সম্পর্ক আপনা থেকে পাতা হচ্ছে দেখে দৌড় দিয়েছি। এখন আমার ভয় ভেঙে গেছে।'

'কী করে ভাঙ্‌ল ?'

'তোমার সঙ্গে থেকে। তুমি নারী নও। অথচ তোমার সত্তা নারীসত্তা। আমিও পুরুষ নই। অথচ আমার সত্তা পুরুষসত্তা। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ তোমার সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক।'

কান্তির প্রয়োজন শেষ হয়েছিল, সে তার সমস্যার সমাধান পেয়েছিল। এবার সে ফিরে যাবে, ফিরে গিয়ে নাচের দল গড়বে, নাচবে, নাচাবে, ভয় পাবে না, ভয়ের কারণ হবে না। মীনাক্ষী যদি তার নৃত্যসহচরী হয় তবে ওর সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে বিশুদ্ধ রসের। সে সম্পর্ক হৃদয়কে বাদ দিয়ে নয়, হৃদয়ই তো রসের মধুচক্র। কিন্তু নারীকে বাদ দিয়ে। পুরুষকে বাদ দিয়ে। অথচ নারীসত্তাকে রেখে, পুরুষসত্তাকে রেখে।

ছুইলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কান্তি কলকাতা গেল। যা ভেবেছিল তাই। দলের অস্তিত্ব নেই। নতুন করে গড়তে হবে। কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, আবার খুঁজে পেতে ধরে আনতে হবে। মীনাক্ষীর খোঁজ নিয়ে জানতে পেলো সে ঘরসংসার করছে, সুখে আছে। আর নাচবে না। তার স্বামীরও আর উৎসাহ নেই। সে

পলিটিক্সে নেমেছে।

ইতিমধ্যে দিন বদলে গেছে। নয়া জমানার দর্শকরা কলকারখানার ছোঁয়াচ চায়, কিষান মজদুর কী করে না করে ওরা তা ক্ষেতে খামারে দেখবে না, নাটবেদীতে দেখবে। কান্তিও তো কিছুদিন রাজমিস্ত্রী, করাতী, রং মিস্ত্রী হয়েছে, গোরুর খুরে নাল বসিয়েছে, বাঁক কাঁধে করে হাটে গেছে। এসব অভিজ্ঞতা নৃত্যে রূপান্তরিত করা নিয়ে তার মনে ভাবনা জেগেছিল। কল্পনা তার উপর রং ফলাতে শুরু করেছিল। নতুন ধরনের নাচ দিয়ে সে দেশের লোকের মনোহরণ তো করবেই, দুঃখীদের দুঃখমোচনও করবে। তামাশা নয়। গান দিয়ে সেকালের গুণীবা আকাশ থেকে বর্ষা নামাতেন। অনাবৃষ্টির দিন গাইয়েরাই ছিলেন মানুষের শেষ আশা। একালের নাচিয়েরাই বোধ হয় মানুষের শেষ ভরসা।

কান্তির দল বরফের গোলার মতো দিন দিন বেড়ে চলল। করাত নৃত্য, বাঁক নৃত্য ইত্যাদি আনকোরা নাচ দর্শকদেরও টেনে আনল। একজন ক্যাপিটালিস্ট মুগ্ধ হয়ে ধনসম্পদ উৎসর্গ করলেন। তবে ম্যানেজিং ডিরেক্টর তিনিই হলেন। অনুতাপে বিনম্র হয়ে ধনিক পরিবারের কন্যারাও মজুরনী কিষানী সাজতে এগিয়ে এলেন। নয়া জমানা। সেকালের যাত্রায় হাভিডোমের উচ্চাভিলাষ ছিল রাজা মন্ত্রী সাজতে। একালের ফিল্মে উঁচু ঘরানাদের সাধ অচ্ছুৎ-কন্যা সাজতে।

ভারতের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রদক্ষিণ করে কান্তির দল অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ইউরোপের দিকে পা বাড়াল। তাদের জাহাজ যেদিন বম্বে ছাড়বে সেদিন হঠাৎ চার বন্ধুর পুনর্মিলন। অনুত্তম, কান্তি, তন্ময়, সুজন। রূপকথার চার কুমার।

সাফল্যের নেশায় কান্তির মাথা ঘুরে গেছল। তা হলেও কোনো দিন সে ভুলে যায়নি যে সে কান্তিমতী রাজকন্যার অন্বেষণে বেরিয়েছে, যে রাজকন্যা তার হাতের কাছে, অথচ নাগালের বাইরে। অন্তরে অন্তরে তার ব্যথা জমছিল। বাইরে যদিও অন্তহীন ফুর্তি।

কেন ব্যথা? কারণ তার নৃত্যসহচরী হবার জন্যে আজকাল দস্তুরমতো প্রতিযোগিতা। তাই সবাইকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে সে সকলের সঙ্গে নাচে। গোপী সকলেই। রাধা কেউ নয়। রসের সম্পর্ক পাতিয়ে এক সমস্যার সমাধান হলো, কিন্তু আরেক সমস্যা নতুন করে দেখা দিল। সে তো কৃষ্ণের মতো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নয় যে একই সময়ে দশটি গোপীর সঙ্গে রাসনৃত্য করতে পারবে। দশটির মধ্যে একটির সঙ্গেই সে তা পারে। কিন্তু তা হলে একজনকে প্রাধান্য দিতে হয়। মীনাক্ষীর স্থান দিতে হয়।

সাফল্যের দিনে অত বড় একটা ঝুঁকি নিতে তার সাহসে কুলায় না। আছে একটি মেয়ে তার নজরে। খুবই অল্পবয়সী। কুমারী। কিন্তু রত্নাকে সে যদি রাধার সম্মান দেয়

গোপীরা তাকে ক্ষমা করবে না। দলে ভাঙন ধরবে। তা না হয় হলো। কিন্তু রত্না নিজেই স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করবে সম্পর্কটাকে অক্ষয় করবার জন্যে। নাটবেদীতে তো বটেই, বিবাহবেদীতেও। শেষকালে ঐ রত্নাকেই কেন্দ্র করে ঘুরবে তার জীবন, তার জীবিকা, তার শিল্প, তার দল। ঐ রত্নাই হবে তার দলের একমাত্র সম্বল। মুথুলক্ষ্মী, খুরশিদ, ফিরোজা, ইন্দিরা, হাসুনা—এরা কি থাকবে।

বিয়ে যখন করবেই না তখন রত্নাকে রাধার ভূমিকা না দেওয়াই ভালো। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এড়াতেই হবে। নীড় রচনার স্বপ্ন মুকুলেই ঝরে যাক। রত্না শিখুক আকাশে উড়তে, আকাশেই বিশ্রাম করতে। তা যদি না পারে তবে অন্য কাউকে বিয়ে করুক। কান্তিকে নয়।

কিন্তু এ কথা ভাবতেও যে তার কষ্ট হচ্ছিল না তা নয়। রত্না এক দিন বড় হবে, তার বাপ মা তার বিয়ে দেবেন, তার মতো সুন্দর মেয়ের জন্যে পাত্রের অভাব হবে না। দূর হোক অপ্রীতিকর ভাবনা। আপাতত ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে আসা যাক। দিগ্বিজয়ীর মতো।

বম্বের কয়েকটা ঘণ্টা বন্ধুদের সঙ্গে খেয়ে গল্প করে ফোটো তুলিয়ে কেটে গেল। ভাব বিনিময়ের জন্যে সময় ছিল না। উপাখ্যান বলার জন্যে তো নয়ই। জাহাজ ধরতে হবে। একশো রকমের খুঁটিনাটি। মনটা ভারী হয়ে রয়েছে সুমতির জন্যে। সেও চেয়েছিল সহযাত্রিণী হতে। তার তুলার ব্যাপারী স্বামী বাদ সাধলেন। তবে মনটা খুশ আছে আরেকটা বোঝ ধরবে। প্যারিসের বিখ্যাত নর্তকী ইভেৎ তার দলে যোগ দিতে উৎসুক।

জাহাজ ছাড়বে, জাহাজ থেকে নেমে যাবার সময় সুজন বলল, 'প্যারিসে হয়তো সোনিয়ার সঙ্গে দেখা হবে। তাকে লিখব তোর কথা।'

কান্তি বলল, 'বেশ, বেশ। যদিও জানিনে কে তিনি। আহা। শোনা হলো না তোর কাহিনী। তন্ময়েরটা মোটামুটি শুনেছি। আর অচ্যুতম, তোরটাও শোনা হলো না। সুজন তবু হেড লাইনটা শুনিয়ে রেখেছে। সোনিয়ার নাম করে। তুই কিন্তু একটুখানি আভাস পর্যন্ত দিসনি।'

ঐখান দিয়ে চলাফেরা করছিল রত্না। কান্তি তার গলা জড়িয়ে ধরল এক হাতে। অমনি মনে হলো দলের লোক ঠাওরাবে সে অপক্ষপাত নয়। তখন আরেক হাত বাড়িয়ে দিল ফিরোজার কাঁধে। নিজের অপক্ষপাতিতায় নিজেই তৃপ্ত হয়ে সে তার বন্ধুদের বলল, 'পুনর্দর্শনায় চ।'

অন্বেষণের অপরাহ্ণ

১৯৪৯ সালের বড়দিন। তন্ময় এসেছে সপরিবারে কলকাতায়। উঠেছে পৈত্রিক বাসভবনে। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে। কান্তি এসেছে সদলবলে। অতিথি হয়েছে এক মহারাজার প্রাসাদে। মধ্যপ্রদেশের মহারাজা। অনুত্তম এসেছে নোয়াখালী থেকে, সহকর্মী সংগ্রহ করতে। সুজন তাকে ধরে নিয়ে গেছে অশ্বিনী দত্ত রোডে, নিজের বাড়ীতে। বাড়ীখানা ছোট দোতালা। কিন্তু তার চার দিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। দাঙ্গা বাধলে আর যেখানেই বাধুক এ পাড়ায় না। নেহাৎ যদি বাধেই দেয়ালের হেঁয়ালি সমাধান করতে পারবে না।

'আগে নিরাপত্তা। তার পরে অন্য কথা। যে টাকায় তেতালা হতো সে টাকায় ম্যাজিনো ওয়াল হয়েছে বলে সীতার সঙ্গে আমার ঝগড়া। বলে, এটা অবন ঠাকুরের অশোকবনের আইডিয়া।' সুজন বলছিল অনুত্তমকে।

'নোয়াখালীতে', বলছিল অনুত্তম, 'যে গাঁয়ে সব চেয়ে বিপদ সেই গাঁয়েই আমার কুঁড়ে ঘর। গুণ্ডারা আমাকে ঘিরে রয়েছে, তাই আমি সবচেয়ে নিরাপদ।'

সুজনের গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। 'য়্যাঁ! বলিস কী! তা হলে তো, ভাই, তোকে ফিরে যেতে দেওয়া চলে না। বিয়ে হয়নি বলে কি তোর প্রাণের মূল্য নেই? তোর স্ত্রী থাকলে কি তোকে আদৌ যেতে দিতেন?'

'স্ত্রী থাকলে কী করতেন জানিনে, কিন্তু যার অন্বেষণে বাহির হয়েছি তিনি যে আমাকে বিপদের দিকেই টানছেন। যেন সেইখানেই মিলনের সঙ্কেত স্থল।'

সেদিন ওরা দুই বন্ধু অপর দুই বন্ধুর প্রতীক্ষা করছিল। আগে পৌঁছল তন্ময়। তিনজনে কোলাকুলি করে নীরব রইল কিছুক্ষণ। তার পরে সুজন বলল, 'সীতা বাড়ী নেই। আফসোস জানিয়েছে। ওর বোনের সন্তান হবে বলে রাত জাগতে হবে।'

'আমার কিন্তু রাত করে ফিরতে মানা। রেবা একটুও রাত জাগতে পারে না।' মুরগীতে ঠোকরানো স্ত্রৈণ স্বামীর মতো সভয়ে বলল তন্ময়। তার মাথার চুল চৌদ্দ আনা শাদা। কিন্তু শরীর আগের চেয়ে চিকণ। একটি বড় মাপের খোকা পুতুলের মতো চেহারা। গৃহিণীর হাতযশ সর্বাঙ্গে। স্বচ্ছন্দে আশী বছর বাঁচবে।

ওদিকে সুজনের মাথাজোড়া টাক। সেটা অবশ্য নতুন কিছু নয়, কিন্তু ঘরণীর হেফাজতে তন্ময়ের যেমন চেকনাই হয়েছে সুজনের তেমন হয়নি। ওকে যেন তুলোয় মুড়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। সাবধানে থাকলে সুজনও আশী বছর বেঁচে থাকতে পারে। দাঙ্গাবাজদের রুখতে যেমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলেছে অদৃশ্য ব্যাধিবীজদের রুখতে

তেমনি তুমুল আয়োজন করেছে। তিন চার আলমারি ওষুধে বোঝাই।

অত্যুত্তম চুল ছেঁটেছে কদম ফুলের মতো। ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা চুল। দাড়ি কিন্তু রক্তবীজের ঝাড়। চাঁছলে বাগ মানে না বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বোধ হয় নোয়াখালীর মোল্লাই ফ্যাশন। চোখে সেই বিখ্যাত নীল চশমা। শরীরটা মাংসবহুল নয়, পেশীবহুল। শিরাগুলো ঠেলে বেরোচ্ছে। শক্ত গাঁথুনি। যৌগিক ব্যায়াম করে। গায়ে কোর্তার বদলে চাদর জড়ানো, ধুতীও সংক্ষেপিত। হাঁ, খদ্দরের। দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা প্রতি অঙ্গে। পরিচ্ছদে।

মহারাজার মোটরে করে এলো কান্তি। ও গাড়ী কখনো এত ছোট বাড়ীর সামনে দাঁড়ায়নি। কিন্তু এটা রাজপুরী না হোক দুর্গ তো বটে। ছোটখাট ফোর্ট উইলিয়াম। লাফ দিয়ে ফুর্তি করে ছাদে উঠল কান্তি। বলল, 'শীত কোথায় কলকাতায়। এইখানে বসা যাক কফির পেয়ালা নিয়ে। আর, সুজন, তুই আয়। অত্যুত্তম, তন্ময়, তোরাও বদ্ধ ঘরে বসে থাকিস নে, বুড়ো হয়ে যাবি।'

চির তরুণ। নানা রঙের রেশমী পোশাক। বাবরি চুল। ফুলের মালা। যেমনটি ছিল পঁচিশ বছর আগে তেমনিটি আছে পোয়া শতাব্দী পরে। তবে মুখভাবে এক প্রকার কঠোরতা এসেছে। চরিত্রের কঠোরতা। তার তপোভঙ্গ করা মেনকার অসাধ্য।

'পড়েছি এক মহারাজার পাল্লায়।' রগড় করে রসিয়ে রসিয়ে বলল কান্তি। 'খরচ বেঁচেছে। কিন্তু জান বাঁচে কি না সন্দেহ।'

'তার মানে?' কৌতূহলী হলো তন্ময়।

'দু'বেলা শুনতে হচ্ছে নতুন এক স্লোগান। এক স্বামী এক স্ত্রী। দেশটা দিন দিন হলো কী। রাজাগুলোও ধুয়ো ধরেছে এক স্বামী এক স্ত্রী। সরদার বল্লভভাই এমন হাল করেছেন যে একটির বেশি পুষতে পারে না। পণ্ডিত জবাহরলালই বা কম কিসে। ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট একটি রানীকেই দেবেন, আর সব রানীদের সাধারণ পাসপোর্ট। বিপ্লব হবে না? প্যালেস রেভলিউশন শুরু হয়ে গেছে। মহারাজা এর মধ্যেই তাঁর রক্ষিতাদের বিদায় করে দিয়েছেন। রানীদের একটিকে রেখে বাকী তিনটিকে স্বাধীন জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠ করতে চান। একটিকে হয়তো আমার দলে যোগ দিতে বলবেন। সেই রকম তো শুনছি।'

'দেখিস্, ভাই। পদচালনা করতে গিয়ে পদস্খলন না হয়।' অত্যুত্তম বলল গম্ভীর স্বরে। 'মহারানী শুনে মহাভয় লাগছে।'

'হা হা!' কান্তি অত্যুত্তমের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'তেমনি কাঠখোট্টা আছিস্। রসকষ এক ফোঁটা নেই। ওরে, আমার কাছে ময়রানীও যা মহারানীও তাই। মাজুরকা নেচে এলুম পোলাণ্ডের চাষানীদের সঙ্গে, পোল্‌কা নেচে এলুম চেকোস্লোভাকিয়ার

মজুরনীদের সঙ্গে। আমেরিকার ক্রোড়পতিদের দুহিতাদের সঙ্গে নেচে এলুম ফক্‌স্‌ট্রট আর ট্যাঙ্গো। ইংলণ্ডের কাউন্টেস্‌ ও ব্যারনেসদের সঙ্গে নেচে এলুম সার রজার ডি কভারলী। কোনোখানেই পা ফসকায়নি। শেষে কিনা চৌকাঠের উপর আছাড় খেয়ে পড়ব!'

'তবু', মন্তব্য করল সুজন, 'সাবধানের মার নেই।'

'তা হলে', কান্তি সুর নামিয়ে বলল, 'খুলে বলি। কারো সঙ্গে আমি রসের সম্পর্ক ভিন্ন আর কোনো সম্পর্ক পাতাইনে। কিন্তু রস বলতে আমি রতিরঙ্গ বুঝিনে। বুঝি লীলাকমলের নির্যাস। এর ফলে বার বার ফল্‌স্‌ পোজিশনে পড়তে হয়েছে। তেমন অবস্থায় পড়লে আমার নিয়ম হচ্ছে, দে দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে আমি এত দূর এসেছি। আমার জীবনটাই একটা ম্যারাথন রেস।'

হো হো করে হেসে উঠল তন্ময়। টিপে টিপে হাসল সুজন। অনুত্তম গম্ভীর ভাবে বলল, 'ম্যারাথন রেসে পতনও ঘটে।'

কান্তি বলল সকৌতুকে, 'তা বলে চেহারাটাকে সজারুর মতো করে অর্ধেক সমাজের কাছে ঘোষণা করব না, ছুঁয়ো না আমাকে।'

হাসতে হাসতে তন্ময় গড়িয়ে পড়ল সুজনের গায়ে, সুজন মুখ ফেরালো।

তারপর কান্তি তাদের সবাইকে মাতিয়ে রাখল নিজের জীবনের কাহিনী বলে। ঘড়িগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হলো কেউ যাতে টের না পায় রাত কত হয়েছে। ওদিকে রেবা হয়তো ছটফট করছে। তা একটু করলই বা। এদিকে সুজনও তো ছটফট করছে সীতার জন্যে।

কান্তির কাহিনীর অনেকখানি আমাদের জানা। সে অংশের পুনরাবৃত্তি করব না। যেটুকু অজানা সেটুকু এই।

কান্তিরা যখন ইউরোপে যায় তখন মহাযুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে। তার কালো ছায়া সকলের জীবনে। তা বলে নাচবে না, নাচ দেখবে না, তেমন বেরসিক ইউরোপের লোক নয়। কান্তিরা পরম সমাদর লাভ করে। কিন্তু হিটলারের চালচলন দেখে হিতৈষীরা পরামর্শ দেন, আসল শিবতাণ্ডব শুরু হলে নকল শিবতাণ্ডব দেখবে কে! মাঝখান থেকে আটকা পড়বে তোমরা। সময় থাকতে আমেরিকায় সরে পড়ো। আটলান্টিক পেরিয়ে দেখে সেখানেও থমথমে ভাব। তবে অঢেল টাকা। কান্তিরা ঝম ঝম করে নাচে আর ঝন ঝন করে টাকা ঝরে। টাকার গাছে নাড়া দিয়ে ফল কুড়োতে ব্যস্ত। খেয়াল নেই যে জাপানীরা পার্ল হারবারে হানা দিয়েছে। যখন টনক নড়ে তখন দেখে দেরি হয়ে গেছে। দেশে ফেরবার জলপথ আকাশপথ বন্ধ। স্থলপথের তো কথাই ওঠে না।

সঞ্চয় ভেঙে ক'দিন চালাতে পারে! যে যেখানে পারে চাকরি নেয়। যে কোনো

চাকরি। রত্না গেল মেয়েদের অক্জিলারি কোর-এ। কান্তি গেল রয়্যাল ন্যাভিতে। মুথুলক্ষ্মী ফিরোজা বাবনজী মিশিরজী এঁরা ছড়িয়ে পড়লেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে। বিচিত্র কার্যে। যুদ্ধশেষে একে একে ফিরে এলো অনেকে। যারা ফিরল না তাদের মধ্যে রত্না। সে বিয়ে করে সেখানকার এক শিল্পীকে। আবার দল গড়তে হলো। গড়তে হলো নতুন লোক নিয়ে। পুরোনোরা ধনের স্বাদ পেয়েছে, মোটা তনখা না পেলে আসবে না। এসে করবেই বা কী। নাচতে তো ভুলে গেছে। নতুন যারা এলো তাদের তালিম দিতে দিতে বছরের পর বছর গেল গড়িয়ে। এই সম্প্রতি কান্তি সদলবলে আসরে নেমেছে। কিন্তু অনভ্যাসের দরুন অনায়াস নয় পদক্ষেপ। মনের মতো সাথী নেই বলে লীলায়িত নয় ভঙ্গী। রত্না তার চেয়ে বয়সে যথেষ্ট ছোট ছিল। এরা তো তার মেয়ের বয়সী। এদের সঙ্গে নাচা যেন খোকাখুকুর নাচন। পশ্চিম থেকে কৌশল শিখে এসেছে প্রচুর। জীবনের অভিজ্ঞতাও প্রভূত। কিন্তু রূপ দিতে গিয়ে দেখছে এক হাতে হয় না। মহারানী কি সত্যি যোগ দেবেন?

এর পর তন্ময়ের কাহিনী। তার প্রায় সবটাই আমরা জানি। বাকীটুকু এক নিঃশ্বাসে বলা যায়। তন্ময়কে রাজ একবার টেলিফোন করে তার ক্লাবে। কী একটা খবর ছিল, সাক্ষাতে জানাবে। তন্ময় তার সঙ্গে দেখা করেনি, তাকে দেখা করতেও দেয়নি। কিছু দিন বাদে শুনতে পায় রাজ আবার বিয়ে করেছে। বিয়ে করে চলে গেছে তিব্বতে। যার সঙ্গে গেছে সে একজন ফরাসী বৌদ্ধ লামা। বজ্রাম্বর সম্প্রদায়ের লামাদের বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। তিব্বতে বহুকাল কাটিয়ে ওরা এখন হিমালয়ের কোন এক উপত্যকায় অজ্ঞাতবাস করছে। এদিকে ঘোরতর বিষয়ী হয়ে উঠেছে তন্ময়। মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। ছেলেকে বিলেত পাঠাচ্ছে। স্ত্রীর জন্যে বাড়ী কিনছে লণ্ডনের উপকণ্ঠে।

তন্ময়ের পরে অনুত্তম। তার কাহিনীর অধিকাংশ আমরা জানি। অবশিষ্ট লিখছি। অনুত্তম ও তারা একই দিনে ছাড়া পায়। কংগ্রেস আবার প্রাদেশিক সরকারের ভার নিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা নিয়ে ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে দরদস্তুর চলছে। তারা বলে, সংগ্রাম করতে আর ভালো লাগছে না। দরকারও দেখছিনে। এসো, চুপচাপ একসঙ্গে থাকি। মানুষের কি ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই? দেশের ভার আর যেই নিক, অন্তু, ঘরের ভার তুমি আমি নিই। অনুত্তম বুঝতে পারে তারার মনে কী আছে। বিয়ে। ঘরসংসার। ছেলেমেয়ে। বয়সও তো হলো কম নয়। লবণ সত্যাগ্রহের সময় থেকে দেশের কাজে নেমেছে। বড় ঘরের মেয়ে। বাপ মা'র কথা শোনেনি। বিয়ে করেনি। অনুত্তমেরও কি সাধ যায় না সুখী হতে, শান্তি পেতে। তারার মতো সঙ্গিনী পাবে কোথায়! তার পরম সৌভাগ্য, তারা তাকে মনোনয়ন করেছে। সে স্বয়ংবর সভার বীর।

কিন্তু অনুত্তমের যে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। দেশ স্বাধীনতা না পেলে সেও স্বাধীনতা পাবে না। বিয়ে করবে না ততদিন। তার পরে যাকে করবে সে নিবন্ত সলতে নয়, জ্বলন্ত শিখা। বেচারি তারা যে এখন থেকেই নিবু নিবু। সে তেজ নেই। সে দাহ নেই। এ কি সেই তারা! সেই পদ্মাবতী! মনে তো হয় না। অনুত্তম বলে, আমি দুঃখ। কিন্তু নিরুপায়। তারা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

তারাকে কানপুরে পৌঁছে দিয়ে অনুত্তম দিল্লীতে কয়েক মাস কাটায়। কলকাতার দাঙ্গা তাকে বিচলিত করে, কিন্তু বল্লভভাই তাকে অন্য কাজে লাগান। নোয়াখালীর ডাক শুনে সে আর স্থির থাকতে পারে না। গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ দেয়। তখন থেকে নোয়াখালীতেই তার স্থান। গান্ধীজী নেই, তবু কাসাবিয়াঙ্কার মতো সে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আগুনলাগা জাহাজের ডেক-এ। কোথায় তার পদ্মাবতী! কবে ফুটে উঠবে পদ্ম ফুলের মতো কন্যা আগুনের পালঙ্কে!

অনুত্তমের পর সুজন। সুজনের কাহিনীর অল্পই আমাদের অজানা। সেটুকু বলি। বিদেশ থেকে ফিরে সুজন দেখে তার বাবা কোনো মতে নিঃশ্বাস ধারণ করে রয়েছেন বৌমার কোলে মাথা রেখে নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন এই আশায়। তাঁর যন্ত্রণার অবসান হবে সে যদি তাঁর কথামতো বিয়ে করে। নইলে তার যন্ত্রণা দীর্ঘতর হবে। ছেলের মুখে 'না' শুনলে হয়তো তিনি তৎক্ষণাৎ হার্ট ফেল করে মারা যাবেন। এমন বিপদেও কেউ পড়ে! সুজন চোখ বুজে বিয়ে করল। আর বাবা বৌমার কোলে মাথা রেখে চোখ বুজলেন। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য।

বিয়ে মোটের উপর সুখের হয়েছে। সীতা সেকালের সীতার মতো পতিব্রতা। নিজের জন্যে কিছু চায় না। ঝি চাকর রাখতে দেয়নি। নিজেই রাঁধে। সেইজন্যেই সুজনের হাতে টাকা জমতে পেরেছে। অধ্যাপনা করে, সিনারিও লেখে, অভিনয়ের মহড়ায় উপস্থিত থেকে নির্দেশ দেয়। এই সব করে সুজন একরকম গুছিয়ে নিয়েছে। একটি সন্তান হয়েছিল। বাঁচল না।

মধ্যে একদিন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে বকুলের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা। সুজন প্রথমটা চিনতে পারেনি। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কাঠ কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে বকুল। কী একটা সাংঘাতিক অসুখ করেছিল তার। দু'বছর ভুগতে হয়েছে। বহু দেশ বেড়িয়ে এখন একটু ভালো বোধ করছে। বকুল যদিও বলল না তবু সুজন বুঝতে পারল কী সে অসুখ। কে তার জন্যে দায়ী। বকুলের চাউনি এড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল। সে চাউনি বঞ্চিতা নারীর। বকুল বিশ্বাস করেনি যে সুজন সত্যি সত্যি বিয়ে করবে আরেকজনকে। মুখে অনুমতি দিয়েছিল বটে। মন থেকে তো দেয়নি। জ্বলেপুড়ে মরছে।

চার জনের কাহিনী সাঙ্গ হলে চার দিক নিস্তব্ধ হলো। রাত তখন অনেক। ঘড়ি

আনিয়ে দেখা গেল বারোটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। তন্ময় লাফ দিয়ে উঠল। স্বজন তাকে ধরে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা বছরের শেষ রাত্রি। একটু পরে আরম্ভ হবে নববর্ষ।'

'সিলভেস্টার।' কান্তি চমকে উঠে বলল, 'নাচতে ইচ্ছা করছে যে।'

তন্ময়েরও ইচ্ছা করছিল নাচতে। দুই বন্ধুতে হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করে দিল। ওদের বেহায়াপনা দেখে অনুত্তম বিষম অপ্রসন্ন হলো। স্বজন গেল সাপার আনতে। খেতে খেতে বারোটা বাজিয়ে দেওয়াই রেওয়াজ।

'যত সব বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড।' অনুত্তম ফেটে পড়ল যখন লক্ষ্য করল স্বজন দুই হাতে দুই গ্লাস তরল পদার্থ নিয়ে উঠে আসছে।

ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। ততক্ষণে ওরা স্যাণ্ডউইচ পনীর ও বিস্কুট খেতে বসেছে। অনুত্তমের জন্যে গরম দুধ। আর সকলের জন্যে দ্রাক্ষারস। চার জনেই চার জনকে বলল, 'নববর্ষ সুখের হোক।'

কান্তি বলল, 'আজ থেকে আবার আমাদের যাত্রারম্ভ। যে জীবন পিছনে পড়ে রইল তার দিকে ফিরে তাকাব না। যে জীবন সামনে তার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাব।'

'তোর সঙ্গে যতক্ষণ আছি,' তন্ময় বলল, 'ততক্ষণ মনে হচ্ছে আমার বয়স বিশ একুশ বছর। তা তো নয়। একটু পরে যেই বাড়ী ফিরব অমনি মালুম হবে ষাট বাষট্টি বছর জীবনের আর ক'টা বছর বাকী আছে যে নতুন করে যাত্রারম্ভ করব। কার অভিমুখে পদক্ষেপ? তাকে যে, ভাই, চিরকালের মতো হারিয়েছি। আমার রূপমতীকে।'

'আমিও আমার কলাবতীকে।' বলল স্বজন। কেন বেঁচে থাকব, কিসের প্রত্যাশায় বেঁচে থাকব, সেইটেই বুঝতে পারছিনে। লিখতে বসলে লেখা আসে না। সাহিত্যের পাট চুকে গেছে। পয়সার জন্যে যা করছি এ তো ব্যবসাদারি। বয়সটা আমার আজ পঁচিশ বছর কমে গেছে, কিন্তু কাল বকুলের দিকে তাকালে হু হু করে বেড়ে বাহাত্তর হবে। যাত্রারম্ভ আমার জন্যে নয়।'

'এই ক'বছরে আমার বুকে শেল বিঁধেছে।' বলল অনুত্তম। 'শেল বিঁধে রয়েছে। দেশ ভগ্ন। লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণী নিহত, উন্মূলিত, ধর্ষিত, নষ্ট। মহাগুরু নিপাতের পাপে জাতীয় শরীর বিষাক্ত। বেঁচে আছি বলে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। তবু বাঁচতে হবে। এখনো তার সঙ্গে শুভদৃষ্টি বাকী। আমার পদ্মাবতীর সঙ্গে। তা বলে যাত্রারম্ভ। না ভাই। সে উৎসাহ নেই। বয়স আমার কমেনি। আজকের দিনেও।'

কান্তি ভেবে বলল, 'আমাদের 'পর ভার পড়েছে আমরা আদি কাল থেকে চলে আসতে থাকা একটি অন্বেষণের ধারাকে বহমান রাখব। অন্বেষণ সার্থক হলে তো ফুরিয়েই গেল। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় নয় যে ফুরিয়ে যায়। তাঁর সৃষ্টি যেমন

অসমাপ্য আমাদের অন্বেষণও তেমনি। অন্বেষণ চলতে থাকবে। আরো লক্ষ লক্ষ বৎসর। নিরবধি কাল।'

'আমি কিন্তু এ ভার বইতে পারছিনে, ভাই।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল তন্ময়। 'আমি সরে দাঁড়ালুম। অন্বেষণ চলতে থাক। আমি অচল। রাজ যেদিন চলে যায় সেই দিন থেকে অচল। সেদিন আমার উচিত ছিল তার অন্বেষণ করা, তার পশ্চাদ্ধাবন করা। সব সহ্য করে তার সঙ্গে লেগে থাকা। তা তো আমি পারলুম না। আমি এক হিসাবে অসমর্থ পুরুষ। নেহাৎ মিথ্যে বলেনি সে। দৈহিক অর্থই একমাত্র অর্থ নয়।'

'আমারও ভুল হয়েছিল বকুলের মুখের কথাকে মনের কথা ভেবে তার অন্বেষণ ছেড়ে দেওয়া, তার পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করা।' সুজন বলল অনুশোচনার সঙ্গে। 'বিবাহের বাসনা প্রবল হয়েছিল, বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুযন্ত্রণা সইতে পারিনি। তখন তো বুঝতে পারিনি যে বকুলের জীবনের মূলে কুড়ুলের কোপ লেগেছে। বকুল এখন ছিন্নমূল। আমিও তাই। অন্বেষণের ধারা বহমান রাখা কি আমার কাজ। অনুত্তম কান্তি, তোরা দু'জনে এগিয়ে যা। তোদের দু'জনের মধ্যেই সার্থক হব আমরা দু'জন, তন্ময় আর আমি।'

'আমার দৌড় কতটুকু।' অনুত্তম বলল ভাঙা গলায়। 'মহাত্মা বলে রেখেছিলেন তিনি ভ্রাতৃহত্যার জীবন্ত সাক্ষী হবেন না। আমিও বলে রেখেছি যে আর একটা সাম্প্রদায়িক নরমেধ ঘটলে আমি প্রাণ দেব। অন্বেষণের ধারা বহমান রাখা আমার পক্ষে কী করে সম্ভব। আমাকেও বাদ দে। ঐ কান্তিই আমাদের সকলের যৌবন। ওর সার্থকতাই আমাদের সার্থকতা।'

তখন ওরা কান্তিকে ঘিরে বসল। বলল, 'কান্তি, তুই আমাদের সকলের তারুণ্য। তোর সার্থকতায় আমাদের সার্থকতা। অন্বেষণের ধারা অব্যাহত থাকবে তোর মধ্যে, তোর অন্বেষণের মধ্যে। জীবনমোহনের যোগ্য উত্তরসাধক তুই, কান্তি। আমরা নই।'

কান্তি অভিভূত হলো। ধীরে ধীরে বলল, 'আমার ঘর নেই। আমি অনিকেত। আমার সংসার নেই। আমি অসংসারী। আমার সঞ্চয় নেই। আমি অসঞ্চয়ী। সম্বল বলতে আমার একটা সুটকেস ও একখানা কম্বল। কোথাও বাঁধা পড়ব না বলে বিয়ে করিনি ও করব না। বিবাহই একমাত্র বন্ধন নয়। তার চেয়ে বড় বন্ধন স্বত্ব। সে বন্ধনও আমি পরিহার করেছি ও করব। কিন্তু নারীকে আমি পরিহার করিনি। করব না। তার রস আস্বাদন করেই আমি ক্ষান্ত। নারীর মধ্যে চিরন্তন হচ্ছে তার রস। তার রসকলি।'

'তাই কি।' অনুযোগ করল অনুত্তম। 'চিরন্তন হচ্ছে তার শক্তি। তার সিঁথির সিঁদুর।'

'চিরন্তন তার অন্তর্দীপ্তি। তার তুলসী তলার প্রদীপ।' নিবেদন করল সুজন।

'তার অঙ্গস্বযমা। তার নীবিবন্ধ।' অভিমত দিল তন্ময়।

কান্তি হেসে বলল, 'এ সেই অন্ধের হাতী দেখার মতো হলো। আমরা চার জনে চার জায়গায় হাত রেখেছি। চার জনের সত্য যদি এক জনের হয়, চার জন যদি হয় এক জন, তা হলে আমাদের সকলের কথা হবে এক কথা। পাই আর না পাই, হারাই আর না হারাই, আমরা কেউ ব্যর্থ হইনি। আমাদের চারটি কাহিনী মিলে একটি কাহিনী।'

'সে কাহিনী একই রাজকন্যার, যে কন্যা সব নারীর কল্পরূপ।' বলল সুজন।

'যে নারী চিরন্তনী।' বলল অনুত্তম।

'যে চিরন্তনী ক্ষণিকা।' বলল তন্ময়।

কান্তি তার বন্ধুদের হাত নিজের হাতের ভিতর টেনে নিল। বলল, 'পিছন ফিরে তাকাব না। কিন্তু যদি তাকাই তা হলে যেন একককেই দেখতে পাই, একাধিককে নয়। যখনি তাকাই তখনি যেন দেখতে পাই সেই এককের অফুরান সৌন্দর্য।'

'অফুরন্ত প্রীতি।' ইতি সুজন।

'অসীম সাহস।' অথ অনুত্তম।

'অপার করুণা।' অতঃপর তন্ময়।

রাত গভীর হয়ে আসছিল। আর দেরি করা যায় না। সুজনের উনি যে কোনো সময় এসে পড়বেন। তন্ময়ের ইনি ক্ষমা করবেন না। অনুত্তমের চিটাগং মেল সকাল ছ'টায়। কান্তিকে মহারাজা প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ করেছেন। মহারানীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন।

কান্তি বলল, 'সামনের দিকে তাকালেও সেই একককেই দেখতে পাব। তন্ময়ের ঘরে তিনিই এসেছেন। সুজনের ঘরেও তিনি। কোনো খেদ রাখব না। ধন্যতা জানাব পদে পদে, কথায় কথায়।'

'শত শত ধন্যবাদ।' জানাল অনুত্তম।

'শত সহস্র ধন্যবাদ।' জ্ঞাপন করল তন্ময়।

'সহস্র সহস্র ধন্যবাদ।' শেষ করে দিল সুজন।

একা কান্তি যাত্রা করল চার জনের হয়ে। অন্বেষণের ধারা বহমান রাখতে। যৌবনের প্রান্তে উপনীত হয়ে তন্ময় সুজন অনুত্তম আবিষ্কার করল যৌবন ফুরিয়ে যায়নি। যৌবনের স্বপ্ন মিলিয়ে যায়নি। যেখানে অস্ত সেখানেই উদয়। যেখানে অন্ত সেইখানে আদি। যেমন বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ।

(১৯৫২-৫৩)

—

সুখ

একটি মানুষকে সুখী করা কি সোজা কাজ! আমি তো মনে করি এর চেয়ে একটা সাম্রাজ্য জয় করা সহজ।

কিশোর বয়সে আমার বিশ্বাস ছিল সবাইকে সুখী করতে পারা যায়। আমি যদি না পারি সেটা আমারি দোষ। বার বার ঠেকে দেখলুম সবাইকে সুখী করা আর যারি সাধ্য হোক আমার তো অসাধ্য। একে একে আর সকলের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে একজনকেই সুখী করার সাধনায় নিমগ্ন হলুম।

পারলুম কি সেই একজনকেও সুখী করতে। ব্যর্থতা বহন করে যখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসি তখন আমার বয়স বিশের কোটার শেষ সীমানায়। কাউকেই আমি সুখী করতে পারব না। সে বিশ্বাসই আমার নেই।

তা হলে কি আমি আপনাকে সুখী করতে চাইব? না, সেটাও আমার স্বভাব নয়। তাতে আমার আত্মাভিমানে বাধে। আমাকে সুখী করবে আর সকলে। কেউ যদি না করে কাউকেই আমি সাধতে যাব না। কারো উপর রাগও করব না। অপেক্ষা করব। করতে করতে একদিন মরে যাব।

আমি জানি যে, এ জগৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আমার মতো নগণ্য প্রাণীকে সুখী করার জন্যে এত বড় বিশ্বব্যাপার ফেঁদে বসেননি। তাঁর অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। তাই কোনো দিন তাঁকে ভুলেও প্রার্থনা করিনি যে, প্রভু, আমাকে সুখী কর।

প্রার্থনা যখন করেছি তখন এই বলে করেছি যে, প্রভু, আমাকে সৃষ্টিক্ষম কর, সৃষ্টিতৎপর কর। আমার সামান্য একটুখানি সীমার মধ্যে আমিও যেন তোমারি মতো স্রষ্টা হতে পারি। তেমনি নিন্দাপ্রশংসার ঊর্ধ্বে। তেমনি ক্রয়বিক্রয়ের অতীত।

আমি আরো জানি যে, দুটো বর বিধাতা কাউকে দেন না। দিলে একটাই দেন। সেইজন্যে ওই একটাই বর প্রার্থনা করেছি। তার উপর যদি বলতুম, হে প্রভু, আমাকে সুখী কর, তা হলে পর পর দুটো বর চাওয়া হতো। বরাবর এমন ভয়ও ছিল যে সুখ বর দিলে তিনি হয়তো সৃষ্টি বর দিতেন না। কিংবা দিয়ে কেড়ে নিতেন। সুখ নিয়ে আমি করতুম কী যদি সৃষ্টি করতে না পারলুম! সুখ যদি আপনা থেকে আসে তা হলে বেশ। যদি আপনা থেকে না আসে তা হলেও বেশ। এলে মাথা পেতে নেব। না

এলে হাত পাততে যাব না। বিধাতার কাছেও না।

আমি যে সৃষ্টি বর পেয়েছি এ আমার একমাত্র প্রার্থনার উত্তর।

তুমি সাহিত্যিক, তোমার অভিজ্ঞতা কী রকম, জানিনে। আমি চিত্রকর, আমার অভিজ্ঞতা যদি জানতে চাও তো বলি, সৃষ্টির পক্ষে হতাশ প্রণয়ের মতো আর কিছু নয়। দেশে ফিরে এসে দিনরাত ছবি আঁকি সবগ্রাসী বেদনাকে ভুলতে ও ঢাকতে। ভূতের মতো খাটি শিল্পী হিসাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও দশজনের একজন হতে। সুখের কল্পনা একদিনের জন্যেও মনে উদয় হয়নি। তা সত্ত্বেও সুখ মাঝে মাঝে পথ ভুলে এসেছে। বড় কিছু নয়। ছোটখাটো সুখ। দু'হাত যোড় করে নিয়েছি। কিন্তু একবারও ভুলিনি যে আমাকে সৃষ্টি করে যেতে হবে কী শীত কী গ্রীষ্ম কী বর্ষা কী শরৎ।

কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘটল। একদিন লক্ষ করি আর্ট একজিবিশনে আমার আঁকা ছবি একদৃষ্টে ধ্যান করছেন বছর পঞ্চাশ বয়সের এক বাঙালী ভদ্রলোক। তাঁর অদূরে এক বাঙালী মহিলা। মহিলার মনোযোগ অন্য একজনের অঙ্কনের উপর ন্যস্ত। এঁদের আমি আগে কোথাও দেখিনি। কৌতূহল জন্মাল। কারা এঁরা? নজরবন্দী করলুম এঁদের। ভদ্রলোক ছবির দাম দেখতে দু'পা এগিয়ে গেলেন। তার পর মহিলার সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করলেন। তার পর আপিসে গিয়ে খবর দিলেন যে কিনতে চান।

আমি তার ও তার গৃহিণীর অনুসরণ করছিলুম। আপিসে যাঁদের ডিউটি তাদের একজন বললেন, 'ওই যে, স্বয়ং আর্টিস্ট আপনাদের পিছনে হাজির।'

ভারি খুশি হলেন তাঁরা আমাকে দেখে। আর আমিও তাদের অনুগ্রহ দেখে। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডক্টর ও মিসেস্ দস্তিদার। দু'জনেই অনুরোধ করলেন আমি যেন একদিন ওঁদের ওখানে আসি। ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমরা বুধবার সন্ধ্যায় বিসিভ করি।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা, আমি কোনো এক বুধবার সন্ধ্যার সন্ধানে রইলুম।'

জানতে চাইলুম তাদের বাড়ীর ঠিকানা, তাঁদের সঙ্গে চলতে চলতে।

ভদ্রলোক একটা বিখ্যাত রাস্তার নাম করে বললেন, 'চোদ্দ নম্বর। মনে থাকবে তো? চোদ্দ পুরুষ। চোদ্দ ভুবন। শিবচতুর্দশী। চতুর্দশপদী কবিতা।'

আমি হেসে বললুম, 'এক কথায় মনে রাখতে হলে—সনেট।'

এই বলে তাঁদের তুলে দিলুম তাঁদের মোটরে। তাঁরা বার বার করে বলতে থাকলেন, 'আসবেন কিন্তু।' 'আসবেন।'

এর পর ছবিখানার তলায় কাগজ এঁটে লিখে দেওয়া হলো 'বিক্রী হয়ে গেছে।'

রাস্তার নাম ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। নম্বরও আমার মনে ছিল। কিন্তু বুধবার না

গিয়ে আমি বৃহস্পতিবার যাই। ব্যর ভ্রম।

বাড়ী নয়। ফ্ল্যাট। কলিং বেল টিপতেই সাড়া দিল একটি বর্মী মেয়ে। কার্ড পাঠিয়ে দিলুম ভিতরে দাঁড়াতে হলো না। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে ধরে নিয়ে গেলেন কর্তা স্বয়ং। যেন কতকালের পরিচয়।

'কাল আমরা আপনাকে অনেকক্ষণ প্রত্যাশা করেছিলুম। এলেন না দেখে ধরে নিলুম যে এ সপ্তাহে আপনার সময় হলো না, পরের সপ্তাহে আসবেন। তার পর? ঠিক নম্বর খুঁজে পেয়েছিলেন তো?'

'হ্যাঁ, সার। সনেট আওড়াতে আওড়াতেই এসেছি। কিন্তু বারটা যে বৃহস্পতি নয় বুধ তা তো খেয়াল করিনি। ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। অদিনে এসে আপনাদের জ্বালাতন করছি। দেখুন, আজ বরং আমি ফিরে যাই। বুধবার আসব ঠিক।'

'আরে না, না। তা কি হয়! আর্টিস্টরা ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে বাছা বাছা ভুলগুলি নিয়েছে। আমাদের জন্যে—বৈজ্ঞানিকদের জন্যে—কিছু রাখেনি। ওঁরা খেতে বসেছেন। আসুন, আপনাকে খাবার ঘরে নিয়ে যাই।'

ভেবেছিলুম গৌরবে বহুবচন। তা নয়। খাবার টেবলে আরো একজন ছিলেন। দস্তিদার দম্পতীর একমাত্র কন্যা—একমাত্র সন্তান।

মালাকে তুমি তার যোল বছর বয়সে দেখনি। আমি দেখেছি। আমার পরম সৌভাগ্য। ও বয়সে ও যা ছিল তা অবর্ণনীয়। আমি তো সাহিত্যিক নই। ভাষায় বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়। তুলি দিয়ে করতে পারতুম হয়তো। সে রকম একটা প্রস্তাব ও ওঁদের দিক থেকে এসেছিল কিছুদিন পরে। রাজী হইনি কেন, জানো?

আচ্ছা, বলছি। তার আগে বলি সেদিন খাবার ঘরে কী হলো। ওঁরা আমাকে জোর করে টেবলে বসিয়ে দিলেন। মালার মুখোমুখি। খাব না, খাব না করে খেলুম সবই। বরং অপরের চেয়ে বেশী করেই খেলুম। ছবি আঁকার সময় ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। তার পর এমন খিদে পায় যে ভদ্র ও ভদ্রাদের সঙ্গে বসে অভদ্রের মতো গিলি। ভাগ্যিস্ ওঁরা পান করেন না। পানীয় সামনে রাখেননি। নইলে সেদিন আমার উপর ওঁদের ঘেন্না ধরে যেত।

ডকটর দস্তিদার বৈজ্ঞানিক হলেও সেকালের ঋষিদের মতো গভীর দৃষ্টিমান। কিছুক্ষণ একসঙ্গে কাটালেই বোঝা যায় ইনি প্রাচীন ভারতের কণ্বমুনি আর এঁর কন্যাটি আশ্রমকন্যা শকুন্তলা।

মালা না হয়ে ওর নাম হওয়া উচিত ছিল মিরান্দা। সরলতার, নিরীহতার নিখুঁত প্রতিমূর্তি। আজন্ম বর্মায় মানুষ। এই এক বছর আগে কলকাতা এসেছে। প্রধানত ওর জন্যেই ওর মা-বাবাকে বর্মা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। নইলে আরো বছর দশেক

চাকরি করতে পারতেন দস্তিদার। অসময়ে পেনসন নিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে কি তাঁর সাহস হতো? কিন্তু মালার মা পাঁচ বছর ধরে তাগিদ দিচ্ছিলেন যে তাঁকে তাঁর তপোবন ছেড়ে লোকালয়ে ভাগ্য-পরীক্ষা করতে হবে।

উদ্যানবেষ্টিত তপোবনের মতো ভবন। হরিণ চরে বেড়ায়। লোকলস্কর পশুপাখীতে জমজমাট। প্রকৃতির কোলে লালিত হয় তাঁর মালা। তাঁর শকুন্তলা বা মিরান্দা। প্রকৃতির কোল থেকে তাকে ছিনিয়ে নেবার কথা ভাবতে কি তাঁর মন চায়? থাকুক না আরো কয়েক বছর। কী এমন বয়স হয়েছে! কিন্তু জননী নিষ্ঠুর। মেয়ের বিয়ে দিতে হলে আগে থেকে সেই ভাবে তৈরি করতে হবে। রেঙ্গুনে রেখে সে ভাবে তৈরি করা যায় না। 'হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে' বলে নাকি একটা গান আছে। সেটা গাইতে শেখা চাই। 'নৃত্যের তালে তালে' নাচতে শেখা চাই। নইলে ভালো বিয়ে হয় না। আর ভালো বিয়ে না হলে মেয়েমানুষের জীবন মাটি। বাপ মা তো চিরদিন বাঁচবে না। তখন ও মেয়ের কপালে দুঃখ আছে। যদি না—

সেদিন অতটা আঁচ করিনি। পরে একটু একটু করে বুঝতে পেরেছিলুম যে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে মা বাবার দু'জনের দু'রকম পরিকল্পনা ছিল। বাপ পনেরো বছর নিজের ইচ্ছা খাটিয়েছেন, আর পারেননি, হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এখন মায়ের ইচ্ছা খাটছে। রেঙ্গুনের সঙ্গে দস্তিদারের সম্পর্ক পঁচিশ বছরের। সেখানে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। সকলেই তাঁর নাম জানে, তাঁকে ভক্তি করে। কলকাতায় তিনি কে? অত বড় বাড়ী তাঁকে দেবে কে? বাগান তাঁকে দেবে কে? কায়ক্লেশে মাথা গুঁজে পড়ে আছেন এলগিন রোড অঞ্চলের একখানা ফ্ল্যাটে। আসবাবপত্র জলের দরে বিক্রী করে দিয়ে এসেছেন। সঙ্গে এনেছেন ওই মোটরটি আর ওই বর্মী আশ্রিতাটি। মালার বাল্যসখী। বাড়ীর গৃহকর্মে সাহায্য করে।

'জীবনকে নতুন করে আরম্ভ করতে হবে। এই ভেবে ভেবে জীবন গেল আমার।' বসবার ঘরে আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে মৃদু স্বরে বললেন ডক্টর দস্তিদার।

আমার দৃষ্টি তখন মালার অনুসরণ করছে। সারা ইউরোপে এ রকম মেয়ে আমি একটিই দেখেছি। এক হাঙ্গেরিয়ান আর্টিস্টের কন্যা। যেন এ জগতের নয়। মাটি দিয়ে নয়, আকাশ দিয়ে গড়া। আর একটি দেখলুম এত দিন বাদে আমার স্বদেশে। এদের আঁকা খুবই কঠিন। বিশেষত আমাদের মতো আধুনিক শিল্পীদের পক্ষে। আমরা শরীরের অ্যানাটোমি শিখি। তাই যথেষ্ট নয়। মডেল সামনে রেখে বার বার দেখি, বার বার মিলিয়ে নিই। এই তো আমাদের শিক্ষা। আমাদের যদি যীশুজননী মেরী আঁকতে বলা হয় তো আমরা সাত হাত জলে পড়ি। সে পবিত্রতা আমরা পাব কোথায়? কার কাছে? ও সব বিষয়ে আমরা হাত দিইনে। নিজেদের অক্ষমতা ঢাকি এই বলে

যে, ও সব এখন সেকেলে। ওর মধ্যে নূতনত্ব নেই। পবিত্রতাকেও হেসে উড়িয়ে দিই। মাতৃত্বের মাধুরী আমাদের স্পর্শ করে না। নারীর দেবীত্ব আমাদের চোখে পড়ে না। তাই এলিজাবেথকে আঁকিনি। মালাকেও না।

সেদিন বসবার ঘরে দেখি আমারি আঁকা সেই প্রদর্শনীর ছবি। তারিফ করলেন মিসেস দস্তিদার। বললেন, 'দার্জিলিঙের লেপচা মেয়ের ছবি তো এমন সুন্দর হয় না। একে আপনি কোথায় দেখলেন জানতে ইচ্ছা করে।'

আমি ফস করে জবাব দিলুম, 'ঘুম ছাড়িয়ে টাইগার হিলের পথে।'

তিনজনেই ওঁরা সরলবিশ্বাসী। আমার কথা বিশ্বাস করলেন। কিন্তু সেই যে একবার ধরা পড়ে গেলুম তারপর থেকে আমি অতি সতর্ক। মালার ছবি আঁকলে সেই প্রশ্নই ঘুরে ফিরে শুনতে হতো। আসলে যা হয়েছিল তা তুমি নিশ্চয় অনুমান করেছ। লেপচা মেয়ে আমি টাইগার হিলের পথে না হোক দার্জিলিঙের পথে ঘাটে দেখেছি। কিন্তু ছবি আঁকতে গিয়ে যা ঘটল তা আমার নিজের চোখও বিশ্বাস করতে চায় না। সাদৃশ্য ফুটল আর একটি মেয়ের। যার ছবি রাশি রাশি এঁকেছি। হাঁ, প্যারিসের মেয়ে। প্যারিসিয়েন। প্রিয়দর্শনা ওদিল।

কথায় কথায় বললুম, 'আমিও আপনাদের মতো এক বছর হলো ফিরেছি। প্যারিসের রেশ এখনো মিলিয়ে যায়নি। অসম্ভব নয় যে অজান্তে বিদেশিনীর আদল এসে পড়েছে। ছিলুমও তো বড় কম দিন নয়। লণ্ডনে দুই আর প্যারিসে পাঁচ বছর।'

'ওঃ! তাই নাকি?' দস্তিদারের কৌতূহল উজ্জীবিত হলো। 'কত কাল দেখিনি। মহাযুদ্ধের দু'বছর আগে আমি ইংলণ্ড থেকে সরাসরি বর্মায় পাড়ি দিই। বেশীর ভাগ সময় কেমব্রিজেই কাটিয়েছি। ছুটিতে কন্টিনেন্টে বেড়িয়েছি। হাঁ, প্যারিসেও গেছি। ফরাসীরা হলো জাত বিপ্লবী। তাদের ভিতরে আগুন আছে। অমন একটা বিপ্লব কি আর কোনো জাত বাধাতে পারত? আপনারও কি তা মনে হয়নি?'

মানলুম। বললুম, 'জাত বিপ্লবী না হোক ধাত বিপ্লবী। কিন্তু ওদের মুশকিল হয়েছে এই যে ইতিহাস ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। এখন বিপ্লব বলতে বোঝায় রুশবিপ্লব। ফরাসীবিপ্লব নয়। সকলের নজর রাশিয়ার উপরে। ফ্রান্সের উপর কারো নজর নয়। বিপ্লব ওরা অবশ্য যে-কোনো দিন ঘটাতে পারে। সে শক্তি ওরা রাখে। কিন্তু ঘটনার স্রোত কি সেইখানেই থামবে? ঘটিয়ে তুলবে রুশবিপ্লব। তখন না থাকবে লিবার্টি, না থাকবে প্রপার্টি। ফরাসীদের যে-দুটি না হলেই নয়। সেইজন্যে বিপ্লবকে যদিও ওরা অন্তরে অন্তরে ভালোবাসে তবু বিপ্লবকেই ওরা হাড়ে হাড়ে ডরায়। ওদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান কোনো দিন হবে না।'

দস্তিদার বললেন, 'মহাযুদ্ধের আগে এ রকম তো দেখিনি।'

আমি বললুম, 'না, মহাযুদ্ধের আগে এ রকম ছিল না। এ পরিস্থিতি যুদ্ধোত্তর যুগের। আমরা প্রথমে ভেবেছিলুম যুদ্ধের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। তা নয়। এখন রোগনির্ণয় হয়েছে। এটা বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায় নয়, রুশবিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়। যতদিন না সেন নদীর তীরে আর একটা রুশবিপ্লব ঘটছে ততদিন এর সমাপ্তি নেই। কিন্তু তা তো কেউ প্রাণ থাকতে ঘটতে দেবে না। কাজেই এ রোগের প্রতিকার নেই।'

মিসেস দস্তিদার নীরবে শুনছিলেন। বললেন, 'না থাকাই ভালো। লিবার্টি আর প্রপার্টি বাদ দিলে জীবনে আর বাকী থাকে কী? আপনার ওই আর্ট কদ্দিন থাকবে? আর এঁর এই সায়েন্স কদ্দিন থাকবে?'

আমি নিজেও তাঁরই মতো সন্দিহান। তা হলেও আমাকে বলতে হলো, 'আর্ট কদ্দিন থাকবে, এ প্রশ্ন তো আজকেও করা যায়। ফরাসীরা বিপ্লবের নেশা ছাড়বে না। ওটা ওদের জীবনের অঙ্গ। ও না হলে ওরা ফরাসীই নয়। অথচ বিপ্লব মানে তো সর্বনাশ। তাই ওরা করছে কী, না বিপ্লবের স্বাদ আর্টে খুঁজছে। জীবনে যা ঘটানো গেল না তা আর্টে ঘটাবে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবে। ব্যবহারিক জগতে তার মূলও নেই, তার ফুলও নেই। তা হলে বেঁচে থাক ওরা ওদের লিবার্টি আর প্রপার্টি নিয়ে। তাও পারছে কোথায়? অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জর। ভিতরে ভিতরে অসুস্থ।'

সেদিন আরো অনেক গল্প হলো। কলকাতা শহরে ওঁরাও নবাগত, আমিও নবাগত। আমার কেবল সাত বছর ইউরোপে নয়, চার বছর লক্ষ্ণৌয়ে কেটেছে। উভয় পক্ষে একটা যোগসূত্র পাওয়া গেল। সেটা নবাগতের প্রতি নবাগতের সহানুভূতি। ওঁরা বললেন, 'বুধবার-বুধবার তো আসবেনই। তা ছাড়াও যখন আপনার খুশি।'

যখন খুশি অবশ্য যাওয়া যায় না। সাত দিনে একদিন যেতে হলেও বুধবারগুলোর হিসাব রাখতে হয়। আমি বেহিসাবী মানুষ। বুধবার যে কেমন করে পেরিয়ে যায় আমার খেয়াল থাকে না। পরে আবিষ্কার করি। মাসে হয়তো একবার হাজিরা দিই। ওঁরা অনুযোগ করেন। আমি অজুহাত দেখাই।

এমনি করে ও বাড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। কবে এক সময় ওঁরা আমাকে তুমি বলতে আরম্ভ করেন। আর আমিও ওঁদের মাসিমা ও মেসোমশায় বলে ডাকতে শুরু করি। ভেবেছিলুম দাদা বৌদি বলে ডাকব। কিন্তু তা হলে মালার কাকাবাবু বনতে হয়। তাতে আমার অরুচি। আমি ওর দাদা হতে পারলেই সুখী হই।

তা বলে ওর প্রতিকৃতি আঁকতে সম্মত নই। জানি ব্যর্থ হব। মাসিমা যখন অনুরোধ করলেন আমি বললুম, 'মাসিমা, মালা আপনার চক্ষের মণি। আমারও কাছেও কম আদরের নয়। কিন্তু আর্টের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি দয়ামায়ার ধার ধারেন না। আর্ট সেদিক থেকে বিজ্ঞানেরই মতো নির্মম। মালার ছবি দেখে আপনি হয়তো চমকে

উঠবেন। কৈফিয়ৎ দাবী করবেন। কী কৈফিয়ৎ আমি দেব? লেওনার্দোকে লোকে চার শতাব্দী ধরে দুষছে। মোনা লিসার ভুরু নেই কেন? তবু তো তখনকার দিনে প্রতিকৃতি ছিল মোটের উপর অনুকৃতি। এখন ফোটোগ্রাফির যুগে পাছে আমাদের কেউ ফোটোগ্রাফার বলে সেই ভয়ে আমরা অনুকৃতির ছায়া মাড়াইনে। আপনি হয়তো বলবেন বিকৃতি।'

মাসিমা শিউরে উঠলেন। 'তা হলে কাজ নেই এঁকে।'

আমি বললুম, 'তার চেয়ে আপনি কোনো ভালো ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে ওর পোর্ট্রেট করান। আজকাল ফোটোগ্রাফির আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে। হাতে আঁকার মতোই দেখতে। অথচ অবিকল সেই মানুষটি। সেই মোনা লিসা, সেই ভুরু দুটি।'

'কিন্তু সেই হাসিটি নয়।' বাধা দিলেন মেসোমশায়।

'আহ্! সেই হাসিটি নয়।' আমি দুই হাত তুলে টেবলে তাল দিয়ে বললুম, 'সেই হাসিটি নয়। কিন্তু সে হাসির আবার একমারি অর্থ করা হয়। কেউ কেউ বলে ওটা শয়তানি হাসি। দেখুন দেখি, লেওনার্দোর পাল্লায় পড়ে কী বদনাম হয়েছে বেচারির। এই বা কী। এল গ্রেকোর হাতে গ্র্যাণ্ড ইন্‌কুইজিটর মহোদয়ের কী দশা হলো জানেন তো। তখনকার দিনে কেউ টের পায়নি—স্বয়ং গ্র্যাণ্ড ইন্‌কুইজিটরও না—যে, এল গ্রেকো ভাবী কালের জন্যে একটি ভয়াবহ দলিল সম্পাদন করে যাচ্ছেন। ইন্‌কুইজিটরের আত্মা সেখানে উলঙ্গভাবে উদ্‌ঘাটিত। অথচ বাইরে কেমন ধর্মের ভড়ং। সাক্ষাৎ মহাসাধু।'

মেসোমশায় আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, 'ওহে দেবপ্রিয়, তা হলে তুমি এক কাজ কর। তুমি আমার ছবি আঁক।'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, না, সার। কিন্তু মাসিমা আমার কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'না, বাবা, তোমাকে আঁকতে হবে না। সুনামের সঙ্গে সারাজীবন কাটিয়ে এসে শেষকালে তোমার খপ্পরে পড়ে কী যে চেহারা খুলবে অধ্যাপকের। লোকে বলবে জংলী না বুনো! তা নেহাৎ ভুল বলবে না বোধ হয়।'

সে সময় আমি জানতুম না যে ওঁদের দু'জনের মধ্যে একটা আড়াআড়ি চলছিল। একটু একটু করে আবিষ্কার করি। একদিনে নয়, একজনের মুখ থেকে শুনে নয়। মাসিমা বহুকাল সহ্য করে এসেছেন, আর পারছেন না। বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে তো। কর্তা গাছপালা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে চান করুন যত খুশি। কিন্তু মানুষ তো উদ্ভিদ্ নয়। আর সে তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে কি তার অসহায়তার সুযোগ নিতে হয়! মাসিমা স্বামীকে পুত্র উপহার দিতে পারেননি বলে মনে মনে অপরাধী বোধ করতেন। তাই মালার বেলা পিতার ইচ্ছায় কর্ম মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে।

দেখে বিশ্বাস হয় না যে মেসোমশায় ছিলেন স্বদেশীযুগে সন্ত্রাসবাদীদের দলে। তাঁর বাবা সে কথা জানতেন না। যেদিন জানতে পেলেন সেদিন সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে বিলেত পাঠানোর আয়োজন করলেন। তিনি তখন এম এ পড়ছিলেন, বিলেত গিয়ে কেম্ব্রিজে পড়তে হবে শুনে আনন্দে অধীর। কিন্তু একটা শর্ত ছিল। বিয়ে করে যেতে হবে। তাঁর তাতে ঘোরতর আপত্তি। তখন একটা রফা হলো। বিবাহ নয়, বাগ্‌দান। মাসিমা তখন ভগিনী নিবেদিতার স্কুলের ছাত্রী। নিবেদিতার প্রিয়পাত্রী। বাগ্‌দান তাঁকে স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার সময় দিল। তার পরে মেসোমশাই বলে পাঠালেন তিনি ডক্টরেট না নিয়ে ফিরবেন না। মাসিমাকে আরো দু'বছর অপেক্ষা করতে হলো। সে দু'টো বছর তিনি তাঁর ভাবী স্বামীর নির্দেশে বেথুন কলেজে পড়েন। তখনকার দিনে ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে সেটা একটু অসাধারণ।

বিলেতের জলহাওয়ায় মেসোমশায়ের সন্ত্রাসবাদ সেরে যায়। তা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে বাংলাদেশে চাকরি করা নিরাপদ হতো না। টিকটিকি তো পিছনে লাগতই, দাদারাও তাঁকে ছাড়তেন না, অন্তত চাঁদাটা আদায় করতেন। তাই তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যান। মাসিমা কী আর করেন। সীতার মতো অনুগতা হন। রেঙ্গুনের কাজে যোগ দিয়ে তার পরে এক সময় কলকাতা এসে মেসোমশায় বিয়ে করে মাসিমাকে নিয়ে যান। সেখানে ওঁরা সুখেই ছিলেন। একমাত্র দুঃখ ওঁদের সন্তানভাগ্য আশানুরূপ হয়নি। আশা ছিল তিন ছেলেমেয়ের মা বাপ হবেন। তাদের নাম রাখবেন অরুণ বরুণ কিরণমালা। অরুণ বরুণ তো এলোই না। কিরণমালা এলো দশ বছর বাদে। ততদিনে কিরণমালা নামটা সেকেলে হয়ে গেছে। তাকে ছেঁটে ছোট করা হলো, যাতে আধুনিকদের মনে ধরে। মালা বলে নামকরণ হলো মেয়ের।

মেসোমশায়ের বাবা বিশ্বাস করতেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ তার অতীতের পুনরাবর্তন। তিনি ছিলেন তপোবনের পক্ষপাতী, তপোবনে বালকদের আবাসিক শিক্ষার পক্ষপাতী। মেসোমশায়ের বাল্যকালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তাঁর বয়সটা ততদিনে আশ্রম বিদ্যালয়ের বয়ঃসীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই তাঁর মনে একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। তপোবনের প্রতি অনুরাগ ও সন্ত্রাসবাদের প্রতি আকর্ষণ এক স্তরের নয়। একটা সুগভীর, অন্যটা অগভীর। বিলেত থেকে ফিরে আসার পরও তিনি তপোবনের চিন্তায় বিভোর থাকেন। তবে সেকালের তপোবন ও একালের তপোবন একই রকম হতে পারে না। বল্কল পরিধান, সমিধ সংগ্রহ, অগ্নিহোত্র ও বেদমন্ত্র পাঠ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য পুত্রকন্যাকে জননীর কোল থেকে নিয়ে প্রকৃতির কোলে তুলে দেওয়া। কিন্তু প্রকৃতি বলতে বনজঙ্গল বোঝায় না, যেখানকার অধীশ্বর পশুরাজ। প্রকৃতি বলতে বোঝায় তপোবন, যেখানকার কুলপতি মহর্ষি। মহর্ষিরও বাঁধাধরা সংজ্ঞা

নেই। তিনি বৈজ্ঞানিকও হতে পারেন আইনস্টাইনের মতো। ধন্বন্তরিও হতে পারেন সোয়াইটসারের (Schweitzer) মতো। তিনি নিরীশ্বরবাদী হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তপস্যা তাঁকে করতে হবেই। করতে হবে আলোর জন্যে, ভালোর জন্যে, যার জন্যে হট্টগোল থেকে অপসরণ না করে উপায় নেই।

একমাত্র কন্যাকে মেসোমশায় অন্য কোনো ঋষির তপোবনে পাঠাননি, নিজের কাছে রেখে নিজেই তার জন্যে তপোবন গড়ে তুলেছিলেন। নিজেই হতে চেয়েছিলেন কুলপতি ঋষি। ও মেয়ে জলে ভিজেছে, রোদে পুড়েছে, ঝড়ঝাপটায় ঘরে বন্ধ থাকেনি। ও মেয়ে খালি পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, প্রত্যেকটি ফুল পাতা চিনেছে, পাখী পুষেছে, গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি উৎপন্ন করেছে। বীজ বুনেছে, গাছ লাগিয়েছে, বাগান করেছে। লেখাপড়াও শিখেছে। গান গেয়েছে। ছবি এঁকেছে। মূর্তি গড়েছে। আবার ঘরকন্নার কাজও করেছে। ঝি চাকরের উপর নির্ভর করেনি। তাদের সঙ্গে ব্যবধান রক্ষা করে চলেনি। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা তিনি তার মূল্যবোধকে উচ্চ গ্রামে বেঁধেছেন।

কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য, কোন্‌টা সার কোন্‌টা অসার, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য, কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায়, কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা শ্রেয় কোন্‌টা প্রেয়, কোন্‌টা ধ্রুব কোন্‌টা অধ্রুব, কোন্‌টা সুন্দর কোন্‌টা অসুন্দর, এ নিয়ে মালার সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনা গল্পসল্প ওর আট ন'বছর বয়স থেকেই। মালাকেও তিনি নিজের যুক্তি খাটাতে বলতেন, নির্বিচারে মেনে নিতে বলতেন না। এমনি করে মালার শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল। উপনিষদের ঋষিকন্যাদের মতো।

ঋষিকন্যাদের মতো মালারও একদিন বিবাহ হবে, মেসোমশায় তা জানতেন। ও যখন সাবালিকা হবে তখন কেউ যদি ওকে প্রার্থনা করে তখন প্রার্থনা পূরণ করবে কি করবে না সেটা ও নিজে স্থির করবে। তখন পরামর্শ চাইলে পরামর্শ দেওয়া যাবে, সাহায্য চাইলে সাহায্য করা যাবে। কিন্তু বিবাহের জন্যে উপযাচিকা হওয়া ওর দিক থেকে যেমন অবমাননাকর ওর পিতামাতার দিক থেকেও তেমনি। কেনই বা তাঁরা বরপক্ষের দ্বারে উপযাচক হয়ে দাঁড়াবেন। মালা যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো তা হলে কি কন্যাপক্ষের দ্বারস্থ হতেন? আর মালারও কি আত্মসম্মান নেই? মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে কি ওর আত্মা নেই? বর্মী মেয়েদের দেখে শিখুক কেমন করে নিজের মান নিজে রাখতে হয়। তথাকথিত স্বস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে বিকিয়ে দিতে হয় না।

ওদিকে মৈত্রেয়ীর মতো মাসিমার কেবল একটিমাত্র জিজ্ঞাসা। 'যা দিয়ে আমার মেয়ে সুখী না হবে তা নিয়ে আমি কী করব?' তাঁর মতে সেই হচ্ছে বিদ্যা যা ভালো বিয়ের জন্যে। ভালো বিয়ে দাও, দেখবে মেয়ে চিরজীবন সুখী হবে। মেয়ের জন্মের পর থেকেই তাঁর মাথায় ঘুরছে কবে কেমন করে এ মেয়ের ভালো বিয়ে হবে। মেসোমশায়ের

কাছে মালা ব্যক্তিবিশেষ। তার অবাধ বিকাশ পূর্ণ বিকাশ হলো কাম্য। বিবাহ যেমন পুরুষের হয় তেমনি নারীরও হবে, কিন্তু ব্যক্তিগত পূর্ণতাটাই আসল। আর মাসিমার কাছে মালা মেয়েছেলে। বেটাছেলে নয়। ভুলে ভুল হবে যদি তাকে বেটাছেলের মতো করে মানুষ করা হয়। গোড়া থেকেই মেনে নিতে হবে যে একদিন একটি সুপাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। বিয়ে হবে বনে নয়, গ্রামে নয়, বর্মায় নয়, কলকাতা শহরে, বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে। সম্ভবত বনেদী একান্নবর্তী পরিবারে। তা হলে সেই অনুসারেই তাকে প্রস্তুত করতে হয়। শ্বশুর শাশুড়ী কেমনটি চান, তাঁদের ছেলে কেমনটি চায়, দেওর ননদ কেমনটি চায় এইটেই আসল। চাহিদা যাতে মেটে সেইটেই কাম্য। তাতেই সুখ, কারণ তাতেই নিরাপত্তা। নারী চায় নিরাপত্তা। আর সব তো অলঙ্করণ।

মেয়ে যতদিন হয়নি ততদিন রেঙ্গুনে তাঁরা বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলেন। স্থানান্তরের কথা চিন্তা করেননি। মালার যখন স্কুলে যাবার বয়স হলো মাসিমা বললেন, চল, কলকাতা যাই। বদলি কি কলকাতায় হয় না? হয়, হয়, চেষ্টাচরিত্র করলে হয় বইকি। নজীর আছে। মেসোমশায় বললেন, চেষ্টাচরিত্র মানে তো ধরাধরি। মোসাহেবী। সেটি আমাকে দিয়ে হবে না। আমি কাজ পেয়েছি যোগ্যতার জোরে, বর্মা বেছে নিয়েছি খোলা চোখে। বর্মা না চেয়ে বেঙ্গল চাইলে তখনি তা পাওয়া যেত। কেন চাইনি তা তো তুমি জানো। সন্ত্রাসবাদ একটুও কমেনি। কমলে পরে তখন দেখা যাবে।

মাসিমা কী আর করেন! স্বামীকে দণ্ডকারণ্যে ফেলে অযোধ্যায় ফিরে যেতে পারেন না। ভাগ্যিস্ এ সমস্যা সীতার জীবনে উদয় হয়নি। মাসিমার আত্মীয়রা তাঁকে লিখেছিলেন, তুই তোর মেয়েকে নিয়ে এখানে চলে আয়, বুড়ি। তারপর কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি মেয়ের বাপও আসবে। মাসিমা তাতে রাজী হননি। স্বামীকে তিনি একদিনের জন্যেও ত্যাগ করেননি। কিন্তু মালার জন্যে অনবরত মন খারাপ করেছেন। বিয়ে অবশ্য কম বয়সে দিতে ইচ্ছা নেই। কিন্তু বিবাহের প্রস্তুতি অল্প বয়স থেকেই শুরু করতে হয়। ব্রত উপবাস লক্ষ্মীপূজা শিবপূজা এসব দিয়েই শুরু। তারপর বিয়ে না হয় দু'দিন পরে হবে, না হয় আঠারো বছর বয়সে, কিন্তু বিয়ের নির্বন্ধ দু'দিন আগে হলেই বা ক্ষতি কী! এই ধরো এগারো বারো বছর বয়সে। গরিবের ছেলেকে বেঁধে রাখতে হয় মেডিকাল কলেজে বা এনজিনীয়ারিং কলেজে পড়িয়ে। কিংবা বিলেত পাঠিয়ে। বড়লোকের ছেলেকে বেঁধে রাখতে হয় সম্পত্তির আশা দিয়ে। সময় থাকতে কলকাতায় বসে খোঁজ খবর না রাখলে ভালো ভালো পাত্রগুলি সব বেহাত হবে। পড়ে থাকবে নিরেস মাল। সময় ও জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না।

রেঙ্গুনের স্কুল মাসিমার মনে ধরেনি। ওখানকার শিক্ষা বাঙালীর মেয়েকে বাঙালী সমাজে খাপ খাওয়াতে অক্ষম। চিরটা কাল তাকে বেখাপ হয়ে থাকতে হবে। তার

চেয়ে বাড়ীতে প্রাইভেট পড়া ভালো। তা বলে বাড়ীটাকে তপোবন করে তোলার মর্ম তিনি বোঝেন না। লোকালয়েই যাকে বাস করতে হবে বরাবর তাকে লোকালয়ের উপযুক্ত করে মানুষ করতে হয়। তপোবন থেকে লোকালয়ে গিয়ে সে কি জলের মাছ ডাঙায় সাঁতার কাটবে? আর ওই যে ভালো মন্দ ন্যায় অন্যায় সত্য অসত্যের চুলচেরা সন্ধিবিচ্ছেদ ও কি ব্যবহারিক জীবনের ধোপে টিকবে? বেঁচে থাকতে হলে আপোস করতে হয়। মুনি ঋষিরাও নিখুঁত ছিলেন না। সংসারে টিকে থাকতে হলে অনেক অনাচার অত্যাচার চোখ বুজে হজম করতে হয়। বিশেষ করে মেয়েমানুষকে।

অবশেষে বর্মা স্বতন্ত্র হলো। মেসোমশায়ের মনে হলো বর্মার লোকের মতো তিনিও ভারতের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছেন। তাঁকেও মনঃস্থির করতে হবে। কোন্‌টা তাঁর স্বদেশ? ভারত না বর্মা? বর্মাকে তিনি প্রাণভরে ভালোবাসতেন, কিন্তু তার জন্যে তিনি ভারতের প্রতি আনুগত্য হারাতে রাজী ছিলেন না। তা হলে বর্মায় তাঁকে বিদেশীর মতো বাস করতে হয়। তাতেও তিনি নারাজ। রেঙ্গুন থেকে বদলি হওয়া সম্ভব ছিল না। পেনসন নেওয়া সম্ভব ছিল। তিনি দেখলেন সেই ভালো। তারপর গৃহিণীর ইচ্ছায় কর্ম। কলকাতায় সংসার পেতে বসা। আপাতত ফ্ল্যাটে। পরে নতুন তৈরি নিজের বাড়ীতে। তারপর মনের মতো কাজ যদি জুটে যায় করবেন। নয়তো জীবনটাকে নতুন করে গুছিয়ে নেবেন। সেটাও তো একটা কাজ। বরং সেইটেই সব চেয়ে গুরুতর কাজ। তার জন্যে অবশ্য মজুরি মেলে না। নাই বা মিলল। জীবন তো জীবিকা নয়।

মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে মাসিমা চরকীর মতো ঘোরেন। আর মেয়ের বিকাশের কথা ভেবে মেসোমশায় বই কেনেন, ছবি কেনেন, রেকর্ড কেনেন, চারাগাছ কেনেন। তবে মাসিমার যেমন সেই একমাত্র ভাবনা মেসোমশায়ের তেমন নয়। তাঁর সঙ্গে কথা বললে তিনি সেজান, মাতিস্‌, পিকাসো নিয়ে মেতে থাকেন, আশ্চর্য তাঁর কৌতূহল ও গ্রহিষ্ণুতা। কিন্তু হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন আর বলেন, 'নতুন করে আরম্ভ করতে চাই, কিন্তু কোন্‌খান থেকে যে আরম্ভ করি! পুরাতন করে চাকরি করাই কি নতুন করে আরম্ভ!'

অফার পেয়েছিলেন দু'চার জায়গা থেকে। বললেন, 'থাক, কাজ নেই যুবকদের অন্ন মেরে। ওরা বেকার থাকলে ওদের মন ভেঙে যাবে। আমি বেকার থাকলে আমার তেমন কোনো আশঙ্কা নেই। তবে, হাঁ, চর্চার অভাবে যেটুকু শিখেছি সেটুকু ভুলে যেতে পারি। কাজ যদি হয় এমন কোনো কাজ যা যুবকদের দিয়ে হবার নয়, যার জন্যে প্রার্থীও নয় তারা, তা হলে বিবেচনা করতে পারি।'

গৃহিণী তা শুনে রাগ করেন। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে। বসে বসে খেলে

কুবেরের ধনও ফুরোয়। পেনসনের টাকায় তো কুলোয় না। পুঁজি ভাঙতে হয়। তা হলে মেয়ের বিয়ে হবে কী দিয়ে?

তখন কর্তা বলেন, 'মালার বিয়ের সময় হলে আমি স্বয়ংবর সভা ডাকব। দেখবে কত রাজপুত্তুর আসে। মালা তাদের একজনের গলায় মালা দেবে। সেই মাল্যবান হবে সবার চেয়ে ভাগ্যবান।'

॥ দুই ॥

দস্তিদারদের নতুন বাড়ী তৈরি হয়েছিল। গৃহপ্রবেশের দিন তাঁরা আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন আমার বোন নীলিমাকেও যেন নিয়ে যাই। সেদিন নীলির সঙ্গে মালার আলাপ হয়। আলাপ ক্রমে বন্ধুতায় পরিণত হয়।

বণ্ডেল রোডের এই নতুন বাড়ীতে মেসোমশায় নবীন উদ্যমে তপোবন রচনা করছিলেন। বহুকালের পুরোনো গাছ ছিল অনেকগুলি। গাছের গোড়ায় বেদী নির্মাণ হলো। নতুন গাছ লাগানো হলো যাতে সুদূর ভবিষ্যতে পুরোনো গাছের অভাব পূর্ণ হয়।

'এটাও একটা কাজের মতো কাজ। এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। আমি দেখতে পাব না। তাতে কিছু আসে যায় না পরে যারা আসবে তারা দেখলেই আমারও দেখা হবে। কী বল, দেবপ্রিয়?' মেসোমশায় আমার সমর্থন আশা করলেন।

আমি বললুম, 'আপনাকে আমরা অনায়াসেই আরো ত্রিশ বছর পাচ্ছি। যেমন শরীরের গাঁথুনি আর নিয়মনিষ্ঠ জীবন ত্রিশ কেন চল্লিশ বছর।'

তিনি আমার দুই কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, 'এসব গাছ বনস্পতি হতে অনেক বেশী সময় নেয়। এ যেন অজন্তার গুহাচিত্র। একখানা আঁকতে তিন পুরুষ লেগে যায়। এ তোমাদের আধুনিক চিত্রকলা নয় যে তিন দিনে একখানা সারা হবে। রাগ কোরো না। তোমাকে লক্ষ্য করে বলিনি।'

'বললেও আমি রাগ করতুম না, মেসোমশায়। কথাটা আমার বেলাও খাটে। তিন দিনে একখানা না হোক তিন মাসে একখানা আঁকা না হলে মনে হয় বৃথাই বেঁচে আছি। আর সবাই জোর কদমে এগিয়ে গেল। আমিই ঘোড়দৌড়ের শেষ ঘোড়া।'

তিনি আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, 'খরগোসদৌড়ের শেষ কচ্ছপ।'

ইতিমধ্যে তিনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছিলেন আমার আরো খানকয়েক ছবি কিনে। কেন যে কিনলেন তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি তো ইণ্ডিয়ান আর্ট বা

ভারতীয় ঐতিহ্যের ধার ধারিনে। একবার বলেওছিলুম ও কথা।

তিনি বলেছিলেন, 'তুমি সচেতনভাবে ভারতীয় শিল্পী নও। কিন্তু তোমার সৃষ্টি যে উৎস থেকে রস আকর্ষণ করছে সেটা ভারতেরই গঙ্গোত্রী। শুধু পদ্ধতিটা পাশ্চাত্য। তুমি শত চেষ্টা করলেও সেজানের রসের উৎস আবিষ্কার করতে পারবে না, মাতিসেরও না। ওঁদের কতকগুলো প্রবলেম আছে। সে সব প্রবলেম আঙ্গিকের বলে ভ্রম হয়। কিন্তু ওর ভিতরে আরো কথা আছে। যন্ত্রযুগের সঙ্গে ওঁরা একটা বোঝাপড়া করতে চান। তোমার কাছে এখনো সেসব সত্য হয়নি, কারণ ভারতের পক্ষে সত্য হয়নি।'

একজন বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে আর্ট শিখতে হবে আমাকে! হা ভগবান! যে আমি অত যত্ন করে কিউবিজম সিম্বলিজম ও সুররিয়ালিজম আয়ত্ত করে এলুম। শুধু কি পদ্ধতি? ও দেশে আমার জীবনযাত্রা ছিল বোহেমিয়ান। যেমন আর দশজন আর্টিস্টের। সেটি কি এ দেশে হবার জো আছে! আর প্রবলেমের কথা যদি উঠল তা হলে বলি, ওসব প্রবলেম এ দেশেও দেখা দেবে, কারণ আধুনিকতা অপরিহার্য। ওসব পাশ্চাত্য নয়, বিশ্বজনীন।

আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম যে মেসোমশায়ের টাকা আমি তাঁকে কৌশলে ফেরৎ দেব। মালাব বিয়েব সময়। ও টাকা আমার পাওনা নয়, তিনি আমার ছবি ঠিক চিনতে পারেননি। প্যারিসের প্রদর্শনীতে আমার ছবি দেখে সমজদাররাও ধরতে পারেননি যে, ও ছবি একজন ভারতীয়েব আঁকা। মেসোমশায়ও ধরতে পাবতেন না যদি প্যাবিসে দেখতেন। উঃ! বুকটা ফেটে যায় শুনলে যে আমি ভারতীয় শিল্পী! আমি ভারতীয় হতেও রাজী আছি, শিল্পী হতেও রাজী আছি, কিন্তু ভারতীয় শিল্পী হতে নারাজ।

আমার ছবি ইউরোপীয়রাই কেনে বেশী। আরো বেশী দাম দিয়ে। ওদেরও ধারণা ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শন সংগ্রহ করছে। মরুক গে। টাকাটা আমার দরকার। আমি কেন ছাড়ি? কিন্তু পরে একদিন ওদের দেশের সমজদাররাই বলবে যে আইকং একজন মডার্ন আর্টিস্ট, যাঁর দেশ নেই, কাল আছে।

আমাব মনে হয় মেসোমশায় এটা জানতেন, সব জেনেশুনেই আমার ছবি কিনতেন, কারণ তাতে এমন কিছু ছিল যা তাঁকে স্পর্শ করত। আমি তো রং দিয়ে আঁকতুম না, আঁকতুম রক্ত দিয়ে। যে বেদনা অহরহ আমাকে বিহ্বল করে রেখেছিল তাবই একটা ক্যাথারসিস অন্বেষণ করতুম চিত্রকলায়। ওদিকে মেসোমশায়েরও একটা ব্যথা ছিল। ছেড়ে চলে এসেছেন চিরাচরিত জীবন।

একদিন বললুম, 'জীবন তো নতুন করে আরম্ভ হলো। যেমনটি চেয়েছিলেন।'

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তার পরে ধীরে ধীরে বললেন, 'পুরোনো

পরিবেশটাকে কোনো রকমে ফিরিয়ে আনা গেল। এই পরিবেশেই আমি সুখী ছিলুম, তাই আবার আমার সুখী হওয়া তো উচিত। তবু হতে পারছি কই? পুরোনো বোতলে আমি চাই নতুন মদ। ভারতও চায় তাই। কিন্তু কোথায় সে নতুন মদ। তুমি বলবে, কেন? ইউরোপে। দূর! ইউরোপ যাকে নবযৌবন বলছে সেটা কায়কল্প।'

এ নিয়ে আমি তাঁকে আর খোঁচাইনি। তিনি যদি নতুন করে আরম্ভ করতে জানতেন তা হলে করে দেখাতেন। জানতেন না বলেই আকুলতা বোধ করতেন। আমার যদি জানা থাকত আমি তাঁকে সবিনয়ে জানাতুম। আমার নিজের ধারণাও তখন অস্পষ্ট। এখনো খুব এমন কী স্পষ্ট।

বাইরে ত্রিশ বছর কাটিয়ে এসে মেসোমশায় মনে করেছিলেন দেশের লোক সেই স্বদেশী যুগেই রয়েছে। সেই তপোবন পুনরাবর্তনের যুগে। মোহভঙ্গ হতে বেশী দেরি হলো না। ধর্ম আর ধর্মের জন্যে নয়। ধর্ম এখন রাজনীতির জন্যে। দেউলিয়া রাজনীতিকদের সম্বল হলো ধর্ম। তাঁরা ভাজেন ঝিঙে তো বলেন পটল। তেমন ধর্ম দিয়ে রাজনৈতিক অভিসন্ধি হাসিল হতে পারে, কিন্তু একটা মহৎ জাতির পুনর্জাগরণ সাধিত হবে না। তা হলে কী দিয়ে সাধিত হবে? বিজ্ঞান? বিজ্ঞানের উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান দিয়ে যেমন অশেষ মঙ্গল হতে পাবে তেমনি অপরিসীম অমঙ্গলও হতে পারে। তার রাশ টানবার জন্যে যদি থাকে ধর্মবুদ্ধি তা হলেই তার দ্বারা বিশুদ্ধ মঙ্গল হবে। আর নয়তো অনিয়ন্ত্রিত হয়ে সে মানবকুল ধ্বংস করবে। ধর্মকে মানুষের বড় দরকার। এটা জরুরি।

ওদিকে মাসিমা তাঁর নতুন বাড়ী নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মেয়ের বিয়ের ভাবনায় একটু ঢিলে দিয়েছিলেন। কলকাতার বাজার দেখে একটু দমেও গেছলেন। তাঁর দিদিরা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, 'বুড়ি, মেয়েটাকে অমন করে বসিয়ে রাখিসনে। দিন-কাল বদলে গেছে। সেকালে যেমন পাশ করা মেয়ে শুনলে ভয় পেয়ে যেত একালে তেমন পায় না। শাশুড়ীরাই চায় পাশ করা বৌ। দুটো একটা পাশ হলো হাতের পাঁচ। কে জানে কখন কাজে লেগে যায়।'

মালাকে কিছু আদা আর কিছু নুন কিনে দেওয়া হয়েছে। সে আদানুন খেয়ে প্রাইভেট ম্যাট্রিকের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তার বাপ তার প্রধান সহায়। পেশাদার এক টিউটরও রাখা হয়েছে। নীলির মতো বান্ধবীরাও একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়। নীলির কাছে শুনি বনের পাখীকে খাঁচার বুলি কপচাতে শেখানো হচ্ছে। যে ছিল অকুতোভয় তাকে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার ভয় দেখানো হচ্ছে।

সাধে কী মেসোমশায়ের মুখখানা শ্রাবণের মেঘলা আকাশ! কী করা যায়! রূঢ় বাস্তব। সীতাকেও অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। মালাকেও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হবে।

দুনিয়া তাকে বাজিয়ে নেবে। অমনিতেই স্বীকার করবে না যে সে শিক্ষিতা মহিলা। কে জানে কোন্‌দিন কাজকর্মেরও প্রয়োজন হবে। তখন স্বীকার করবে না যে তার যোগ্যতা আছে। ঋষিকন্যারা একালে জন্মান্তর গ্রহণ করলে তাদেরকেও সার্টিফিকেট নিতে ও দেখাতে হতো।

মালা জানে সবই, কিন্তু গুছিয়ে লিখতে পারে না, লিখলেও পরীক্ষার মতো করে নয়। মাস্টার মশায় তার ভালোর জন্যেই তাকে দিয়ে ভুল ইংরেজী লেখান। সে বিদ্রোহ করে। তার বাপ অসহায়। পরীক্ষকরাই যে মাস্টারের মাস্টার।

'মালা ভুল ইংরেজী শিখছে বলে ওর বাপের যে মাথাব্যথা তার সিকির সিকি যদি থাকত ওর ভালো বিয়ের জন্যে! তা হলে এত দিনে একটা হিল্লে হয়ে যেত, বড়দা।' মাসিমা বললেন একদিন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর গুপীবাবুকে।

'ভায়া হে,' গুপীবাবু বললেন মেসোমশায়কে, 'আমাকে তুমি বুঝিয়ে দিতে পারো ভুল ইংরেজী শিখে আমার কী ক্ষতি হয়েছে আর ঠিক ইংরেজী শিখে তোমার কী লাভ হয়েছে। দিব্যি ওকালতী করে খাচ্ছি। তোমার চেয়ে ঢের বেশী রোজগার করেছি ও করছি। সত্তর আশি বছর বয়স পর্যন্ত করতে থাকব। কই, জজ সাহেবরা তো আমার ইংরেজীর ভুলের জন্যে আমাকে মোকদ্দমা হারিয়ে দেন না।'

মেসোমশায় নিরুত্তর। তাঁর ভায়রা ভাই ইংরেজীনবিশ সরকারী চাকুরে। মিস্টার চৌধুরী তাঁর হয়ে উত্তর দেন, 'কিন্তু জজসাহেবরা কোনো কালে আপনাকে জজসাহেব করবেন না।' তারপর মেসোমশায়ের দিকে ফিরে বলেন, 'অমল, তোমাকেও ছাড়ছিনে। তোমার মেয়েকে তুমি ক্লাউড-কুকু-ল্যাণ্ডে রাখতে চেয়েছিলে। এখন তাকে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসতে দেখে কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু এটাও তার শিক্ষার অঙ্গ। রোমে যখন যাবে তখন রোমানদের মতো আচরণ করবে। সেখানকার লোকে ঠিক ইংরেজী বোঝে না। ঠিক জ্যোতির্বিজ্ঞান জেনেও চন্দ্রগ্রহণের দিন হাঁড়ি ফেলে। গঙ্গাস্নান করে। তোমার মেয়ে যদি বিদ্যা ফলাতে যায় শ্বশুরবাড়ী গিয়ে অশান্তি ভোগ করবে।'

মেসোমশায় চুপ করে শুনে গেলেন। একটি কথাও শোনালেন না। পরে মাসিমাকে বললেন, 'এত বড় একটা দেশে একটি মেয়ে একটু অরিজিনাল হবে কেউ সেটা সহ্য করবে না। কেউ তার জন্যে ত্যাগস্বীকার করবে না। সে-ই করবে সকলের জন্যে ত্যাগ-স্বীকার। অন্যায় নয়? আমি স্থির করলুম আমার মেয়ে প্রাইভেট ম্যাট্রিক দেবে না, জুনিয়র কেম্‌ব্রিজ দেবে। তার পর সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ। একটু দেরি হবে এই যা আফসোস।'

মাসিমার চক্ষুস্থির। তিনি অবশ্য প্রাইভেট ম্যাট্রিকই বহাল রাখলেন। কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম। মেসোমশায় পীড়াপীড়ি করলেন না।

আমাকে একান্তে বললেন, 'ত্রিশ বছর বাদে দেশে ফিরে দেখছি জাতকে জাত সুবিধাবাদী বনে গেছে। এ দেশের কপালে দুঃখ আছে, দেবপ্রিয়।'

ভুলে গেছলুম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল দশ বছর বাদে যেদিন সেখানে সেখানে লঙ্কা ভাগ করে নিল।

'মালাকে আমি কেমন করে বাঁচাব এর ছোঁয়াচ থেকে? এই সর্বনেশে সুবিধাবাদের ছোঁয়াচ থেকে? আমার আজকাল রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, দেবপ্রিয়।' আমাকে বিশ্বাস করে বললেন মেসোমশায়। সত্যি তার চোখের কোল ফোলা ফোলা।

আমি এর উত্তরে কী বলতে পারি? অন্য প্রসঙ্গ পাড়ি।

ওদিকে মাসিমারও রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। একদিন স্পষ্ট বললেন আমাকে। 'অবাধ বিকাশের ফল কী হয়েছে, দেখছ তো। মালাকে মনে হয় নীলিমার চেয়ে বড়। লোকে যখন শোনে ওর বয়স মোটে সতেরো তখন মুচকি হাসে। ভাবে দু'তিন বছর হাতে রেখে বলছি। মেয়ে যার দিন দিন শশিকলার মতো বাড়ছে—পূর্ণিমার পরেও থামতে চায় না—তার তো রোজ রাত্রে কোজাগরী।'

নীলির বয়স তখন উনিশ। তখনো বিয়ের ফুল ফোটেনি। আমার মা অত লেখাপড়া জানতেন না। তবু একটু আধটু ইংরেজীর ফোড়ন দিয়ে বলতেন, 'আমার মাথার উপর আড্রোক্লিসের খড়্গ ঝুলছে।'

বাবার কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত ছিল না। তিনি তাঁর দ্বিতীয় সংসার নিয়ে স্বতন্ত্র বাস করতেন। ছেলেবেলায় তাঁর উপর রাগ করে আমি বাড়ী থেকে পালাই। ফিরতে ইচ্ছা ছিল না। ফিরি তো কৃতী হয়ে ফিরব। স্বাবলম্বী হয়ে ফিরব। ছবি আঁকার হাত ছিল। লক্ষ্ণৌতে গিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হই। ওখানকার এক বাঙালী ডাক্তার পরিবার আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরে আমি তাঁদের সম্ভ্রান্ত পেশেন্টদের প্রতিকৃতি এঁকে আত্মনির্ভর হই। তাঁদের একজন পরে উজীর হন। সরকারী সাহায্য দিয়ে আমাকে লণ্ডনে পাঠান। সাহায্য মাত্র দু'বছরের জন্যে। দু'বছরে কতটুকুই বা শেখা যায়! কপাল ঠুকে হাজির হলুম আর্টিস্টদের মক্কায়। আমার উত্তম দক্ষিণ হস্ত আমাকে অভাবে পড়তে দেয়নি। কিন্তু খাটতে হয়েছে শ্রমিকের মতো।

বাস্তবিক, শিল্পীতে শ্রমিকে ভেদ নেই। কস্মিন্‌কালে ছিল না। বুর্জোয়া মূল্যবোধ এসে ভেদবুদ্ধি জাগিয়েছে। বুর্জোয়াদের কমিশন না হলে ছবি আঁকাই হয় না, তাই আমরা বুর্জোয়াদের দ্বারস্থ হই। যেমন রাজমিস্ত্রী যায় প্রাসাদ গড়তে। তা বলে নিজে বুর্জোয়া হতে চাইনে। সে পথে মরণ। বুর্জোয়াত্ব পাবার পর শিল্পী আর শ্রমিক থাকে না। এ যুগে সেই হয়েছে বিপদ। সমাজে যেই তার উত্থান হয় রূপলোকে অমনি তার পতন। ডানা কাটা এন্‌জেল যেমন। ডানা কাটা গেলে এন্‌জেলের আর কী থাকে?

আমি উড়তে চাই মর্ত্য থেকে স্বর্গে, স্বর্গ থেকে মর্ত্যে। ডানা আছে আমার। আমার মতো ধনী কে ?

নীলিকে আমি বলি, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট। অভাবে পড়া ভালো নয়। আবার পায়ের উপর পা দিয়ে আরামে থাকলেও স্বভাব নষ্ট। পরগাছা হওয়াও ভালো নয়। তোকে বোধ হয় ডানা কাটা পরী বলে কারো ভ্রম হবে না। তবু তুই তোর ডানা দুটো কাটতে যাসনে। বরের জন্যেও না। ঘরের জন্যেও না। উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে। সে অন্নের স্বাদই আলাদা।'

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর মালাকে নিয়ে তার মা পাহাড়ে ঘুরে এলেন। তার বাবা গাছপালা ছেড়ে কোথাও নড়বেন না। গরমেও তিনি ভালো থাকেন। তাঁর যে ব্যথা সে তো পাহাড়ে গেলে সারবে না। আমি মাঝে মাঝে যাই। একটু গল্প করি। তাতে আমার নিজের হাওয়া বদলের কাজ হয়।

'বৈজ্ঞানিককে মারে কে ? এটা তারই তো যুগ।' মেসোমশায় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন। 'তবে তোমাদের কথা আলাদা। এ যুগে তোমাদের বেঁচে থাকা শক্ত। কায়িক অর্থে বাঁচলে যদি তো আত্মিক অর্থে নির্বাণ লাভ করলে। তোমরা আবার বাঁচাবে কাকে ? বাঁচলে তো বাঁচাবে।'

আমি কি এ কথা মাথা পেতে মেনে নিতে পারি ? আর্টের প্রেস্টিজে বাধে। ধর্ম অর্থ কাম এরাই হলো চিরকালের যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুন। তার পরে কে বড় ? আর্ট না বিজ্ঞান ? নকুল না সহদেব ? যমজ হলেও নকুলই বড়। আর্ট আগে হয়েছে। তার পরে বিজ্ঞান। যে কোনো সভ্যতার ইতিহাসে এই বলে। বিংশশতাব্দীর সভ্যতা কি সৃষ্টিছাড়া ?

'এ যুগটা তো, মেসোমশায়, আপনার চোখের সুমুখেই সরে যাচ্ছে। এই যে আবার মহাযুদ্ধ বাধবে শুনছি এ যদি বাধে তবে যুগান্তর অনিবার্য। তখন দেখবেন শ্রমিকদের যুগ এসেছে। শিল্পীরাও শ্রমিক তো। কাজেই সেটা হবে শিল্পীদেরও যুগ। আমরা তখন সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ব। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাড়ী উঠবে শ্রমিকদের জন্যে, সাধারণের জন্যে। আমরা গিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুরাল চিত্র আঁকব। ওরাই আমাদের চাঁদা করে খাওয়াবে পরাবে, আস্তানা জোটাবে। আমাদের জন্যে সব কিছু ফ্রী। তাই আমাদের দিক থেকেও সব কিছু ফ্রী। ছবি এঁকে আমরা এক পয়সাও নেব না। অশন বসন আবাসের জন্যে এক পয়সাও দেব না। বেচাকেনার নাগপাশ থেকে আমরা বাঁচতে চাই। ওরা যদি আমাদের বাঁচায় আমরাও ওদের বাঁচাব। বাঁচবে ওরা সৌন্দর্যের অমৃত পান করে। এমন জাদু করব যে যেদিকেই তাকাবে সেদিকেই সৌন্দর্য। চোখ চাইলেই সৌন্দর্য।'

মেসোমশায় সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, 'ওটা একটা দেখবার মতো স্বপ্ন। শিল্পী বল,

বৈজ্ঞানিক বল, দার্শনিক বল, আসলে ওরা এসেছে একটা বাণী নিয়ে। সেটা দিয়ে না যাওয়া অবধি ওদের মুক্তি নেই। বাণীকে পণ্য করে বেচাকেনার ব্যাপারে নামলে বাণী তার পোটেন্সী হারায়। এই সওদাগরি যুগ থেকে পরিত্রাণ না পেলে আমরা আর্টিস্টরা ও ইনটেলেকচুয়ালরা ধীরে ধীরে নির্বীর্য হব। অথচ ঋষিদের ভারতে বা সোক্রেটিসের গ্রীসে ফিরে যাবার পথ গেছে হারিয়ে। পথ করে নিতে হবে আমাদের, কিন্তু কেমন করে তা আমি জানিনে।'

আমি তখনকার দিনে সবজান্তা। বললুম, 'আমি জানি। রেলে যারা কাজ করে তারা যেমন ফ্রী পাশ পায় তেমনি শিল্প বিজ্ঞান দর্শন নিয়ে যারা আছে তাদেরও ফ্রী পাশ দেওয়া হবে। শুধু রেলভ্রমণের জন্যে নয়, সব কিছুর জন্যে। বাড়ী চাই। পাশ দেখালুম। অমনি বাড়ী মিলে গেল। ভাড়া গুণতে হবে না। গাড়ী চাই। পাশ দেখালুম। অমনি গাড়ী মিলে গেল। ভাড়া লাগবে না। খাবার চাই। পাশ দেখালুম। অমনি খাবার মিলে গেল। দাম দিতে হবে না। পোশাক চাই। পাশ দেখালুম। অমনি পোশাক জুটে গেল। বিল মেটাতে হবে না। বাকীটা আপনি কল্পনা করে নিন।'

'কিন্তু ঐ পাশখানার পরিবর্তে তুমি কী দিচ্ছ?' জেরা করলেন তিনি।

'রাশি রাশি ছবি। ঐ নিয়েই তো আছি দিনরাত।'

মেসোমশায় বললেন, 'হাঁ। কিন্তু ওটা অত সহজ নয়। আমাদের সমাজে ও-পরীক্ষা তিন হাজার বছর ধরে হয়েছে। পৈতে দেখালে পাড়াগাঁয়ে কিছুদিন আগেও সব কিছু অমনি পাওয়া যেত। যার পৈতে নেই তার ভেক। ভেক নিয়ে ভিক্ষায় বেরোলে এখনো সব কিছু অমনি পাওয়া যায়। এর মূলে ছিল ওই আইডিয়া যে, যারা ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরধ্যান নিয়ে আছে তাদের ফ্রী পাশ দিতে হবে। দিয়ে দেখা গেল ব্রাহ্মণ হলে যেমন পৈতে নেয় তেমনি পৈতে নিলেই ব্রাহ্মণ হয়। বৈষ্ণব হলে যেমন ভেক নেয় তেমনি ভেক নিলেই বৈষ্ণব হয়। তখন আর তাকে ব্রহ্মজ্ঞানী হতে হয় না, ভগবদ্‌ভক্ত হতে হয় না। ধর্ম বলতে সেই খাড়া বড়ি থোড়। বিদ্যা বলতে সেই থোড় বড়ি খাড়া। শিশুর হাতে মোয়া ধরিয়ে দিয়ে চালাকরা সোনাটা দানাটা নেবে। তেমনি তোমার পাশ সিস্‌টেমও হয়ে দাঁড়াবে পৈতে সিস্‌টেম বা ভেক সিস্‌টেম। দিনরাত লোক ভোলানো মোয়া তৈরি চলবে। তারই নাম দেওয়া হবে দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প। পাশ যার আছে সেই বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী। বাণী নাই বা থাকল।'

'তা হলেও', আমি তর্ক করলুম, 'আপনি স্বীকার করবেন যে সভ্যতা আজকের এই চোরাগলির ভিতর দিয়ে আর বেশী দূর যেতে পারবে না, তার দম বন্ধ হয়ে আসবে। মোড় তাকে নিতেই হবে। পাশ যাকে বলছি সেটা একটা সিম্বল। আপনি তার বদলে আর কোনো সিম্বল ব্যবহার করতে পারেন। এমন এক দিন আসবে যে-দিন আমার

মুখ দেখেই সকলে সব কিছু দেবে। মুখ দেখেই চিনতে পারবে যে, আমি একজন দাতা।'

মেসোমশায় চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, 'কিন্তু মুশকিল বাধবে কোথায় তা জানো? তুমি যা দিলে আর তুমি যা নিলে এ দুইয়ের মধ্যে সমতা থাকা এসেনৃশিয়াল। তুমি বলবে সমতা আছে। সমাজ বলবে সমতা নেই। মতবিরোধ অনিবার্য। যাঁরা আর্টের কদর জানেন তাঁরা তোমার পক্ষে। যাঁরা বাড়ীভাড়া গাড়ীভাড়া খোরাক পোশাক ইত্যাদির কদর জানেন তাঁরা তোমার বিপক্ষে। এমন বিচারক কোথায় যিনি স্পিরিচুয়াল ও মেটিরিয়াল উভয়বিধ সামগ্রীর কদর ও তৌল জানেন? এ রকম তো প্রায়ই দেখা যায় যে, শিল্পীর মৃত্যুর এক শ' দু' শ' বছর পরে তার এক একখানা ছবি পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকায় বিকোয়। অথচ তার দীর্ঘ জীবনে হয়তো সে সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকাও উপার্জন করেনি। সমসাময়িকদের বিচারে স্পিরিচুয়ালের অনুপাতে মেটিরিয়ালের দাম বেশী। সময়ের ব্যবধান ভিন্ন আর কোনো উপায় নেই যাতে তোমার সৃষ্টির কদর চাষী মিস্ত্রী দর্জি ইত্যাদির উৎপন্ন সামগ্রীর মোট দরের সঙ্গে সমতাসম্পন্ন বলে প্রমাণিত হবে। তুমি মনেও কোরো না যে, একটা যুদ্ধ বা একটা বিপ্লবের ফলে সময়ের ব্যবধান সংক্ষিপ্ত হবে।'

আমি তো প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলুম, মেসোমশায় তা অনুমান করে বললেন, 'সভ্যতার মোড় ফিরবে কখন, জানো? যখন সমাজ স্বীকার করবে যে মেটিরিয়ালের অনুপাতে স্পিরিচুয়ালের দাম বেশী। বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ রস, বিশুদ্ধ রূপ ইত্যাদির সঙ্গে সমতা রাখতে পারে এমন ঐশ্বর্য কুবেরের ভাণ্ডারেও নেই। এসব ব্রতে যারা নিযুক্ত তারা যদি ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে তা হলে তারা যা দিয়ে যায় তা মানবাত্মার পরম সম্পদ। সমাজের কাছে এমন একটা স্বীকৃতি আজকের দিনে কোনো দেশেই লক্ষিত হচ্ছে না। বিপ্লবী দেশ বলে যাদের পরিচয় সেসব দেশেও না। ফ্রান্সেও না, রাশিয়াতেও না। এর জন্যে দোষ কিন্তু শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদেরও কম নয়। তাঁরা মনে করেন নিছক নূতনত্বই অগ্রসরতা, গতি মাত্রেই অগ্রগতি। তা নয়। যা ধোপে টিকবে না তাকে বাদ দিলে পরে যা বাকী থাকবে তাই প্রগতি। তোমাকে এমন ছবি আঁকতে হবে যা বাকী থাকবে। তার জন্যে তুমি লাখ টাকা যদি পাও তা হলেও সেটা ফ্রী। সেটা তুমি অমনি দিয়ে গেলে।'

জানি, লাখ টাকা আমাকে কেউ দেবে না। তবু ভাবতে দোষ কী যে, যা দিল তা রং তুলি ক্যানভাস ইত্যাদির কেনা দাম ও তার সঙ্গে দেবপ্রিয় আইকং বলে এক শ্রমিকের পারিশ্রমিক। কিন্তু আসল ছবিখানা অমনি পেয়ে গেল। ওটা আমার দান। ওটা ফ্রী। আমি সেই গর্বে ছবি আঁকি আর ছবির দাম ধরি আর দাম নিয়ে ফ্রী দিই। ওটা দেবপ্রিয় বলে এক প্রেমিকের প্রেমের মূল্যে অমূল্য। শ্রমিক দাম নেয়। প্রেমিক নেয় না।

তার পর কী হলো শোন। মালা ম্যাট্রিক পাশ করল ঠিক। পাহাড় থেকে ওর মা

ওকে নিয়ে ফিরলেন। রূপ যা খুলেছে মেয়ের! ইচ্ছা করে এঁকে অমর করে দিতে। আমি আর্টিস্ট, আমি এই সব ভাবছি। আর ওদিকে ওর মা ভাবছেন ওর রূপ অম্লান থাকতেই ওর বিয়ে দিয়ে দিলে ভালো বর ভালো ঘর পাবেন। এখন থেকে ঠিকঠাক করে রাখলে পরের বছর শুভবিবাহ। নারীর যৌবন কতদিন থাকে। সেকালে বলত কুড়িতেই বুড়ি। একালে তা বলে না। কিন্তু কুড়ি পেরিয়ে গেলে ফিরেও তাকায় না। অতএব মালাকে অবিলম্বে কোনো এক সুপাত্রের গলায় ঝুলিয়ে দাও। কলেজ? কলেজে পড়তে চায় বিয়ের পরে পড়বে। আপাতত? আপাতত কলেজে নামটা লেখাক। পড়াটা নামে মাত্র। তবে সেটারও একটা বাজারদর আছে। বিয়ের বাজারে।

নীলির মুখে এসব কথা শুনি আর সে বেচারিকে সান্ত্বনা দিই ও মনের জোর জোগাই। মালার চেয়ে সে বয়সে বড। তারই তো আগে বিয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু বিয়েতে বর লাগে। বর আমি কেমন করে জোটাব? বাবা চেষ্টা করলে পারতেন। কিন্তু তিনি চেষ্টা করলেও নীলি তাঁর অনুগ্রহ নেবে না। তা ছাড়া বাংলাদেশের শামলা মেয়ে বলে সে এমনিতেই অভিমানী। নীলির বিয়ের ভাবনা মা ভাবছেন। আপাতত সে আমার কাছে ছবি আঁকা শিখছে। তার ডিজাইনের হাত ভালো। তাকে বলেছি তার বিয়ে না হওয়া অবধি আমারও বিয়ে হবে না। কিন্তু এর থেকে সে যেন ভুল না বোঝে আমি শুধু বোনের বিয়ের জন্যে দায়ে পড়ে দারপরিগ্রহ করব। মা সেরকম কিছু বলতে উদ্যত হলে আমি বাড়ী ছেড়ে পালাবার ইশারা দিয়ে ঠেকাই। মাকে আর নীলিকে মাসির বাড়ী থেকে উদ্ধার করে ভবানীপুরে বাসা বেঁধেছি। তা বলে আবার উড়ব না এমন কোনো কথা নেই। দেশে যদি তেল নুন লকড়ি না জোটে দ্বিতীয়বার আমাকে বিদেশে যেতে হবে। ওটা হয়তো পেট্রিয়টিজম নয়। কিন্তু দেশকে ভালোবাসি বলে ভিক্ষুকের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে আমার বাধে।

এমন যে আমি সেই আমার উপর মাসিমার আদেশ হলো, 'দেবপ্রিয়, মালার জন্যে একটু বলে দেখবে তোমার বন্ধুবান্ধবদের? হয়তো লেগে যাবে।'

আমার বলা উচিত ছিল মাসিমাকে, আমাকে মাফ করবেন, মাসিমা। আমার এতে বিশ্বাস নেই। একজনের সাথী কে হবে আরেক জন তা ঠিক করে দিতে পারে না। মালা বড় হলে মালার উপরেই ছেড়ে দিতে হবে এ ভার।

মাসিমাকে না বলে বললুম কিনা নীলিমাকে। নীলি তো হেসে অস্থির। শেষে বলল, 'ভদ্রমহিলা কি তোমাকে অত কথায় বলতে পারেন যে তাঁর মেয়েটিকে তুমিই বিয়ে কর? বলেছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।'

আমি তা শুনে রেগে অস্থির। নীলির মাথাখানা জিলিপির প্যাঁচ। চাঁটি মেরে বললুম, 'যা। যা। বাজে বকিস্‌নি। অসম্ভব।'

'অসম্ভব বলে একটা শব্দ—নেপোলিয়ন বলতেন—বোকাদের অভিধানেই মেলে। আমার দাদা তো বোকা নয়।' এই বলে সে গম্ভীর স্বরে বলল, 'তবে একটা বাধা আছে। মালার ধনুকভাঙা পণ সে রাজপুত্তুর ভিন্ন আর কারো গলায় মালা দেবে না।'

'তাই নাকি?'

'তাই তো ও বলে। ওর বিশ্বাস এটা রূপকথার জগৎ। এর কোথাও একজন রাজপুত্র আছে। সে যথাকালে আসবে ও কী যেন একটা বীরত্বের কাজ করবে। তখন মালা তাকে মালা দিয়ে বরণ করবে।'

আমি অবাক হলুম। রুদ্ধশ্বাসে বললুম, 'তারপর?'

'তারপর আর কী! তুমি তো রাজপুত্র নও। মন্ত্রীপুত্রও নও। নিদেন পক্ষে সওদাগরপুত্রও নও।' নীলিমা আবার লঘুভাবে বলল, 'তবে সওদাগরি আফিসের বড়বাবুর ত্যাজ্য পুত্র বটে।'

আমি সংশোধন করে বললুম, 'ত্যাজ্য নয়, ত্যাগী। তিনি আমাকে ত্যাগ করেননি, আমিই ত্যাগ করেছি তাঁকে।' রুদ্ধ শ্বাস দীর্ঘ শ্বাসে পরিণত হলো।

তা হলে মালার বিশ্বাস এটা রূপকথার জগৎ। অদ্ভুত মেয়ে। ওর কপালে আছে মোহভঙ্গ। মোহভঙ্গ থেকে ওকে বাঁচাবে কে?

যা হোক, মাসিমাকে আমি ওসব কথা বললুম না। মালার জন্যে রাজপুত্রের অন্বেষণ করলুম। আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ছিলেন দুবরাজপুরের যুবরাজ কুসুমাকর সিংহ রায়। দুবরাজপুর যে কোথায় তাই আমার জানা ছিল না। কুসুমাকর কলকাতায় এলে কোন্‌খানে ওঠেন তা আমি জানতুম। দুবরাজপুর হাউস বলে তিনতলা একটি বাড়ীতে। আলীপুরে। তিনি যেবার লণ্ডনে যান আমি তাঁর গাইড হয়েছিলুম। পরে তিনি আমার ছবি কিনেছেন। বয়স আমার চেয়ে কম। চেহারা আমার মতো কালো নয়। অবিবাহিত।

কুসুমাকরকে একদিন ধরে আনা গেল বুধবার সন্ধ্যায় বালীগঞ্জ অঞ্চলে। ঘুণাক্ষরেও তাঁকে জানাইনি যে মালার জন্যে আমরা পাত্র খুঁজছি। জানলে পরে তিনি সেদিন কলকাতা ছেড়ে উধাও হতেন। অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ছেলে। গ্রাম্য পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। কলকাতার নাগরিকদের তিনি বিষম ভয় করেন। পাছে কেউ তাঁকে পাড়াগেঁয়ে বলে হাসাহাসি করে। কেউ হাসছে দেখলেই তিনি গায়ে পেতে নেন। এমন মুখ করেন যেন কেউ তাঁর বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। লণ্ডনে তাকে আমি হাতে নিয়েছিলুম। সে কী ঝকমারি! ও দেশের মেয়েরা কারণে অকারণে খিল খিল করে হাসে। কুসুমাকর মনে করেন বিদেশিনীদের চোখে তিনি একটি গরিলা কি ওরাং ওটাং। স্বদেশিনীদের সম্বন্ধেও তাঁর একই রকম ধারণা।

মাসিমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলি, 'এঁরা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট জমিদার। সেই বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া। লণ্ডনে পড়েছেন।'

কুসুমাকর যথেষ্ট ভদ্রতার সঙ্গে আমার প্রতিবাদ করে বলেন, 'উত্তরবঙ্গের নয়। পশ্চিমবঙ্গের। বিশিষ্ট নয়। সামান্য। জমিদার নয়। পত্তনিদার ও কয়লার খনির মালিক। বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া নয়, ইংরেজ আমলের খেতাবধারী। লণ্ডনে পড়াশুনা করিনি। ডিনার খেয়ে টার্ম রেখেছি। পরীক্ষার ভয়ে পালিয়ে এসেছি।'

কী বিনয়! আমি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললুম, 'হীয়ার। হীয়ার।'

মালার মাসতুতো ও মামাতো বোনেরা ফিস ফিস করে কী যেন বলছিল। আমার মনে হলো ওরা বলছে, বারো ভূতের এক ভূত।

কুসুমাকরকে একবার শিকারের কাহিনী ধরিয়ে দিতে পারলে তিনি নির্ভীক। তখন সাহসই বা আছে কার যে হাসবে? বাঘ যে কত রকম চাতুরী করতে পারে, মানুষকে যে কত বড় বিপদে ফেলতে পারে, প্রাণ দেবার আগে প্রাণ নেবার জন্যে কত কাছে যে আসতে পারে সেসব কুসুমাকর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেন আর সাসপেন্স সৃষ্টি করেন। গায়ে কাঁটা দেয়।

'তার পর?' মালা প্রশ্ন করে ছোট মেয়েটির মতো গালে হাত দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে শুনতে শুনতে। যেমন শুনত ডেসডেমোনা ওথেলোর বীরত্ব অবদান।

'তার পর সেবারেও আমি বেঁচে যাই নেহাৎ পরমায়ু ফুরোয়নি বলে।' কুসুমাকর উত্তর দেন দু'হাত যোড় করে।

এই তো কেমন রাজপুত্র! এই তো কেমন বীরত্বের কাজ! মালা আর কী চায়? এক কাঁড়ি টাকা আছে, কলকাতায় বাড়ী আছে, শিক্ষাও মন্দ নয়, স্বভাবটিও ভালো। পরের বার অর্গ্যান বাজিয়ে ও অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে কুসুমাকর প্রমাণ করে দিলেন যে সংস্কৃতিও যথেষ্ট। ওঁর বিরুদ্ধে একটিমাত্র পয়েন্ট আমি দেখি। ওঁর বয়সটা মালার চেয়ে দশ এগারো বছর বেশী। পরে শুনেছিলুম ওঁর নাকি একবার বিয়ে হয়েছিল সতেরো আঠারো বছর বয়সে। সে বৌ বারো বছর বয়সে মারা যায়।

আমি কুসুমাকরকে বাজিয়ে দেখলুম। মালা যে কলকাতার মেয়েদের মতো নয় এটা তিনি লক্ষ করেছিলেন। আমার কাছে যখন শুনলেন যে, সে বর্মায় মানুষ হয়েছে শকুন্তলার মতো তপোবনে, তখন বিশেষ আকৃষ্ট হলেন। বললেন, 'বাড়ীর লোকের অমত না থাকলে আমারও কোনো আপত্তি নেই, দাদা।'

বাড়ীর লোককে একবার দেখাতে হবে। মাসিমা তা শুনে বললেন, 'তা হলে বুধবার নয়। অন্য একদিন আমরা আলাদা একটা পার্টি দেব। বিকেলবেলা গার্ডেন পার্টি। ওই বুধবারের দলটিকে আমি এড়াতে চাই।'

এসব ব্যাপারে মেসোমশায়ের পরামর্শ চাওয়াও হয় না, নেওয়াও হয় না। তিনি নির্লিপ্ত পুরুষ। তাঁর পড়ার ঘরে বসে অধ্যয়নরত। কিংবা তাঁর প্রাইভেট ল্যাবরেটরিতে গবেষণারত। আর নয়তো তাঁর তপোবনে ধ্যানরত। গার্ডন পার্টির দিন তাঁকে টেনে বার করা হলো ল্যাবরেটরি থেকে। তিনি একটি তরুবেদীতে আশ্রয় নিলেন। তাঁকে দেখলে মায়া হয়। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দুটো একটা কথা কয়ে আসি।

কুসুমাকরের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর কাকা রত্নাকর, তাঁর দুই ভাই করুণাকর ও কমলাকর। আর তাঁর বোন লবঙ্গলতা ও ভগ্নীপতি মথুরামোহন। এই সব সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে যখন মেসোমশায়কে নিয়ে আসা হলো তিনি এঁদের সাজসজ্জা দেখে হকচকিয়ে গিয়ে উর্দুতে বাতচিৎ শুরু করলেন।

যাক, সেদিন বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা কুসুমাকরকে মালার সঙ্গে নিরিবিলি বেড়ানোর সুযোগ ঘটিয়ে দিই। মালা দেখাচ্ছে আর কুসুমাকর দেখছে তপোবনের ওষধি বনস্পতি। আর আমরা দূর থেকে তাদের উপর নজর রেখেছি। ভোজনপর্ব চলেছে। মেসোমশায় লুকিয়ে সরে পড়েছেন তাঁর গবেষণামন্দিরে।

একটা নারকেল গাছ দেখিয়ে দিয়ে মালা বলল কুসুমাকরকে, 'ডাব খেতে ইচ্ছা করছে। পারবেন পেড়ে দিতে?'

'পারব না? আকাশের চাঁদ পেড়ে আনতে পারি, যদি আজ্ঞা পাই।' কুসুমাকর বললেন বীরের মতো সপ্রতিভ ভাবে।

মালা বলল, 'সে আরেক দিন হবে। আজ ওই ডাবটাই পেড়ে দিন না।'

কুসুমাকর বললেন, 'অত বড় মই পাই কোথায়?'

'ও তো আমাদের মালীও পারে।' মালা বলল ঈষৎ হেসে।

হাসিকে কুসুমাকর ফাঁসীর মতো ডরান। দেখা গেল তিনি ওইখান থেকে পিছু হটছেন আর সকাতরে বলছেন, 'নারকেল গাছে উঠতে হলে কোমরে দড়ি বাঁধতে হয়। দড়িও তো এখানে মিলবে না।'

'ও তো আমাদের মালীও পারে।' বলতে বলতে হেসে ফেলল মালা। কুসুমাকরকে এবার জোরে জোরে পা চালাতে দেখা গেল। মালা রইল পিছনে পড়ে। এমনি করে একটি ফলের জন্যে একটা রাজপুত্তুর হাতছাড়া হলো।

॥ তিন ॥

এই দুর্ঘটনার পর থেকে আর আমি ঘটকালি করিনি। মাসিমাও করতে বলেননি। আশ্চর্যের কথা মাসিমাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর আন্তরিক অভিপ্রায় নয় যে, ও-রকম একটা পরিবারে মালার বিয়ে হয়। তিনি চান ক্যালকেশিয়ান। রাজপুত্তুর না হলেও ক্ষতি নেই।

নীলি বলল, 'কেমন? যা বলেছিলুম তা ঠিক কি না? রূপকথার রাজপুত্তুর না হলে ও মেয়ে মালা দেবে না।'

'সে কী রে! কুসুমাকর কি রাজপুত্র নয়?' আমি বিস্মিত হই।

'উঁহু। রূপকথার রাজপুত্র নয়। তুমি ভুল বুঝেছিলে।' নীলি বলল রূপকথার উপর ঝোঁক দিয়ে। শুধু রাজপুত্র হলে হবে না। রূপকথার রাজপুত্র হওয়া চাই।

আমি হার মানলুম। রূপকথার রাজপুত্রের সন্ধান আমি জানিনে। একদিন মেসোমশায়কে কথায় কথায় বললুম, 'জগতে কী মিলতে পারে আর কী মিলতে পারে না প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এটা জানা উচিত। বিজ্ঞান তো ভোজবাজি নয় যে চাইলেই রূপকথার রাজপুত্র এনে দেবে।'

তিনি এর জন্যে তৈরি ছিলেন না। চমকে উঠলেন। ভেবে বললেন, 'না। বিজ্ঞান অমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় না। কিন্তু প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এটা মনে রাখা উচিত যে, কখনো ভুল করে চাইতে নেই। কারণ চাওয়া অনেক সময় ফলে যায়। যে যা চায় সে তা পায়। ভুল করে চাইলে ভুল করে পায়। ভক্তরা সেই জন্যে স্বর্গও চান না। তাঁরা চান ভগবানকে। স্বর্গ নিয়ে তাঁরা করবেন কী, যদি ভগবানের দেখা না পান? চাইলে স্বর্গও পাওয়া যায়। কিন্তু উন্নত আত্মার পক্ষে সেটা ভুল করে চাওয়া।'

'কিন্তু কোনো মেয়ে যদি রূপকথার রাজপুত্রকে চায়?' আমি ধাঁধায় পড়লুম।

'তা হলে সে রূপকথার রাজপুত্রকে পাবে। ঐ যে পাওয়া ওটা ভুল করে নয়। কারণ এই যে চাওয়া এটা ঠিক করে চাওয়া।'

আমার ধাঁধা ঘুচল না। বললুম, 'মেসোমশায়, তা কী করে হতে পারে? রূপকথার রাজপুত্র থাকলে তো পাবে? রূপকথার জগৎটাই যে অলীক।'

'আমি অতটা নিশ্চিত নই। রূপকথার জগৎ যদি অলীক হয় তবে রূপের জগৎটা কি কম অলীক?' মেসোমশায় পালটা প্রশ্ন করলেন। 'চাঁদের মুখখানা কি চাঁদমুখখানি? এক এক করে সব ক'টা প্রতিমারই খড় বেরিয়ে পড়বে, যদি দূরবীন অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে যাও। কিংবা যদি ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে মনঃসমীক্ষণ কর। তা বলে কি মানুষ

এতদিন অসুন্দরকে সুন্দর বলে ভ্রম করেছিল ? বিজ্ঞান তার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে ?'

আমি ভাবতে বসি। মেসোমশায় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেন। 'না। তাও নয়। রূপের জগৎও সত্য। চাঁদের মুখে বসন্তের দাগ থাকলেও সে সুন্দর। বিজ্ঞান তার সৌন্দর্যকে অপ্রমাণ করতে পারবে না। চায়ও না। বিজ্ঞানের দৃষ্টি সৌন্দর্যদৃষ্টি নয়। সৌন্দর্যদৃষ্টির যাথার্থ্য বিজ্ঞান অস্বীকার করে না। তেমনি ঋষিদের দিব্যদৃষ্টিও যথার্থ। সে দৃষ্টিতে জগৎ অমৃতময়। আনন্দের জগৎও সত্য। তেমনি আর একটি দৃষ্টি আছে। সে দৃষ্টি শিশুবয়সে তোমারও ছিল। এখন হয়তো নেই। সে দৃষ্টিতে জগৎ রহস্যময়। রূপকথার জগৎও সত্য।'

হাঁ। এ দৃষ্টি আমারও ছিল। কবে এক সময় হারিয়ে গেছে। তাই আমি এখন বাস্তববাদী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুররিয়ালিস্ট। জীবনে নয়, শিল্পে।

মেসোমশায় বলতে লাগলেন, 'বরং ওই রূপকথার জগৎই সত্যের সব চেয়ে কাছাকাছি। আর সব চেয়ে দূরে হলো আমাদের প্রাত্যহিক সংসারযাত্রার জগৎ, দিন আনা দিন খাওয়ার জগৎ, শাদা চোখে দেখা ব্যবহারিক জগৎ। কেবল কি সত্যের থেকে দূরে ? সৌন্দর্যের থেকেও। রূপকথায় জগতের যে রূপ ফুটেছে সে শুধু অতীতের আভ্যন্তরিক সত্য নয়, সব কালের। একালেরও। দেখবার চোখ আছে যার সেই দেখতে পায়। মালার সে চোখ আছে। আমার আশঙ্কা হয় সেও দিনে দিনে হারাবে। তখন সে আর রূপকথার রাজপুত্রকে পাবে না। চাইবেই না।'

তাঁর কণ্ঠে গভীর উদ্বেগ। সে উদ্বেগ কন্যার উত্তম বিবাহের জন্যে নয়। সাংসারিক সাফল্যের জন্যেও নয়। সেটা মাসিমার ভাগে পড়েছে। মেসোমশায় ভাবছেন মালা যেন তার শিশুসুলভ বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। যেন চাইতে পারে। যেন ঠিক মতো চায়।

বললেন, 'তখন সে আর সত্যের অন্দর মহলে প্রবেশ পাবে না। আমাদের মতো দেউড়িতে কিংবা সদর দালানে ঘুরে বেড়াবে।'

এবার তাঁর আক্ষেপ নিজের জন্যেও। কে জানে হয়তো আমার জন্যেও।

জগতের যে চেহারা আমি দেখি তা অশেষ বৈচিত্র্যময়। তা সত্ত্বেও তাতে আমার মন ভরে না। মনে হয় আমি সদর দালান ঘুরে ঘুরে দেখছি। অন্দরে আমার প্রবেশ নেই। অন্দরে যেতে হলে মালার মতো চোখ নিয়ে যেতে হয়। যে চোখ দিয়ে দেখা যায় রূপকথার সত্য। এক কালে আমারও সেখানে যাওয়া আসা ছিল। কিন্তু এখন আমি বড় হয়েছি কিনা। এখন আর ছোট হতে পারিনে। আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার চাবী, আমার সাঙ্কেতিক শব্দ। মায়া কপাট বন্ধ হয়ে গেছে। আর খুলবে না।

এই নিয়ে নীলির সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। সে মালার কাছে মাঝে মাঝে

যায়। মালাকে পড়াশুনায় সাহায্য করে। বলে, 'মালা সত্যি বিশ্বাস করে যে রূপকথার রাজপুত্র একদিন আসবে। কিন্তু তাকে যখন জিজ্ঞাসা করি কেমন করে রাজপুত্রকে চিনবে, কী কী লক্ষণ দেখে, সে তখন চুপ করে থাকে। উত্তর দিতে পারে না। ভয় হয়, দাদা, একদিন একটা বাজে লোক কি পাজি লোক এসে তার হাত থেকে রাজপুত্রের পাওনা মালাগাছি নেবে। পরে অবশ্য সে টের পাবে, কিন্তু ও মালা একবার দিলে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।'

ও ভয় কেবল দীদির মনে নয়, আমার মনেও ছিল। ভাবতুম মালার বাবার চেয়ে মালার মা-ই তার প্রকৃত বন্ধু। বাবা তাকে রূপকথার পাষাণ রাজপুরীতে ঘুমন্ত রাজকন্যা করে রেখেছেন, সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে কবে তার রাজপুত্র আসবে। আর তার মা তাকে জাগাতে চান, তার স্বপ্নের ঘোর কাটাতে চান। এই বাস্তব দুনিয়ায় কেমন করে চলতে হয় ফিরতে হয় তা শেখাতে চান। জানাতে চান কত ধানে কত চাল। সে যদি কোন্ জিনিসের কত দাম তার খোঁজ না রাখে তা হলে পদে পদে ঠকবে। এমন লোকও থাকতে পারে যে তাকে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচবে। এ বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে রূপকথার ধরন ধারন খাটে না।

এক এক সময় মালাকে দেখে মনে হতো সে রূপকথার কিরণমালার মতো অকুতোভয়ে মায়াপাহাড়ের অভিমুখে চলেছে। আনতে হবে তাকে সোনার শুকপাখী, মুক্তা ঝরার জল। সে ঠিক ঘুমন্ত রাজকন্যা নয়। সে বীরবেণী রাজকন্যা। তার বাবা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন কার নাম সত্য কার নাম অসত্য, কার নাম ন্যায় কার নাম অন্যায়, কার নাম উচ্চ কার নাম তুচ্ছ, কার নাম সার কার নাম অসার। ভারবিলাসে তার কৈশোর কাটেনি। সে আশ্রমকন্যা। স্বল্পাহারী, পরিশ্রমী, শীতে গ্রীষ্মে অকাতর। তার জীবনের ভিৎ শক্ত করে পাতা হয়েছে। ভয় কিসের ?

রূপকথার রাজপুত্রকে কি কেউ পায় ? মালাও পাবে না জানি। তাহলেও আমার প্রার্থনা হলো, আহা, এই মেয়েটি যেন পায়। যেন পায় তার রূপকথার রাজপুত্রকে। কেমন করে পাবে সে আমি জানিনে। তবু প্রার্থনা করে যাই, যেন পায়, যেন পায় এই একটি মেয়ে। এই একটি মেয়ে তার রূপকথার রাজপুত্রকে।

প্রার্থনা করি, কিন্তু নিঃশঙ্ক চিত্তে নয়। যা কেউ কখনো পায় না তা যদি পেতে হয় তবে তার জন্যে দাম দিতে হয় কত। ওইটুকু মেয়ে কি পারবে অত দাম দিতে ? ও কি জানে, ও কি বোঝে সুখের মূল্য দুঃখ ? পরম সুখের মূল্য পরম দুঃখ ? ও কি পারবে অত দুঃখ সইতে ? অত দাম দিতে ? কেন তবে প্রার্থনা করে ওর কপালে দুঃখ টেনে আনি।

মালা আমাকে দেবুদা বলে ডাকে। আমার মালা বোনটির জন্যে আমি সুখ সৌভাগ্য

কামনা করি। যেমন করি নীলি বোনটির জন্যেও। আমি চাই তাকে দুঃখ দুর্গতি থেকে রক্ষা করতে। যেমন চাই নীলিকেও। কিন্তু তা বলে আমার সেই প্রার্থনার ভাষা বদলে দিইনে। বলিনে, মালা যেন একটি ভালো বর পায়, একটি ভালো ঘর পায়। যেন শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটায়।

নীলির জন্যেও কি এ ভাষায় বলি? না, তার জন্যেও না। কারো জন্যে না। এ জগৎ যাঁর সৃষ্টি তিনি যদি দয়া করে দেন এসব তবে উত্তম। না দিলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যাব না। নিজেরাই এর উদ্যোগ আয়োজন করব। সফল হই, উত্তম। না হলে নিজেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব না। অদৃষ্টকেও এর মধ্যে টেনে আনব না। বার বার চেষ্টা করব। কোনো বিয়েকেই আমি চরম বলে স্বীকার করিনে। এক বিয়ে ব্যর্থ হলে স বিয়ে ভেঙে দেবার দাবী রাখি, তার পর আরেক বিয়ের কথা ভাবি। পড়ে পড়ে সহ্য করতে তোমাকে বলছে কে? ভগবান? কই, হিন্দু পুরুষকে তো তিনি তা বলেন না।

মানুষ সুখ শান্তির জন্যে সমাজ গড়ে পরিবার গড়ে। সুখ শান্তি না পেলে আবার ভেঙে গড়ে না কেন? কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে যে সুখ শান্তি না পেলেও সমাজকে পরিবারকে আস্ত রাখতে হবে? ধর্ম? সেইজন্যে ধর্মের উপর থেকে একালের মানুষের শ্রদ্ধা চলে গেছে। শ্রদ্ধা ফিরে আসবে তখনি, যখন ধর্ম বলবে সুখ শান্তির জন্যে ভেঙে আবার গড় ভাঙনটাও ধর্ম, যদি পুনর্গঠনের জন্যে হয়। আর সেই পুনর্গঠন হয় মানুষের সুখ শান্তির জন্যে।

আমার নীলি বোনটিকে আমি ছবি আঁকতে শেখাচ্ছিলুম, যাতে সেও আমার মতো সৃষ্টির আনন্দ পায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়ায়। তার পর বিয়ে করতে চায় করবে। সুখী না হয় ভেঙে দেবে। ইচ্ছা হয় আবার করবে।

নীলির জন্যে আমার প্রার্থনা ছিল, নীলি যেন পরাজিত না হয়। যেন পরাজয় মেনে না নেয়। তার সুখ শান্তির আশা যেন তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে। সে যেন বিয়ের জন্যে বা বিয়ের ঠাট বজায় রাখার জন্যে আপনাকে ছোট হতে না দেয়।

নীলির উপর আমার ভরসা ছিল সে কারো পায়ে লুটিয়ে পড়বে না। পতিরও না পতিকুলেরও না। মা'র মেয়ে তো? মা'র কাছে সে ও শিক্ষা পেয়েছিল। মা'র দৃষ্টান্ত দেখে। তবে মা তাকে এ-শিক্ষা দেননি যে স্বামী আরেক জনকে বিয়ে করলে স্ত্রীও আরেক জনকে বিয়ে করতে পারে, করলে সেটা অধর্ম নয়। মা বলতেন, এক পক্ষ যদি অন্যায় করে অপর পক্ষ কেন পালটা অন্যায় করবে? করবে অসহযোগ, করবে সত্যাগ্রহ। তাই তিনি করে এসেছেন। এখনো তাঁর আশা আছে যে বাবা নিজের ভুল কবুল করবেন।

কবুল করলেই বা হবে কী? বাবা আবার বিয়ে করেছেন। দুটি মেয়ে, একটি ছেলে

হয়েছে। সবাই মিলে মিশে মনের সুখে বাস করবে এ কি কখনো সম্ভব। মা এ-কথা জানেন। সেইজন্যে তাঁর চোখের জল শুকোয়নি। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়নিশ্চিত যে অসহযোগের যথেষ্ট কারণ ছিল। নিজের সংসারে রানীর মতো থাকতে পারলে গরিবের বৌ হয়েও সুখ আছে। বাঁদির মতো থাকতে হলে বড লোকের বৌ হয়েও সুখ নেই। একতরফা ত্যাগস্বীকার কি সারাজীবন চলে? এলো একদিন একটা ব্রেকিং পয়েন্ট। মা চলে এলেন আমাদের নিয়ে। বাবা করলেন আরেকবার বিয়ে।

এত বড় একটা করুণ অভিজ্ঞতার পরও মা বিশ্বাস করেন গুরুজনের নির্বন্ধে। নীলি নিজের পছন্দমতো বিয়ে করবে এ তিনি ভাবতেই পারেন না। এতে নাকি সুখ হয় না। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করব যে, আমার হাতে সাক্ষীপ্রমাণ থাকলে তো? নিজের পছন্দমতো বিয়ে করেও কি বড় কম মেয়ে অসুখী হয়েছে? ইউরোপে দেখে এলুম অনেকগুলি উদাহরণ। আমার নিজের অভিজ্ঞতাই আমার যুক্তির বিপক্ষে যাবে। বিয়ে করিনি, কিন্তু করলে কি ও ছাড়া আর কোনো পরিণাম হতো?

ওদিলকে আমি দোষ দিইনে। জীবনে সুখী হতে কে না চায়। আমাকে নিয়ে সুখী হবার আশা থাকলে সে কেনই বা আর কারো কথা ভাবত? আর্টিস্টরা এমনিতেই সৃষ্টিছাড়া মানুষ। তাদের সঙ্গে ঘরসংসার করা দুরূহ ব্যাপার। তাদের নিয়ে সুখী হওয়া দুঃসাধ্য। তাদের সময় নেই অসময় নেই দিন নেই রাত নেই। 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর', তাদের মুখেই এটা মানায়। আর সব মানুষ যখন ঘুমিয়ে তখন তারা জেগে। আর সব মানুষ যখন জেগে তখন তারা যোগে। শিল্পীর স্ত্রী হওয়াও একটা শিল্প। কেউ যদি হয় অনিচ্ছুক বা অক্ষম তাকে তার বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়াই শ্রেয়।

বাবাকে ও ছোট মাকে আমি এড়িয়ে এড়িয়ে চলি। তাঁরাও আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু ছোট ছোট ভাইবোনগুলি কী দোষ করেছে? বাণী আর কল্যাণী আর কানু এদের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। আমার স্টুডিওতে আসে। বাসাতেও। তবে ঠাকু'মার সঙ্গে তো ও ভাবে দেখা হবে না। মাঝে মাঝে ও বাড়ীতে যাই। তখন নীলির বিয়ের কথা উঠবেই। আমার বিয়ের কথাও। আমার বিয়ের প্রসঙ্গ বেশী দূর এগোয় না। সকলেই জানে আমি চাকরি করিনে। দিন আনি, দিন খাই। কিন্তু নীলির বেলা সেটা খাটে না।

মার্চেন্ট অফিসে বাবার অসামান্য প্রতিপত্তি। কর্মপ্রার্থীরা রোজ সকালে তাঁর দরজায় হাজিরা দেয়। তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলেদেরও দেখা যায়। ইচ্ছা করলে তিনি নীলির জন্যে স্বয়ংবর সভা ডাকতে পারতেন। নীলি যার কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিত তিনি তার কণ্ঠে বাকলেস বেঁধে দিতেন। বড়বাবুকন্যা ও বড চাকরি পেয়ে সে আনন্দে ল্যাজ নাড়ত। আহা, তার চেয়ে প্রার্থনীয় আর কী হতো! তেমন আভাসও তিনি

দিয়েছিলেন নীলিকে। নীলি প্রায়ই যেত ও বাড়ীতে। সকলের সঙ্গে ওর সদ্ভাব।

কিন্তু নীলি কী বলে, শুনবে? নীলি বলে, 'ম্যাচ করে যদি আমার বিয়ে দেওয়া হয় তবে আমার বর হবে হাজার টাকা মাইনের চাকুরে বা এক হাজারী মনসবদার। আর ভালোবেসে যদি আমাকে বিয়ে করতে দেওয়া হয় তবে আমরা দু'জনে মিলে উপার্জন করে সংসার চালাব, যার যতটুকু সাধ্য।'

বাবা পেছিয়ে যান। ঠাকু'মাও মাথায় হাত দিয়ে বসেন। ছোট মা নীলির পক্ষ নেন। মা শুনতে পেয়ে চোখের জল ফেলেন। আমার দিকে তাকান। আমি নিঃস্পন্দ। সুখী নই বলে সুখী করার জন্যে আমি ব্যাকুল নই। সুখী করার কৌশল আমার জানা নেই। কী করলে আমার দুঃখিনী মা সুখী হন তা আমি জানিনে। তাঁর ধারণা নীলির আর আমার বিয়ে হয়ে গেলে তাঁর মরা গাঙে সুখের বান ডাকবে। কিন্তু সে ধারণা ভুলও হতে পারে।

নীলিকে আমার বলা আছে সে যেদিন বিশেষ কাউকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইবে আমাকে বললেই আমি মাকে রাজী করাব। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালোবেসে বিশেষ কেউ তাকে বিয়ে করতে চায়নি। সে যে মালার মতো রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখে তা নয়। সে আমারি মতো বাস্তববাদী। কিন্তু তারও হৃদয় বলে একটি পদার্থ আছে। হৃদয় চায় হৃদয় বিনিময়। হৃদয় দিয়ে হৃদয় পাবে কি না বলবার সময় এখনো আসেনি। আরো দু'পাঁচ বছর সবুর করলে ক্ষতি কী? ইতিমধ্যে নিজেও তো যোগ্য হয়ে থাকবে। জীবনসংগ্রামের যোগ্য।

কতকটা পরিহাস ছলে কতকটা সত্যি সত্যি নীলিকে বলি, 'যোগ্যতা বলতে মেয়েদের বেলা বিবাহযোগ্যতাও বোঝায়। তার জন্যে শুধু লেখাপড়া বা গৃহকর্ম বা কলাবিদ্যা যথেষ্ট নয়। ফরাসিনীদের মতো রূপচর্চা প্রসাধনচর্চা করণীয়। অলিভ অয়েল মাখিস্।'

তা শুনে নীলি বলে 'বৃথা। বৃথা। বেণাবনে মুক্তো ছড়ানো। বাংলাদেশের কালা আদমীরা ঠিক দক্ষিণ আফ্রিকার গোরা আদমীদের মতোই বর্ণান্ধ। তুমি মানবে কি না জানিনে, কিন্তু এ দেশের বিয়ের বাজারে একটা প্রচ্ছন্ন 'কালার বার' আছে। আমার তো সন্দেহ হয় যে এ-দেশের ছেলেদের ভালোবাসাও বর্ণনির্ভর।'

বলতে যাই, 'অথবা স্বর্ণনির্ভর।' কিন্তু আমিও তো এ-দেশের ছেলে। অভিযোগটা আমারও গায়ে লাগে। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলি, 'শ্যামা কি গৌরীর চেয়ে কম সুন্দর! আমার তো মনে হয় ভারতীয় শিল্পীদের রূপধ্যান শ্যামাতেই সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত। তাঁর সম্বন্ধেও অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারা যায়, নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী। কিন্তু ও-কথা শুনলে আবার ধর্মান্ধরা ক্ষেপে যাবেন।'

নীলি হেসে বলে, 'প্যারিসে বসে বসে নগ্নমূর্তি আঁকতে আঁকতে তোমার চোখ ঝলসে

গেছে। শিব ঠাকুর কিন্তু এ-দেশের ছেলে। তাই কালীর সঙ্গে ঘর করেন না, গৌরীর সঙ্গেই থাকেন। মাথায় করে রাখেন যাঁকে তিনিও যমুনা নন, গঙ্গা। যাঁর জল কালো নয়, শাদা। না, দাদা, তুমি যাই বল, আমরা এ দেশের মেয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করি।'

আছে হয়তো এর পিছনে কোনো আশাভঙ্গ। খোঁচাতে যাইনে। তবে রয়ে সয়ে নীলিকে আমার প্যারিসের আখ্যায়িকা শোনাই। বলি, 'কে যে কী দেখে ভালোবাসে তা কেউ জানে না, জানতে পারে না। সে রহস্য ঈশ্বরের মতোই দুর্জ্ঞেয়। মাইকেলের মতো একটি কালো রঙের পুরুষকেও পর পর দুটি গৌরবর্ণ নারী ভালোবেসেছিলেন। তুই তো তাঁর মতো কালো নয়। তোর আশা আছে। কিন্তু ভালোবাসা পাওয়াটাই তো সব কথা নয়। পেয়ে রাখতে পারে ক'জন? যেখানে দু'জনেই দু'জনকে চায় সেখানে কিছুই তাদের মাঝখানে দাঁড়াতে পারে না। না ধর্ম, না জাতি, না বর্ণ, না স্বর্ণ। কিন্তু কে জানে কখন তৃতীয় একজন এসে দাঁড়াতে পারে। আমি সুখী যে আমার বিয়ের আগেই এটা ঘটেছে, বিয়ের পরে নয়। নইলে কি আমার মুখ দেখানোর জো থাকত? তা হলেও আমি সুখী হতুম এই ভেবে যে এমন কিছু আমি করিনি যার জন্যে সত্যি লজ্জিত হতে পারি। লোক লজ্জাটা তো আসল লজ্জা নয়। যে জগতে আমরা বাস করি সে জগতে তৃতীয় জনও আছে, তারও দাবী আছে। প্রেমের দাবী। এ কথা মনে রাখলে অনেক দুঃখ বাঁচে, বোন। মনে রাখিস্, মনে রাখিস্।'

নীলির মনের গভীরে বদ্ধমূল যে বর্ণ কমপ্লেক্স তা কি একদিনে যায়! সে আমাকে পালটা বোঝায় যে আমি ভ্রান্ত। ওদিল নাকি আমাকে তত দূর ভালোবাসেনি যত দূর ভালোবাসলে একটি কালো রঙের পুরুষকে বিয়ে করা যায়। এবং কালা পানী পার হওয়া যায়। তখন তাকে নিয়ে যেতে হলো আমার বন্ধু সিতাংশুর বাড়ী। সেখানে আলাপ করিয়ে দিতে হলো ডেনমার্কের মেয়ে কারিনের সঙ্গে। ওদিলের চেয়ে আরো ধবধবে। নীলির বিশ্বাস হলো যে বর্ণ থেকে যে দুঃখ আসে সেটা সকলের বেলা নয়, কিন্তু তৃতীয় জনের প্রবেশ থেকে যে বেদনা সেটাই সর্বত্রিক।

'কী ভয়ঙ্কর জগতে আমরা বাস করছি!' এই হলো নীলির আতঙ্কিত প্রতিক্রিয়া।

'কেন রে! অত ভয়ের কী আছে।' আমি তাকে সাহস দিতে গেলুম।

'এর পদে পদে তৃতীয় জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।' উত্তর দিল নীলি।

'তা বলে ট্র্যাজেডী তো ঘরে ঘরে ঘটছে না। কচিৎ এক আধ জায়গায় ঘটে।' আমি তাকে আশ্বাস দিতে চাইলুম।

'না, দাদা, পর্দা উঠিয়ে দিয়ে ভালো কাজ করছেন না দেশের নেতারা। বাইরে মেলামেশার এত বেশী সুযোগ ভালো নয়।' নীলি গম্ভীরভাবেই বলল।

'তা হলে তো মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষার সুযোগও হারায়। বহুমুখী জীবিকার সুযোগও। মেয়েদের ঘরে বন্ধ রেখেও কি ট্র্যাজেডী এড়ানো যায়? যা হবার তা হবেই।' একটু অর্থপূর্ণ ভাবে তাকালুম।

ইঙ্গিতটা মর্মভেদ করল। নীলি মাথা নিচু করে বলল, 'তা সত্ত্বেও আমি মনে করি ম্যাচ করে বিয়ে করাই ভালো। তাতেই দুঃখ কম। মা বাপকে দোষ দিয়ে অদৃষ্টকে দায়ী করে গায়ের জ্বালা জুড়োয়। আমাদের মা মাসিমাদের জগৎ এমন ভয়ঙ্কর ছিল না। ট্র্যাজেডী তো ঘরে ঘরে ঘটত না। কচিৎ এক আধ জায়গায় ঘটত।' এই বলে নীলিমা আমারি উক্তি আমারি গায়ে ছুঁড়ে মারল।

'তা হলে আর কী!' আমি শ্লেষ দিয়ে বললুম, 'এবার বাবাকে গিয়ে সুসমাচারটা শুনিয়ে দাও। শুভস্য শীঘ্রম্। সেই সঙ্গে শর্তটাও একটু নামাও। হাজার থেকে পাঁচ শ'তে নামলে বাবা হয়তো ভরসা পাবেন। আমি কিন্তু এর মধ্যে নেই। আমি মনে করি অমন সুখের চেয়ে দুঃখ অনেক ভালো। দুর্ভাগ্যের জন্যে আমিই দায়ী, আমিই দোষী। মা বাবাকে জড়াতে চাইনে। অদৃষ্টকেও টেনে আনতে চাইনে।'

'আমার জন্মের জন্যে আমি দায়ী নই। আমার বিয়ের জন্যেও আমি দায়ী নই। জন্মদাতাই দায়ী। তা বলে অত নিচে আমি নামব না।' নীলি হেসে উড়িয়ে দিল।

ষাট মণ ঘিও পুড়বে না। রাধাও নাচবে না। নীলি জানে, তবু হাজার টাকার উপর জোর দেয়। বুঝতে পারি যে ওটা হাসির কথা নয়। ওর আড়ালে আছে ওর আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। বিয়ের বাজারে যদি বিকোতেই হয় তবে চড়া দরেই বিকোবে। নয়তো নয়। বিয়ে না করে আমি যেমন মা'র কাছে আছি সেও তেমনি মা'র কাছে থাকবে। থাকা দরকার। বৌদি তো আসছে না। মাকে দেখবে শুনবে কে? আমি আর্টিস্ট, ধ্যানসর্বস্ব। নীলি ছবি আঁকছে বটে, কিন্তু আর্টিস্ট নয়, নিতান্তই একজন নকলকার বা কারিগর। এটা অবশ্য নীলির কথা। আমার নয়। আমি বিশ্বাস করি যে ইচ্ছা করলে নীলিও আমার মতো আর্টিস্ট হতে পারে। আর আমিই বা কী এমন আর্টিস্ট!

ওদিকে ইউরোপে মহামারী আরম্ভ হয়ে গেছল। সভ্য মানুষ তো প্লেগে মরবে না। প্লেগ উঠিয়ে দিয়েছে। দুর্ভিক্ষে মরবে না। দুর্ভিক্ষ উঠিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির হাতে মরবে না। প্রকৃতির উপর খোদকারী করেছে। মরবে তা হলে কিসে? তা হলে কি সে অমর হবে নাকি? তার ওই অপরিমিত ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য নিয়ে সে যদি অমর হতে চায় তবেই হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের ভারসাম্য নষ্ট হবে! তাই তাকে মাঝে মাঝে যুদ্ধে বিগ্রহে বিনষ্ট হতে হয়। কতকটা তার নিজের ইচ্ছায়, কতকটা বিধাতার।

যুদ্ধ আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। জানতুম যে অতগুলো দেশ যখন ওর জন্যে কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত হচ্ছে তখন তাদের প্রস্তুতিই প্রসূতী হবে যুদ্ধের। তা বলে আমি কি কল্পনা করতে পেরেছি যে অত সত্বর তার আবির্ভাব ঘটবে আর অমন ঝড়ের বেগে নাট্‌সীরা মাজিনো লাইন ভেদ করে প্যারিসের পতন ঘটাবে। হায় প্যারিস! সুন্দরী নাগরী! এবার তো গাম্‌বেত্তার মতো প্রেমিক নেই। কে তোমাকে রক্ষা করতে প্রাণপণ করবে? সেবার চার মাস ধরে তুমি প্রতিরোধ করেছিলে। এবার একদিনেই আত্মসমর্পণ। মাঝখানের সত্তর বছরে ফ্রান্স আপনাকে আরো দুর্বল করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে বোঝা যায়নি। বিপ্লবের দেশ বিপ্লবের থেকে আরো দূরে সরে গেছে। তার জন্যে পরিতাপ বৃথা।

তবু আমার মনে গভীর আঘাত লাগল। আমি তো কেবল ওদিলকেই ভালোবাসিনি। ভালোবেসেছিলুম প্যারিসকেও। আমার বন্ধুদের পরপদানত অবমাননা আমাকেও স্পর্শ করেছিল। ইচ্ছা করলেই তাঁরা প্যারিস ছেড়ে যেতে পারতেন। তাতে তাঁদের সম্মান বাঁচত। কিন্তু তাঁরা তা করবেন না। প্যারিসের টান। প্যারিসের প্রতি আনুগত্য। আমার বন্ধু সিতাংশু বলত, 'প্যারিস এমন সুন্দরী যে পতিতা হলেও তার সৌন্দর্যের ক্ষয় নেই। তুমি শিল্পী, তুমি যা হারালে তার প্রতিরূপ পাবে কোথায়! এই কলকাতায়? এখানে তোমার কিচ্ছু হবে না।'

প্যারিসে থেকে গেলেও কিছু হতো না। ঝড়ের আগের হিমেল হাওয়া আমার গায়ে লেগেছিল। ঝড়ের মুখে ঝরা পাতার মতো আমাকে উড়ে যেতে হতোই। সম্ভবত লণ্ডনে। এ ঝড় কি সেখানেও পৌঁছত না? প্যারিসের পতনের পূর্বে ইংলণ্ডের উপর আকাশ থেকে যে শিলাবৃষ্টি হলো সেই ব্রিটিসের মার খেয়ে কে কে বেঁচে আছেন জানিনে। আমি যে বাঁচতুম তার নিশ্চয়তা কোথায়! নিশ্চয়তা অবশ্য এ দেশেও নেই। কোন্ দিন কে যে আক্রমণ করে বসে বলা যায় না। মরতে হয় নিজের জন্মভূমিতেই মরব। ফিরে আসার সময় এ কথাও ভেবেছি। আরো ভেবেছি বিপ্লবের কথা। এবার বিপ্লব যদি কোথাও ঘটে তো ভারতবর্ষেই ঘটবে। ইতিহাস যাঁরা গুলে খেয়েছেন তাঁরাই আমাকে বলেছেন। তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য হয় তবে বিপ্লবের দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দর্শন করব, আর স্বহস্তে অঙ্কন করব। এ বাসনা আমার অনেক দিনের। অবশ্য বিপ্লবের দিন যদি প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকি।

না। দেশে ফিরে এসে আমি ভুল করিনি। তবে এ কথাও আমি ভুলে যাইনি যে চিত্রকলার মূলস্রোত সেন নদীর কূলে প্রবহমান, গঙ্গানদীর তটে নয়। আমি চলে এসেছি বলে মূলস্রোতটাও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেনি। যেখানকার স্রোত সেখানেই রয়ে গেছে। নাট্‌সী বুটের তলায় প্যারিসের মাটি কামড়ে পড়ে আছেন যে

ক'জন তাঁরাই মূলস্রোতের অবগাহী। আর্টের খাতিরে আর্টিস্টকে অনেক অপমান মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। যেমন সন্তানের খাতিরে জননীকে। আমার মা-ও মনে মনে অনুশোচনা করেন। লোকে যখন জানতে চায় আমার কাছে, 'এইটেই কি আধুনিকতম', আমি ফাঁপরে পড়ি। যদি বলি, 'না,' তা হলে আমার ছবি বিকোবে কোন গুণে? আমি তো দেশধর্মী নই। আমি যুগধর্মী। অথচ মূলস্রোত থেকে অত দূরে সরে এসে কোন্ মুখে বলি, 'হাঁ'? তবু তো এত দিন প্যারিসের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। পত্রিকা আসত। ফোটো আসত। প্রতিলিপি আনিয়ে নিতুম। বই কিনতুম। এখন সব সম্পর্ক ছিন্ন হলো। মূলস্রোত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি তা হলে করি কী?

কেন? গোগ্যাঁ কী করেছিলেন? তাহিতি তো পৃথিবীর উলটো পিঠে। আমার চেয়ে ঢের বড় শিল্পী। আমার চেয়ে ঢের বেশী আধুনিক। তাঁর তো লেশমাত্র পিছুটান ছিল না। তিনি তো ভুলে যেতে পেরেছিলেন। হাঁ, গোগ্যাঁ মূলস্রোত থেকে স্বেচ্ছায় সরে গেছলেন। কারণ তিনি আরো মৌলিক স্রোতের সন্ধান পেয়েছিলেন। সে স্রোত আদিকাল থেকে আগত। আদিকালেই অবস্থিত। অথচ জীবন্ত। আমাদের এ দেশেও সেরূপ একটি আদিকাল থেকে প্রবহমান মৌলিক রসধারা ছিল। এখন নেই। থাকলেও তার স্থিতি আদিকালে নয়। আধুনিক কালেও নয়। তার মধ্যে জীবনের ভাগ অল্প। তাকে জীবন্ত না বলে নির্বস্ত্র বলাই সঙ্গত। সাঁওতালরাও সে সাঁওতাল নয়, গোন্দরাও সে গোন্দ নয়, নাগারাও সে নাগা নয়, লেপচারাও সে লেপচা নয়। তাহিতিও কি আর সে তাহিতি আছে? যেখান থেকে পালাব সেইখানেই পৌঁছব। গিয়ে দেখব সভ্যতা আমার আগেই হাজির হয়েছে। এমন মিশাল ঘটিয়েছে যে আদিমদের মধ্যে আর আদমকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ইভকেও সাপের দল আপেল খাইয়ে দিয়েছে। গোগ্যাঁর ভাগ্যে যে সুখ ছিল সে সুখ চিরকালের মতো অস্ত গেছে। উষ্ণতা যদি না থাকে নগ্নতা নিয়ে আমি কী করব?

ও ভুল আমি করিনি। ইয়ারদের হাসিতামাশার পাত্র হয়েছি। এমন কি মেয়েরাও আমাকে কৃপার পাত্র মনে করেছে। তা সত্ত্বেও আমি কাচের বদলে কাঞ্চন সঁপে দিইনি। ওরা যাকে সুখ বলে তার মধ্যে উষ্ণতা কোথায়? হৃদয় উষ্ণ নয়, দেহ উষ্ণ নয়। ওর চেয়ে বরফজলে স্নান করা আরামের। যে উষ্ণতা প্রাণ সৃষ্টি করে শিল্পও তার সংস্পর্শ পেলে বাঁচে। কিন্তু সূর্যের আলোর উষ্ণতা চাঁদের আলোয় নেই। 'নগ্নতা' 'নগ্নতা' করে প্যারিসের শিল্পীগুলো মোলো। সবাই নয় অবশ্য। বোঝে না যে দু'রকম নগ্নতা আছে। সদ্যোজাত শিশুর নগ্নতা। সে নগ্নতা জীবনধর্মী। চিতার আগুনে নরদেহের নগ্নতা। সে নগ্নতা মরণধর্মী। উত্তাপ দিয়ে তাকে ঘিরে দিলে কী হবে? ভিতরে তার উষ্ণতা নেই। শিল্পে তাকে রূপ দিতে পারো। কিন্তু তাপ দেবে কী মন্ত্রবলে? আঙ্গিক?

আঙ্গিক এখানে কোন্ কাজে লাগবে? শেষপর্যন্ত শিল্পীর সম্বল তার নিজের হৃদয়ের, নিজের প্যাশনের উষ্ণতা। অবশ্য ও জিনিস সোনায় সোহাগা নয়। কচিৎ ওর সাক্ষ্য পাই। বহুভাগ্যে মেলে।

আধুনিকতাকে আমি কিসের সঙ্গে তুলনা করব? সূর্যের আলোর সঙ্গে নয়। চাঁদের আলোর সঙ্গে নয়। ওই স্রোতের সঙ্গে। প্রবাহের সঙ্গে। সারা পৃথিবী জুড়ে এর বিস্তার। কিন্তু মূল স্রোত সর্বত্রব্যাপী নয়। অগণ্য সাধকের পরম্পরাগত সাধনার ফলে পশ্চিম ইউরোপেই শিল্প ও সাহিত্যের মূল স্রোত। তার থেকে স্বেচ্ছায় সরে এলেও আমি একেবারে বিযুক্ত হতে চাইনি। এই মহাযুদ্ধ আমাকে বিয়োগব্যথা দিল। আমার ছবি যে আধুনিকতম নয় এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। বেদরদী সমালোচকরা যখন নুন ছিটিয়ে দেয় তখন আমি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করি। আর দেশধর্মী সমালোচকরা আমাকে ফেরঙ্গ বলে আমলই দিতে চান না। আমি যে তাঁদের স্রোতে গা ভাসাইনে।

আমরা এক পালকের পাখীরা মিলে ছোট খাটো একটা ঝাঁক বাঁধি। সমালোচকদের খোঁটা আমাদের সকলের গায়ে ব'জে বলে আমরা নিজেরাই নিজেদের তারিফ করি। 'ওরা বলছে?' 'কী বলছে?' 'বলতে দাও।' এই হলো আমাদের উত্তর। বাচনিক উত্তর। আসল উত্তর যেটা সেটা তো কথায় নয়, কাজে। যা আঁকছি তা যদি সুন্দর হয়ে থাকে সত্য হয়ে থাকে তবে তাকে না দেখছে কে? ছবি যদি দর্শনীয় হয়ে থাকে তবে লোকে ভিড় করে দেখবেই। ওটা একটা মিথ্যে বিপদ। ওটার জন্যে আমরা পরোয়া করিনে। কিন্তু আর একটা বিপদ আছে। সেইটেই সত্যিকার বিপদ।

তোমরা সাহিত্যিকরা বিদেহী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারো। আমরা চিত্রকররা ভাস্কররা কি তা পারি? দেহ বাদ দিলে ছবির বা মূর্তির কী থাকে? নগ্ন দেহই বা না আঁকব কেন? না গড়ব কেন? অবশ্য তার বেসাতি করে যারা বড়লোক হতে চায় তাদের কথা আলাদা। তাদের হয়ে জবাবদিহি করা আমাদের সাজে না। পর্নোগ্রাফিকে আমরা আর্ট বলিনে। তা বলে নগ্নতাকে সচেতনভাবে বর্জন করাও কি আর্ট? আমরা যদি গোড়া থেকেই সমালোচনার ভয়ে আর্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি তা হলে ছবি হতে পারে, মূর্তি হতে পারে, কিন্তু আর্ট হবে না। তাই যদি না হলো তবে আমরা কিসের জন্যে জীবন উৎসর্গ করলুম? ভালো ছেলে হওয়াই যদি মনোগত অভিপ্রায় তবে আর্ট ছাড়া কি দুনিয়ায় আর কোনো উপজীব্য ছিল না?

ছেলেবেলায় আমার ঠাকু'মা আমাকে বলতেন, যাকে রাখ সেই রাখে। বড় হয়ে আমিও আমাকে বলে থাকি, যাকে রাখ সেই রাখে। আমি যদি আর্টকে রাখি আর্ট আমাকে রাখবে। কিন্তু লোকের যদি ষত্ব ণত্ব জ্ঞান না থাকে, তারা যদি আর্টকে ভাবে পর্নোগ্রাফি আর পর্নোগ্রাফিকে ভাবে আর্ট তবে তাদের মার পড়বে নির্দোষীর পিঠে

আর হার ঝুলবে দোষীর গলায়। তার লক্ষণ দেখে মনের জোর কমে যায়। মেসোমশায়ের কাছে যাই নৈতিক সমর্থনের খোঁজে। শিল্পের যেটা অপরিহার্য অঙ্গ তার নাম মানবের অঙ্গ। এ তত্ত্ব তিনি মানেন। তবে তার সঙ্গে আত্মাও থাকবে। নইলে অপূর্ণতা রয়ে যাবে। নগ্নতা সম্বন্ধেও তাঁর বিকার নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে পূর্ণতা থাকা চাই। পূর্ণতাই লক্ষ্য। পূর্ণ সৌন্দর্য। সেই পূর্ণতা যেখানে আছে নগ্নতা সেখানে পূর্ণতার মধ্যেই আছে। তাকে বাদ দিলে পূর্ণতাও থাকে না। যেমন গ্রীক ভাস্কর্যে।

প্রাচীন গ্রীকরা প্রাচীন ভারতীয়রা রসিক ছিলেন। মধ্যযুগেও রসিকজনের অভাব ঘটেনি, কিন্তু সাধুজনের প্রভাব সাধারণের রসবোধকে আচ্ছন্ন করেছিল। আধুনিক যুগ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হয়নি। সত্যিকার বিপদ এইখানেই।

॥ চার ॥

মেসোমশায় তখনো তাঁর নিজের জীবনের পুনরারম্ভ নিয়ে চিন্তাকুল। আমাকে খুলে বলতেন না, কাউকেই না, কোন্‌খানে তাঁর ব্যথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন চাকরি তো তিনি পায়ে ঠেললেন। আবহাওয়া তাঁর পছন্দ নয়। অমন আবহাওয়ায় কাজ হয় না।

ওদিকে মাসিমার সেই এক ভাবনা, এক ধ্যান। মালার ভালো বিয়ে দিতে হবে। জগৎ জুড়ে যুদ্ধ হতে পারে, দেশ জুড়ে সত্যাগ্রহ হতে পারে, মানবসভ্যতা টলমল করতে পারে, কিন্তু মাসিমা হলেন সেই আদ্যিকালের ভবী। ভবী ভোলে না। ভোলে না যে তাঁর মেয়ের বয়স দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, এই বেলা তাকে পাত্রস্থ করতে না পারলে পরে আর ও মেয়ের ভালো বিয়ে হবে না।

আমার সাহায্য চেয়ে সে-বার তিনি নাকাল হয়েছিলেন। সেটা যদিও আমার দোষে নয় তবু আমার সঙ্গে সেটার কাকতালীয় সম্পর্ক ধরে নিয়েছিলেন। আর আমাকে বলতেন না। তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন তো কলকাতা শহরে বড় কম নেই। তাঁদের বলতেন। তাঁরা চেষ্টাচরিত্র করতেন। ভালো মন্দ মাঝারি সব রকম ছেলে একে একে হাজির হতো। অবশ্য পার্টিতে নিমন্ত্রণছলে।

আমার মালা বোনটি কিন্তু এমন অবুঝ। সে-বার যেমন রাজার ছেলেকে ভাব পাড়তে বলে অপ্রস্তুত করেছিল তেমনি সলিসিটারের ছেলে, ব্যারিস্টারের ছেলে, ডাক্তারের ছেলে, হাকিমের ছেলে, ইঞ্জিনীয়ারের ছেলে, এদের এক একজনকে এক একটি

অসাধ্য সাধন করতে বলে অপদস্থ করেছে। অসাধ্য সাধন ? নয় তো কী। ভদ্রমহিলার রুমাল মাটিতে পড়ে গেলে কুড়িয়ে আনা সুসাধ্য সাধন। কিন্তু হঠাৎ এক পাটি চটি ছিঁড়ে গেলে সেটিকে বিশেষরূপে বহন করা বিবাহের জন্যে অসাধ্য সাধন নয় কি ? গ্যালান্ট হলে তাও পারা যায়, কিন্তু ছেঁড়া কাগজের টুকরো, কমলালেবুর খোসা ইত্যাদি লিটার কুড়োনো কি ভদ্রলোকের ছেলের সাজে ? মালাকে বিয়ে করতে চাইলে মালী হতে হবে। য়্যাঁ ?

বেচারিদের মাথা কাটা যায়। মুখ লাল হয়ে ওঠে। তার পরে অন্তর্ধান। মাসিমা মেয়েকে দাবড়ি দেন। মালা করুণ চোখে তাকায়। সে-চোখ দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে, মালা ইচ্ছে করে বিস্কুটটা ফেলে দিয়েছে বা চটির পাটি ছিঁড়ে ফেলেছে। বরং স্বীকার করবে অমন হয়ে থাকে। মাসিমা কিন্তু হাড়ে হাড়ে জানেন কী বার অঘটন আপনি ঘটে না, ঘটতে পারে না। মালাই ঘটিয়েছে। আর যদি আপনি ঘটেও তবু চুপ করে থাকলেই হয়। ভদ্রলোকের ছেলেকে এটা সেটা কুড়োতে বলা কেন ? মালা এর উত্তরে বলে সব মানুষই সমান, সব শ্রমই সম্মানের। মাসিমা রেগে যান।

রায় বাহাদুরের ছেলেকে ঝুল ঝাড়তে বলে মালা যে কাণ্ডটি বাধাল সেটি তো দৈব ঘটনা নয়। ছেলেটি সত্যি খুব ভালো। মালার মুখ রক্ষা করল, ঝুল ঝাড়ল। কিন্তু তার পর থেকে অদৃশ্য। মাসিমা ফেটে পড়লেন। মেয়েকে বললেন, 'একটা কথা আছে, মালু। অতি ঘরন্তী না পায় ঘর। কোনো বরই যার মনে ধরে না তার বিয়ে হয় না। তোমাকে একদিন এর জন্যে পশতাতে হবে, মা!'

মালা বলল, 'বিয়ে না হলে পশতাতে হবে এমন কী কথা আছে ? আমাদের লেডী প্রিন্সিপালের তো বিয়ে হয়নি। কই, তাঁকে তো দিন দিন শুকিয়ে যেতে দেখিনে।'

তা শুনে হাসাহাসি পড়ে গেল। মাসিমার যুক্তি এক কথায় খণ্ডিত হলো।

তিনি মেসোমশায়কেই এর জন্যে দায়ী করলেন। মেয়েকে ছেলেবেলা থেকে এমন কুশিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সে ভদ্রলোকের ছেলেদের অসাধ্য সাধন করতে বলে। কেন তারা তা করবে ? কী এমন রূপসী গুণবতী ধনীর মেয়ে যে তার জন্যে ব্যারিস্টারের ছেলে চটি জুতো কুড়িয়ে আনবে, জজসাহেবের ছেলে লিটার কুড়োবে। যিনি তাকে কুশিক্ষা দিয়েছেন তিনি কেন দারুব্রহ্ম সেজে ঠুঁটো হয়ে বসে আছেন ? দিন কেমন করে দেবেন মেয়ের বিয়ে। ভালো বিয়ে।

মেসোমশায় বলেন, 'মালা এখন সাবালিকা হয়েছে। কলেজে পড়ছে।' ওর যদি বিয়ে করতে ইচ্ছা না থাকে আমরা কী করতে পারি। সবুর করো। আগে ওর পড়াশুনো শেষ হোক। বয়স এমন কী হয়েছে!'

মাসিমা বলেন, 'তা বলে এতগুলি ভালো ভালো পাত্র অকারণে হাতছাড়া হবে ?

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা তোমার স্বভাব। তোমার মেয়েরও স্বভাব হবে?'

তাঁদের মতবিরোধ ধীরে ধীরে দাম্পত্য কলহের ধার ঘেঁষে চলেছিল। মাসিমার স্থির বিশ্বাস মেসোমশায় প্রশ্রয় দেন বলেই মালা অমন বেপরোয়াভাবে সুপাত্রদের বরখাস্ত করে। তিনি যদি তাঁর মেয়েকে শাসন না করেন তবে মাসিমার সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হবে। ওর বয়সের প্রত্যেকটি মেয়ের এক এক করে ভালো বিয়ে হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। একদিন দেখা যাবে ওর বয়সের গাছপাথর নেই। তখন সে যে কী বিপদ!

সে যে কী বিপদ সেটা মেসোমশায় অনুধাবন করতে পারেন না। মেয়ে যদি অনূঢ়া থেকে যায় তিনি দুঃখিত হবেন নিশ্চয় কিন্তু মেয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বে বিয়ে হলেই কি তিনি সুখী হবেন? জীবনটা তাঁর নয়, মাসিমারও নয়। জীবনটা মালার। তার জীবন সে কেমন ভাবে খরচ করবে সেটা তারই উপর ছেড়ে দেওয়া ভালো। মাসিমা কিন্তু ও তত্ত্ব মেনে নিতে নারাজ। তাঁর মতে ওটা ভালো নয়, মন্দ।

এখন মেয়ের ইচ্ছা নেই বলে মেয়ে বিয়ে করবে না, কিন্তু যখন তার ইচ্ছা হবে তখন কি তার জন্যে সুপাত্ররা বসে থাকবে? না তাদের কেউ বসে থাকতে দেবে? দু'মিনিট দেরি করে পৌঁছলে বাজার থেকে মাছ উধাও হয়ে যায়। তার পর তুমি সারা দিন সন্ধান করে রুই কাতলা ইলিশ পাবে না, পেলে হয়তো পাবে আড কি বাচা কি বোয়াল। ইহাই নিয়ম। ইংরেজীতে বলে সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। আমরা হলে বলতুম সময় আর সুপাত্র কারো জন্যে সবুর করে না।

মাসিমা আমার কাছে আফসোস জানান। 'তুমি, বাবা, মালাকে একটু বোঝাও। নীলি তো ওর খুব বন্ধু। সেও যদি একটু বোঝায়।'

মালাকে আমি এ বিষয়ে কিছু বলিনে, বলতে পারিনে। নীলি বলে। তখন মালা জবাব দেয়, 'রূপকথার রাজপুত্তুর যখন আসবে তার আগেই যদি আমি পরের হয়ে থাকি তবে তিনটি জীবন ব্যর্থ হবে। যে কর্মের পরিণামে তিনটি মানুষ অসুখী সেটা কি শুভকর্ম?'

'আর রাজপুত্তুর যদি না আসে?' নীলি প্রশ্ন তোলে।

'যদি আসে।' মালা কাটান দেয়।

'আহা! একবার মেনে নে না। যদি না আসে?' নীলি টেনে টেনে বলে।

'তুই মেনে নে না। যদি আসে?' মালা আরো টেনে টেনে বলে।

'কেমন করে জানলি যে আসবে?' নীলি ঘুরিয়ে জেরা করে।

'কেমন করে জানব যে আসবে না?' মালা কাটিয়ে যায়।

এ তর্কের মীমাংসা নেই। যার যা বিশ্বাস। নীলির বিশ্বাস রূপকথার রাজপুত্রের অস্তিত্ব নেই। থাকলে তো আসবে। যারা আছে ও আসে তাদেরই একজনের গলায়

মালা দেওয়াই বিজ্ঞতা। মালার বিশ্বাস রূপকথার রাজপুত্র আছে ও আসবে। তার জন্তে মালা গেঁথে তুলে রাখাই শ্রেয়। আর কারো গলায় মালা দেওয়া অপরিণামদর্শিতা। প্রতীক্ষা যদি নিষ্ফল হয় তবে সে একা অসুখী হবে। প্রতীক্ষা যদি না করে তবে তিনটি মানুষ অসুখী হবে। কোন্‌টা ভালো? একজন অসুখী না তিনজন অসুখী?

'শুনলে তো, দাদা, মালার যুক্তি?' নীলি সবিস্তারে শোনায়।

'শুনলুম। তা বলে ওই পাগলীর প্রলাপ এক কথায় উড়িয়ে দিতেও পারিনে।' আমি রায় দিই। 'রাজপুত্র না থাক, এমন কেউ হয়তো আছে যাকে দেখলেই আপনার বলে চেনা যায়। সে যদি বিয়ের পরে আসে তবে তাকে পর বলে অস্বীকার করা ভীরুতা। অথচ তাকে আপনার বলে স্বীকার করাও ভয়ঙ্কর। তখন তিনটি কেন, আরো কয়েকটি মানুষও অসুখী হয়। যদি জন্মে থাকে। তার চেয়ে যতকাল সম্ভব সবুর করাই কম দুঃখের।'

বাধ্য হলে সবুর করতে নীলিও রাজী। কিন্তু একটির পর একটি সুপাত্রকে একটা না একটা ছলে নামঞ্জুর করবে এতখানি সাহস তার নেই। সাহস তো নয়, আস্পর্ধা। যার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সেই তো আপনার। জন্মে জন্মে আপনার। সে ভিন্ন আর সকলেই তো পর। বিয়ের পরে কবে কে একজন আসবে, সেই হবে আপন, সোয়ামী হবে পর? মা গো! ভাবতেও পাবা যায় না। ঘেন্না করে।

মাসিমা কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। তিনি বরং শক্ত হাতে হাল ধরবেন। মেয়েব বাপ তো উদাসীন, মাও যদি উদাসীন হন তবে আর ও-মেয়ের সময়ে বিয়ে হবে না, পরে ও নির্ঘাত অপাত্রে পড়বে। তখন ও মা-বাপকেই দোষ দেবে। তার চেয়ে সময়মতো ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভালো। ওর মত থাক আর নাই থাক। মেয়েদেব মত নেওয়ার রেওয়াজ হলো কবে থেকে? যত সব সাহেবিয়ানা। সাহেবদের ভালো গুণগুলো নিতে জানে না। মন্দ গুণগুলোই নেয়। বিবাহেব মতো পবিত্র ব্যাপারে গুরু-জনের মতই শিরোধার্য। গুরুজন যেটুকু স্বাধীনতা দিয়েছেন সেটুকুর সদ্‌ব্যবহার করলেই মঙ্গল। ওই যে সুপাত্রদের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে দেওয়া হয়েছে ওটা কত বড় একটা প্রগতির লক্ষণ। বল, কথা বল, কিন্তু ঝুল ঝাড়তে জুতো কুড়োতে ডাব পাড়তে বোলো না। ওটা স্বাধীনতার অপব্যবহার।

মাসিমা এখন থেকে জবরদস্ত হলেন। পাত্র ঠিক করার ভার নিজের হাতেই নিলেন। তাঁর যাকে পছন্দ তাকেই বিয়ে করবে মালা। কিন্তু মেসোমশায়ের দিক থেকে তিনি লেশমাত্র সহানুভূতি পেলেন না। কর্তা অধিকাংশ সময় মৌন। দুটো একটা কথা যখন বলেন তখন ও-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। শীতল যুদ্ধের পূর্বাভাস।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর একদিন কথায় কথায় মেসোমশায় আমাকে বললেন, 'না।

তপোবনের উপযোগী আবহাওয়া নেই। না কলকাতায়, না কলকাতার এক শ' মাইলের মধ্যে কোনো খোলা জায়গায়। স্থান নির্বাচনে ভুল হয়েছিল তাঁর। আমারও।'

আমি বললুম, 'মেসোমশায়, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি ?'

তিনি অভয় দিলেন। তখন আমি বললুম, 'শুধু স্থান নির্বাচনে নয়। কাল নির্বাচনেও। বিংশ শতাব্দী যদি খ্রীস্টপূর্ব বিংশ শতাব্দী হতো তা হলে তপোবনের উপযুক্ত আবহাওয়া আপনারা যে কোনো জায়গায় পেতেন। খ্রীস্টোত্তর হয়েই মাটি করেছে। আবহাওয়া আপনি কোনোখানেই পাবেন না।'

মেসোমশায় মাথা নাড়লেন। 'আমি অতটা নিশ্চিত নই। হিমালয় এখনো আছে। ভাবছি হিমালয়ে গিয়ে বাস করব। আলমোড়ায় কি লছমনঝোলায়। মুশকিল হচ্ছে সেখানে বিজ্ঞানের উপযুক্ত আবহাওয়া নেই। কী নিয়ে থাকব ?'

মনটা কেমন করে উঠল। মেসোমশায়রা তা হলে কলকাতায় থাকবেন না, আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। ক'টা দিনেরই বা আলাপ, তবু অলক্ষে একটা স্নেহের বাঁধন তৈরি হয়েছিল। তা ছাড়া ঝড়ঝাপটার যুগে অন্তর যখন বিক্ষুব্ধ তখন শান্তির জন্যে আলোর জন্যে কার কাছেই বা যাই ? মেসোমশায় ছিলেন আমার আলোকস্তম্ভ, আমার পোতাশ্রয়।

বুঝতে পারছিলুম কলকাতায় তাঁর মন বসছে না। চাকরি পেলেও না। গাছ যেমন মাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ পাতায় মানুষও তেমনি তার বাসস্থানের সঙ্গে। গৃহনির্মাণ করলেই কি সম্বন্ধ পাকা হয় ? প্যারিসে তো আমার ঘরবাড়ী ছিল না। তবু তো একটা সম্বন্ধ পাতানো হয়েছিল। জীবনের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে দিতে পারলেই মানুষ অঙ্গাঙ্গিতা অনুভব করে। মেসোমশায় তো কলকাতার জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন।

কলকাতা ছাড়তে মাসিমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। চব্বিশ পঁচিশ বছর রেঙ্গুনে কাটিয়ে এসে কলকাতায় তিনি জমিয়ে বসেছেন। এই তো তাঁর স্বস্থান। এখান থেকে নড়তে হবে শুনলে তিনি বিদ্রোহ করবেন। তলে তলে তাঁর সাধ ছিল একটি ঘরজামাই সংগ্রহ করা। মালার হাত থেকে নিজের হাতে নির্বাচনের ভার কেড়ে নিয়ে তিনি নতুন করে সে বিষয়ে উদ্যোগী হলেন। আবিষ্কার করলেন যে পাত্র তাঁর হাতের মুঠোয়।

বুধবারের পার্টিতে প্রায়ই আসত একটি ফিটফাট ধোপদুরস্ত ছেলে। কী করত জানিনে। চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরেজী বলত আর পরিবেশনের সময় মাসিমার পায়ে পায়ে ঘুরত। নাম শুনেছিলুম টোগো। টোগো খাশনবিশ। টোগোর মস্ত একটা গুণ ছিল নিজের মোটরে আমার মতো পদাতিকদের তুলে নিয়ে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া। মাঝে মাঝে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে আসা। যেদিন পার্টিতে লোকজন কম সেদিন সে গাড়ী করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমার মতো গরহাজিরদের ধরে নিয়ে আসবেই। মাসিমার প্রতি আনুগত্যে তার দোসর ছিল না। বিনয়, নম্রতা, সৌজন্য, অপরের প্রতি বিবেচনায়

সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাকে মিস্টার খাশনবিশ বললে সে অভিমান করে। বলতে হবে টোগো। আপনি বলা চলবে না। বলতে হবে তুমি। অথচ সে যে কে, কার কী হয়, তাই আমার জানা নেই।

পরে জেনেছিলুম তার মা বাপ দু'জনেই কোয়েটার ভূমিকম্পে মারা যান। সে ও তার দুই বোন কোনো গতিকে রক্ষা পায়। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই তার এখন ঝাড়া হাত পা। ইতিমধ্যে বিলেত ঘুরে এসেছে। কিন্তু কাজকর্ম জোটেনি। দরকারও নেই। সঙ্গতি আছে। সুযোগ পেলে আর্মিতে যাবে। কিংবা নেভিতে। টাকার জন্যে নয়। অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে। কোনো রকম বদ খেয়াল নেই। নেহাৎ সামাজিকতার খাতিরে ধোঁয়া আর পানী দুই রকম পান করে।

টোগোর পরিচয় দেবার সময় মাসিমা বলতেন, 'মিস্টার খাশনবিশ। জার্নালিস্ট।' কোন্ কাগজে লেখে তা বলতেন না। সেও চুপ করে থাকত। চাপ দিলে এড়িয়ে যেত। পরে আমাকে বিশ্বাস করে আপনি বলেছিল যে সে টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার সামাজিক সংবাদদাতা। ওরা তার নাম প্রকাশ করে না। জানাজানি হয়ে গেলে সকলে সতর্ক ভাবে মিশবে। তা হলে আর সংবাদ কী হলো? সংবাদ হলো তাই যা অসতর্ক মুহূর্তে লোকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই উপলক্ষে কলকাতার সমাজের বিভিন্ন মহলে তার গতিবিধি। কিন্তু ইতিমধ্যেই এতে তার অবসাদ এসেছে। আসল সংবাদ যেখানে উৎপন্ন হচ্ছে সেখানে তো তার প্রবেশ নেই। যেমন বড়লাটের শাসন পরিষদে বা জঙ্গীলাটের দপ্তরে বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বা কমিউনিস্ট পার্টির অন্তঃপুরে।

জাপান যখন যুদ্ধে নামল টোগো তখন যুদ্ধের ঘোড়ার মতো চঞ্চল হয়ে উঠল। ভারতীয় ফৌজ ও নৌবহর কে ভারতের বাইরে এক অনির্দিষ্ট রণাঙ্গনে প্রেরিত হয়েছে এ খবর আমরা কেউ জানতুম না। টোগো কেমন করে জানতে পেরেছিল। সেও তাদের সঙ্গে যেতে চায়। কিন্তু ভারতীয় সাংবাদিকদের হাত পা বাঁধা। চাইলেই তো চাওয়া মঞ্জুর হয় না। কমিশন পেলে ইউনিফর্ম পরে সৈনিক হতেও সে প্রস্তুত। আসল সংবাদ যেখানে উৎপন্ন হচ্ছে সেখানে গিয়ে হাজির হবার সেও তো এক উপায়। তাতে আর কিছু হোক না হোক তার কৌতূহল চরিতার্থ হবে।

জাপান যখন সিঙ্গাপুর নিল তখন টোগোর মুখে হঠাৎ শোনা গেল, 'জাপানকে রুখতে হবে।' আমাদের মধ্যে সেই সব চেয়ে উত্তেজিত।

তা শুনে মাসিমা বললেন, 'টোগোকে রুখতে হবে।' তিনিও সমান উত্তেজিত।

'কেন, মাসিমা, টোগোকে রুখতে হবে কেন?' জিজ্ঞাসা করলুম আমি। 'সে তো জাপানী অ্যাডমিরাল টোগো নয় যে ভারত আক্রমণ করবে।'

'উহু, তুমি বুঝতে পারছ না। টোগো জাপানীদের আক্রমণ ঠেকাতে চায়। অমন

করলে কি ও বাঁচবে!' মাসিমার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

'ও না বাঁচুক দেশশুদ্ধ মানুষ বাঁচবে।' আমি ভালোমানুষের মতো বলি।

'বা! তুমি তো ওর বেশ হিতৈষী দেখছি। কোয়েটার ভূমিকম্পে ও মরতে মরতে বেঁচে গেছে। ওর মা থাকলে কি ওকে মরতে পাঠাতেন? ওর মা নেই বলে কি কেউ নেই? তোমার মা কি তোমাকে যুদ্ধে যেতে দেবেন?' মাসিমা চোখ কপালে তুললেন।

আমি শিল্পী। আমি যুদ্ধে গেলে শিল্প মরবে। কিন্তু টোগো যুদ্ধে গেলে কার কী ক্ষতি? এই হলো আমার প্রশ্ন। এর উত্তরে মাসিমা দৃষ্টি দিয়ে অগ্নিবৃষ্টি করলেন।

নীলি আমার চেয়ে বেশী জানত। শুনে আশ্চর্য হলো না যে মাসিমা টোগোকে জাপানীদের হাত থেকে বাঁচাতে চান। বলল, 'মায়ের চেয়ে শাশুড়ীর দরদ বেশী।'

কথাটা এমন কিছু ধারালো নয়। তবু আমাব মনের ভিতরে কী যেন কেটে গেল। শাশুড়ী! মাসিমা হবেন টোগোর মতো একটা যে সে লোকের শাশুড়ী। মালা পড়বে মুক্তোর মালার মতো বাঁদরের গলায়।

আমার ভাব দেখে নীলি হেসে আকুল। 'কী, দাদা? তোমার মুখখানা কালো হয়ে গেল কেন? তোমার তো খুশি হওয়া উচিত যে এত কাল পরে মালা বোনটির বিয়ের ফুল ফুটল। বোনের সুখ তোমার সহ্য হচ্ছে না?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'টোগো যদি মালার যোগ্য বর হতো আমি এই মুহূর্তেই ওর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করতুম।'

নীলি খিল খিল করে হাসল। 'যোগ্য বর হলে তুমি আরো ব্যথা পেতে, দাদা। আমার কাছে লুকিয়ে কী হবে? তুমি ধরা পড়ে গেছ।'

সত্যি কি তাই? আমি অবাক হয়ে ভাবি। নীলি হাসতেই থাকে।

আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'নীলি, বিয়ে করবি?'

'কাকে?' সন্ত্রস্ত হলো নীলি।

'টোগোকে।' রুদ্ধশ্বাসে বললুম আমি।

'যাও!' নীলি এমন স্বরে বলল যেন টোগো একটা মানুষই নয়। তার হাসি থামল। পরে একটু পরিষ্কার করে বলল, 'বন্ধুর বর চুরি করা অন্যায়।'

সঙ্কোচের সঙ্গে জানতে চাইলুম মালা কি মাসিমার নির্বন্ধে রাজী?

নীলি বলল, 'না। সে তার রাজপুত্র ভিন্ন আর কারো বধূ হবে না।'

ধন্যবাদ। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারিনে। মাসিমা হয়তো মালাকে বাধ্য করবেন। মেসোমশায় হয়তো হিমালয়ে যাবার জন্যে রাতারাতি দায়মুক্ত হতে চাইবেন। মালা বেচারি কার ভরসায় বেঁকে বসবে? কাল্পনিক এক রাজপুত্রের ভরসায়?

খুব একটা গর্হিত কাজ করতে হলো আমাকে। টোগোর সঙ্গে নীলির বিয়ের সম্বন্ধ। নীলিকে টোগো আগেই দেখেছিল, মোটরে করে পৌঁছে দিয়েছিল। তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল। একদিন টোগোকে আমাদের বাসায় নেমন্তন্ন করে মা'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম। প্রস্তাবটা মা'র মুখ দিয়েই করা হলো। নীলি ও আমি তখন আড়ালে। থতমত খেয়ে টোগো সময় নিল ভাবতে। ভেবে বলল, 'আচ্ছা'।

মাসিমার মনে যাই থাক তিনি টোগোর কাছে কোনো দিন প্রকাশ করেননি যে তাকে তিনি জামাই করতে ইচ্ছুক। সুতরাং টোগোর দিক থেকে অপরাধ কিছু হয়নি। কিংবা আমার দিক থেকে। মাসিমা আমাদের দোষ ধরতে পারেন না। ভিতরে ভিতরে আঘাত পেলেন ঠিকই। বাইরে আনন্দ দেখালেন। নীলিকে সোনার সিঁথিমৌর গড়িয়ে উপহার দিলেন।

এর পর শুরু হলো টোগোর নিন্দাবাদ। পড়াশুনায় ভালো নয়। বিলেত থেকে যে ডিগ্রী এনেছে তার বাজারদর নেই। ও-রকম ছেলের যুদ্ধে নাম দেওয়াই ভালো। জাপানীরা তো বর্মা দখল করে ফেলেছে। আর ক'দিন পরে চাটগাঁয় ঢুকবে। তখন তাদের রুখবে কে? এটা কি বৌ নিয়ে সুখে ঘর করার সময়?

টোগো যুদ্ধে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছিল। মাসিমার কটু কথা তাকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিল। নৌবহরের উপর বরাবর তার একটা ঝোঁক ছিল। যাদৃশী ভাবনা তাদৃশী সিদ্ধি। নেভীতে একটা কমিশন জুটে গেল। তখন তাকে পায় কে! নীলিকে বলল, 'এই বার আমি অ্যাডমিরাল টোগো না হয়ে ছাড়ছিনে।'

তা শুনে মাসিমার মুখ শুকিয়ে গেল। অ্যাডমিরাল না হোক কমোডোর কি ক্যাপটেন তো হবে। সমাজে কত সম্মান! তবে প্রাণে বাঁচলে হয়!

আমার মা'রও অবিকল একই চিন্তা। নীলি কিন্তু নির্ভয়ে তার স্বামীকে যুদ্ধের জন্যে স্বহস্তে সাজিয়ে দিল। বলল, 'তুমি বীরপুরুষ। আমি ধন্য হয়েছি।'

আমিও টোগোর প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলুম। এত দিন ও নিজের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছিল, তার কারণ প্রকৃত সুযোগ পায়নি, প্রকৃত সঙ্গিনী পায়নি। দেখতে দেখতে লোকটার চেহারা বদলে গেল। সে আর মাসিমার মেজর ডোমো বা টাইমস অফ ইন্ডিয়ার কলামনিস্ট নয়। সে একজন যোদ্ধা, একজন দেশরক্ষী।

এর পর থেকে মাসিমার মুখে আমি তার প্রশংসা ভিন্ন আর কিছু শুনিনি। কিন্তু নীলিকে কিংবা আমাকে তিনি ক্ষমা করেননি। যদিও ব্যবহারে সেটা বুঝতে দেননি। নীলি একদিন মালাকে সব কথা খুলে বলেছিল। তা শুনে মালা তার গলা জড়িয়ে ধরে চোখের জল ঝরিয়েছিল। 'কী বাঁচন বাঁচিয়েছিস আমাকে তোরা দু'জনে।' এই বলে সে নীলিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল।

দেখলুম আমার প্রতিও সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার বেশী না। আমি তো রূপকথার রাজপুত্র নই। সে-রকম কোনো অভিমানও আমার ছিল না। আমি যা আমি তাই। নিতান্তই একজন আর্টিস্ট। জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত। সেই আমার রাক্ষসের সঙ্গে রণ। অসুন্দরের সঙ্গে রণ। শিল্পীর জীবনসংগ্রাম নিছক জীবিকার জন্যে নয়, সৌন্দর্যের স্বীকৃতির জন্যে। আমি যা সৃষ্টি করে যাচ্ছি তার ভিতরে যদি সৌন্দর্যের স্বীকৃতি থাকে তবে তার বাইরেও সেই সৌন্দর্যের স্বীকৃতি থাকবে। থাকতেই হবে। সেই অনুপাতে অসুন্দরের অধিকার খর্ব হবে। অসুন্দরের পরাজয় হবে। এ বিশ্বাস যদি হারিয়ে ফেলি তবে আমারি পরাজয়। লক্ষ টাকার মালিক হলেও।

সিঙ্গাপুরের পতনের পর থেকে কলকাতার লোকের মনে ভয় ঢুকেছিল। রেঙ্গুনের পতনের পর সে ভয় বেড়ে গেল। যে কোনো দিন কলকাতায় বোমা পড়বে। যে কোনো দিন বাংলাদেশে জাপানীরা প্রবেশ করবে। স্থলপথে পৌঁছতে কিছু সময় লাগতে পারে, কিন্তু জলপথে সাত দিনও লাগে না। বুদ্ধিমানবা ইতিমধ্যেই পালাতে শুরু করেছিলেন। কলকাতার বাইরে তো নিশ্চয়ই, বাংলাদেশের বাইরেও। যার দৌড় যত দূর তার নিরাপত্তা তত দূর। যেখানে যত পোড়ো বাড়ী ছিল সব ভরে গেল।

মেসোমশায় টলবার পাত্র নন, কিন্তু মাসিমার আত্মীয়-স্বজনদের টনক নড়েছিল, তাই দেখে মাসিমারও। তাঁদের কেউ দেওঘরে, কেউ শিমুলতলায়, কেউ বেনারসে, কেউ দেরাদুনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন মাসিমাও নানান জায়গায় বাড়ী খুঁজতে লাগলেন। ঠিক এমনি সময় মেসোমশায় একখানা চিঠি পেলেন এলাহাবাদ থেকে। তাঁর বন্ধুরা তাঁর জন্যে চাকরি জোগাড় করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ। নেবেন কি নেবেন না? তিনি ইতস্তত করছিলেন। মাসিমা তাঁর হাত ধরে টেলিগ্রামের ফর্ম সই করালেন। তিনি নিলেন।

মালার মনে আতঙ্ক ছিল না। কিন্তু সেও কলকাতা ছাড়তে পারলে বাঁচে। এখানকার সমাজে সে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছিল না। আর নিষ্প্রদীপ তার মনের উপর ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছিল। এয়ার রেড কবে হবে কে জানে? তার জন্যে এখন থেকেই গর্ত খুঁড়ে সাইরেনের আওয়াজ শুনবামাত্র গর্তে ঢোকায় তার ঘোর আপত্তি। ওর চেয়ে বোমা খেয়ে মরা অনেক সহজ। তা বলে সে কলকাতা থেকে পালাতে চায়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে পিছনে ফেলে পালানো মানে তো মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে যাওয়া, শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে যাওয়া। কী লজ্জা! কী অন্যায়! তারা পালাবে কোথায়? তাদের যে জীবিকা এখানে।

তবু মালাকেও চলে যেতে হলো তার মা বাবার সঙ্গে। না গিয়ে উপায় ছিল না। কারণ মাসিমা কী জানি কার পরামর্শে বাড়ীখানা জলের দরে বেচে দিয়েছিলেন। তিনি

ধরে নিয়েছিলেন যে জাপানীরা যখন রেঙ্গুন দখল করতে পেরেছে তখন কলকাতা দখল না করে ছাড়বে না। নেহাৎ যদি তা না পারে তবে ধ্বংস করে দেবে। এমনও হতে পারে যে ইংরেজই পোড়ামাটি করবে, যাতে জাপানীর হাতে না পড়ে।

মেসোমশায় ইচ্ছা করলে বাড়ী বিক্রী বন্ধ করতে পারতেন। কিন্তু তা হলে বাড়ীর জন্যে তাঁর পিছুটান থাকত। হয়তো বাড়ীর টানে তাঁর পা উঠত না। অন্যের চোখে যা পলায়ন তাঁর চোখে তা অচল অবস্থা থেকে উদ্ধার। কলকাতায় তিনি যা আশা করে এসেছিলেন তা পাননি। তাঁর নিজের জীবনের পুনরারম্ভ। আর মাসিমাও কি পেলেন যা প্রত্যাশা করেছিলেন ? মেয়ের ভালো বিয়ে ? দেখতে দেখতে বছর পাঁচেক কেটে গেল। অচল অবস্থা সচল হবার লক্ষণ নেই। তা হলে আজ এখনি মনঃস্থির করতে হয়। যুদ্ধ যদি কলকাতার দিকে এগিয়ে না আসত তা হলে মনঃস্থির করতে আরো সময় লাগত। হয়তো কোনো দিন মনঃস্থির করার মতো মনের জোর খুঁজে পাওয়া যেত না।

যুদ্ধকে তা হলে ধন্যবাদ দিতে হয়। তার দ্বারা অন্তত এইটুকু হয়েছে যে মাসিমার কলকাতা থেকে মন উঠে গেছে। আগে প্রাণ, তার পরে ধনসম্পদ। বেঁচে থাকলে আবার বাড়ী হবে। যদিও কেমন করে হবে তা তিনি জানেন না। পঁচিশ বছরের অর্ধেক সঞ্চয় তো বাড়ীর পিছনে গেল। দাম যা পাওয়া গেল তা সুদের চেয়েও কম। মাসিমা কী করবেন ! অদৃষ্ট ! তবু তো তাঁর ভাগ্য ভালো যে পাঁচ বছর আগে বর্মা থেকে চলে আসতে পেরেছেন। নইলে জাপানীদের আক্রমণের মুখে ঘরসংসার ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিতে হতো। তখন কোথায় দাঁড়াতেন ! তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব সময়মতো চম্পট দিতে না পেরে জাপানীদের খপ্পরে পড়েছে। মা গো ! গা শিউরে ওঠে।

মাসিমা কাঁদতে কাঁদতে ট্রেনে উঠলেন। মেসোমশায় গম্ভীর বদনে। মালা শান্ত চিত্তে। এঁদের সঙ্গে আমার জীবন এমন ভাবে জড়িয়ে গেছল যে এঁদের ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে আমারও মন কেমন করছিল। বললুম, 'মাসিমা, জাপানীদের আক্রমণের মুখে আমাকে ফেলে যাচ্ছেন। আপনি বড় নিষ্ঠুর।'

মাসিমা অভিভূত হয়ে বললেন, 'তা হলে তুমিও চল।'

আমি কৃতার্থ হয়ে বললুম, 'না, মাসিমা। স্পেনে কেন যাইনি তার জন্যে এখনো জবাবদিহি করে মরছি। কলকাতা কেন ছাড়লুম তার জন্যে জবাবদিহি অসম্ভব। আমাকে থাকতেই হবে। এর শেষ কোথায় তা দেখতেই হবে। অন্যের পক্ষে যা দুর্যোগ শিল্পীর পক্ষে তাই সুযোগ। কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকলে সঞ্জয় দেখত কী আর দেখে বলত কী ? মহাভারত লেখা হতো কী নিয়ে ? এবার কৌরবকে নয়, জাপানকে রুখতে হবে।'

মাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম তাঁর ইচ্ছায় দেশের বাড়ীতে। নীলি তার বিয়ের পর থেকে বাগবাজারে তার শ্বশুরবাড়ীতে থাকে। টোগোর আত্মীয়রা কেউ সরতে চান না।

এর মধ্যেই দু' দু' বার কলকাতার বাইরে লটবহর নিয়ে ঘুরে আসা হয়েছে। বলেন, রামে মারলেও মরেছি, রাবণে মারলেও মরেছি। আমরা তো মরেই রয়েছি। তা হলে খামকা কলের জল ফেলে কুয়োর জল খেয়ে কলেরায় মরি কেন? জাপানী বোমার চেয়ে আমাদের দেশী মশা কম কিসে? না, বাপু, আর আমরা নড়ছিনে।

মেসোমশায় ট্রেন ছাড়ার সময় বললেন, 'দেখ, দেবপ্রিয়, যার যেখানে কাজ তার সেখানে স্থিতি। কলকাতায় আমার কাজ বলতে কিছু ছিল না। মালার বিয়ের চেষ্টার জন্যেই সেখানে থাকা। তা তো হবার নয়। যেখানে আমার কাজ সেখানে আমি যাচ্ছি। যুদ্ধের থেকে পালিয়ে যাচ্ছিনে। তফাৎ আছে। মনে রেখো।'

আমার মন মানল না। ওটা একপ্রকার পলায়নই। স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দিতে যাইনি বলে আমার বিবেক আমাকে খোঁটা দিত। ফাসিস্টদের জিততে দিয়েছি, তাই তারা এখন দাবানলের মতো দুনিয়ার দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতেও ছড়াতে কতক্ষণ? এবার আর দূর থেকে দেখা নয়, দূরে পালিয়ে গিয়ে দাবানলের গ্রাস থেকে বাঁচা নয়, এবার তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। যুঝতে হবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করতে হবে। গতিরোধ করতে হবে। আমি শিল্পী। আমার হাতে হাতিয়ার নেই। তুলিকেও আমি হাতিয়ার করতে নারাজ। কিন্তু এক শ' রকম উপায়ে আমি অন্যায়কে বাধা দিতে পারি। ন্যায়কে জোর দিতে পারি।

কিন্তু এইখানেই খটকা বাধল। ন্যায়কে জোর দিতে যাব যে, ন্যায় কি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের দিকে? আগে তো ওরা সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করুক। করেছে তার প্রমাণ দিক। নয়তো সাম্রাজ্যবাদকেই জিতিয়ে দেওয়া হবে। কেমন করে বলব যে, সেটা ফাসিবাদের চেয়ে ভালো? হয়তো এক পোঁচ কম কালো। কিন্তু কালো বইকি। ক্রিপস্ মিশন ফিরে যাবার পরে দেশের লোককে বোঝানো শক্ত হলো যে, কম কালোর পক্ষেই ন্যায়, বেশী কালোর পক্ষে অন্যায়, সুতরাং কম কালোর পক্ষে খাড়া হতে হবে।

অথচ নিরপেক্ষ থাকাও লজ্জাকর। কেবল লজ্জাকর নয়, অপরাধজনক। জাপানীরা ধ্বংস করতে করতে ভারতের বুকের উপর দিয়ে এগিয়ে আসবে, ইংরেজরা ধ্বংস করতে করতে ভারতের বুকের উপর দিয়ে পিছু হটবে, ভারতের লোক উলুখড়ের মতো দু'পক্ষের মার খেয়ে মরবে। কে এ দৃশ্য দেখে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে! করতে একটা কিছু হবেই। সম্ভব হলে অহিংসভাবে। না করলে অপরাধ হবে। দেশের কাছে, জনগণের কাছে। করলে আবার কথা উঠবে যে ফাসিস্টদের সহায়তা করা হচ্ছে। ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। তার আগে দুনিয়া জুড়ে বদনাম দেওয়া হবে। হিংস্র বলে বদনাম। বিভীষণ বলে বদনাম। আমরা তা হলে মুখ দেখাব কী করে? কালো মুখ নিয়ে ফাঁসীকাঠে ঝুলব? তা ছাড়া এমনও তো হতে পারে যে, ফাসিস্টরা তার সুযোগ নিয়ে

জিতবে। আর সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে ফাসিবাদবিরোধীদেরও হার হবে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মেসোমশায়কে চিঠি লিখি। তিনি উত্তর দেন, 'জাতি হিসাবে স্বাধীনতা কবে পাব জানিনে, কিন্তু স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত আজ এখনি নিতে পারি। নেওয়া উচিতও। সিদ্ধান্তটা আমাদের হাতে। ফলাফল ইতিহাসের হাতে। এমন লগ্ন বহু শতাব্দীতে একবার আসে। আজকের এই লগ্নে গান্ধীজীই বর। আর সকলে বরযাত্র। আমিও তাঁর পিছনে। যদিও আমাকে আমার পেনসন বাঁচিয়ে চলতে হবে।'

চিঠিখানা আমি ছিঁড়ে ফেলি।

গান্ধীজী তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে চার দিকে সাড়া পড়ে যায়। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'যে কোনো লোক একটা সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাতে পারে। কিন্তু আমি চাই জনগণকে জাগাতে।' তাই ঘটল। জনগণ জাগল। ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব সেই জাগরণ। জগতের ইতিহাসেও তার তুলনা নেই। যুদ্ধের মাঝখানে কে কবে সাহস পেয়েছে যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তিকে জাগাবে? পরে বোঝা গেল আসলে ওটা যুদ্ধবিরোধী উদ্যোগ। যুদ্ধের গতিরোধই তার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ভারতের মাটিতে যুদ্ধবিগ্রহ হলো না।

জাপানীরা এলো না। কিন্তু আমার মতো একচক্ষু হরিণদের অবাক করে দিয়ে কোথা থেকে এসে হাজির হলো মন্বন্তর। বাংলাদেশে পঁয়ত্রিশ লাখ মানুষ মারা গেল মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষে। যুদ্ধে কি এত লোক মরত! লজ্জায় ক্রোধে গ্লানিতে আমার পেয়ালা ভরে গেল। যুদ্ধের দৃশ্য বিপ্লবের দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায় ও আঁকা যায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষের দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখাও পাপ। এমন নৈতিক সঙ্কটে কখনো আমি পড়িনি। আমি যে খেয়ে দেয়ে বেঁচে আছি এটা তো শুধু আরেকজন বা আরো কয়েকজন না খেতে পেয়ে মারা গেছে বলেই। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ভূত প্রেত পিশাচ আঁকি। জানতে চেয়ো না পিশাচ কারা। প্রদর্শনীতে ছবি দিই। দর্শকরা বলেন, ঠিক যেন পাগলের প্রলাপচিত্র। অনুভব করি শিল্পকে পাগলের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। যে পালায় সেই বাঁচায়।

অগাস্ট মাসের বিক্ষোভ বা বিপ্লবের পর লক্ষ করি আমার নিজের অভ্যন্তরেও একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমি আমার স্বকালের হতে গিয়ে স্বদেশের হতে ভুলেছিলুম। এখন উপলব্ধি করলুম যে ভারতের অনাদি অনন্ত শিল্পীপরম্পরা থেকে বিযুক্ত হলে আমি কেউ নই। আমি না ঘরকা না ঘাটকা। ভারতের ইতিহাসের স্রোত যেদিকে আমার সৃষ্টির স্রোতও সেই দিকে। সুতরাং পলায়নের সংকল্প যখন নিলুম তখন তার নাম দিলুম ভারতের শিল্পীপরম্পরার অন্বেষণ।

এলাহাবাদ আমার পথে পড়ে। বিছানাপত্তর স্টেশনে রেখে টাঙ্গায় চেপে বসলুম।

॥ পাঁচ ॥

জানতুম সেই বিয়ের ব্যাপারের পর থেকে মাসিমা আমার উপর অপ্রসন্ন। কিন্তু অবাক হয়ে আবিষ্কার করলুম যে, প্রয়াগে কেবল গঙ্গাযমুনা নয়, অন্তঃসলিলা ফল্গুও প্রবহমান। মাসিমা আমার ওজর আপত্তি কানে তুললেন না। স্টেশনে লোক পাঠিয়ে মালপত্তর আনিয়ে নিলেন।

মাসিমারও পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি ও তাঁর মতো কয়েকজন মহিলা মিলে একটি মণ্ডলী করেছেন। তাঁদের কাজ হলো রাজবন্দীদের পরিবারের তত্ত্ব নেওয়া, নির্যাতিতদের জন্যে চাঁদা তোলা, উৎপীড়িতদের আদালতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। এর দরুন তাঁদের সরকারী মহলের বিষ নজরে পড়তে হয়েছে। মাসিমা নিমন্ত্রণ করলে কেউ তাঁর বাড়ীতে আসেন না, আসতে সাহস পান না। পাছে রিপোর্ট যায় যে রাজদ্রোহী। তাঁকে বা মেসোমশায়কেও কোথাও নিমন্ত্রণ করা হয় না। ব্যতিক্রম কেবল অধ্যাপক মহল।

'অন্যায় তো আমরা কিছু করিনি বা করছিনে। মানুষের প্রতি মানুষের যেটুকু কর্তব্য শুধু সেইটুকুই করতে চেষ্টা করছি। তার দরুন যদি কষ্ট পেতে হয় পাব। কিন্তু রাঙা চোখ দেখে পেছিয়ে যাব না। কালো মানুষের রাঙা চোখ দেখলে হাসিও পায় আমার। ছি ছি! বিদেশীর কাছে এমন করে দাসখৎ লিখে দিতে আছে!' মাসিমা ধিক্কার দেন।

'তা হলেও, মাসিমা, একটু সাবধান হওয়া ভালো। মেসোমশায়ের পেনসন—' কথাটা আমি শেষ করবার আগেই মাসিমা কেড়ে নেন।

'সেইখানেই তো বাধছে। নইলে আমিও প্রমাণ করে দিতুম ভারতের বীরাঙ্গনারা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। জানো, দেবপ্রিয়, ওরা গ্রামকে গ্রাম ঘেরাও করে লোকগুলোকে পশুর মতো গুলী করে মেরেছে। ওঃ! আমরা অসহায়। আমরা, দেশশুদ্ধ লোক অসহায়। জবাহরকে যে কোথায় চালান দিয়েছে কেউ বলতে পারছে না। শুনছি নাকি দক্ষিণ আফ্রিকায়। বেঁচে আছে কি না কে জানে! হাঁ, ওরা সব পারে। যেমন তোমার জাপানী তেমনি তোমার ইংরেজ।'

আমি যে পাগল হবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি সে কি এইসব শুনতে? তা হলে তো আবার পাগল হতে হয়। গান্ধীজী অসহায় বলেই তিন সপ্তাহ অনসন করে জগতের দরবারে তাঁর আক্ষেপ জানালেন। আমিও অসহায়। কিন্তু আমার তো অনসন করার ক্ষমতা নেই। দিন তিনেক চালিয়েছিলুম। তার পর থেকে সে ভার যোগ্যতরদের উপর অর্পণ করেছি।

মেসোমশায়ের ঘরে গিয়ে দেখি তিনি আপন কাজে তন্ময়। নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখার মতো স্থির। ধ্যানীবুদ্ধের মতো আত্মদীপ। তাঁর ভাস্বর মুখমণ্ডল ঘিরে অদৃশ্য একটি আভামণ্ডল। আমি তাঁর তপোভঙ্গ করিনে। এক কোণে আসন নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। পকেট থেকে কাগজ পেনসিল বার করে আঁকি।

'এই যে, নির্মল, কখন এলে?' মেসোমশায় আমাকে প্রথমটা চিনতে পারলেন না। তার পর বললেন, 'ও! দেবপ্রিয়! কখন থেকে বসে আছো? আমি ভাবছি নির্মল। আমার ইনষ্টিটিউটের সহকারী। আসবে একটু পরে। আলাপ করে খুশি হবে।'

'আপনার জীবনের পুনরারম্ভ দেখে আরো খুশি হচ্ছি, মেসোমশায়।' বললুম তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে।

যে ফসল ফলাতে ছ'মাস লাগে তাকে তিন মাসে ফলানো যায় কি না এই নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা। তা যদি সম্ভব হয় তবে বছরে চার বার ফসল ফলবে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের পেট ভরবে। তিনি বললেন, 'এই তোমার মন্বন্তরের ধন্বন্তরি।'

'মেসোমশায়', আমি বললুম, 'এই তা হলে আপনার প্রশান্তির সীক্রেট! আমি যে এদিকে পাগল হয়ে গেলুম চার দিকে অনাসৃষ্টি দেখে দেখে।'

তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন, 'অনাসৃষ্টির উত্তর সৃষ্টি। যেমন অনাবৃষ্টির উত্তর বৃষ্টি। ওরা যেমন তোমাকে পাগল করে দিচ্ছে তুমিও তেমনি ওদের সুস্থ করে দেবে। কার জোর বেশী? ওদের না তোমার? পাপের না পুণ্যের? কুশ্রীতার না সৌন্দর্যের? ওরা যদি চলে ডালে ডালে তো তুমি চলবে পাতায় পাতায়। অন্যায়ের উপর ন্যায় একদিন জয়ী হবেই। অসত্যের উপর সত্য। কিন্তু পালিয়ে আসা তো কোনো সমাধান নয়। ওদের আওতা থেকে তুমি যেমন বাঁচলে তেমনি তোমার আওতা থেকে ওরাও তো বঞ্চিত হলো। সেটা কি ওদের পক্ষে ভালো হলো?'

আমি গলে গেলুম। বললুম, 'আমার যদি জানা থাকত প্রশান্তির সীক্রেট।'

'ওহে দেবপ্রিয়,' তিনি বললেন কারুণ্যের সঙ্গে, 'যা দেখছ তা নয়। আমার মতো অশান্ত আর কে? দেশ আমার পরাধীন। স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছে। আমি যোগ দিতে পারছি কই? রেড ক্রসের কাজ করছেন আমার গৃহিণী। সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। তার বেশী কী আর করতে পারি দেশকে স্বাধীন করতে? ভিতরে ভিতরে জ্বলছি। গান্ধী তাঁর সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেবার সময় চমৎকার একটি কথা বলে-ছিলেন। চার দিকে যখন আগুন জ্বলছে তখন আগুনে ঝাঁপ দিয়েই শীতলতা। আমি তাঁর উক্তির নীর বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু নিয়েছি। রাজনৈতিক কর্মপন্থা ছেড়ে নৈতিক ধর্ম-পন্থা। আগুন জ্বলছে। আমিও জ্বলছি। প্রাণ আমার শীতল। আঃ কী ঠাণ্ডা!'

তিনি যে জলছেন তার আঁচ আমার অঙ্গেও লাগছিল। নিবাত নিষ্কম্প যে দীপশিখা সেও তো জলতে জলতেই নিবাত নিষ্কম্প।

মেসোমশায় বলতে লাগলেন, 'তোমার মাসিমাকে বলি, আজকের পৃথিবীতে তুমি সুখ দেখছ কোথায় ? সুখ চাইলেই কি সুখ মেলে ? সুখ পেলেও কি সুখ ভোগ করতে লজ্জা করবে না ? যেখানে এত দুঃখ। এত অসুখ। মালাকে বলি, এমন কিছু কর যাতে মানুষ বাঁচে, যাতে মানুষ সুখী হয়, তা হলে তুইও বাঁচবি, তুইও সুখী হবি। যে বাঁচায় সেই বাঁচে। যে সুখী করে সেই সুখী হয়। তোমাকেও বলি, পালিয়ে তুমি যাবে কোন স্বর্গে ! সর্বত্র এই একই মৃত্যু, একই অসুখ। নাম রূপ ভিন্ন। ইউরোপে জন্মালে কি তুমি এতদিন বেঁচে থাকতে ? থাকলে হয়তো এতদিনে যুদ্ধক্ষেত্রে কি বন্দিশালায় কি পাগলাগারদে। স্বাধীনতা নেই বলে আমরা অশান্ত। কিন্তু স্বাধীনতা থেকেও তো ওরাও অশান্ত। তা হলে মানুষ কী চায় ? কী পেলে মানুষ শান্ত হবে ?'

আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। কোনো দিন এ নিয়ে চিন্তা করিনি। প্রতিধ্বনি করলুম, 'কী পেলে মানুষ শান্ত হবে ?'

মেসোমশায় ভাবাকুল স্বরে বললেন, 'এক এক বয়সে এক এক উত্তর দিয়েছি। এই তো কিছুদিন আগে বলতুম, ঈশ্বরকে। এখন মনে হচ্ছে ঈশ্বরকে পেলেও মানুষ শান্ত হবে না। তা হলে কি ঐশ্বর্যকে পেলে শান্ত হবে ? তাই যদি হতো তবে বুদ্ধ কেন গৃহত্যাগ করতেন ? সেণ্ট ফ্রান্সিসও তো বড়লোকের ছেলে। না, এটা একটা উত্তরই নয়। যম নচিকেতার কাছে এই প্রস্তাবই করেছিলেন। নচিকেতা প্রত্যাখ্যান করেন। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। আছে আর কোনো উত্তর। যা পেলে এক নিমেষেই এ লড়াই থেমে যেত।'

একটিমাত্র উত্তর আমার মনে আসছিল। মানুষ চায় মানুষেরই প্রেম। জগতে যা সব চেয়ে দুর্লভ। রাশিয়ানদের প্রেম পেলে জার্মানরা নিরস্ত্র হতো, জার্মানদের প্রেম পেলে রাশিয়ানরা নিরস্ত্র হতো। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রাশিয়ান জার্মানকে ও জার্মান রাশিয়ানকে ভালোবাসলেও জাতিগতভাবে ভালোবাসতে শেখেনি। বরং আরো ঘৃণা করতে শিখছে। জাতিবৈর দিনকের দিন আরো গভীর আরো নিবিড় হচ্ছে। যুদ্ধে হারজিত অনিশ্চিত, কিন্তু জাতিবৈর সুনিশ্চিত। একালে একজন মহাপুরুষকেই জাতিগত-ভাবে ভালোবাসার শিক্ষা দিতে দেখি। একটিমাত্র দেশেই। কিন্তু বুকে হাত রেখে বলতে পারিনে যে গান্ধীর শিক্ষা আমরা গ্রহণ করেছি। অহিংসার উপর আস্থা আগে যেটুকু ছিল এখন সেটুকুও নেই।

আমার মুখে এসব কথা শুনে মেসোমশায় বললেন, 'গান্ধীকেই সাক্ষ্য দিয়ে যেতে হবে। ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। প্রেম ব্যক্তিগত থেকে জাতিগত হবে যদি প্রথমে

একজনের অন্তরে জয়ী হয়। গান্ধী তো হেরে যাননি। না গেছেন?'

আমি আবেগময় কণ্ঠে বললুম, 'না। তিনি হেরে যাননি। নইলে একুশ দিনের অগ্নিপরীক্ষায় মারা যেতেন। মহাত্মা গান্ধীকী জয়।'

'তুমি আমার জীবনের পুনরারম্ভ দেখছ বলছিলে,' মেসোমশায় অন্য প্রসঙ্গে গেলেন, 'পুনরারম্ভ অত সহজ নয়। কাজটা মনের মতো, স্থানটা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম প্রাণকেন্দ্রের অন্যতম, স্মৃতি তিন হাজার বছর পেছিয়ে যেতে কোথাও ছেদ পায় না, ভারতের প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে অসংখ্য নরনারী আসে ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করতে—যেমন আসত তিন হাজার বছর আগে, যেমন এসেছে তিন হাজার বছর ধরে। ভারতীয় সভ্যতার মূলস্রোতে অবগাহনের আনন্দ আমারও প্রতি অঙ্গে। তা হলেও পুনরারম্ভ এ নয়। আমি চাই এমন এক সরোবরে স্নান করতে যা আমাকে নূতন করে দেবে, তরুণ করে দেবে। সামনে যে আরো তিন হাজার বছর রয়েছে। স্বপ্ন দেখতে হবে যে।' বলতে বলতে তাঁর নয়নে স্বপ্ন নেমে এলো ভাবী ভারতের।

তাঁর দিকে চেয়ে মনে হলো আমিই তাঁর তুলনায় বৃদ্ধ। কারণ আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। আমি তো সামনের ত্রিশ বছরের বেশী দেখতে পাইনে। তার সমস্তটা জুড়ে এই শতাব্দীর অভিনব থার্টি ইয়ার্স ওয়ার। এ যুদ্ধ কি ত্রিশ বছরের আগে থামবে? থামলেও ধোঁয়াতে থাকবে তার আগুন। আবার একদিন জলে উঠবে। যতদুর দৃষ্টি যায় আমি শুধু দেখতে পাই অনর্থ আর অনাসৃষ্টি, পচন আর ভাঙন। আমি শুধু দেখতে পাই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয় আর অপচয়। স্বপ্ন দেখতেও আমি ভয় পাই। সারা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে স্বপ্ন দেখেছিল ইউরোপের মানুষ। তার পরিণাম হলো সারা বিংশ শতাব্দী ধরে সংগ্রাম আর সংঘাত আর বিপ্লব আর ধ্বংস।

মেসোমশায় তা শুনে বললেন, 'তোমার সব কথা মেনে নিলেও এই হচ্ছে ছবি আঁকবার স্বপ্ন দেখবার ধ্যান করবার সময়। বীজ বুনতে হলে বুনতে হয় এই দুর্দিনেই। একটা যুগের বা একটি শ্রেণীর পতনকেই তুমি মানবসভ্যতার বা ভারতসভ্যতার পতন বলে হাল ছেড়ে দিয়ো না। যেখানে সভ্যতার যথার্থ ভিৎ সেখানে ঝড়ের দাপট পৌঁছয় না। সত্য বা সৌন্দর্য বা প্রেম তার দ্বারা একটুও টলে না। আমি থাকব সত্য নিয়ে, তুমি থাকবে সৌন্দর্য নিয়ে, গান্ধী থাকবেন প্রেম নিয়ে। কে আমাদের কী করতে পারবে? সাধককে মৃত্যুও সাহায্য করে।'

মালারও পরিবর্তন হয়েছিল। এই এক বছরে সে অনেকখানি বেড়েছে। ছিল বালিকা। হয়েছে নারী। তার মনের নাগাল পাওয়া ভার। কেবল আমার পক্ষে নয়, তার জননীর পক্ষেও। তিনি একদিন আমাকে বলছিলেন যে তাঁর মেয়ে তাঁর কাছে মন খোলে না। মেয়ের মন জানতে হলে যেতে হয় তার সখীদের দ্বারে। সখীদের মধ্যে

সব চেয়ে প্রিয় মনোরমা কওল। কাশ্মীরী। একদিন সেই মনোরমার সঙ্গেও আমার আলাপ হয়ে গেল। ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। ফরওয়ার্ড মেয়ে। পরে সালোয়ার কামিজ ও চুন্নি। মালাও তাই ধরেছে। ঘোরে সাইকেলে চড়ে। তাও লেডিজ সাইকেল নয়। মালাও তাই করে। তবে ওর যেমন বব করা চুল মালার তেমন নয়। দেরি আছে।

মালাকে একদিন নিভৃতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা, মালা, এখনো কি তুমি বিশ্বাস কর যে এটা রূপকথার জগৎ?'

মালা চমকে ওঠে। প্রশ্নটা তার প্রত্যাশাতীত। বলে, 'কার কাছে শুনেছেন এ কথা? নীলির কাছে?' তার পর ধীরে ধীরে মন খোলে, 'হাঁ, দেবুদা, এখনো আমি বিশ্বাস করি যে এটা রূপকথার জগৎ।'

'বল কী!' আমারও চমক লাগে। 'এত বড় বিপর্যয়ের পরেও! কলকাতার বাড়ী-খানা নীলাম দরে বিকিয়ে গেল। এলাহাবাদে এসে আশ্রয় নিতে হলো। তবু তুমি বলবে এটা রূপকথার জগৎ! তাই যদি হবে তো এই সব যুদ্ধ বিপ্লব মন্বন্তর এ জগতে কেন?'

'রূপকথা পড়েননি?' মালা বলে বিস্ময়ের সঙ্গে বিষাদ মিশিয়ে, 'তাতেও দেখবেন রক্তের নদী হাড়ের পাহাড। রাক্ষস রাক্ষসী। নিষ্ঠুর রাজা। ডাইনী রানী। নিরীহ শিশুর প্রাণনাশ। উঃ! কী নেই তাতে!' মালা শিউরে ওঠে, তার পরে সামলে নিয়ে বলে, 'তা সত্ত্বেও সেটা রূপকথার জগৎ। সে জগতে সুন্দর আছে। রাজপুত্র আছে। সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে আর বিভীষিকার সঙ্গে লড়াই করে। আর জেতে। আর অমনি সব ঠিক হয়ে যায়। সংসারে সুখ ফিরে আসে। মরেছে যারা তারাও বেঁচে ওঠে।'

এই সরল মিষ্টি মেয়েটিকে আমি কেমন করে বোঝাব যে সেই সব রক্তের নদী আর হাড়ের পাহাড় যদিও আছে, সেই সব রাক্ষস রাক্ষসী আছে যদিও, নিষ্ঠুর রাজা আর ডাইনী সওদাগর যদিও রয়েছে, তবু আজকের এ জগতে রাজপুত্র নেই, থাকলেও সে লড়াই করে না, লড়াই করলেও সে জেতে না, জিতলেও সব অমনি ঠিক হয়ে যায় না। লড়াই একটা বাধে বইকি। কিন্তু তার মধ্যে রাজপুত্র কোথায়? জয় একটা ঘটে বইকি। কিন্তু তার মধ্যে মহত্ত্ব কোথায়? শান্তি ফিরে আসে না, সুখ ফিরে আসে না। মরেছে যারা তারা মরে বেঁচেছে। বেঁচে ওঠার প্রস্তাব করলে তারা বলবে, 'বাঁচিতে চাহি না আমি কুৎসিত ভুবনে।'

মালা তার ডাগর দুটি চোখ আকাশের দিকে তুলে আপন মনে বলে যায়, 'আমার কেমন যেন বোধ হয় আমি কোনো এক রূপকথার ভিতর দিয়ে চলেছি। ঘটনাগুলো রূপকথার ঘটনার মতো লাগছে। যুদ্ধ আর বিদ্রোহ আর মন্বন্তর সব যেন রূপকথার ঘটনা। সুন্দর আর অসুন্দর আর সু আর কু সব যেন আমার চেনা চেনা ঠেকছে। মনে

হচ্ছে এ কাহিনীটা আমার জানা। খুব একটা নতুন কিছু নয় যে উত্তেজিত হব।'

আমি আশ্চর্য হয়ে সুধাই, 'কোন্ কাহিনী, বল তো ?'

মালা নিবিষ্টভাবে উত্তর দেয়, 'অরুণ বরুণ কিরণমালা। কিরণের মতো আমিও চলেছি মায়াপাহাড়ের পথে। দুর্গম পথ। পাথরের পর পাথর। যত সব পথিক রাজপুত্র। পথে প্রাণ দিয়েছে। আনতে হবে মুক্তা ঝরার জল। সে জল ছিটিয়ে দিলে ওরা বাঁচবে। আনতে হবে সোনার শুকপাখী। সে পাখী ঘরে নিয়ে ওরা সুখী হবে। পারব কি আমি আনতে ? পারব কি ওদের বাঁচাতে ও সুখী করতে ? না ওদেরি মতো পাথর হয়ে যাব ?'

যা ভয় করেছিলুম তাই। ওর নাম যে কিরণমালা থেকে মালা। মনে ছিল না বলে জিজ্ঞাসা করি, 'কেন ওরা পাথর হয়ে যায় ? ওই সব পথিক রাজপুত্র ?'

'জানেন না ?' মালা বলে তার সুন্দর চোখ দুটি আমার চোখে রেখে, 'ওরা ভুলে যায় যে পিছন ফিরে তাকালেই পাথর হয়ে যাবে। যেই পিছন ফিরে তাকিয়েছে অমনি পাথর হয়ে গেছে।'

'কিন্তু কেন পিছন ফিরে তাকায় ?' আমার মনে পড়ে না বলে সুধাই।

'ওঃ! আপনার মনে নেই বুঝি ?' কাহিনীটার খেই ধরিয়ে দেয় মালা। বলে, 'ওরা জানত যে পিছন ফিরে তাকালেই পাথর হয়ে যেতে হবে। তবু ওরা কেউ বা ভয় পেয়ে কেউ বা প্রলোভনে ভুলে কেউ বা আর্তনাদ শুনে করুণায় গলে গিয়ে পিছন ফিরে তাকায়। আর অমনি মায়াপাহাড় ওদের পরাস্ত করে।'

হাঁ। আমার মনে পড়ে। কিন্তু বুঝতে পারিনে আমি কী ওর তাৎপর্য। জানতে চাই। 'তার পর, মালা ? ওই যে সব রাজপুত্র ওরা কারা ?'

'ওরা কারা ?' মালা আমার প্রতিধ্বনি করে। 'ওরা এই যুগের সাধারণ সৈনিক। ওদের মধ্যে অহিংসাবাদী সৈনিকরাও আছে। ওদের কার কী দেশ বা রাষ্ট্র, কার কী জাতি বা ধর্ম, কার কী মতবাদ বা আদর্শ সেসব আমার গণনা নয়। আমি দেখতে পাই সকলেই ওরা যে যার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। বেশীর ভাগই পথের মাঝখানে প্রাণ দিয়েছে বা দেবে। যুদ্ধশেষে ফিরবে যারা তারাই বা কী হাতে করে ফিরবে ? সে ফেরাটা কি মুক্তা ঝরার জল আর সোনার শুকপাখী নিয়ে ফেরা ? তা যদি না হয় তবে আবার তাদের যাত্রা করতে হয়। লড়াই করতে হয়। আবার প্রাণ দিতে হয় পথের মাঝখানে।'

আমি অবাক হই। মালাও তা হলে এত কথা ভাবে! ওই একরত্তি মেয়ে। ওর এত কথা মনে আসে! না, একরত্তি মেয়ে নয়। এখন কত বড় হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই পিতার তপোবনে বাধাহীনভাবে বেড়েছে।

অরিজিনাল ভাবে মানুষ হয়েছে। শুধু বড় হয়েছে তা নয়। বন্ধ হয়েছে।

সবাই তো আজকাল চুল চেরা বিশ্লেষণ করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের কোথায় অমিল, কেন অমিল। কারা ফ্যাসিস্ট, কমিউনিস্ট কারা, কারা ইম্পিরিয়ালিস্ট বা ফিউডালিস্ট, কারা গান্ধীবাদী। মানুষে মানুষে মিল দেখছে কে? সে ওই মালা। ওর কাছে অমিলটা তুচ্ছ।

কিন্তু আমার কাছে তো নয়। আমি কেমন করে সায় দিই? আমি বলি, 'মালা, মুক্তা ঝরার জল কিন্তু সকলের জন্যে নয়। তুমি যদি কিরণমালা হতে তা হলে হয়তো করুণা করে নাটুসীদেরও বাঁচাতে। তা হলে কী সর্বনাশ হতো বল দেখি!'

মালা বলে তন্ময়ভাবে, 'মুক্তা ঝরার জল যদি সত্যি পাই তা হলে আমি কার্পণ্য করব না। বাছবিচার করব না। যতগুলো পাথর দেখব প্রত্যেকটার গায়ে ছিটিয়ে দেব। তা ছাড়া পাথরগুলো যদি পাশাপাশি পড়ে থাকে একটার গায়ে ছিটোনো জল আরেক-টার গায়েও লাগবে। এড়ানো যাবে না। পাথরের রূপ দেখে চিনবই বা কী করে, কে নাটুসী কে নয়?'

এ যুক্তির উত্তর নেই। তবু আমি ভাবতেই পারিনে যে মুক্তা ঝরার জল সকলের জন্যে। মানবের শত্রু দানবের জন্যেও। বলি, 'মালা, তুমি যাকে বাঁচাবে সে যদি আর পাঁচজনকে বাঁচতে না দেয়, সে যদি হয় কালসাপ, তা হলে তাকে বাঁচানো মানে তো আর পাঁচজনকে মারা। তখন তুমিই হবে তাদের মৃত্যুর নিমিত্ত। না, মালা, মুক্তা ঝরার জল সকলের জন্যে নয়। আর সোনার শুকপাখী? সেও কি সকলের জন্যে? যারা আর-দশজনকে অসুখী করবার জন্যেই বাঁচে সেই সব ডাইনী সওদাগরদের হাতে সোনার শুকপাখী দিলে কি তারা পাখীটার ঘাড় মটকিয়ে সোনাটাকে মুনাফায় খাটাবে না? আর-দশজনকে অসুখী করবে না?'

মালা টলে না। বলে, 'সে ভাবনা কিরণমালার নয়। সে ভাবনা ভাবলে মুক্তা ঝরার জল আনতে যাওয়া হয় না। গেলেও সে যাওয়া নিষ্ফল।'

'মালা,' আমি তারই ভালোর জন্যে বলি, 'শুনেছি কিরণমালা থেকে মালা তোমার নাম। তা বলে কিরণমালার মতো তুমি কেন যাত্রা করবে নিশ্চিত বিপদের হানা এলাকায়? কাজ কী তোমার মুক্তা ঝরার জল সোনার শুকপাখী আনতে গিয়ে?'

'ওসব তবে আনতে যাবে কে? অরুণ বরুণ তো নেই। আপনি?' মালা আমার দিকে তাকায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

'আমি!' আমি হকচকিয়ে যাই। আমি গেলে যদি মালার যাওয়া রদ হয় তা হলে আমি যেতে রাজী। কিন্তু আমি যে স্বীকারই করিনে এটা রূপকথার জগৎ বা এখানে মুক্তা ঝরার জল সোনার শুকপাখী খুঁজলে মেলে। অবিশ্বাস নিয়ে যদি রওনা হই তবে

অরুণ বরুণের মতো আর ফিরে আসব না। তখন মালাকেই বাহির হতে হবে।

'আমি!' আমি সামলে নিয়ে বলি, 'না, মালা। আমি নয়।'

'তা হলে,' মালা বলে মলিন মুখে, 'কিরণকেই যেতে হয়। তার নিয়তি।'

আমি মেনে নিতে পারিনে। আবেগের সঙ্গে বলি, 'এত বড় জগতে আর কেউ কি নেই? যার খুশি সে যাক। তুমি কেন যাবে? তোমার বয়সের তরুণীদের মতো তুমিও হাসবে খেলবে আমোদ আহ্লাদ করবে। ভালোবাসবে বিয়ে করবে সুখী হবে।'

'ওঃ! এই আপনার সুখের সূত্র!' মালা হেসে ওঠে। তার চোখে বিজলী ঝলক।

তার চোখে চোখ রেখে আমার চকিতে মনে হয় এ মেয়ে ভালোবাসা কাকে বলে জানে। এলাহাবাদে এসে মালার যে পরিবর্তন হয়েছে এই তার সঙ্কেত। মালা প্রেমে পড়েছে।

কেন জানিনে আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারলুম না। ভুলে গেলুম কী ওর জিজ্ঞাসা। এই তো একটু আগে ওকে বলছিলুম ভালোবাসতে বিয়ে করতে সুখী হতে। তাও গেলুম ভুলে। আমার অন্তর তখন উদ্বেল। মালা প্রেমে পড়েছে। কে জানে কে সেই ভাগ্যবান যার প্রেমে পড়েছে। সে কি নির্মল? না, জানতে চাইনে। জানতে আমার প্রবল অনিচ্ছা।

আকাশে রামধনু দেখলে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের হৃদয়টা নেচে উঠত, যেমন ছেলে-বয়সে তেমনি যুবাবয়সে তেমনি বুড়োবয়সে। আমার হৃদয় নেচে ওঠে যখন শুনি কোনো মেয়ে বা কোনো ছেলে প্রেমে পড়েছে। সম্পূর্ণ অহেতুক আমার পুলক। যেমন কিশোর-কালে তেমনি প্রথমযৌবনে তেমনি মধ্যযৌবনে। আমার সঙ্গে যার শত্রুতা আছে এমন কোনো যুবক প্রেমে পড়েছে শুনলে আমি শত্রুতা ভুলে গিয়ে অকারণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হই। সে হয়তো খবরই রাখে না যে আমি আমার মনে মনে তার সুখ কামনা করছি। মনে মনে বলছি, সুখী হোক, সুখী হোক বিটকেলটা। রাসকেলটা সুখী হোক।

প্রেমের সঙ্গে সুখের কী সম্পর্ক? বৈষ্ণব কবি বলে গেছেন, 'সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ আসে তার ঠাঁই।' তাঁর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করতুম, 'আচ্ছা, গোসাঁই ঠাকুর, দুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি কী আসে তার ঠাঁই?' তিনি বোধহয় ফাঁপরে পড়ে বলতেন, 'সুখ'। তা হলে সুখী হবার কৌশলটা শিখে নিতুম দুঃখের ভিতর দিয়ে গিয়ে। দশ বছর দুঃখ পেলে যদি এক বছর সুখ মেলে তো তাতেই আমি রাজী।

কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় সে রকম বলে না। সুখের জন্যে আমি ভালোবাসিনি। তবে ভালোবেসে সুখ পেয়েছি। আর পেয়েছি দুঃখ। মালাও কি দুঃখ পাবে? কে জানে। হয়তো পাবে। তা হলে কেন বলি ভালোবাসতে বিয়ে করতে সুখী হতে? একটার সঙ্গে আরেকটার লজিকাল সম্পর্ক কী? কিছুই না। এমনি ওটা একটা কামনা,

একটা আশা। সব মানুষের অন্তরের বাসনা ভালোবেসে বিয়ে করা, বিয়ে করে সুখী হওয়া।

'কী বলছিলে, মালা? সুখের সূত্র আমার এই?' মনে পড়ল তার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে সে নীরবে অপেক্ষা করছে। তার চোখে স্থির প্রদীপের আভা।

'কত রকম সুখ আছে জীবনে। এই যেমন রামধনু দেখে সুখ। আবার রামধনু এঁকেও সুখ। আমার নিজের খেয়ালের রামধনু। প্রকৃতির প্রতিকৃতি বা অনুকৃতি নয়। সুখের কি সংখ্যা আছে না সংজ্ঞা আছে? কিন্তু সব বলার পর যা বাকী থাকে তা এই।' আমি আর খোলসা করতে পারিনে। ইঙ্গিতে বোঝাই।

'তা এই?' মালা বোঝে। শুধু নিশ্চিত হতে চায়।

'তা এই।' আমি নিশ্চয়তা দিই।

মালা উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'সোনার শুকপাখী আনতে যেতে হবে এ কথাটাও বাকী। যাতে সকলের সুখ তাই তো সুখ।'

শুনে চমক লাগে। ব্যথাও লাগে। মালা যে সকলের সুখের জন্যে মায়াপাহাড়ের বিভীষিকার অভিমুখে নিঃসঙ্গ যাত্রা করবে এ কি আমি সমর্থন করতে সহ্য করতে পারি? না, না। আমার একটুও ভালো লাগে না এ কথা ভাবতে। অথচ কী এমন উপায় আছে যা দিয়ে আমি ওর গতি রোধ করতে পারি, ওর মতি পরিবর্তন ঘটাতে পারি? সাধ্য যদি কারো থাকে তবে তা ওর প্রেমাস্পদের। আমার নয়।

কিন্তু ও যে প্রেমে পড়েছে এটা তো আমার অনুমান। এর উপর ভিত্তি করে বলতে কি পারি কিছু? বলা উচিতও নয়। আমি অনধিকারী। আমি কে যে একটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে প্রেম নিয়ে আলোচনা করব? নীলির সঙ্গেও যা করিনি।

ব্যথিতভাবে পরিহাস করে বলি, 'যাদের জন্যে তুমি সোনার শুকপাখীর সন্ধানে যাবে তারা কিন্তু সোনার লক্ষ্মীপেঁচা হাতে পেলেই স্বর্গসুখ পায়। ইহলোকে স্বর্গরচনার যতগুলো পরিকল্পনা দেখি সর্বত্র লক্ষ্মীপেঁচারই জয়।'

'আপনি তাহলে লক্ষ্মীপেঁচার অন্বেষণে যান।' মালা আমার মুখের উপর ছুঁড়ে মারে এই উক্তি। মেয়েটা পরিহাস বোঝে না।

আরো ব্যথা পাই। বুকে আরো বাজে। আমি শিল্পী। আমি কি ধনের জন্যে ছবি আঁকছি? ধনী হবার এটাও কি একটা পথ? যা আমি বেছে নিয়েছি আমার জীবনে? হায়, কন্যা! কেমন করে তোমায় আমি বোঝাই যে আমার অভিষ্ট লক্ষ্মীপেঁচা নয়। নয় শুকপাখীও। আমি যাকে খুঁজে ফিরছি তার নাম সৌন্দর্য। তার প্রতীক নীলপাখী।

সেই যে নির্মল বলে ছেলেটি মেসোমশায়ের সহকারী তার সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার আলাপ জমেছিল। যদিও সে বিজ্ঞানের ঘরানা তবু আর্টের খবরও মন্দ রাখে না।

বিশেষ করে সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রকলার। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই আমার কাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। আমাকে সমীহ করে। তার ধারণা আমি যে ইণ্ডিয়ান আর্টের বিশেষণ অংশটার উপর তেমন ঝোঁক না দিয়ে বিশেষ্য অংশটার উপর দিই সেইটেই ঠিক। বিপরীতটা বেঠিক। ছবি যদি আর্ট হিসাবে না বাঁচে তার স্বদেশিয়ানা কি তাকে তরাবে? নির্মল তাই আশ্চর্য হলো যখন শুনল যে আমি ভারতীয় পরম্পরার মধ্যে নিজের স্থান খুঁজতে বেরিয়েছি। আমি যদি ভারতীয় না হই তো আমি কেউ নই।

ছেলেটি মালার কাছাকাছি বয়সী। কিন্তু বিলকুল অন্য ধাতের। ঘোরতর বাস্তববাদী ও যুক্তিনিষ্ঠ। যেমন বিজ্ঞানের প্রতি তেমনি জীবনের প্রতি তার সমীপবর্তিতার ধারাটা প্র্যাকটিকাল। রূপকথার জগৎ থেকে সহস্র যোজন দূরে। তা বলে আমার জগতের নিকটতর নয়। দেশে আকাল পড়লে সে আমার মতো পালিয়ে বেড়াবে না। ঘটনাস্থলে গিয়ে অনুসন্ধান করবে। রিপোর্ট তো লিখবেই, চাঁদা তুলে লঙ্গরখানা খুলবে ও বহুলোককে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে। বাঁচানোর ওই একটিমাত্র অর্থ সে জানে ও বোঝে। মালার মনের দুয়ার তার কাছে রুদ্ধ। কিন্তু এমনিতেই তাদের দু'জনায় খুব ভাব। মালার ময়ূরের জন্যে জালি দিয়ে ঘেরা অষ্টাবক্র ঘরখানা তারই ভাবকে গড়া। ডিজাইনটা যদিও মালার নিজের।

দু'জনায় খুব ভাব এলাহাবাদে এসে হয়েছে তা নয়। জাপানীরা যখন বর্মা আক্রমণ করে তখন নির্মলরা রাতারাতি রেঙ্গুন ছেড়ে উত্তর দিকে পালায়। তারপর হাঁটা পথে ভারত প্রবেশ করে। সে এক রোমহর্ষক কাহিনী। বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে তাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভরসা ছিল না। কে জানে জাপান যদি বাংলাদেশে হানা দেয়। তা হলে তো আবার দৌড়তে হবে। তার চেয়ে বেশ কিছু দূর এগিয়ে থাকা ভালো। এলাহাবাদে তখন বাস করা স্থির হয়। মেসোমশায়রা তখনো সেখানে হাজির হননি। নির্মল বেকার বসেছিল। মেসোমশায় তাকে উদ্ধার করলেন। সেও হলো তাঁর দক্ষিণ হস্ত। পুরোনো ভাবটা ঝালিয়ে নেওয়া গেল। দুই পরিবারের মধ্যে। মাঝখানে দীর্ঘ একটা ছেদ। সেটা প্রবাসের ও দুর্দিনের কল্যাণে হ্রস্ব হয়ে এলো।

নির্মলকে দেখে বিশ্বাস হয় না যে সে রূপকথার রাজপুত্র। মালা তা হলে কী মনে করে তাকে ভালোবাসবে? ভাব আর ভালোবাসা একই কথা নয়। নির্মলের সঙ্গে আমি অনেক দিন টাঙ্গায় করে বেড়িয়েছি। সে আমার ও আমি তার গাইড। নতুন এলাহাবাদ আমার অচেনা, তার চেনা। পুরোনো এলাহাবাদ তার অচেনা, আমার চেনা। দেখতে দেখতে তার সঙ্গে আমারও ভাব হয়ে যায়। যদিও বয়সের ব্যবধান মালার তুলনায় বেশী। নির্মলকে বাজিয়ে দেখি সে প্রেমে পড়েনি। মালা যদি তার প্রেমে পড়ে থাকে তবে সেটা এখনো তার অগোচর। মালা তবে কার প্রেমে পড়েছে?

নির্মলকে জিজ্ঞাসা করিনে। কয়তে অনিচ্ছা জাগে। কে জানে সেও হয়তো আমারি মতো অজ্ঞ। হয়তো আমার চাইতেও। হয়তো খবরই রাখে না যে মালা কোনো একজনকে ভালোবেসেছে।

এলাহাবাদে আমি থাকতে আসিনি। মেসোমশায়ের প্রতিকৃতি অঙ্কনের অজুহাতে আর কতদিন থাকা যায়! অথচ যেতে আমার পা ওঠে না। খাজুরাহো বহু দূর। একা কেমন করে যাই? সাথী যদি জোটাতে পারতুম একজনকে। নির্মল হলেও মন্দ হতো না। গড়িমসি করি। এমন সময় মালা দিল আমাকে আঘাত। আমাকে লক্ষ্মীপেঁচার অন্বেষণে যেতে বলে।

এরপরে একদিন নির্মলকে বলি, 'খাজুরাহো আমার লক্ষ্য। এলাহাবাদ আমার পথে পড়ে। কিন্তু এখন দেখছি কবে আমার ব্রেক-জার্নির মেয়াদ পেরিয়ে গেছে। নড়তেও আর পা সরছে না। টাঙ্গায় চড়েই আমি য়্যাডভেঞ্চারের সুখ পাই।'

'তা হলে থেকেই যান না, দেবুদা।' মালার দেখাদেখি নির্মলও আমাকে 'দেবুদা' বলে ডাকে। খাজুরাহো সম্বন্ধে তারও যথেষ্ট ঔৎসুক্য। কিন্তু সে এই মুহূর্তে সাথী হতে নারাজ।

'কিন্তু মাসিমার স্নেহমমতার সুযোগ নিয়ে আর বেশীদিন ওঁদের ওখানে থাকা চলে না। মেসোমশায়ের প্রতিকৃতি তো পর্যাপ্ত ঋণশোধ নয়।' বলি একটু কুণ্ঠা সহকারে।

'বেশ তো। আমার ওখানে আপনার জায়গা হবে। মন খুঁৎ খুঁৎ করলে ভাড়া হিসেবে যা খুশি দেবেন। যতদিন খুশি থাকবেন।' নির্মল বলে উৎসাহভরে।

'না, না, তোমাদের অসুবিধে হবে।' আমি পেছিয়ে যাই। জানি ওর সঙ্গে থাকেন ওর বিধবা মা, বিধবা বোন ও ছোট ছোট দুটি ভাগনে। পাড়াটাও ঘিঞ্জি। বাড়ীটাও পুরোনো। একখানামাত্র বাথরুম।

নির্মল আমার মুখ দেখে আঁচ করে বলল, 'অসুবিধে আমাদের নয়, আপনারই হবে। পরে ভালো একটা আস্তানা খুঁজে নেবেন।'

বিবেচনা করতে সময় চাই। আশঙ্কার কথা মাসিমার বাড়ী ছেড়ে নির্মলের ওখানে উঠে গেলে তিনি তার অন্য অর্থ করবেন। বিরূপ হবেন শুধু আমার উপর নয়, নির্মলেরও 'পরে। আর কোনো বাসা কি পাওয়া যায় না! সন্ধান নিয়ে দেখি যেখানে যা খালি ছিল বর্মাওয়ালারা দখল করে বসে আছে। জাপান কবে হারবে, কবে ওরা বর্মায় ফিরে যাবে। তার পর আবার খালি হবে।

তাদের আশাবাদের হেতু ছিল। জাপান আর ভারতের দিকে এগোয়নি। দেড় বছর হলো তটস্থ হয়ে রয়েছে। তার মতিগতি থেকে মনে হয় না যে সে ভারতের মাটিতে এসে 'যুদ্ধং দেহি' বলবে। ওদিকে দুর্ভিক্ষের উপর নতুন বড়লাটের নজর পড়েছে।

এর আগে ছিলেন তিনি জলীপাট। জলী বরনে দুর্ভিক্ষ দমনে লেগে গেছেন। পারবেন বলে ভরসা হয়।

তা হলে কলকাতায় ফিরে যাইনে কেন ? একদিন আচমকা এই চিন্তা মাথায় এলো। খাজুরাহো না হয় এযাত্রা বাকী রইল। রইল বাকী রাজস্থান ও পাটন। বেঁচে থাকলে হবে অন্য কোনো সময়। ভারতীয় শিল্পীপরম্পরা কি চাক্ষুষ দর্শনের অপেক্ষা রাখে ? বই পড়ে প্রতিলিপি দেখে কি হয় না ? হয় বইকি। নইলে খরচ বাড়ে।

হাঁ, সেটাও একটা ভাববার কথা। আমার আর সে বয়স নেই যে একবস্ত্রে ভারত বেড়িয়ে আসব আহারনিদ্রার অবহেলা করে। যত্রতত্র খেয়ে ও থেকে। নির্মলকেই প্রথম জানাই, 'ভাবছি কলকাতা ফিরে যাব।'

'সে কী। কলকাতা!' নির্মল আশ্চর্য হয়ে সুধায়, 'হঠাৎ ?'

'সেখানে', একটু রহস্যময় করে বলি, 'লক্ষ্মীপেঁচা থাকে।'

'লক্ষ্মীপেঁচা ! তার মানে !' সে বিস্ময়বিমূঢ়।

বুঝিয়ে বলি তার মানে। সে হো হো করে হেসে ওঠে। টাঙ্গাওয়ালা পিছন ফিরে তাকায়। আমি কিন্তু গম্ভীর।

বলি, 'খালি রুটি খেয়ে মানুষ বাঁচে না। কিন্তু বাঁচতে হলে রুটিও চাই। মুক্ত' ঝরার জল খেয়ে কি পেট ভরে ?'

'তার মানে কী হলো, দেবুদা !' নির্মল আবার বিমূঢ় হয়।

আবার বোঝাতে হয় তাকে। এবার কিন্তু তার হাসি পায় না। তার খোঁকা লাগে

এবার আমি ভেঙে বলি, 'ছেলেবেলায় কে না বিশ্বাস করে যে এটা রূপকথার জগৎ ! কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। মালার কিন্তু এখনো বিশ্বাস যে আমাদের এটা রূপকথার জগৎ। সোনার শুকপাখী আর মুক্তা ধারার জল এসব নাকি সত্যি কোনো এক মায়াপাহাড়ে গেলে পাওয়া যায়। এসব পাওয়া নাকি খুব জরুরি। যুদ্ধে যারা নিহত হচ্ছে তাদের বাঁচানোর জন্যে, বাঁচানোর পর তাদের সুখী করার জন্যে।'

নির্মল স্তম্ভিত হয়ে মন্তব্য করে, 'তাজ্জব।'

'যা বলেছ।' আমি তার পিঠ চাপড়ে দিই। আমার বুঝতে বাকী থাকে না যে মালা নির্মলকে বলেনি। বলত না কেন, যদি প্রেমে পড়ে থাকত নির্মলের ?

'মালা মেয়েটা বরাবরই আনপ্র্যাকটিকাল।' নির্মল আমাকে শোনায়। 'তা বলে এতদূর পাগল !'

'এখন এই পাগলের ভার নেয় কে ? বাপ মা থাকতেই এই। কাজেই তাঁরা অপারগ। এখন তুমিই একমাত্র ভরসা।' আমি আঁধারে ঢিল ছুঁড়ি।

'আমি !' নির্মল যেন আকাশ থেকে পড়ে। টাকা থেকে নয়। কী ভাগ্যি !

বেচারার চেহারা দেখে আমার সংশয়মোচন হয়। না, নির্মল নয়। তবে কে? কাকে মালা দিতে চায় মালা? অশিষ্ট আমার কৌতূহল। কিন্তু অদম্য।

'তুমি যদি না হও তবে তোমারি মতো আর কোনো নওজোয়ান। মালা যাকে রূপকথার রাজপুত্র বলে চিনেছে।' আমি ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে তাকাই।

'কই, আমার তো চোখে পড়ে না। এক মনোরমা কওলকেই বার বার দেখি।' নির্মল আমার মনেও ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

॥ ছয় ॥

মেসোমশায়ের প্রতিকৃতি সমাপ্ত করে তাঁর সামনে তুলে ধরতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি কে হে, দেবপ্রিয়? চিনি চিনি মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক চিনতে পারছিনে।'

এতদিন তাঁকে জানানো হয়নি যে আমি তাঁর প্রতিকৃতি আঁকছিলুম। মাসিমা জানতেন। মালা জানত। কিন্তু তাঁর জন্মদিনে তাঁকে একটা সারপ্রাইজ দেবার মানসে আমরা তিনজনেই চুপ করে ছিলুম। নির্মলও। কৌশলে আমি তাঁর মুখের আদরা এঁকে নিয়েছিলুম তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁর ল্যাবরেটরিতে বসে।

'ইনি', আমি হাসি চেপে বললুম, 'একজন ভারতীয় ঋষি। ঋষির আইডিয়াটাই ফোটাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে কালের ঋষি নন। তাই দাড়িগোঁফ বা জটাজুট নেই। একালের ঋষি ধ্যান করছেন টেস্ট টিউব হাতে নিয়ে। তপোবনে নয়। ল্যাবরেটরিতে।'

এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হলো। তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'ওহে, আমি নয় তো? য়্যাঁ! আঁকলে কী করে? কবে? কই, সিটিং দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। এই দেখ, তোমরা ইমপ্রেসনিস্টরা কী সাংঘাতিক লোক!'

আমরা অবশ্য ইমপ্রেসনিস্ট বলে পরিচয় দিইনে। আমরা পোস্টইমপ্রেসনিস্ট। কিন্তু কী হবে তর্ক করে? মেসোমশায় যে চিনতে পেরেছেন এই ঢের। চেনা দুঃসাধ্য। আমরা তো অনুকৃতি আঁকিনে। আমরা তো ফোটোগ্রাফার নই। আমরা ভাবগ্রাহী।

মেসোমশায় সত্যি খুব খুশি হলেন। তিনি তো বোঝেন এ ধরনের কাজ এ দেশে দুর্লভ। কিন্তু মাসিমার উৎসাহ নিবে গেল। তাঁরও প্রতিকৃতি আমি আঁকি এ রকম একটা প্রত্যাশা তাঁর ছিল। নমুনা দেখে তাঁর চক্ষুস্থির।

কেন আর এলাহাবাদে থাকা? একদিন টিকিট কেটে পূর্বগামী ট্রেনে উঠে বসা

গেল। আরো পশ্চিমে যাবার সংকল্প আপাতত পরিত্যক্ত হলো। ভারতীয় শিল্পী-পরম্পরার সঙ্গে আমি মনে মনে সন্ধি করেছিলুম। আমিও তাঁদেরি মতো ভারতীয়, আমিও তাঁদেরি মতো শিল্পী, আমিও অন্তরে অন্তরে ভারতীয় শিল্পী. অথচ আমি বিংশ শতাব্দীর জীবনের মধ্যে জীবিত, স্পন্দনের মধ্যে স্পন্দিত, গতির মধ্যে গতিমান, বেগের মধ্যে বেগবান। সেইসূত্রে ইউরোপের নিকটতর। এত নিকট যে প্রায় অভিন্ন।

কলকাতা ইতিমধ্যে বদলেছে। এ নগরী দিনে দিনে বদলায়। যতবার দেখি ততবার দেখি আর একটু কম পুরাতন, আর একটু বেশী নূতন। মন্বন্তর নিয়ে আর কেউ ভাবছে না। চলতি গুজব আই এন এ। ভারতের মুক্তিবিধাতা নাকি বর্মায় পৌঁছে গেছেন। যে-কোনো দিন স্থলপথে ভারতপ্রবেশ করবেন।

দেখি আমার বন্ধুরা কেউ বসে নেই। আস্ত একটা বাজার সাগর পার হয়ে এসেছে। মার্কিন সৈনিকরা ভারতীয় ছবির সওদা করছে। দেশে নিয়ে যাবে স্মরণচিহ্ন রূপে। বন্ধুরা তাই ভারতীয় ছবির যোগান দিতে দিনরাত খাটছেন। তার মধ্যে ছবিত্ব না থাক, ভারতীয়ত্ব থাকলেই হলো। আমিও তাদের সঙ্গে ভিড়ে যাই।

এই রোজগারের মরসুমে আমি আর কোনো দিকে তাকাবার অবসর পাইনি। না লিখেছি চিঠি, না দিয়েছি চিঠির জবাব। খোঁজ নিইনি মেসোমশায় কেমন আছেন। মালা কী করছে। তার মায়াপাহাড় যাত্রার কতদূর। তার ভালোবাসার কী খবর।

যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি। তবে তার ফলাফল একরকম জানা গেছে। কলকাতা নিরাপদ। তার চেয়ে বড় কথা প্যারিসের মুক্তি আসন্ন। আমি এ ক'বছরে যা জমিয়েছিলুম তা দিয়ে জাহাজের প্যাসেজের বায়না করলুম। যুদ্ধের পর প্রথম জাহাজে যারা যাবে তাদের মধ্যে থাকবে আমার নাম। জানি একবার প্যারিসে পৌঁছতে পারলে আর সব আপনি হবে। আঃ! কত বড় একটা বাঁচোয়া যে বিয়ে করিনি, বাঁধা পড়িনি।

কিন্তু মা দেখলুম দস্তুরমতো প্রতিকূল। গেলে তো ফিরতে আবার সাত আট বছর। ততদিন কি তিনি বেঁচে থাকবেন? নিতান্তই যদি যাই তবে বিয়ে করে বৌ রেখে যেন যাই। বৌ হবে আমার জামিন বা হসটেজ। শেষে মা'র সঙ্গে রফা হলো আমি এক বছরের বেশী বাইরে থাকব না। ফিরে এসে বিয়ের কথা ভাবব।

টোগো য়্যাডমিরাল হয়নি। স্থায়ী কমিশন পায়নি। তাকে ওরা যুদ্ধের পরে বিদায় দেবে। তার তাতে ক্ষোভ নেই। সে চেয়েছিল য়্যাডভেঞ্চার। তা মন্দ হয়নি। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে চায়। জাহাজের কারবারে ঠাঁই করে নিতে পারবে। মা তা হলে মেয়ে জামাইকে কাছে পাবেন। তাঁর দেখাশোনার জন্যে আমার আবশ্যক নেই। আমি স্বচ্ছন্দেই একটা বছর প্যারিসে কাটিয়ে আসতে পারি।

এইসব জল্পনাকল্পনা হচ্ছে এমন সময় মাসিমার একখানা চিঠি এসে হাজির।

এলাহাবাদ থেকে নয়। কলকাতার পার্ক সার্কাস থেকে। আমাকে ডেকেছেন চা খেতে। আমি তো অবাক। কবে এলেন, এমনি বেড়াতে না বরাবরের জন্যে, সবাই এসেছেন না একা তিনি, কিছুই খুলে বলেননি। টেলিফোন নম্বর দেননি। অগত্যা কৌতূহল চেপে রাখতে হলো।

গিয়ে দেখি মাসিমা তাঁর বান্ধবী মিসেস মুখার্জির অতিথি। মালা নেই। মেসো-মশায়ও না। ব্যাপার কী? তিনি এক কথায় জানালেন যে কলকাতায় থাকা যখন নিরাপদ তখন মিছিমিছি এলাহাবাদে পড়ে থেকে কী হবে? কাছেই এক টুকরো জমির সন্ধান পেয়ে দেখতে এসেছেন। পছন্দ হলে ছোট একটা বাড়ী তৈরি করা যাবে।

তার পর মাসিমার সঙ্গে যেতে হলো জমি দেখতে। জমিটা ভালো। কিন্তু পাড়াটা বাজে। আমি বললুম, 'এত রাজ্যি থাকতে পার্ক সার্কাস! তাও বস্তির মাঝখানে!'

'বণ্ডেল রোডের বাড়ীখানা জলের দরে ছেড়ে দিয়ে কী মূর্খতাই না করেছি!' মাসিমা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এখন পুঁজি কোথায় যে মনের মতো পাড়ায় বাড়ী করব? কর্তা চান প্রচুর ফাঁকা জায়গা। আমি চাই ট্রাম লাইনের কাছাকাছি। মালা চায়—মালা অবিশ্যি খুব ফুটে বলে না সে কী চায়, আমার মনে হয় সে চায় নিরিবিলি। সব দিক মেলাতে হলে এই অঞ্চলেই ডেরা তুলতে হয়।'

তিনি শহর থেকে দূরে যেতে নারাজ। নইলে টালিগঞ্জ প্রস্তাব করতুম। যাই হোক মাসিমার কথায় সায় দিলুম। তিনি আমার উপর ভার দিলেন কোনো ইউরোপীয় বাস্তুশিল্পীকে দিয়ে বাড়ীর ডিজাইন প্রস্তুত করার। তিনি স্বাদেশিকতার পক্ষে নন। তিনি নিশ্চিত জেনেছেন যে ওসব তপোবন টপোবন এ যুগে অচল। আবার যদি কখনো বেচে দিতে কি ভাড়া দিতে হয় তপোবন শুনলে এ কালের বড়লোকেরা পেছিয়ে যাবে। ভালো দাম বা ভালো ভাড়ার উপর নজর রাখতে হলে খানদানীদের নয় ভুঁইফোঁড়দের রুচি মেনে চলতে হয়।

মাসিমা এলাহাবাদে ফিরে গেলেন। সেখান থেকে আমাকে চিঠি লিখতে ও তাগিদ দিতে থাকলেন। আমার হাতের কাজের সঙ্গে এই উপরি কাজ যোগ দিয়ে আমাকে মাতিয়ে রাখল। আমার জাহাজ হাতছাড়া হলো। গৃহনির্মাণের কাজেও মাসিমা আমার সহায়তা চাইলেন। দোসরা জাহাজের জন্যে ভাবি কখন? ইচ্ছা রইল মাসিমাদের নতুন বাড়ীতে স্থিতিবান করে দিয়ে তার পরে সমুদ্রে ভাসব।

যুদ্ধ সত্যি সত্যি শেষ হলো। হিরোশিমা আমার বিবেকে বিঁধল বটে, কিন্তু আর সকলের মতো আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। ব্ল্যাক আউট তো কেবল বাইরে নয়, মনেরও নিষ্প্রদীপ ঘটেছিল। ফাসিস্টদের যে পতন হলো এটা ধর্মের জয় কি না জানিনে, কিন্তু অধর্মের পরাজয় তো বটেই। দূর থেকে ফরাসীদের সঙ্গে উৎসব করতে সাধ গেল।

কলকাতায় বসে যতটা সম্ভব। মস্ত একটা পার্টি দিলুম বন্ধুদের। চাইনীজ রেস্টোরান্টে।

মাস কয়েক পরে মাসিমারা গৃহপ্রবেশ করলেন। লক্ষ করলুম মাসিমা যেমন আহ্লাদে আটখানা মেসোমশায় তেমনি বিষাদে ম্রিয়মাণ। মনে হলো তাঁর পরাভব ঘটেছে। মহাযুদ্ধে নয়, গৃহযুদ্ধে। আর মালা? মালার দিকে তাকালে মনে হয় খুব যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে তার অন্তরে আর বাইরে। তাই তার চেহারা কেমন শুকনো আর বিরস আর ক্লান্ত। দৈর্ঘ্যে বেড়েছে। প্রস্থে ক্ষীণ।

আবার বুধবার বুধবার হাজিরা দিতে হলো। তেমনি রিসেপশন। অথচ তেমনি নয়। মাঝখানে চার বছর ব্যবধান। ছেঁড়া তার জোড়া লাগে না। আগেকার দিনের সে দলটা ভেঙে গেছে। কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন যারা আসে তাদের মন অশান্ত ও চালচলন অস্থির। যেন তাদের জীবন থেকে শ্রী হারিয়ে গেছে। লালিত্য মিলিয়ে গেছে। পড়ে আছে উৎকট বাস্তববাদ। তারা অনেক খবর রাখে। তাদের মুখ দিয়ে কথার তুবড়ি ছোটে। তারা সব পারে। দরকার হলে সাধারণ ধর্মঘট, সশস্ত্র বিদ্রোহ, দাঙ্গাহাঙ্গামা। তাদের জীবনদর্শন হলো, 'বাঁচতে তো হবে।'

দেখি মাসিমাও তাদের সঙ্গে একদিল্। কথায় কথায় তিনিও বলেন, 'বাঁচতে তো হবে।' এই আবহাওয়ায় আমি বেশীক্ষণ মাথা ঠিক রাখতে পারিনে। তর্ক করতে যাই। তর্কের উত্তরে শুনি, 'আপনি, মশায়, ইউরোপীয়ান। আপনি তো অমন বলবেনই।' তখন তর্কে ভঙ্গ দিই। সঙ্গে সঙ্গে উঠি। মালা আমার দিকে অসহায় ভাবে তাকায়। আর মেসোমশায় তো নীরব শ্রোতা। তিনি একটিও কথা বলেন না, বললে নেহাৎ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। এই যেমন, 'টোগো আজকাল কী করছে হে? নীলিকে দেখিনে কেন?'

মালার সঙ্গে বাক্যালাপের সুযোগ বিশেষ হয় না। জানতে ইচ্ছা করে কী তার মনে আছে। তার অন্তরের সমাচার। নীলি ছিল এককালে তার ও আমার মাঝখানে সেতু। সে এখন তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। মালাকে একদিন সে জিজ্ঞাসা করেছিল কেন এলাহাবাদ থেকে চলে আসা হলো। মালা বলেছিল, 'সে অনেক কথা।'

একদিনে নয়, একটু একটু করে নানা সূত্রে আমি জানতে পাই অনেক কথা বলতে কী বোঝায়। মেসোমশায় চেয়েছিলেন আরো পশ্চিমে ও আরো উত্তরে যেতে। লছমন-ঝোলায় কি আলমোড়ায়। মাসিমা রাজী হননি। তাঁর পিছুটান কলকাতামুখে। মালা চেয়েছিল নারীসঙ্ঘে যোগ দিয়ে গ্রামের কাজে নামতে। মাসিমা রাজী হননি। এলাহাবাদ শহরে বসে মা'র চোখে চোখে থেকেও যে হরিজন মেয়েদের জন্যে পাঠশালা চালাবে তার জো নেই। ছোটলোকদের সঙ্গে মেশা চলবে না। কী তা হলে সে করবে? পড়াশোনা তো শেষ। মাসিমা বলেন সঙ্গীত শিখবে। এলাহাবাদ সঙ্গীতচর্চার পক্ষে প্রশস্ত। মালা যে সঙ্গীত ভালোবাসে না তা নয়। কিন্তু তার আন্তরিক ইচ্ছা কর্মক্ষেত্রে

ঝাঁপিয়ে পড়া। পাঁচজনকে নিয়ে কাজ করা। যেমন করছে মনোরমা কওল। সে এখন একজন বিখ্যাত নেত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী।

অবশ্য মনোরমার সঙ্গে মালার ঠিক মেলে না। মালার জীবন রূপকথার রেখা ধরে চলেছে। সে চায় বাঁচাতে। সে চায় তৃষ্ণার জল বয়ে এনে মুখে দিতে। সে চায় সুখী করতে। অসুখ সারাতে। নিছক রাজনীতি তার কাছে তুচ্ছ। নিছক যুদ্ধবিগ্রহ তাকে মাতায় না।

নীলি জানতে চেষ্টা করেছিল মালা তার রাজপুত্রের দেখা পেয়েছে কি না। মালা ধরাছোঁয়া দেয়নি। দেখা একজনের পেয়েছে হয়তো, সে জন কিন্তু রাজপুত্র নয়। তাকে ভালোবেসেছে কি? কে জানে কাকে বলে ভালোবাসা! নীলি তখন জানায় যে ভালোবাসা হচ্ছে বিয়ে করতে চাওয়া। মালা হাসে। বলে, না, সে রকম কোনো অভিপ্রায় নেই। বিয়ে করলে ভালোবাসা উড়ে যেতেও পারে।

মাসিমা টের পেয়েছিলেন বই কি। না পেলে কি এলাহাবাদের চাকরিটা অকালে ছেড়ে আসতে মেসোমশায়কে প্রবর্তনা দিতেন? চাকরি কি চাইলেই পাওয়া যায়? তা ছাড়া ওটা ছিল জীবিকার চেয়ে বড়। ওটা ছিল জীবনের কাজ। মেসোমশায় কি মাসিমার কথায় জীবনের কাজ ছেড়ে চলে আসতে রাজী হতেন? হলেন মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবেই। মেয়েকে তো যার তার হাতে সঁপে দেওয়া যায় না। বেশীদূর গড়াতে দিলে সঁপে দিতে হতোই। এসব ক্ষেত্রে স্থানত্যাগের বিধান আছে। অবশ্য নিজেরা স্থানত্যাগ না করে মালাকে স্থানান্তরে পাঠাতে পারতেন। তা হলে মালা দুঃখ পেতো। বিদ্রোহী হতো কি না কে জানে! তাকে তো ছেলেবেলা থেকেই শেখানো হয়েছে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয়। না, মেয়েকে কাছে রাখাই নিরাপদ।

মেসোমশায় যে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হচ্ছেন তা কি আমার জানতে বাকী ছিল? মেয়েকে যার তার হাতে সঁপে দেওয়া যায় না, এটা কেবল মেয়েলি শাস্ত্র নয়। মহা-পণ্ডিতরাও এটা মানেন। মেয়েকে যার তার হাতে সঁপে দিলে তার পরিণামে মেয়েই কষ্ট পাবে। তাকে তার কৃতকর্মের পরিণাম থেকে রক্ষা করাই কর্তব্য। যদিও তার বয়স হলো চব্বিশ কি পঁচিশ তবু তার নিজের বিবেচনার উপর তার বিবাহের নির্বন্ধ ছেড়ে দেওয়া যায় না। সে ভুল করবে। তার জন্যে পরে পশতাবে। তখন কিন্তু আর পিছু হটবার উপায় থাকবে না। বিয়ে একবার করলে চিরকালের মতো করা হয়ে যায়। বিশেষ করে মেয়েদের বেলা। স্বামী চিরদিন স্বামী। জীবনে আর সব ব্যাপারে পুনর্বিবেচনার অবকাশ আছে। কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে একবার যদি অবিবেচনা ঘটে তবে চিরকাল তার জের চলে। মাসিমার মতো মেসোমশায়েরও এই ধারণা।

বুঝি সব। কিন্তু সমর্থন করতে পারিনে প্রবীণদের এই মূঢ়তা। মালার উপর ছেড়ে

দিলে সে হয়তো ভুল করত, কিন্তু সে ভুল এমন ভুল নয় যা সংশোধনের অতীত। সমাজের মনে লাগবে, লোকে নিন্দা করবে, কেলেঙ্কারিতে কান পাতা দায় হবে। সব সত্যি। তবু এ কখনো হতে পারে না যে একটি মেয়ে যদি একটা ভুল করে থাকে তবে তা সংশোধনের অতীত, অতএব তাকে ভুল করতে দেওয়া হবে না, ঠিক করতেও দেওয়া হবে না, তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হবে। মেয়েদের বিয়ে যখন বারো তেরো বছরে দেওয়া হতো তখন যা নীতি ছিল এখন বিয়ের বয়স দু'গুণ হলেও সেই একই নীতি খাটানো হবে। মালাকে যে ছেলেবেলা থেকে ঢের বড় বড় কথা শেখানো হয়েছে সেসব তা হলে কাজের কথা নয়। কাজের বেলা ঠাকুমা দিদিমাদের মেয়েলি শাস্ত্র।

যাক গে। আমার কী? আমি কে? আমার অত মাথাব্যথা কিসের? আমি আমার চিত্রসাধনায় মগ্ন থাকতে চাই। আফসোসের বিষয় প্যারিসে যাবার সেই পরিকল্পনাটা করে ভেস্তে গেছে মাসিমার বাড়ী বানানোর ধান্দায়। তার পর আর আমি উদ্যোগী হইনি। জাহাজের পর জাহাজ হাতছাড়া হতে দিয়েছি। আগ্রহ কিছুমাত্র কমেনি। কিন্তু পালটা আকর্ষণে ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলছি। মালা সম্বন্ধে কৌতূহল। তার রুচি সম্বন্ধে কৌতূহল। কাকে তার মনে ধরেছে। কে তার ভালোবাসা পেয়েছে।

বল দেখি এসব কথায় আমার কী? কেনই বা আমি আমার প্যারিসযাত্রা স্থগিত রাখি আর মাকে স্তোক দিই? অথচ মাসিমার ওখানেও নিয়মিত হাজিরা দিতে গাফিলতী করি। তবে ছবি আঁকা আমার বন্ধ থাকে না। পেটের দায়ে বল, প্রাণের দায়ে বল, স্বপ্নের দায়ে বল কাজ আমাকে প্রতিদিন করে যেতে হয়। কাজ যেদিন করিনে ভাত সেদিন খাইনে। নেই খাটুনি তো নেই খাওন। লেনিনের মতো আমার ফতোয়া। নিজের উপরেই আপাতত ওটা জারি হচ্ছে। পরে দেশের লোকের উপরেও হবে। কথায় কথায় এরা হরতাল করে। হরতালের দিন অনশনের বিধান দিলে কর্মে মতি হবে। নেই খাটুনি তো নেই খাওন।

মালা বস্তির ছোট ছোট মেয়েদের খেলার ছলে লেখাপড়া শেখাতে চায় আর সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন, যতটুকু তার জানা। এই নিয়ে একদিন কথা কাটাকাটি হয়ে গেল মাসিমার সঙ্গে। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'আমি তো হদ্দ হয়ে গেলুম বোঝাতে বোঝাতে। এখন তুমি যদি বোঝাতে পারো। কাজটা যে ভালো তা তো আমি অস্বীকার করছিনে। কিন্তু যে মেয়ে এম এ পাশ করেছে সে কেন বস্তির মেয়েদের নিয়ে সময় নষ্ট করবে? পড়াতে চায় কলেজে চাকরি নিক। কিংবা হাই স্কুলে।'

আমার কতকগুলো কৌশল আছে যা দিয়ে আমি কথা বার করি। সেদিন মাসিমার আপত্তির আসল কারণটা জেরা করে বার করলুম। বস্তিটা মুসলমানদের। ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে মিশতে গেলে বড় বড় গুণ্ডাদের নেকনজরে পড়তে হবে। তারা ত্যাগের

মহিমা জানে না। জানে একটি জিনিস। সেই ভয়ে মুসলমান মহিলারা বোরকায় সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখেন। নইলে উলটে দোষ দেওয়া হয় ওঁদের। কেন ওঁরা পুরুষদের প্রলুব্ধ করতে যান। মালাকেও উলটে দোষ দেওয়া হবে তো? রটানো হবে যে মেয়েটাই নষ্টের গোড়া। মালা না হয়ে নীলি হলে কি আমি তাকে মুসলমানদের বস্তিতে মেয়েদের পাঠশালা খুলতে দিতুম? কিংবা বস্তির মেয়েদের ডেকে এনে বাড়ীতেই পাঠশালা বসাতে?

বুকে হাত রেখে বলতে পারব না যে মুসলমান গুণ্ডাদের নামে ভয় পাইনে আমি। পাই। পাই। একটু আধটু পাই। মাসিমা আমার মনের দুর্বল জায়গায় ঘা দিলেন। আমাকে মানতেই হলো যে নীলিকে আমি ও রকম কোনো ঝুঁকি নিতে দিতুম না। শিক্ষার ভার কর্পোরেশন নিয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি শিক্ষা থেকে কেউ বঞ্চিত থাকে তবে খবরের কাগজে চিঠি লেখা যেতে পারে। স্বাস্থ্যের ভারও তো কর্পোরেশনের। ট্যাক্স দিচ্ছি। তাই যথেষ্ট নয় কি? মাসিমা আমার যুক্তি শুনে পরম আপ্যায়িত হন। আর আমাকেও আপ্যায়ন যা করেন তাও চরম।

কিন্তু মালার সামনে আমার মুখ ফোটে না। সে বেচারি একেবারে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো নিষ্ক্রিয়। কত রকম পক্ষাঘাত আছে। এও একরকম। সে চায় দুর্গম পথে যাত্রা করতে। সুগম পথ আর যারই জন্যে হোক মালার জন্যে নয়। সে চায় ওই পথের শেষে মুক্তা ঝরার কূলে পৌঁছতে। সে চায় বাঁচাতে। এক একটি দুর্গম পথের দিকে পা বাড়ায়। আর অমনি তার মা এসে তার পথ আগলে দাঁড়ান। সে নজরবন্দী। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে নয়। সে যদি ইচ্ছা করে ভদ্র ঘরের মেয়েদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে রেসপেক্‌টেবল কাজ করতে পারে। মালার অভিরুচি সেদিকে নয়। যা হোক একটা কিছু করতে হবে এ মনোভাব তার নয়।

আমি চুপ করে বসে আছি দেখে মালা বলে, 'কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই, দেবুদা। কোনো খেদও নেই আমার মনে।'

'তা হলে তো কোনো কথাই ওঠে না।' আমি বলি, 'তা হলে তো সব ঠিক আছে।'

কথাবার্তা এর বেশী এগোয় না। আমি ভাবতে থাকি। মালা বলে, 'মা যা করতে বারণ করেছেন তা করতে আমিও যে এমন কিছু অধীর হয়ে উঠেছি তা নয়। আমাকে অধীর করে তোলা সহজ নয়। আমি স্বভাবতই ধীর।'

'সে আমি জানি। তোমার ধৈর্যের সীমা নেই।' আমি তার প্রশংসা করি। বাস্তবিক তার প্রশংসা না করে পারিনে। কবে থেকে সে স্বপ্ন দেখছে কিরণমালার মতো। স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারার দুঃখ আমি বুঝি।

'ধৈর্য অসীম হলে কি মা'র সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়? আমি লজ্জিত।' সে আমার

কাছে অনুশোচনা প্রকাশ করে। 'মা যে আমার ভালোর জন্তেই চিন্তিত তা কি আমি বুঝিনে?'

এর কিছুদিন পরে টোগো এসে হাজির। দারুণ উত্তেজিত। কী একটা বলতে চায়, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরয় না।

'কী হয়েছে, টোগো?' আমি তাকে ধরে নাড়া দিই।

'সর্বনাশ!' সে এক কথায় সারে।

'সর্বনাশ! কার সর্বনাশ! কেমন সর্বনাশ!' আমি বিমূঢ় হয়ে বলি। যত রকম সর্বনাশ হতে পারে তার মিছিল দেখতে থাকি কল্পনার চোখে।

'মিউটিনি।' সে ধপ করে বসে পড়ে।

'মিউটিনি!' আমি আতঙ্কিত হই। কিন্তু সে আতঙ্ক অবিমিশ্র নয়। আনন্দমিশ্রিত। বাধল তা হলে আর একবার সিপাহীযুদ্ধ। এবার ইংরেজ সামলাতে পারলে হয়।

টোগো আবো পরিষ্কার করে বলে, 'নেভাল মিউটিনি। বম্বেতে, করাচীতে গুলী বিনিময় চলেছে। ভাগ্যিস আমি ওর মধ্যে নেই।'

আমি তামাশা করে বলি, 'বা! এত বড় একটা অ্যাডভেঞ্চার তোমার বিগুমানে ঘটল না, এর জন্তে তোমার আফসোস নেই?'

টোগো দার্শনিকের মতো বলে, 'তোমার বোনের দিকটাও একবার ভেবে দেখতে হয়। বাবা! অ্যাকশনে মরতে আমি যে কোনোদিন তৈরি ছিলুম। কিন্তু কোর্ট মার্শালের হুকুম শুনলেই আমার হার্টফেল করত। আহা, এই হতভাগারা জানে না এদের কপালে কী আছে! আমি জানি, তাই আমার বুক কাঁপছে।'

কথাটা সত্যি। নেভাল মিউটিনি ইংরেজরা অনায়াসেই দমন করতে পারবে। একমাত্র ভরসা যদি এয়ার ফোর্সে ও আর্মিতে ছড়ায়।

যা ভেবেছিলুম এয়ার ফোর্সেও ছড়াল। কিন্তু তার আগেই নেভির আগুন নিবে-ছিল। তেমনি এয়ার ফোর্সের আগুনও নিবল। আমি যে টোগোর মতো নিশ্চিন্ত হলুম তা নয়। আমার মনে হলো ভারতবর্ষ একটা ঐতিহাসিক সুযোগ হারালো।

কিন্তু এসব ঘটনা ব্যর্থ হলো না। ক্যাবিনেট মিশন এলো নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে। আসর জমে উঠল রাজনীতিবিশারদদের। সেসব কূটতর্ক আমার মতো অব্যবসায়ীর বোধগম্য নয়। টোগো যদিও সাংবাদিকতা ছেড়ে জাহাজের কারবারে ভিড়েছে তবু প্রত্যেকটি রাজনৈতিক চালের সন্ধান রাখে ও অর্থ বোঝে। দেখা হলেই আমাকে শোনায়।

'জিন্না ভেবেছিলেন ইংরেজ তাঁর ডামি হয়ে ব্রিজ খেলতে বসেছে।' টোগো রসিয়ে রসিয়ে বলে, 'এ, বাবা, সে ইংরেজ নয়।'

আমি জানতুম না যে ইংরেজ এতদিন ডামি হয়ে খেলছিল। অজ্ঞতা ঢেকে বলি, 'তাই তো! ইংরেজ কবে থেকে এমন লায়েক হলো!'

'ওরা এতকাল পরে নির্ঘাত সমঝেছে', টোগো সবজান্তার মতো বলে, 'নেহরুকে চটালে মিউটিনি। জিন্নাকে চটালে তেমন কিছু নয়। জোর একটু দাঙ্গাহাঙ্গামা। তাও ইংরেজের গা বাঁচিয়ে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি', সে আমাকে বিশ্বাস করে বলে খবরের কাগজের ভাষায়, 'ক্যাবিনেট মিশন নিষ্ফল হলেও নেহরুকেই আহ্বান করা হবে তাঁর নিজের পছন্দমতো গভর্নমেণ্ট গঠন করতে।'

ফ্রান্সে আমি তিন মাস অন্তর অন্তর গভর্নমেণ্ট গঠনের দৃশ্য দেখেছি। তাই একটু রগড় করে বলি, 'ক'মাসের জন্যে?'

টোগো আমার উপর খাপ্পা হয়। 'তুমি কিস্সু বোঝো না, দেবপ্রিয়। ক্ষমতা আমাদের হাতে আসছে কে জানে ক'শতাব্দী পরে। এই প্রথম আমরা দিল্লী থেকে গভর্নমেণ্ট চালাব বাঙালী বিহারী গুজরাতী মরাঠা পাঞ্জাবী মাদ্রাজী হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীস্টান মিলে। আঃ! কত কালের কত বড একটা স্বপ্ন সফল হতে চলল। হায়, রবীন্দ্রনাথ! তুমি কেন বেঁচে রইলে না আরো কয়েকটা বছর! গুরু হে, তুমিই সত্য।'

এই বলে সে গুনগুনিয়ে ওঠে, 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা।'

আমার হৃদয়েও দোলা লাগে। বলি, 'মহাভারত পড়েছ নিশ্চয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগ দিতে এসেছিল সারা ভারতবর্ষ। গান্ধার, মদ্র, বাহ্লীক, সিন্ধু, পাঞ্চাল, প্রাগ্জ্যোতিষ, পুণ্ড্র, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মালব, অন্ধ্র, দ্রাবিড়, সিংহল, কাশ্মীর। সেকালের ভারতবর্ষ একালের চেয়েও বৃহত্তর ছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দেখে কেউ বা সেদিন কল্পনা করেছিল যে এর পরে আসছে কুরুক্ষেত্র? কেন ও রকম হলো? হলো এইজন্যে যে যুধিষ্ঠিরের যাতে হর্ষ দুর্যোধনের তাতে বিষাদ। আর দুর্যোধনের শিবিরটিও কম যায় না।'

টোগো ফুৎকার দেয়। 'তুমি বলতে চাও আর একটা কুরুক্ষেত্র বাধবে।'

'অসম্ভব নয়, যদি যুধিষ্ঠির তাঁর ভাই দুর্যোধনকে ভালোবাসা দিয়ে জয় না করে বুদ্ধি দিয়ে চালমাৎ করতে যান। বুদ্ধির খেলায় হেরে গেলে লোকে বাহুবলের পরীক্ষা চায়। বিনা যুদ্ধে হার মেনে নেয় না।' আমি গম্ভীরভাবে বলি।

'তুমি এসব বিষয়ের কিস্সু বোঝো না। একদম আনাড়ি।' টোগো হেসে উড়িয়ে দেয়। 'রাজনীতির খেলায় চালমাৎ হলেই অমনি যুদ্ধ বেধে যায় না। আর বাধলেই বা কী? আমরাই বাহুবলে শ্রেষ্ঠ।'

'আমরা' কথাটা আমার কানে খট করে বাজে। একরকম গুলীর আওয়াজ। আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করি, 'তোমার ওই 'আমরা' কথাটার মানে কী?'

টোগো ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'কেন ? আমরা ! মানে হিন্দুরা।' তার পরে শুধরে দিতে গিয়ে বলে, 'হিন্দুরা আর শিখেরা আর জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা। যাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়েছিলেন নেতাজী। আহা, নেতাজী ! তুমিই সত্য।'

এমন মানুষের সঙ্গে তর্ক করবে কে ? আমি ভঙ্গ দিই। মনটা হায় হায় করে ওঠে। কী যে আছে দেশের কপালে ! সবাই মিলে বিদেশী শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করা এক কথা। সবাই মিলে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তখন 'সবাই' আর সবাই থাকে না। ধর্মের টানে বা রক্তের টানে একপক্ষের সৈনিক অপর পক্ষে চলে যায়। ওই আজাদ হিন্দ ফৌজকে যদি বলা হতো জিন্নার দলের বিদ্রোহ দমন করতে ফৌজ দু'ভাগ হয়ে যেতো। সংহতিনাশ অনিবার্য। জাতীয়তাবাদী সেন্টিমেন্ট বাইরের লোকের বিরুদ্ধে জাগানো যায়। ঘরের লোকের বিরুদ্ধে নয়। তখন যা স্বভাবত জাগে তা হিন্দু বা মুসলিম সেন্টিমেন্ট।

জিন্না এ রহস্য সকলের চেয়ে বেশী বুঝতেন। কারণ একদা তিনি নিজেই একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ছিলেন। নেহরু গভর্নমেন্ট গড়তে গিয়ে সৌজন্যবশত জিন্নার সহযোগিতা চাইলেন। জিন্না প্রত্যাখ্যান করলেন। নেহরু দিল্লীর মসনদে বসবার আগেই শুরু হয়ে গেল ওস্তাদের মার। ডাইরেক্ট অ্যাকশন।

উঃ ! সে কী পৈশাচিক কাণ্ড ! সশস্ত্র পুরুষের সঙ্গে সশস্ত্র পুরুষের বলপরীক্ষা নয়। যুদ্ধ বলতে যা বোঝায়। এমন কি ওকে দাঙ্গা বললেও ভুল বলা হয়। দাঙ্গাও তো সবলের সঙ্গে সবলের, সশস্ত্রের সঙ্গে সশস্ত্রের। ফরাসীদের ইতিহাসে পড়েছি একদা সেদেশে ঘটেছিল সেন্ট বার্থোলোমিউ দিবসের ম্যাসাকার। ক্যাথলিকরা দলবদ্ধভাবে চড়াও হয়ে বা ঘেরাও করে নিরীহ প্রোটেস্টান্টদের নির্বিচারে নিকাশ করে। প্ররোচনা দিয়েছিলেন স্বয়ং কাথারিন দ মেদিসি। প্রবল পরাক্রান্ত রাজমাতা। রাজ্যের প্রকৃত শাসক। কারণটা ধর্মগত নয়, রাজনীতিগত। যে ষোড়শ শতাব্দীর সেই ফরাসী পৈশাচিকতা দেশকাল অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর ভারতে উপনীত দেখে আমি তো বেবাক দিশেহারা। গরীব দুঃখী পথচারী, নারী ও শিশু হয়েছে তাদের শিকার।

দেখলুম প্রোটেস্টান্টরাও কিছু কম যায় না। অবিকল একই রকম শিকারপদ্ধতি ও শিকারীপনা। কে কাকে শেখাবে ? খুন চেপে গেছে মাথায়। রক্তের বদলে রক্ত। মাংসের বদলে মাংস। না, মাংস সম্বন্ধে আমি অতটা নিশ্চিত নই। তবে একেবারেই যে নিরামিষ ব্যাপার তা বিশ্বাস করা শক্ত।

টোগো একদিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলে, 'কী করে উদ্ধার করা যায়, বল তো ?'

আমি চমকে উঠে বলি, 'কাকে ?'

'মালাকে ও তার মা বাবাকে।' সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'ওঁদের পার্ক সার্কাসের

বাড়ীটা পড়েছে মুসলিম পকেটে। ওখানে পুলিশ পর্যন্ত যেতে ভয় পায়। ভলান্টিয়াররা ভয়ে ঘেঁষতে চায় না। আমি একা কী করতে পারি!'

আমি ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকি। মালা! মালার মা বাবা! হা ঈশ্বর! কোনো মতে বলি, 'ওঁরা বেঁচে আছেন ঠিক জানো?'

'ঠিক জানি। অন্তত আধ ঘণ্টা আগেও বেঁচেছিলেন।' টোগো আমার অশান্ত অন্তরে যা ছিটিয়ে দিল তা শান্তিজল নয়।

'তা হলে চল যাই উপায় দেখি।' আমি তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়ে নিই।

পথে যেতে যেতে শুনি মেসোমশায়দের বাড়ীর চার দিকে গুণ্ডারা হানা দিচ্ছে। ভিতরে ঢুকতে পারেনি, তার কারণ মাসিমা পশ্চিম থেকে গুটি দুই হিন্দুস্থানী ঠাকুর চাকর এনেছিলেন, তারা লুচি বেলতে যতটা সিদ্ধহস্ত নয় লাঠি চালাতে যতটা। কিন্তু তারাও তো মনিবকে ছেড়ে বাইরে গিয়ে খবর দিতে পারছে না। খবরটা তা হলে দেবে কে? বাড়ীতে টেলিফোন নেওয়া হয়নি। ডাকপিয়নও যায় না, যেতে সাহস পায় না। মুসলমান দরজি গেছল জামার ডেলিভারি দিতে। তাকেও ঢুকতে দেয়নি। কিন্তু লোকটা ধর্মভীরু। মেসোমশায়কে ভক্তি করত। সে তার নিজের বুদ্ধিতে এইটুকু করেছে যে গ্রাইট স্ট্রীট পর্যন্ত হেঁটে এসে তার আরেক জন খদ্দেরকে অর্থাৎ টোগোকে খবরটা দিয়েছে। হাঁ, সবাই বেঁচে আছেন।

গভর্নমেণ্ট হাউসে আমার যাতায়াত ছিল। নতুন গভর্নর আমাকে চেনেন না, কিন্তু এঁর আগে যিনি ছিলেন তিনি চিনতেন। কারণ তিনি ছবি চিনতেন। সেইসূত্রে স্টাফের সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল। সশরীরে হাজির হয়ে আমার কার্ড পাঠিয়ে দিই। মিলিটারি সেক্রেটারি আমাকে দর্শন দিলেন। আমার জন্যে তিনি কী করতে পারেন? করতে পারেন আমার স্বজনদের উদ্ধার কার্যে সাহায্য।

চললুম আমি সরকারী গাড়ীতে করে গোরা সার্জেণ্টের সঙ্গে পার্ক সার্কাস। আমাকে দেখে যারা মারতে আসত গোরাকে দেখে তারা বিনা বাক্যে অন্তর্ধান। সাদা চামড়ার প্রেসটিজ কত! আমি তো লজ্জায় মরি। অন্য সময় হলে কখনো ওদের সাহায্য নিতুম না। কিন্তু এ হলো একটি পরিবারের জীবনমরণ সমস্যা। বলা বাহুল্য টোগোও ছিল আমার সঙ্গে। সে না থাকলে সার্জেণ্টের সঙ্গে চাল দেবে কে? সার্জেণ্ট তাকে 'সার' বলছিল।

মাসিমা আমাদের দু'জনকে দেখে কেঁদে ফেললেন। আর মেসোমশায় এমন এক হাসি হাসলেন যা কেবল সাধুসন্তেরা পারেন। মালা যেন রূপকথার রাজ্যে বাস করছে। সে তার স্বপ্নের ঘোরে বলে, 'অরুণ, বরুণ, তোমরা বেঁচে আছো তো? পাথর হয়ে যাওনি তো?'

টোগো আমাকে এক ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে, 'পাগলামির পূর্বলক্ষণ।'

আমি বলি, 'না। থাক, তুমি বুঝবে না।'

বাড়ী রইল ঠাকুর চাকরের পাহারায়। মালীটি মুসলমান। সে তার স্বধর্মীদের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। গোরা সার্জেন্টকে দেখে তারও বুকে সাহস জাগল। সেও পাহারা দেবে। মাসিমা অবিশ্বাস করছিলেন, আমি তাঁকে অভয় দিয়ে পাড়ার লোককে ডাক দিয়ে বললুম, 'ভালো করে দেখে নাও, গাড়ীখানা লাটসাহেবের বাড়ীর।'

এন্তার সেলাম কুড়োতে কুড়োতে মাসিমাদের তিনজনকে নিয়ে রাইট স্ট্রীটে নীলির হাতে গছিয়ে দিলুম। এটা টোগোদের পৈত্রিক ভদ্রাসন নয়। তার কোম্পানী তাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। বন্দুকধারী দারোয়ান ছিল। তাকে দেখে মাসিমার প্রত্যয় হলো যে গুণ্ডাশাহীর দাপট অতদূর পৌঁছবে না। তিনি আরো একবার কেঁদে ফেললেন। টোগোর সঙ্গে মালার বিয়ে কেন হলো না তাই ভেবে বোধ হয়।

সার্জেন্টকে ও শোফারকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দেওয়া হলো। না, শুধু ধন্যবাদে চিঁড়ে ভেজে না। গলা যাতে ভেজে এমন দ্রব্যও টোগো তার সেলার থেকে বার করে গোপনে পাচার করে দিল বাড়ী থেকে গাড়ীতে।

মেসোমশায়কে কখনো গান করতে শুনিনি। স্থানকালপাত্র ভুলে তিনি গান ধরলেন, 'সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।'

গান শেষ হলে আপন মনে বলতে লাগলেন, 'গেল। গেল। এই তিনটি দিনে নিঃশেষ হয়ে গেল তোমার পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার অভিমান! তোমার মহত্বের দম্ভ! তোমার সিম্পেসিসের বড়াই! তোমার গুরুগিরির দর্প।'

তার পর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'গো অ্যাণ্ড রিপেন্ট। যাও। অনুতাপ কর। প্রায়শ্চিত্ত কর। তপস্যা কর। চুপ চুপ। একটি কথাও না। হিন্দু করেনি, মুসলমান করেছে শুনতে চাইনে এ কথা। কে হিন্দু? কে মুসলমান? একই চেহারা। একই অপরাধ। কে ফরিয়াদী? কে আসামী? গো অ্যাণ্ড রিপেন্ট। যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।'

আমরা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। তখন তিনি একটু শান্ত হলেন। তিন দিন তাঁর নিদ্রা হয়নি। কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

॥ সাত ॥

কেবল কলকাতার উপর নয়, সারা দেশের উপর নেমে এলো জার্মান পুরাণের কালরাত্রি Walpurgis Night. সাত শ' বছরের বাসি মড়ারা কবর থেকে বা শ্মশান থেকে উঠে এলো। উঠে এসে লড়াই যেখানে থেমেছিল সেইখান থেকে আবার শুরু করে দিল। কবেকার কোন্ যুদ্ধের পুনরভিনয়। বোধ হয় প্রথম পাণিপথের যুদ্ধের। ভূতের সঙ্গে ভূতের রণ।

রাত যেন আর পোহাতেই চায় না। যেন বারো ঘণ্টার রাত নয়। বারো মাসের রাত। কালরাত্রি ভোর হলো। মামদো আর ব্রহ্মদৈত্য কবরে আর শ্মশানে ফিরে গেল। অবাক হয়ে দেখি দেশ ভেঙে গেছে। প্রদেশ ভেঙে গেছে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই চুড়িওয়ালার মতো আমিও ভাঙা বুকের মধ্য হতে ডুকরিয়ে কেঁদে উঠে দুই হাতে চোখ চেপে ধরে বলে উঠলুম, 'মাবে, এ মুই কী দ্যাখলাম! অ্যার আগে মুই মল্যাম না ক্যান!'

কিন্তু থাক সে কথা। বলব আমি যথাক্রমে। যখনকার কথা তখন।

'মহৎ কলিকাতা হত্যাকাণ্ডে'র সময় আমার অন্তরজীবনে একটা সঙ্কট চলেছে। তাই নিয়ে আমি অন্যমনস্ক। শিল্পী ব্যতীত আর কেউ বুঝবে না, আর কাউকে বোঝানো যাবে না সঙ্কট কিসের আর কেনই বা সঙ্কট। ওই যে শিমুলগাছটা দেখছ ওটা আছে। ওর অস্তিত্বের জন্যে ওকে জবাবদিহি করতে হয় না, ব্যাখ্যা করে বলতে হয় না কী ওর তাৎপর্য। ওটা যে বট নয়, অশথ নয়, শিমুল এটাও স্বতঃসিদ্ধ। যার চোখ আছে সে-ই চিনতে পারে ওটা শিমুল। ঘটা করে চেনাতে হয় না। তেমনি কুতব মিনার বা তাজমহল বা পুরীর মন্দির দেখে প্রশ্ন ওঠে না, কেন এটা আছে। কী এর মানে। কোন্‌খানে এর বৈশিষ্ট্য। অত কথায় উত্তর দিতে হয় না। এক কথায় বলতে পারা যায়, 'দ্যাখ!'

শিল্পকর্ম নিছক অস্তিত্বের দ্বারা আপনাকে আপনি প্রচার করে। তার প্রকাশটাই তার প্রচার। অথচ যত প্রচার আমাদের ছবির বেলা। প্রচার না করলে তো গেলে। দর্শক বা ক্রেতাদের বোঝাতে বোঝাতে আমরা হদ্দ হয়ে যাই যে এটিও একটি অস্তিত্ব। এটি আছে বলেই আছে। আছে যখন তখন একটা মাথামুণ্ডু আছে বইকি। কী ওর মানে সেটা তো কেউ কুতব মিনারকে বা তাজমহলকে শুধায় না। চেনাও কঠিন নয় কোন্‌টা তাজমহল আর কোন্‌টা মোতি মসজিদ। তা হলে আমাকে অত কথায় বোঝাতে হয় কেন? দর্শক ও ক্রেতাদের উপর আমি রাগ করেছি। রাগ করে ছবি আঁকা ছেড়ে

দেব কি না ভেবেছি। যখনকার কথা বলছি তখন অন্যমনস্ক হয়ে চিন্তা করছি কেমন করে ছবি আঁকলে কেউ আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে না। চাইবে ছবির কাছে। ছবিই বলবে, কেন সে আছে, কী তার মানে। হাঁ, ছবি সত্যি সত্যি বলবে। বলবে ছবির ভাষায়। সে ভাষা যারা জানে না তারাও বুঝবে যে কিছু একটা বলা হচ্ছে কী একটা অজানা ভাষায়। ভাষাটা একবার যত্ন করে শিখে নিলে ছাবটা আর দুর্বোধ্য নয়। বরং একান্ত সহজবোধ্য। সেটুকু যত্ন যারা করবে তারা লাভ করবে অমূল্য উপভোগ। রূপভোগ।

এইসব ভাবনা নিয়ে আমি অন্যমনস্ক। এমন সময় ঘটে গেল 'মহৎ কলিকাতা হত্যা-কাণ্ড।' সভ্য সমাজে বাস করে যথেচ্ছ খুন জখম করে যাও, সাজা হবে না। বরং বীর বলে বন্দনা পাবে। যুদ্ধে তবু প্রাণ নিতে গেলে প্রাণ দিতে হয়। এক্ষেত্রে প্রাণ দেবার বালাই নেই। আততায়ীরা প্রত্যেকেই জীবিত। পুলিশের সঙ্গে, পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে তলে তলে যোগ আছে। প্রাণ দেবে সশস্ত্র বলবান আততায়ী নয়, নিরস্ত্র নিরীহ পথচারী। ডিমওয়ালা, চানাচুরওয়ালা, মুচি, ধাঙড়। একবেলা খাইবে না বেরোলে যাদের পেট চলে না। সমগ্র সমাজকে কাঁধে করে চলেছে যারা। সভ্যতার বোঝা যাদের পিঠে চেপেছে। হায়! হায়! মরবে কি না এরাই!

মরতেই হবে! না মরে উপায় আছে? সংখ্যা মিলবে কী করে? রাত্রে হিশাব করা হয় আজ কলকাতা শহরে ক'জন হিন্দু আর ক'জন মুসলমান নিকাশ হলো। হিশাবে হিন্দু কম ও মুসলমান বেশী হলে পরের দিন বেশী হিন্দু ও কম মুসলমান মরা চাই। বাঁদরের পিঠেভাগের মতো দুই পাল্লা সমান রাখতে প্রাণান্ত। কথা নেই, বার্তা নেই, অজানা একটা লোক হঠাৎ কোন্‌খান থেকে বেরিয়ে এসে ধাঁ করে আর একটি অজানা লোকের বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কেন? আগে থেকে শত্রুতা আছে? না, শত্রুতা নেই। তবে কিসের জন্যে এ আক্রমণ? অর্থের জন্যে? না, তাও নয়। হিশাব মেলাতে হবে। হিন্দুর বদলে হিন্দু। মুসলমানের বদলে মুসলমান। চোখের বদলে চোখ। দাঁতের বদলে দাঁত। আজ যদি সাতটি হিন্দু কম পড়ে কাল যাকে পাবে তাকে মারতেই হবে, নাই বা থাকল তার কোনো দোষ। তেমনি কাল যদি পাঁচটি মুসলমান কম পড়ে তবে পরশু যেমন যেমন করে হোক পূরণ করতেই হবে, নয়তো মান থাকে না, মারণের খেলায় হার হয়।

কাজটা যে গর্হিত সকলেই তা জানে। তবু বিবেককে এই বলে বুঝ দেয় যে, ওকে না মারলে ও-ই হয়তো একদিন মারত। কিন্তু ও যে গরিব ফেরিওয়ালা! রেখে দিন, মশায়, গরিব ফেরিওয়ালা! সাপ, সাপ, সাক্ষাৎ কালসাপ। সাপের শেষ রাখতে নেই। সাপের সঙ্গে বাস করা যায় না। সুযোগ পেলেই কাটবে। এ পাড়াকে আমরা সাপের

কামড় থেকে বাঁচাতে চাই। তাই একধার থেকে সাপের বংশ সাবাড় করে আনছি। বাধা যদি দেন তো আপনাকেও—। আমি পিট্‌টান দিই।

মেসোমশায় দিন কতক পরে প্রকৃতিস্থ হন। কথা বেশী বলেন না। মৌন থাকেন। কী যেন ধ্যান করছেন। একদিন আমাকে পাশে বসিয়ে বলেন, 'প্রেমের বড় অভাব।'

আমি তাঁকে বলতে দিই। বাক্যক্ষেপ করিনে।

'আমি যেন দেউলে হয়ে গেছি। ভালোবাসতে চাই। ভালোবাসতে পারছিনে। কোনো মতে ঘৃণাকে ঠেকিয়ে রাখছি। ক্রোধকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিনে। আরুণির মতো আমিও আলের বাঁধ বাঁধছি। কিছুতেই আল বাঁধতে না পেরে শুয়ে পড়ে শরীর দিয়ে ছিদ্র নিরোধ করছি। জলের তোড়ে ভেসে যাইনি এখনো। প্রাণপণে স্থির থাকছি।' বলতে বলতে তিনি ঘেমে ওঠেন। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে যদিও।

তাঁর অন্তরে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল। দেবাসুরের দ্বন্দ্ব। ঘৃণাসুরের সঙ্গে, ক্রোধাসুরের সঙ্গে প্রেমদেবতার দ্বন্দ্ব, কল্যাণদেবতার দ্বন্দ্ব। বাইরে যেমন হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বে নিরীহ শিকার কম পড়ছিল অন্তরে তেমনি প্রেম কম পড়ছিল, কল্যাণ কম পড়ছিল! বাইরে কম পড়লে পুষিয়ে দেবার উপায় ছিল। অন্তরে কিন্তু তেমন নয়। প্রেমের বড় অভাব। প্রেম পারছে না অপ্রেমের সঙ্গে পাল্লা সমান রাখতে। প্রেম হেরে যাচ্ছে।

অন্তর অন্বেষণ করে দেখি আমিও তেমনি দেউলে হয়ে গেছি। আমি কাপুরুষ। নিরীহ শিকারকে বাঁচাতে যাইনে, পাছে শিকারীদের কোপে পড়ে প্রাণ হারাই। মরব কী করে? আমার হাতে যে অসমাপ্ত কাজ। আধখানা ছবি শেষ করবে কে?

মেসোমশায়কে বলি, 'আজকের দিনে প্রেমের মতো বিপজ্জনক আর কী আছে? রাস্তায় বেরোতে হয় আমাকে। চোখ বুজে পথ চলতে পারিনে। যা চোখে পড়ে তা আমার পৌরুষকে লজ্জা দেয়। মনুষ্যত্বকে লজ্জা দেয়। প্রেম আমাকে ঠেলা দিয়ে বলে, লোকটাকে বাঁচাও। ওকে বাঁচানো মানে আপন মনুষ্যত্বকে বাঁচানো, পৌরুষকে বাঁচানো। আমি কি তার কথা শুনি! আমি বলি, ওটা পুলিশের কাজ। রাষ্ট্রের কাজ। আমার কাজ ছবি আঁকা।'

বেশ বুঝি যে আমার মনুষ্যত্বে টান পড়ছে, পৌরুষে টান পড়ছে। প্রেমের কথা যদি না শুনি তবে প্রেমেরও অভাব হয়। মেসোমশায়ের মতো আমারও দশা। আমিও ভালোবাসতে চাই। কিন্তু ভালোবাসতে পারছিনে। কিন্তু অন্য অর্থে। আমার অন্তরের দ্বন্দ্ব অপ্রেমের সঙ্গে প্রেমের নয়, অক্ষমতার সঙ্গে প্রেমের। কাপুরুষতার সঙ্গে প্রেমের।

এসব সমস্যা সমস্যাই নয় আমার প্রতিবেশী ডক্টর পাকড়াশির কাছে। এই বিদ্বান একদিন আমাকে প্রশ্ন করেন, 'ওহে আর্টিস্ট, তুমি তো পড়াশুনোও করেছ শুনেছি। বলতে পারো ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কত?'

আহা, কে না জানে যে চল্লিশ কোটি! আমার উত্তর শুনে ভদ্রলোক বলেন, 'বেশ। এখন হিন্দুর সংখ্যা কত?'

একটু বিরক্ত হয়ে বলি, 'ত্রিশ কোটি।' তা শুনে তিনি থামবার পাত্র নন। জানতে চান মুসলমানের সংখ্যা কত। বলি, 'দশ কোটি।'

'তা হলে', ভদ্রলোক অদম্য, 'এবার বল দেখি দশ কোটি হিন্দু যদি মরে বাকী থাকে কত আর দশ কোটি মুসলমান যদি মরে কত বাকী থাকে।'

আমি তো চিত্তির! মাথা চুলকাই। ভদ্রলোক তা দেখে এক গাল হেসে বলেন, 'আরে! অত ভাববার কী আছে! ও তো সোজা অঙ্ক। এ পক্ষে দশ কোটি যদি মরে ষষ্ঠীর কোলে আরো বিশ কোটি বেঁচে থাকে। আর ও পক্ষে দশ কোটি যদি মরে একটিও বেঁচে থাকে না। হিন্দুস্থান সাফ হয়ে যায়। অবশ্য জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়, উপায় নেই। সর্বনাশং সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।'

হাঁ। তিনি একজন পণ্ডিত। আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিই যে আরম্ভটা যখন বাংলাদেশে হয়েছে তখন বাঙালীর সংখ্যাই প্রাসঙ্গিক। এ পক্ষে তিন কোটি আর ও পক্ষে তিন কোটি যদি মরে তা হলে বাঙালী হিন্দু বলতে একজনও বেঁচে থাকে না, অথচ বাঙালী মুসলমান বলতে বেঁচে থাকে আধ কোটি। তখন তামাম বাংলাদেশটাই পাকিস্তান।

এবার তিনিই চিত্তির। আমিও অনেক দুঃখে হাসি। 'কেন? এ তো সোজা অঙ্ক। আর ওরাও তো কম পণ্ডিত নয়। অর্ধেক কেন, বারো আনা ছাড়তেও রাজী।'

এইসব মাথা খারাপের দল একদিন গায়ের চামড়া বাঁচাবার জন্যে বাংলার দশ আনা ত্যাগ করবে তা কি তখন আমি কল্পনা করতে পেরেছি? দিল আমাকে এমন এক বিস্ময়ের ধাক্কা যা আমি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এরা মরবেও না, বাঁচবেও না, আধ-মরা আর আধ-বাঁচা হয়ে ত্রিশঙ্কুর মতো ইতিহাসের শূন্যে ঝুলে থাকবে।

মাসিমা ঠাউরেছিলেন এ গোলমাল দু'দিন বাদেই থেমে যাবে। মাথার উপর ইংরেজ থাকতে ভাবনা কী? অন্যান্য বারের মতো আমাদের সমঝিয়ে দেবে যে ওরা ভিন্ন আর গতি নেই। সাপুড়ে যেমন সাপকে ডালা থেকে বার করে নাচায়, তারপর আবার ডালায় ভরে তেমনি দাঙ্গাবাজদের খেলতে দিয়ে খোঁয়াড়ে পুরবে। ইংরেজের উপর যদিও তাঁর ভীষণ রাগ—ইতিমধ্যে তিনি নেতাজীর ভক্ত হয়েছেন—তবু তাঁর অন্তিম ভরসা ওই ইংরেজই। আমাকে বলেন, 'ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। তুমি দেখবে, দেবপ্রিয়, একদিন এক চড়ে ঠাণ্ডা করে দেবে। ওরা কি সত্যি যাচ্ছে?'

কে যে ওস্তাদ সেবিষয়ে মতভেদ ছিল। মাসিমার মতে ইংরেজ। আমার সর্বত্যাগী বন্ধু উৎপলের মতে গান্ধীজী। সে বলে 'দেখিস তোরা, দেখিস। আর সবাই যখন ব্যর্থ

হয়ে হাল ছেড়ে দেবেন, মহাত্মাজী তখন হাল হাতে নেবেন। মিরাক্‌লের দিন যায়নি রে। মিরাক্‌লের দিন আসছে। আজ যাদের দেখা যাচ্ছে খুনোখুনি করতে সেদিন তাদের দেখা যাবে কোলাকুলি করতে।'

অবশ্য বেঁচে থাকলে। উৎপল শুনলে মর্মাহত হবে, তাই মুখ ফুটে বলিনে। আমার নিজের মতে ওস্তাদ যদি কাউকে বলতে হয় তবে জিন্নাকে। বিরোধটা গোড়ায় ছিল জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের। কিন্তু কায়দে আজম আজ এমন বেকায়দায় ফেলেছেন যে জাতীয়তাবাদীদেরও গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে সাম্প্রদায়িক রা। ঠিক যেমনটি ওস্তাদজী চেয়েছেন। কথায় না হোক কাজে তো প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে হিন্দুরা এক নেশন, মুসলমানরা আর এক নেশন। কিংবা নেশন কোনো পক্ষই নয়, দুই পক্ষই সম্প্রদায়। শুধু ইংরেজের সঙ্গে লড়বার সময় ভাবতীয়। সে লড়াই তো এখন চুকে গেছে। দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন জবাহরলাল। বড়লাটের যুবরাজ।

একদিন মেসোমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন রাজেক হোসেন চৌধুরী। পার্ক সার্কাসে তাঁর প্রতিবেশী। জানতুম না যে একদা তিনি মেসোমশায়ের সহপাঠী ছিলেন। আর ছিলেন স্বদেশীযুগের সহকর্মী। বয়সে কিছু বড়, তাই মেসোমশায় তাঁকে ডাকতেন 'রাজেকদা' বলে। রাজেকদা থেকে রাজেনদা। এই নামটাই পরে চল হয়ে যায়। রাজেক হোসেনরা হুগলী জেলার খানদানী বংশ। আচারে ব্যবহারে হাফ হিন্দু। তাঁদের বাড়ীতে গোমাংস ঢুকত না। তাঁদের আলাদা একটা অতিথিশালা ছিল হিন্দুদের জন্যে। সেখানে বামুন রাঁধত। মেসোমশায়ও সেখানে অতিথি হয়েছেন স্বদেশীযুগে।

বঙ্গভঙ্গের জন্যে রাজেক হোসেনও বিপদ বরণ করেছিলেন। আন্দোলনটা ক্রমেই হিন্দু হয়ে উঠছে দেখে পশ্চাতে সরে যান। বলেন, স্বদেশী মানে কি স্বধর্মী? তাই যদি হয় তবে মুসলমানেরও তো স্বধর্ম আছে। সে কেমন করে অংশ নেবে? তাকে তা হলে স্বতন্ত্র ভাবে লড়তে হয়। ইংরেজের সঙ্গে। কী করে তা সে পারবে যদি বেশীর ভাগ স্বধর্মী উদাসীন হয় কিংবা ইংরেজের পক্ষে দাঁড়ায়? রাজেক হোসেন মনের দুঃখে নির্বাসনে যান। স্বয়ংবৃত নির্বাসন। অনেক দিন পরে আবার তাঁকে নামতে দেখা গেল অসহযোগ তথা খেলাফৎ আন্দোলনে। স্বদেশের সঙ্গে স্বধর্মকে একসূত্রে গেঁথে তিনি তাঁর দেশপ্রেম তথা ধর্মনিষ্ঠা একসঙ্গে চরিতার্থ করেন। জেলে যান। জেল থেকে ফিরে একটু একটু করে আবার সরে যান পিছনে।

লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি যোগ দেননি। জিজ্ঞাসা করলে বলেছেন, একসঙ্গে লড়তে হলে একসূত্রে গাঁথতে হয়। তেমন সূত্র কই? লড়তে যে আমার অনিচ্ছা তা নয়। কিন্তু একসঙ্গে লড়া অসম্ভব। যদি কোনো দিন লড়ি তো আলাদা লড়ব। ইংরেজ আমারও শত্রু। আর লড়তে আমিও জানি।

এর বছর সাতেক পরে দেখা গেল তাঁদের দেউড়ির দু'দিকে দণ্ডায়মান দুই সিংহের মূর্তি অপসারিত হয়েছে। ব্রিটিশ সিংহের অপসারণ নয় তো? না। রাজেক হোসেন বলেন, ওটা পৌত্তলিকতা। মুসলমান অতিথিরা আপত্তি করেন। তাঁর চৌধুরী পদবীটিও তিনি বিসর্জন দেন। চৌধুরী সাহেব বলে সম্বোধন করলে তিনি সসঙ্কোচে বলেন, না, না, এই কৃষক আন্দোলনের দিনে ওদের চক্ষুঃশূল হতে চাইনে। তাঁর সমন্বয়শীল মন এমন একটি সূত্র খুঁজে বার করল যা মোল্লা এবং চাষী মুসলমান উভয়ের গ্রহণযোগ্য: মুসলমানকে তিনি বিভক্ত হতে দেবেন না। জমিদারি রক্ষা করবেন। কিন্তু অলক্ষে তিনি হিন্দুদের থেকে দূরে সরে গেলেন। ইংরেজের উপর তাঁর রাগ যা ছিল তা জল হয়ে গেল বাংলার মসনদে মুসলমানকে বসতে দেখে। কিন্তু তখনো তিনি বাঙালী। হাড়ে হাড়ে বাঙালী। জিন্নাকে বলেন 'জিন্' আর পাকিস্তানের নাম দেন 'গোরস্থান'। না, হিন্দুর সঙ্গে তিনি লড়বেন না। ভারতবর্ষ ভেঙে খান খান করবেন না।

রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তিনি পার্ক সার্কাসে এসে বাস করতে লাগলেন। তার মনটা কিন্তু পড়ে থাকে দেশের বাড়ীতে। সেইখানেই ছিলেন তিনি যখন মেসোমশায়রা বিপন্ন হন। নইলে বিপদের দিন ছুটে আসতেন। পাড়ার লোকের তরফ থেকে মাফ চেয়ে বললেন, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। আর সে রকম হবে না। অমল, আমি তোকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। আমার সঙ্গে ফিরে চল। তুই ফিরে না গেলে অন্যেরা ফিরবে না। তুই ফিরে গেলে অন্যেরা তোর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তাতেও যদি ফল না হয় আমরা দুই বন্ধু শান্তি মিশন নিয়ে বেরোব। আমাদের সঙ্গে আর কেউ না আসুক, তুই আর আমি। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে তুই একলা চল রে।' মনে আছে তো রবি ঠাকুরের স্বদেশী গান? সে উদ্দীপনা কি ভোলবার? তা হলে চল সেই উদ্দীপনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। রবিবাবু বেঁচে থাকলেও তাই করতেন। তিনি চলে গিয়ে আমাদের অনাথ করে দিয়ে গেছেন। তিনি থাকলে কি এ রকম ঘটত? চল আমরা এককণ্ঠে গেয়ে বেড়াই, 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল— পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।' তবে মাঝে মাঝে ভগবান কথাটিকে বদলে দিয়ে বলতে হবে, হে রহমান।'

কথাগুলি ভালো। মানুষটি ভালো। মেসোমশায়ও যাবার জন্যে ছটফট করছিলেন। কিন্তু মাসিমার আত্মীয়রা তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে আবার বাধবে। যঃ পলায়তি স জীবতি। দেশ ভাগ হোক বা না হোক শহর ভাগ হয়ে যাচ্ছে। লোকে পা দিয়ে ভোট দিয়ে জানাচ্ছে কোন্‌টা কী স্থান। পা কী স্থান চায় এই প্রশ্নে যে গণভোট নেওয়া হচ্ছে আজ তার থেকে বোঝা যাচ্ছে পার্ক সার্কাস হবে পাকিস্তান।

'তা হলে বাড়ীটা?' মাসিমা আর্তনাদ করেন।

'বাড়ীটা থাকবে। তবে তার দখলকার কে হবে সেটা খোদায় মালুম।' বলেন তাঁর বড় দাদা গুপীবাবু।

'না। এ কখনো আইন হতে পারে না। হাইকোর্ট মাথার উপর থাকতে, গভর্নর মাথার উপর থাকতে আমার বাড়ী থেকে আমি বেদখল হতে পারিনে।' মাসিমা বলেন।

'ও পাড়ায় মুসলমানদেরও তো বেদখল করা হচ্ছে। করছি আমরাই।' গুপীবাবু খোশ মেজাজে বলেন। 'ওটা খোদার এলাকা নয়। মা কালীর এলাকা।'

রাজ্জেক হোসেনের প্রস্তাবে মেসোমশায়ের উৎসাহ লক্ষ করে মাসিমা গম্ভীর হয়ে যান। ভেবে চিন্তে বলেন, 'কথা হচ্ছে কে আমাদের রক্ষা করবে। পুলিশ যে করবে না তা আমি জানি।'

রাজ্জেক হোসেন তা শুনে বলেন, 'আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।' মাসিমা বলেন, 'কিন্তু দেশটা আমার, এর মুক্তির জন্যে আমিও যৎকিঞ্চিৎ করেছি, এর কোনোখানেই আমি বিদেশী নই, অনধিকারী নই। কেন তবে আমি আপনার গ্যারান্টি নেব? বাড়ী বড় না মর্যাদা বড়?'

ভদ্রলোক অত্যন্ত অপ্রতিভ হন। মেসোমশায় বলেন, 'রাজ্জেনদা, কিছু মনে কোরো না। আমরা হলুম ঘরপোড়া গোরু। একবার পুড়েছি কি না, তাই ভয় পাই। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার সঙ্গে শান্তির জন্যে বেরোব। কিন্তু এখন নয়।'

ভদ্রলোক বিদায় নিলে মাসিমা বলেন, 'ইচ্ছা তো করে নিজের বাড়ীতে গিয়ে আনন্দে থাকতে। কিন্তু যার ঘরে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আর বাইরে গুণ্ডার দল তার প্রাণে আনন্দ কোথায়? শোন, দেবপ্রিয়, তোমাদের ওদিকে একটা ফ্ল্যাট খালি থাকে তো নিই। নীলির এখানে আর ভালো দেখায় না।'

তা ছাড়া নীলিদের পাড়াটাও যে খুব নিরাপদ তা নয়। কাছেই মুসলমানের বসতি। আমি বলি, 'আমি খোঁজ করে জানাব।'

খাঁটি লোক দুই পক্ষেই আছেন। শহরের অবস্থা তবু খারাপের দিকেই। তাই বেড়ালছানার মতো এই পরিবারের গৃহিণী তাঁর একমাত্র কন্যাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরাতে সরাতে চলেছেন। একবারও জানতে চাইছেন না মালার কী মত। আমার কিন্তু জানতে ইচ্ছা করে।

সেই যে এলাহাবাদে ওর চোখে রহস্যময় দ্যুতি দেখেছিলুম, প্রেমে পড়ার লক্ষণ, তার পর থেকে আর আমি ওর সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারিনি। আমারি দুর্বলতা। ও যে কী করে, কী ভাবে তা আমার কাছে এক অজানা রাজ্য। তবে ইদানীং সেই দ্যুতি নিস্তেজ হয়ে এসেছিল। তাকে কেমন যেন ভাবাকুল দেখায়।

'মালা,' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'আমাদের পাড়ায় যদি ফ্ল্যাট খুঁজে পাই আর

সে ফ্ল্যাট মাসিমার পছন্দ হয় তা হলে কি তুমি খুশি হবে, না পার্ক সার্কাসের জন্যে ভেবে ভেবে মন খারাপ করবে ?'

সে আমার দিকে এমন ভাবে তাকায় যেন কী একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছি। তার পর বলে, 'কোথায় থাকব, কী খাব, কী পরব এসব তো আমার ভাবনা নয়। আমার একমাত্র ভাবনা মুক্তা ঝরার জল আর সোনার শুকপাখী কে আনবে। কবে আনবে! দেশ যে গেল! সেবারে যদি কেউ আনতে যেত আর আনতে পারত তা হলে কি হিরোশিমায় পরমাণু বোমা পড়ত? এবারেও সেই রকম কিছু না হয়।'

পাগল আর কাকে বলে। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাগলামির লক্ষণ অনুসন্ধান করি। সত্যি, মেয়েদের সময়ে বিয়ে দেওয়া উচিত। না দিলে নানান উপসর্গ দেখা দেয়।

'এই সেই রূপকথার রাজ্য।' মালা বলে আমাকে হতচকিত করে। 'এরই কথা শুনেছি, এরই স্বপ্ন দেখেছি। আমার জন্মান্তরের স্মৃতিতেও এরই ছবি আঁকা। রক্তের নদী হাড়ের পাহাড। সব মিলে যাচ্ছে। তা হলে মায়াপাহাড়ই বা না মিলবে কেন? মিলবে, মিলবে। খুঁজতে বেরোলে মায়াপাহাড়ও মিলবে। মিলবে মুক্তা ঝরার জল। সোনার শুকপাখী। আহা, বেচারিরা! পথের ধারে পড়ে পাথর হয়ে গেছে। তাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে বাঁচাতে হবে। তারা যখন ঘরে ফিরে যাবে তাদের মা বোনেরা শুধোবে, কী এনেছ দেখি? তখন তারা বলবে, এই যে এনেছি সোনার শুক। তখন আর কী। তখন সবাই মিলে মনের সুখে বাস করবে।'

মালা বলে যায় কিসের ঘোরে। সে যেন জেগে থেকেও ঘুমিয়ে। সে যেন জাগরণের প্রতি নিদ্রিত, বাস্তবের প্রতি অচেতন। মায়াবাদীরা যেমন বলেন এই জগৎটা একটা মায়া, একটা স্বপ্ন। এদিকে আমি ভাবছি তার নিরাপত্তার জন্যে বাসার সন্ধানে বেরোব। আর ওদিকে সে কিনা ভাবছে বিপদ মাথায় করে মায়াপাহাড়ের সন্ধানে পা বাড়াবে। এই তার সময় বটে!

মালার ওই সাঙ্কেতিক ভাষা একমাত্র আমিই বুঝি। তার মাও বোঝেন না। কিংবা বোঝেন হয়তো। নইলে সেই দুর্দিনেও তাকে পাত্রস্থ করার জন্যে অস্থির হতেন না। একদিন আমাকে বলেন, 'মানুষের জীবন এমনিতেই অনিশ্চিত। এখন তো আরো। আমাদের যদি হঠাৎ কিছু হয় তা হলে অন্তত এইটুকুন আশ্বাস থাকবে যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেছি। আমি আর অপেক্ষা করতে চাইনে, দেবব্রত।'

'তা হলে পাত্র পাওয়া গেছে, মাসিমা। খুব—খুব সুখবর।' আমি বলি সকপটে।

'পাকাপাকি হয়নি। কথাটা গোপন রাখতেই হবে। তবে তুমি হলে আমাদের আপনার লোক। তোমার কাছে ভাঙতে পারি।' তিনি অকপটে বলেন।

কুমুদিনী বলে মাসিমার এক সই আছেন। সেই বাল্যকালে ভগিনী নিবেদিতার

বিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েছেন। তাঁর আছে এক গুণবান ছেলে। সোমনাথ বিলেতে সাত বছর কাটিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছে। কিন্তু থাকবার জন্যে নয়। ব্রিস্টলের কাছে সে প্যানেল কিনে ডাক্তারি করছে। এরই মধ্যে বাড়ী করেছে। এখন তার অভাব বলতে আর কিছু না। একটি বৌ। ছেলেটি মাতৃগতপ্রাণ। মা যাকে পছন্দ করবেন তাকেই সে বিয়ে করবে। বিয়ে করে বিলেত নিয়ে যাবে।

মালার সই-মা মালাকেই পছন্দ করেছেন। সোমনাথেরও মালাকে মনে ধরেছে। মাসিমা কিন্তু মনঃস্থির করতে পারছেন না। তাঁর একমাত্র সন্তান যাবে সাত সমুদ্র পারে। তাও এক আধ বছরের জন্যে নয়। কে জানে কত কাল সোমনাথ ও দেশে প্র্যাকটিস করবে? মেয়েকে অমন করে দেশান্তরী করতে মায়ের মন সায় দিচ্ছে না। মেসো-মশায়কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'মালা যদি সুখী হয় আমরা কি অসুখী হতে পারি?'

মালাকে বলতে সে 'হাঁ'-ও বলে না। 'না'-ও বলে না। একেবারে নির্বাক, তার মানে সে ভাবতে চায়। ভাবতে সময় লাগবারই কথা। বাপ মাকে ছেড়ে দেশ ছেড়ে সাত হাজার মাইল দূরে গিয়ে ঘর বাঁধা। অতকাল থাকা। রাজী হওয়া কি সোজা কথা? অপর পক্ষে অমন একটি সুপাত্র না চাইতেই হাতের মুঠোয় এসে হাজির। হাতছাড়া করতে কোন্ মেয়ে রাজী হবে? ভাবুক। মালা ভাবুক। মাসিমাও ভেবে দেখুন। তবে সোমনাথ এই নভেম্বরেই রওনা হচ্ছে। ওদিকে তার পেসেন্টরা ইম্‌পেসেন্ট। ডাক্তারের কি ছুটির জো আছে? অঘ্রাণের প্রথম লগ্নেই সে যাকে হয় একজনকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। মালার জন্যে বসে থাকবে না।

বাস্তবিক এমন একটি দাঁও পেলে আমিও ছাড়তুম বলে মনে হয় না। নিখরচায় বিলেত বাস। আহ্, সোমনাথটা যদি সোমলতা হতো, লেডী ডাক্তার হতো, তা হলে আমি আজকেই প্রার্থনা জানিয়ে রাখতুম। যদিও তাকে চোখেও দেখিনি। জাহাজের নামগুলো আমার মুখস্থ। সমুদ্রযাত্রার কল্পনায় আমি চঞ্চল হয়ে উঠি। 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।'

কিন্তু মালার ভাবনা মাসিমা যা মনে করেছেন তা নয়। আমি তাঁর কন্যাকে তাঁর চেয়েও ভালো চিনি। রূপকথার রাজপুত্র কবে আসবে তারই জন্যে সে অপেক্ষা করবে। আর কারো গলায় মালা দেবে না। না, বিয়ের জন্যে সে ভাবিত নয়। তার ভাবনা মুক্তা ঝরার জলের জন্যে। সোনার শুকপাখীর জন্যে। অরুণ বরুণ তো নেই। কে যাবে ওসব আনতে? অগত্যা কিরণমালাকেই যেতে হয়।

তা বলে এই তার সময়! আমি আঁতকে উঠি। রোজ বাড়ী থেকে যখন বেরোই অক্ষত শরীরে ফিরব যে তেমন নিশ্চয়তা নিয়ে বেরোতে পারিনে। ফিরি যখন হাঁফ

ছেড়ে বাঁচি। অন্তত একটা দিন তো বেঁচে থাকা গেল। এই যেখানকার অবস্থা সেখানে নারীর স্থান কি অন্তঃপুরে নয়? বাইরে পা বাড়ালে কি রক্ষা আছে! কে কখন লুট করে নিয়ে লুকিয়ে রাখবে। পুলিশ তো খুঁজতে যাবে না। উদ্ধার করবে কে? কত রকম গল্প যে শুনি। কোন্ একটা গলিতে নাকি অনেকগুলি হিন্দুর মেয়েকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। গুণ্ডারা রাতভর তাদের উপর অত্যাচার করে। উঃ! রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

না। মালাকে মায়াপাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করতে দেওয়া যায় না। ভূগোলে তেমন কোনো পাহাড়ের উল্লেখ নেই। মানচিত্রে তার চিহ্ন নেই। কী একটা আজগুবি কল্পনা! তার জন্যে একটি নিষ্পাপ মেয়ে আগুনে ঝাঁপ দেবে! আমি থাকতে! যদি আমার কিছুমাত্র হাত থাকে। সেইজন্যেই আমি আমার পাড়ায় মাসিমার কথামতো বাসা খুঁজি। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও যাই।

'আপনাদের অসুবিধে হবে, মাসিমা। সব ভালো, কিন্তু বাথরুমটা বিশুদ্ধ জাতীয়তা-বাদী।' আমি জুড়ে দিই, 'তা হলেও আমি সুপারিশ করি। নির্ভয়ে বাস করবেন। আর ক্রমশ স্বরাজের জন্যে প্রস্তুত হবেন। ইংরেজ চলে গেলে দেখবেন রেলগাড়ীর বাথরুমও ন্যাশনালাইজ করা হবে। গভর্নমেণ্ট হাউসের বাথরুমও।'

মাসিমার মুখ শুকিয়ে যায়। কিন্তু গরজ বড় বালাই। তিনি বলেন, 'আচ্ছা, রাজমিস্ত্রি ডাকিয়ে যথাবিহিত করিয়ে নেব।'

বাসা পাওয়া গেছে শুনে মেসোমশায় বলেন মাসিমাকে, 'রেঙ্গুন থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে প্রয়াগ। প্রয়াগ থেকে পার্ক সার্কাস। পার্ক সার্কাস থেকে ভবানীপুর। আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী।' তাঁর কণ্ঠস্বরে কাতরতা।

মাসিমা আমার সামনে লজ্জা পান। শরমে সিন্দুর হয়ে বলেন, 'তা বলে রেঙ্গুনের মতো দূরে নয়। তুমি আমাকে নিয়ে গেছলে যেখানে।'

মেসোমশায় কিছুক্ষণ নীরব থেকে আমার দিকে তাকান। বলেন, 'দেবপ্রিয়, তোমার মাসিমাকে বোঝাই কেমন করে যে, রেঙ্গুন আমার পক্ষে দূর নয়। বরং ভবানীপুরই সুদূর। রেঙ্গুনে ছিল আমার জীবনের কাজ, আমার যৌবনের কাজ। ভবানীপুরে আমার কাজ নেই। নিছক টিকে থাকাটা তো একটা কাজ নয়।'

'তা বলে তুমি এই ব্রাইট স্ট্রীটেই পড়ে থাকবে নাকি? বন্ধুবান্ধবের অতিথি হয়ে চিরকাল থাকবে? তা কি হয়!' মাসিমা অনুযোগ করেন।

'না। এখানে পড়ে থাকব কেন? ওই তো রাজেনদা রয়েছে ওখানে। ও যদি থাকতে পারে আমি কেন পারব না? গুণ্ডার কাছে পরাজয় মেনে নেওয়া কি পুরুষত্ব? একটা বন্দুকও তো আছে বাড়ীতে। একেবারে নিরস্ত্র তো নই।' মেসোমশায় খাড়া হয়ে বসলেন।

'হয়েছে, হয়েছে তোমার বীরপনা।' মাসিমা শ্লেষের সঙ্গে বলেন, 'এখনো কি বুঝতে পারনি যে গুণ্ডা যাকে বলছ সে-ই রাজা? রাজেক হোসেন হলেন রাজার জাত। তাঁর ভাবনা কিসের?' তার পর সংশোধন করে বলেন, 'হাঁ, তাঁকেও একটু ভাবতে হয় বইকি, যদি কালীঘাটে থাকতে যান। নরবলি ইংরেজরা বন্ধ করে দিয়েছিল। শুনছি দু'এক জায়গায় ইংরেজ থাকতেই—'

মেসোমশায় যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠেন। মনে হলো আবার অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন। 'গেল! গেল! সর্বস্ব গেল! এর পরে কে আমাদের সভ্যজাতি বলে স্বীকার করবে! ইংরেজ তো বুক ফুলিয়ে বেড়াবেই। সে-ই শ্রেষ্ঠ। সে নরবলি বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের সে গায়ের জোরে হারিয়ে দিক আর না দিক, ন্যায়ের জোরে হারিয়ে দিয়েছিল। আমরা জয়ের যোগ্য নই। স্বাধীনতার যুদ্ধে জয় আমাদের হবে না।'

মালা সেখানে ছিল না। ছুটে এসে জানতে চায় কী ব্যাপার। মাসিমা লজ্জিত হয়েছিলেন। উঠে যান। আমি গোপন করি।

মেসোমশায় পাগলের মতো বলতে থাকেন, 'ইংরেজকে হারাতে হলে তার চেয়েও মহৎ হতে হয়, উদার হতে হয়। সে যেদিন স্বীকার করবে যে আমরাই বড় সেইদিন আমাদের জয়। কিন্তু এর পরে আর সে কথা উঠতেই পাবে না। আমরা হেরে গেছি।'

মালা তার বাপের ভার নেয়। এই মানুষকে ফেলে সে কোন্ মায়াপাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা করবে? ওদিকে মাসিমারও ভবানীপুর যাত্রা স্থগিত রইল।

টোগো আমার মুখে বিবরণ শুনে দুঃখিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'ভালোই হলো। আমার ইচ্ছা নয় যে ওঁরা চলে যান। ওঁরা আছেন বলে আমিও তো কতকটা সাহস পাচ্ছি। আর নীলিমাও তো দিনের বেলা নিঃসঙ্গ বোধ করছে না। আমি বলি, তোমার ওই ভবানীপুরের বাসায় গিয়ে কাজ নেই। ওটা তুমি বাতিল কর।'

বাসাটা বেহাত হলো। আমার মনের কোণে যে লুকোনো সাধ ছিল মালা আমার প্রতিবেশিনী হবে সে সাধ অপূর্ণ রইল। আমারি দুর্ভাগ্য।

মেসোমশায় অবশ্য আবার প্রকৃতিস্থ হলেন। কিন্তু আঘাতের চিহ্ন থেকে গেল তাঁর মুখভাবে। ছোরার আঘাতই কি একমাত্র আঘাত, না গভীরতর আঘাত? দেশের উপর বিশ্বাস টলেছে, দেশের নিয়তির উপরে, এইখানেই তো ট্র্যাজেডী। মানুষ যদি অধঃপাতে যায়, সেইসব কদাচার যদি ফিরে আসে, আবার যদি নরবলি ও সতীদাহ চলে, আবার সেই তান্ত্রিক অভিচার, তবে স্বাধীন হয়েই বা কোন্ কীর্তি স্থাপন করব আমরা?

'আমার ভারতবর্ষকে আমি হারিয়ে ফেলছি,' মেসোমশায় বলেন বিষাদভরে।

'বেদনার জগদ্দল পাথর চেপে আছে বুকের উপর। কেন এমন হলো? হিন্দু মুসলমান কি ভাই ভাই নয়? ভাই যদি না হবে তো তৃতীয় পক্ষকে কেন এতদিন দোষ দিয়ে

এসেছি যে, সে আমাদের বিভক্ত করতে চায়? আমরা যদি এক পাড়ায় থাকতে না পারি তবে এক শহরে থাকব কী করে? যদি এক শহরে থাকতে ভয় পাই তবে এক দেশে থাকব কী করে? তা হলে তো দেশ এক হতে পারে না। দুই কলকাতার মতো দুই বাংলা, দুই ভারত। তাদের ভারতকে তারা যদি পাকিস্তান নাম দেয় আমরা বলবার কে!'

মেসোমশায় জেদ ধরলেন যে পার্ক সার্কাসে তিনি একাই ফিরে যাবেন ভারতবর্ষের উপর বিশ্বাস প্রমাণ করতে। মাসিমা তাঁকে একটা ঘরে বন্ধ করে রটিয়ে দিলেন যে তাঁর মাথা খারাপ। মালা তা সত্য ভেবে মন খারাপ করে।

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ শোনা যায়, 'ইতিহাস, তুমি বড় নিষ্ঠুর! তুমি বড়ই নিষ্ঠুর! তুমি আমাদের ইচ্ছাপূরণের নিমিত্ত নও। আমরাই তোমার ইচ্ছাপূরণের নিমিত্ত। তা হলে আমাদের কর্তৃত্ব কোথায়? স্বাধীন ইচ্ছা কি কথার কথা? আমার যদি হাত না থাকে তো আমি আছি কেন? আমি আছি কেন?'

আমি আছি কেন? আমিও প্রশ্ন করি। আছি ছবি আঁকতে। এ যদি সভ্যতা না হয়ে অসভ্যতা হয়ে থাকে তবু এর ছবি আঁকতে হবে। কিন্তু পারিনে। এ যে বড় নিষ্ঠুর!

॥ আট ॥

প্রকৃতির রাজ্যে আকস্মিক বলে কিছু আছে কি? ঝড় বল, বন্যা বল, ভূমিকম্প বল, দাবানল বল, কিছুই আকস্মিক নয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তার প্রস্তুতি চলে। আমরা কেউ তার খবর রাখিনে, তাই বিপর্যয় ঘটলেই বলি আকস্মিক।

তেমনি ইতিহাসের জগতেও। দশকের পর দশক, শতকের পর শতক, তার প্রস্তুতি চলেছে। কারো দৃষ্টি অত দূর যায়নি। যেই ঘটে গেল নোয়াখালীর হাঙ্গামা অমনি আমরা তার আকস্মিকতায় অভিভূত হলুম। আরো অনেকের মতো আমারও হলো বুদ্ধিভ্রংশ। আমি আমার ইংরেজ বন্ধুদের যাকে দেখি তাকে বলি, 'শিগগির। আজকেই। এই মুহূর্তে সৈন্য পাঠাতে হবে। নইলে জনগণ ক্ষমা করবে না। আইন যে যার নিজের হাতে নেবে।'

সৈন্য পাঠালে মুসলিম লীগ ক্ষমা করত না। শেষ পর্যন্ত গেল কিছু সৈন্য, কিন্তু বিস্তর গড়িমসির পর। ততদিনে বিহারের জনতা ক্ষেপে গিয়ে পাল্টা হাঙ্গামা বাধিয়েছে। সে আরো বীভৎস। আমার অশুভ বাক্য যে অমন করে ফলে যাবে তা কি আমি জানতুম?

মর্মে আঘাত পেলুম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খুশিও হলুম। দেখলে তো? সৈন্য না পাঠানোর কী পরিণাম?

তখন ভেবে দেখিনি, ভাববার সময় ছিল না, সৈন্য পাঠানোর কী পরিণাম। গান্ধীজীর কল্যাণময় প্রয়াস গোড়ার দিকে যেমন কাজ দিচ্ছিল সৈন্য গিয়ে পড়ার পর আর তেমন দিল না। লোকে ধরে নিল যে গান্ধী আছেন বলেই সৈন্য আছে। হিন্দুরা বলতে লাগল, গান্ধীজীর থাকা চাই, তিনি থাকলে সৈন্যও থাকবে। মুসলমানরা বলতে লাগল, গান্ধীজী চলে যান, তিনি চলে গেলে সৈন্যও চলে যাবে। হিংসা আর অহিংসা দুই একসঙ্গে কাজ করলে অহিংসার ক্রিয়া ব্যাহত হয়। গান্ধীজীর গতি রুদ্ধ হলো। ভক্তরাই বলতে আরম্ভ করলেন, অহিংসা ব্যর্থ হয়েছে। অতএব অন্য উপায় দেখা যাক। দেশ ভাগ না করে উপায় নেই।

যাক, এসব পরের কথা। আগে কী হলো বলি। নোয়াখালীর বৃত্তান্ত শুনেই গান্ধীজী সেখানে রওনা হন। তিনি করবেন অথবা মরবেন। ওই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে করবার কী আর আছে! নিশ্চিত মরণের মুখে যাত্রা। কে জানে কোন্ দিন খবর আসে তাঁর হয়ে গেছে। তখন সারা ভারত জুড়ে বইবে রক্তের নদী। জমে উঠবে হাড়ের পাহাড়। মালার রূপকথা সত্য হবে। কী সর্বনাশ।

মালার মনেও সেই আশঙ্কা। শুধু আশঙ্কা নয়, অস্থিরতা। সে বলে সেও যেতে চায় নোয়াখালী। তা শুনে তার মা তাকে নজরবন্দী করেন। তার বাবাকে বলা হয় না। পাছে তিনি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যান।

এমন সময় মনোরমা কওল বলে এলাহাবাদের সেই মেয়েটির আবির্ভাব। ইতিমধ্যে তার বিয়ে হয়ে গেছে। মনোরমা কওল এখন মনোরমা হাকসার। স্বামীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সেও যাচ্ছে নোয়াখালী। সুখে সংসার করার সময় নয় এটা। ভারতের নারীত্বের প্রতি নোয়াখালী একটা চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করেছে। দ্রৌপদীর মতো সেও কেশ বাঁধবে না, যতদিন না নোয়াখালীর অন্যায়ের প্রতিকার হয়।

মালাকে এবার ঠেকায় কে? আবার তার অঙ্গে শালোয়ার কামিজ ওঠে। অনুমতি না নিয়েই সে তৈরি হতে থাকে। মালা যেতে উদ্যত দেখে মাসিমা মনে মনে বিরূপ। অথচ মুখ ফুটে বারণও করতে পারেন না। মনোরমাও তো তাঁরই মেয়ের মতো আর একটি মায়ের মেয়ে। তাঁর আর একটি মেয়ে। কতদূর থেকে সে ছুটে এসেছে, কতদূর সে ছুটে যাচ্ছে ভারত-নারীর সম্মান রক্ষা করতে। সে যদি যায় তবে মালারও যাওয়া উচিত। অথচ বিবাহযোগ্যা কুমারীর পক্ষে নোয়াখালীযাত্রা যেমন ভয়াবহ তেমনি কলঙ্কর। তা ছাড়া সোমনাথ ছেলেটি তো তার জন্যে সবুর করবে না।

তিনি মেসোমশায়ের শরণাপন্ন হন। বলেন, 'মানি দেশের প্রতি কর্তব্য আছে। তা

বলে একমাত্র সন্তানের অমঙ্গল ডেকে আনতে পারিনে। এখন তুমি যদি ওকে একটু বোঝাও।'

উল্টো ফল হয়। মেসোমশায় ধরে বসেন, 'আমিও যাব।'

'সে কী! তুমি যাবে কী করতে।' মাসিমা যেন আকাশ থেকে পড়েন।

'গান্ধী যাচ্ছেন কী করতে? এই সাতাত্তর বছর বয়সে। আমি তো অত বুড়ো হইনি। আমিও যাব।' মেসোমশায় অবুঝ।

'গান্ধী যাচ্ছেন কী করতে?' মাসিমা ভাবনায় পড়েন। 'গান্ধী হলেন দেশের নেতা। দেশকে অহিংস নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। এখন যদি না দিতে পারেন তবে অহিংসাও গেল, নেতৃত্বও গেল। কাজ কী তা হলে তাঁর বেঁচে থেকে? সেই জন্যেই তাঁর পণ—করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে। তাঁর কাছে এটা জীবন মরণ সমস্যা। সমাধান তাকে করতেই হবে। নইলে তাঁর জীবন বৃথা।'

'আমারও।' সংক্ষেপে বলেন মেসোমশায়। তার পর বিশদ করেন। তদ্গত ভাবে। 'এতদিন আমি চিন্তামগ্ন ছিলুম। আমরা কি নিমিত্তমাত্র? ইতিহাসই কর্তা? ইতিহাসের উপর আমাদের হাত থাটে না? গান্ধী উত্তর দিচ্ছেন—তা নয়। আমরাই চালক। মরণ পণ করে আমরাই ইতিহাসের রথ চালাব, চাকা ঘোরাব। মরে গিয়েও ঠেলা দিয়ে যাব। ইতিহাস সৃষ্টি করব। নিমিত্তমাত্র হয়ে বাঁচতে চায় কে?'

মেসোমশায়ের পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল না নোয়াখালী গিয়ে তিনি কী ভাবে চাকা ঘোরাবেন। কিছু একটা যে করা উচিত তা তো আমরা সকলেই বুঝতে পারছিলুম, কিন্তু কী সেটা? কার দায়িত্ব সেটা? কার করণীয় সেটা? এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। এই যেমন আমার মতে সৈন্য পাঠানো। ইংরেজের দায়িত্ব। বড়লাটের করণীয়। গান্ধীজীর মত কিন্তু বিপরীত।

মেসোমশায় কি সহজে নিরস্ত হন? ডাক্তারকে দিয়ে চেক্‌আপ করাতে হলো। হাই ব্লাডপ্রেসার। কিন্তু মালাকে তিনি নিবৃত্ত করেন না। বলেন, 'মনোরমা যখন যাচ্ছে তখন মালাও ইচ্ছা করলে যেতে পারে। যদি করবার কিছু না থাকে ফিরে আসতে পারে। এই সঙ্কটে আমাদের প্রত্যেকের বিবেকের স্বাধীনতা আছে। মালারও। তার বিবেক যদি তাকে স্থির থাকতে না দেয় তবে তাকে বিপদের মুখে যেতে দেওয়াই নিরাপদ।'

মাসিমা কি মেনে নিতে পারেন? আমার উপর ভার দেন মনোরমাকে বোঝাতে। কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি মনোরমা বুঝলে মালাও বুঝবে।

মনোরমা হলো সাক্ষাৎ আগুন। শুনেছি সেই অগাস্ট আন্দোলনের সময় আগুন নিয়ে খেলেছে। কিন্তু আগুনে হাত পোড়ায়নি। সমানে পড়াশুনাও চালিয়েছে।

ওস্তাদ মেয়ে।

'মিসেস হাকসার,' একটু ভয়ে ভয়ে বলি, 'আপনি যেমন স্থন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী। নিশ্চয় এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে নোয়াখালীতে যা ঘটেছে তা দ্বিতীয় এক অগাস্ট আন্দোলনের জের। এর পিছনেও মাথা আছে। যা ঘটেছে তা আগে মানুষের মাথায় এসেছে। এটা হলো এক জাতের খেলা। তাস খেলা। এ খেলায় ও-পক্ষের হাতে একখানা তাস বেশী আছে। নোয়াখালীতে সেটা ওরা খেলেছে। আমাদের হাতে সে তাস নেই। থাকলেও আমরা ঘৃণা করতুম খেলতে। এই হলো সমস্যা। এর সমাধান যদি আপনার জানা থাকে তবে নোয়াখালী অবশ্যই যাবেন। নয়তো গিয়ে শয়তানদের কবলে পড়বেন। তখন'—আমি আরো ভয়ে ভয়ে বলি, 'অক্ষত থাকতে পারবেন কি?'

'কী!' মনোরমা আগুনের মতো লাল হয়ে যায়। মারতে আসে না এই ভাগ্যি! 'আপনার মনটা অতি মূঢ়, নীচ আর কদর্য। কোন্ মুখে আপনি ও কথা উচ্চারণ করতে পারলেন! ছি ছি! বেশ তো, এতই যখন আপনার সন্দেহ, তখন চলুন না আপনিও আমাদের সঙ্গে। আমাদের পাহারা দিতে। রক্ষা করতে। কেমন? সাহস আছে?'

আমি চমকে উঠি। বলে কী! আমি যাব ওই মগের মুলুকে! খালি হাতে! অন্তরে প্রেম থাকলে গান্ধীজীর মতো অকুতোভয়ে আততায়ীর সম্মুখে দাঁড়াতুম। প্রেমই আমার অস্ত্র। তা তো নয়। অক্ষম ক্রোধে আমি দগ্ধ হচ্ছি। আর 'সৈন্য' 'সৈন্য' বলে চেঁচাচ্ছি।

সে যা একখানা সীন সৃষ্টি করে। আমারি উপর যত ঘৃণা আর অবজ্ঞা আর রাগ আর জ্বালা। যেন আমিই নোয়াখালীর নারীখাদক বাঘ। আমাকেই আসামীর মতো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। বলতে হয়, 'বহিন, মাফ কীজিয়ে।'

সে কি থামতে চায়! বলে যায়, 'আমরা মেয়েরা কী করতে নোয়াখালী যাচ্ছি? আমরা কি জানিনে কত বড় ঝুঁকি নিচ্ছি? রাষ্ট্র যেখানে নারীর শত্রু। স্বামীর কাছে আমার কোলের ছেলেকে রেখে এসেছি আমি, কারো কথায় কান দিইনি। সে কি সামান্য কারণে? না, ভাইজী। একটি নারীর অপমানে সব নারীর অপমান। আমারও অপমান। আর এ তো একটিমাত্র নারী নয়, শত শত নারী। এদের আকুল ডাক যদি আমি না শুনি আমার আকুল ডাক কে শুনবে, যদি আমার কপালেও সে রকম কিছু ঘটে? না, না। বলা যায় না। ইংরেজের রাজত্ব শেষ হয়ে আসছে, তাই যেখানে যত উচ্চাভিলাষী আছে মাথা তুলছে। নারীও তাদের কাছে রাজ্যজয়ের প্রতীক।'

আমিও সেই কথা বলি। এ সাধারণ নারীহরণ নয়। এ হলো যুদ্ধজয়।

'তা হলে,' মনোরমা যোগ করে, 'আমাদের কাজ হবে অকুতোভয়ে এগিয়ে যাওয়া। প্রত্যেকটি অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করতে হবে। উদ্ধার করে ঘরে ফিরিয়ে দিতে হবে।

ঘরের লোক হয়তো বলবে, যার সতীত্ব গেছে তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে কী হবে? অশুচি পাত্র কি রান্নার কাজে লাগে? ওদের বোঝাতে হবে, ধর্ষিতাদেরও বোঝাতে হবে যে, দেহ কোনো অবস্থাতেই অশুচি হতে পারে না, যেমন আগুন কোনো অবস্থাতেই অশুচি হয় না। আত্মার বেলা যা সত্য দেহের বেলাও তাই। হিন্দু সমাজের দোষ হচ্ছে সতী অসতী দুই তার চোখে অশুদ্ধ, যদি সতীর গায়ে রাক্ষসের ছোঁয়া লাগে। গান্ধীজী আবার প্রতিরোধ করতে গিয়ে মরণের বিধান দিচ্ছেন। মরে গেলে অবশ্য সমাজের সুবিধা হয়। আমি কিন্তু সমাজকে অসুবিধায় ফেলতে চাই। তাকে তার ভ্রান্ত সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। নইলে বারো মাস ভয়ে ভয়ে বাস করতে হবে। কে কখন গায়ে হাত দেয়!'

আমি বুঝতে পারি যে এটাও একটা জীবন মরণ সমস্যা। মেয়েদের কাছে। তাই মনোরমার কথা মেনে নিই। মালাকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা, তবু মাসিমার তুষ্টির জন্যে সরাসরি তার কাছে যাই। বলি, 'মনোরমা যাচ্ছে, যাক। তুমি নাই বা গেলে, মালা। তোমার বাবার হাই ব্লাডপ্রেসার। তোমার জন্যে ভেবে ভেবে তোমার মাও অসুখ না বাধিয়ে বসেন। এমনিতেই তো বাড়ীর কথা ভেবে ভেবে অসুখী।'

মালা চিবুকে হাত রেখে চিন্তাকুলভাবে বলে, 'তাঁদের জন্যেই তো এতদিন কোথাও বেরোইনি। জীবনে আমার নিজেরও তো একটা কাজ থাকতে পারে, যার জন্যে আমার জন্ম। অরুণ বরুণ তো যাবে না, আমিও যদি না যাই মুক্তা ঝরার জল আনবে কে! দিন দিন আরো জরুরি হয়ে উঠছে। মনোরমা না গেলেও আমি যেতুম! তবে যাওয়া নোয়াখালী পর্যন্ত। আমার যাওয়া নোয়াখালী ছাড়িয়ে। কে জানে কোন্ অচিন ঠিকানায়। নোয়াখালী আমার পথে পড়ে!'

আমার অন্তরে মোচড় লাগে। আবেগে কণ্ঠরোধ হয়। নইলে আমিও হয়তো উচ্ছ্বাসের ঠেলায় বলে বসতুম, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, মালা। যতদূর তুমি যাবে।'

না। আমার কাজ নয় মায়াপাহাড়ের অভিমুখে যাওয়া। মায়াপাহাড়ের অস্তিত্বই আমি মানিনে। আমি অতিবাস্তববাদী। অবাস্তববাদী নই। আর যা নিয়ে আমি আছি তা কম জরুরি নয়। তুলি দিয়ে আমি সৌন্দর্য জয় করে আনছি সব মানুষের জন্যে। কোন্ রাজ্য থেকে জয় করে আনছি সে আমিই শুধু জানি। সেখানে আর কারো প্রবেশ নেই। আমিও একজন রাজপুত্র। আমার তুলি আমার অসি। কেউ যদি মনে করে এটা অকাজ তবে আমি বলব, আজকের সব কাজ যখন বাসি হয়ে যাবে তখন আমার ছবিগুলি তাজা থাকবে। অন্তত এই বিশ্বাস নিয়ে আমি বেঁচে আছি।

মালা বলে করুণ স্বরে, 'বাবাকে মা দেখবেন, মাকে বাবা। আমি যদি বিয়ে করে বিলেত যেতুম তা হলেও তো তাঁদের ছাড়তে হতো, তাঁরা আমাকে ছেড়ে থাকতেন।

ভেবে ভেবে মন খারাপ করা বা শরীর খারাপ করা যে ভালো নয় এ কথা তাঁদের বোঝানোর জন্যে আপনারা রইলেন। আমি যেখানেই যাই না কেন চিঠি লিখব। বিপদে যদি পড়ি খবরটা কেউ দেবে। কেনই বা পড়ব? সবাইকে যে বাঁচাতে যাচ্ছে কেউ কি তাকে মারতে পারে? না, কেউ আমার পর নয়।'

আমি হাল ছেড়ে দিই। মাসিমাকে বলি, 'ওরা যাবেই।'

তার পরে আর কী? একদিন মনোরমা আর মালা শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠে বসে। আমরা যারা তাদের তুলে দিতে গেছলুম রুমাল নাড়ি আর কয়লার গুঁড়োর জ্বালায় চোখ মুছি। মাসিমা যাননি। মেসোমশায় যাননি। তাঁরা কাতর।

মেসোমশায়কে যাই সহানুভূতি জানাতে। তিনি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, 'জানো হয়তো, প্রাচীনকাল থেকে একটা ঋষিবাক্যের প্রচলন আছে। মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন। মিথিলায় যখন আগুন লাগে আর জনক রাজার প্রাসাদে আগুন ধরে তখন আত্মস্থ হয়ে তিনি উচ্চারণ করেন, আমার কিছু পুড়ছে না। অর্থাৎ আমার সত্যিকার সম্পদ তো বাইরে নয় যে পুড়বে। হায়। ও কথা আমি বলতে পারছি কই! আমার ঘরে আগুন ধরেছে। আমার যা পুড়ছে তা অকিঞ্চিৎকর নয়।'

আমার বুঝতে বাকী ছিল না যে মেসোমশায়ের নোয়াখালী যেতে চাওয়ার মূলে ছিল মালাকে সাহায্য করার জন্যে তার কাছে থাকার অভিপ্রায়। বাধা তাকে দেওয়া যেত না, দিলে অন্যায় হতো। সেও যেত, তিনিও যেতেন। তা তো হবার নয়। তিনি কেবল মেয়ের কথাই ভাবছেন আর মন খারাপ করছেন। নোয়াখালী ভীষণ ঠাঁই। কী যে আবার ঘটে কে জানে! তিনি থাকলে তবু যা হয় একটা কিনারা করতেন।

আমি বলি, 'মেসোমশায়, মিথিলায় কবে কী ঘটেছিল জানিনে, কিন্তু বাংলাদেশে আজ আমাদের চোখের সুমুখে যা ঘটে যাচ্ছে তা হাজার বছরে একবার ঘটে। হিন্দুদের মেজাজ দেখে মনে হচ্ছে তারা ইতিহাসের পাতা থেকে সাতশ' বছরের যবন সংস্পর্শ একদিনেই মুছে ফেলবে। আর মুসলমানদের যা মেজাজ তারাও আধখানা হিন্দুস্থান কেটে নিয়ে সেখান থেকে হিন্দুকে নিশ্চিহ্ন করবে। এই দাবানলের মাঝখানেই বসে আছি আমরা। কলকাতা কিছু কম ভীষণ নয়। এখানে থাকলেও মালা একদিন অস্থির হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ত। আপনি কি তার সঙ্গে পথে পথে ঘুরতেন? আপনার পক্ষে সেটা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। আপনি আপনার কাজে মন দিতে চেষ্টা করুন। যেমন আমি করছি।'

মেসোমশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। 'আমার কাজ! সে আমি ত্রিবেণীর জলে বিসর্জন দিয়ে এসেছি, দেবপ্রিয়। সংসারে সকলের কাজ আছে। আমারি কাজ নেই। কোনো মতে সময় কাটানোই আমার কাজ। সময় মানে তো আয়ু। আমাকে আয়ু ক্ষয় করতে

হবে যতদিন আছি। জানো তো, প্রকৃতি কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অব্যবহার পছন্দ করে না। ল্যাজ কাজে লাগাইনি বলে আমাদের ল্যাজ খসে গেছে। তেমনি আয়ুর সদ্‌ব্যবহার না করলে আয়ুও কমে যাবে।'

আমি হেসে বলি, 'ল্যাজ খসে গেছে বলে আমার আফসোস নেই, মেসোমশায়। তবে প্রাণটা খসে গেলে সত্যি প্রাণে লাগবে।'

মেসোমশায়ের জীবনের মূল্য এখন ঘরগৃহস্থালির প্রয়োজনে এসে ঠেকেছে। এই নিয়ে তিনি অন্তরে অন্তরে অসুখী। তার উপর মালার মায়াপাহাড় অভিমুখে যাত্রা। মালা না গেলেই ভালো করত।

মাসিমার আশা ছিল মালা নিজের ভুল বুঝতে পেরে দিন কয়েকের মধ্যেই ফিরে আসবে। তখন তার বিয়ে দিয়ে তাকে তিনি বিলেত পাঠিয়ে দেবেন। সোমনাথও রাজী ছিল আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতে। কিন্তু তার মা কুমুদিনী দেবী মালার উপর বিরক্ত। অন্য জায়গায় মেয়ে দেখা সমানে চলছিল।

মালা যেখানে গেছে সেখান থেকে শুধু হাতে ফিরে আসার জন্যে যায়নি। গেছে মুক্তা ঝরার জল সোনার শুকপাখী আনতে। মাসিমা এ কথা জানতেন না। তাই দিন কয়েক যেতে না যেতেই অধীর হলেন। বলতে লাগলেন, 'ওর ফিরতে অত দেরি হচ্ছে কেন? আমি তো ভেবেছিলুম যাবে আর আসবে। দেখবার কী আছে ওই বাঙাল-দেশের অজ পাড়াগাঁয়? নোয়াখালী যে কোথায় তাই আমি জানিনে।'

আমিও কি জানি! ঢাকার কাছাকাছি কোথাও হবে। বোধহয় আসামের দিকে। পাহাড় আছে নিশ্চয়। নইলে মালা কেন যায় মায়াপাহাড়ের খোঁজে? একটু রহস্যময় করে বলি, 'দেখবার কিছু আছে বইকি। সাধে কি অত লোক ওখানে ছুটেছে! ভারতের সব অঞ্চল থেকে যাত্রীর ভিড়। যেন রূপকথার রাজপুত্রের মিছিল। রাজপুত্রের ছদ্মবেশে রাজকন্যাও।'

বলতে ভুলে গেছি মনোরমা ও মালা দু'জনেরই পরণে ছিল সালোয়ার কামিজ।

সোমনাথ বলে সেই যে সোনার চাঁদ ছেলেটি সে সত্যি অনেক দিন অপেক্ষা করেছিল। শেষে হতাশ হয়ে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে দেশান্তরী হলো। মাসিমা আক্ষেপ করে বললেন, 'এ দুঃখ ভোলবার নয়।'

কেমন করে তাকে বলি যে তাঁর কাছে যেটা দুঃখ আমার কাছে সেইটেই সুখ! মালা যদি বিয়ে করত, যদি বিলেত চলে যেত, যদি ও দেশে বসবাস করত আমি তাকে সব রকমে হারাতুম। সোমনাথ এমন কিছু হারায়নি। সে বৌ চেয়েছিল, বৌ পেয়েছে। মালার বদলে দীপা কিছু মন্দ মনোরম নয়। বিয়েতে আমিও যোগ দিয়েছিলুম। দীপাকে আমার ভালোই লেগেছিল। সোমনাথকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে-

ছিলুম। তার মাকেও বলেছিলুম, 'আপনি কেবল রত্নগর্ভা নন, রত্নশ্বশ্রূ। সোমনাথের সঙ্গে খাসা মানিয়েছে। রতনে রতন চেনে।'

মালা পৌঁছনোর খবর দিয়ে তার করেছিল। চিঠিও লিখেছিল। মাসিমা আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন। চিঠিতে ছিল, 'মা মণি, তোমার মালা যেখানেই থাকুক তোমার কোলেই আছে। আর তার বাবার চোখের তলেই। আমার জন্যে ভেবো না, আমাকে পরের জন্যে ভাবতে দাও। পরকে যাতে আমি আপন করতে পারি।'

আমাকেও তার মনে ছিল। আশ্চর্য! আমার নামেও একদিন একখানা চিঠি এলো। পড়ে দেখি লিখেছে, 'বিচারের সময় পরে। এখন ভালোবাসবার সময়। ভালোবাসলে নির্বিচারে ভালোবাসতে হবে। পাপীকেও। অপরাধীকেও। রাক্ষসকেও। তা যদি না পারি তবে আমরাই ফেল। যাদের পাপী ভাবছি, অপরাধী ভাবছি, রাক্ষস ভাবছি তারাও তো মানুষ। তাদেরও তো মা বোন আছে। মা বোনের ইজ্জৎ তাদের কাছেও তো দামী। তাদেরও তো বাপ দাদা আছে। বাপ দাদার প্রাণ তাদের কাছেও তো দামী। তারা স্বভাবদুর্বৃত্ত নয়। সৎ চাষী। সৎ কারিগর। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খায়। ঈশ্বরকে ভয় করে। মানুষের সঙ্গে বকমারি সম্পর্ক পাতায়। কেন তবে পাগল হলো? এক এক জন এক এক উত্তর দেন। আমি শুনে যাই। সরল কথাটা হলো, মানুষে মানুষে ভেদ নেই। ভেদবুদ্ধিটাই সব চেয়ে দোষের। তার থেকেই যাবতীয় দোষের উৎপত্তি।'

আমার তখন ক্রোধে অন্তরাত্মা জলছে। এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা এসে আমাকে আরো রাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন মুসলমানরা নাকি আমাদের ব্রাদার্স। তা শুনে আমি ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দিয়েছি, 'হুঁ। ব্রাদার্স-ইন-ল।' তখন খেয়াল হয়নি যে কথাটা দু'ধারে কাটে। পরে খেয়াল হলে জলে পুড়ে মরি। বিদেশিনী ছবি কিনে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। নইলে বুঝিয়ে বলতুম ব্রাদার্স-ইন-ল কোন্ অর্থে।

মালার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছা ছিল। করতে সাহস হলো না। সে কি এইজন্যেই নোয়াখালী গেছে যে বর্বরকেও, বজ্জাতকেও নির্বিচারে ভালোবাসতে হবে? তা হলে নাটসীদেরও ভালোবাসতে হয়। অসম্ভব। ওর চেয়ে সাপকেও ভালোবাসা সহজ। গান্ধীজীর অহিংসামন্ত্রে কালসাপও বশ মানতে পারে, কিন্তু নোয়াখালীর ওইসব নারীধর্ষক! অবিশ্বাস্য। ওদের জন্যে চাই মার্শাল ল। কোর্ট মার্শাল। সরাসরি ফাঁসী।

মালাকে এসব কথা লিখিনে। লিখি, 'ভুলে যেয়ো না যে তুমি আনতে গেছ মুক্তা ঝরার জল সোনার শুকপাখী। গান্ধীজীকে ছেড়ে দাও গান্ধীজীর কাজ। তাঁর কাজ তাঁর। তোমার কাজ তোমার।'

আমার মুসলমান সুহৃদদের সঙ্গে আমার ব্যবধান প্রতিদিন বেড়ে চলেছিল। তখন খেয়াল হয়নি যে ব্যবধান যদি বাড়তে বাড়তে অলঙ্ঘনীয় হয় তবে পায়ের তলার মাটি

ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যায়, মাঝখানে দেখা দেয় ভাদ্রমাসের পদ্মা। পনেরোই অগাস্ট এলো। আমার শিল্পীবন্ধুদের একদলকে বসিয়ে দিল কলকাতায়, একদলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঢাকায়। তার পর থেকে অবিরল চোখের জল ফেলছি। কিন্তু সে কথা পরে। ডিসেম্বর মাসে কে জানত অগাস্ট মাসে কী আসছে।

মালা সেই যে আমাকে চিঠি লিখল তারপর একেবারে নীরব। বোধহয় আমার চিঠির সুর তার ভালো লাগেনি।

প্যারিসে গিয়ে আধুনিকতম চিত্রকরদের সঙ্গে পা মিলিয়ে নেবার জন্যে আমার প্রাণ কবে থেকে আকুল। যাইনি, তার কারণ প্রধানত মালাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন কর্তব্যবোধ। আরো কারণ ছিল। আমি একান্তভাবে চেষ্টা করছিলুম আমার ভারতীয় পূর্বসূরীদের সঙ্গেও পা মিলিয়ে নিতে। এ এক দুঃসাধ্য কসরৎ। এক পা মেলাতে হবে ইউরোপীয় আধুনিকের সঙ্গে। আরেক পা মেলাতে হবে ভারতীয় অতীতের সঙ্গে। এ যেন দুই নৌকায় পা রেখে টাল সামলে চলা।

এখন মালা নেই। কবে ফিরবে কে জানে? ইচ্ছা করলে স্বচ্ছন্দে প্যারিস ঘুরে আসা যায়। ওই সোমনাথের সঙ্গেই এক জাহাজে ভাসতে পারা যেতো। ইচ্ছাটাকে দমন করতে হলো। ভারতেরই খাতিরে। দাঙ্গাহাঙ্গামার দ্বারা নির্ণীত হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের সংজ্ঞা। অনেকের বিশ্বাস ভারতবর্ষ মুসলমানের দেশ নয়, যেমন ইংরেজের দেশ নয়। তার ঐতিহ্য মুসলমানের নয়, যেমন ইংরেজের নয়। এরা মেঘের মতো উড়ে এসেছে, জল বর্ষণ করেছে, ফুরিয়ে গেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব আছে ও থাকবে। অর্থনীতিক্ষেত্রেও। কিন্তু জাতীয় সত্তায় বা জাতীয় চেতনায় এদের ধারা বহমান নয়। আমরা যদি সত্যিকার মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গ চাই ইরানে যাব, সীরিয়ায় যাব। যদি সত্যিকার ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংসর্গ চাই প্যারিসে যাব, রোমে যাব। কিন্তু এ দেশের মুসলমান বা ইউরোপীয়ের কাছে যাওয়া বৃথা। এরা ফুরিয়ে গেছে।

আমার নিজের বিশ্বাস অবশ্য ঠিক তা নয়। আমার মনে হয় প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অবক্ষয় উপস্থিত হয়েছিল। তাই মুসলমানকে তার প্রয়োজন ছিল যৌবনের জন্যে। যবন নিয়ে এলো যৌবন। আগেও একবার এনেছিল মুসলমান রূপে নয়, গ্রীক রূপে। পরেও আবার নিয়ে এলো ইংরেজ রূপে। যৌবন বার বার এসেছে। অবক্ষয় বার বার প্রতিহত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জা ভারতবর্ষেরই। একে হিন্দু বললে অবক্ষয়কেই সনাতন বলা হয়। কারণ অবক্ষয়ের পূর্বে এর নাম হিন্দু ছিল না। এর রূপও হিন্দু ছিল না। অজন্তার সঙ্গে এর মিল কোথায়? গান্ধার শিল্পের সঙ্গে? মহেনজো দড়োর সঙ্গে? যা সনাতন তা হিন্দু নয়। যা হিন্দু তা সনাতন নয়। হিন্দু মুসলমানের লড়াইটা ভূতের সঙ্গে ভূতের লড়াই। হিন্দুর মতো মুসলমানেরও অতীত

আছে, ভবিষ্যৎ নেই। থাকলে নিতান্তই স্থূল অর্থে। স্থূলের দ্বারা সূক্ষ্ম সৃষ্টি হয় না। আর্ট হচ্ছে সূক্ষ্ম সৃষ্টি। কিন্তু ভবিষ্যৎ আছে ভারত আত্মার। যদি তার সংস্কারমুক্তি ঘটে। যদি সে দশভুজার মতো দশদিকে দশ হাত বাড়ায়। পূর্ব পশ্চিম ভেদজ্ঞান না রাখে। হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধি না পোষে।

মেসোমশায়ও ভিতরে ভিতরে ছটফট করছিলেন। বাইরে যদিও শান্ত সমাহিত। মাসীর জন্যে অবশ্য। তবে শুধু মাসীর জন্যে নয়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'পঞ্চাশ বছর বয়সের পর মানুষ বাঁচে তার কাজের জন্যে। তার কাজ থেকে তাকে বঞ্চিত কর। দেখবে সে বেঁচে নেই। বেঁচে আছে তার শরীরটা।'

বাস্তবিক, কী নিয়ে তিনি থাকবেন? চাকরি তো করবেন না। নিজের বাড়ীতে বসে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা? তারও তো প্রবাহ রুদ্ধ। কবে দেশের সুদিন ফিরবে! পার্ক সার্কাসে ফিরে যাবেন তিনি। স্থানটি কত কাছে অথচ কত দূরে। দিনটিও কত কাছে অথচ কত দূরে।

বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেই মাসিমা বলে ওঠেন, 'ক্ষেপেছ? ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়? শান্তিপ্রতিষ্ঠা হোক আগে। করবে ইংরেজ। যদি রাজত্ব রাখতে চায়।'

আমি কণ্ঠক্ষেপ করি। 'আর যদি রাজত্ব না রাখতে চায়?'

'সে কী।' মাসিমার চমক লাগে। 'এমন সোনার রাজত্ব কাকে দিয়ে যাবে! তুমিও যেমন এ জিনিস কি প্রাণ ধরে কেউ কাউকে দেয়? ওরা দিয়ে যাবে না। আমরাই গায়ের জোরে কেড়ে নেব। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? হবে, সুভাষ যেদিন আসবে।'

মাসিমাকে শোনাই লাটভবনের কানাঘুষা। সেখানে মাঝে মাঝে যেতে হয় আমাকে। ইংরেজরা আগের চেয়ে অনেক বেশী দিলখোলা হয়েছে। ব্যবহারও তাদের অনেক বেশী ভদ্র। সমস্কন্ধের মতো। এই তো সেদিন শুনে এলুম, 'ক্ষতিপূরণের বহর নিয়ে আপনাদের নেতাদের সঙ্গে দর কষাকষি চলছে। ঈজিপ্টের ওঁরা আমাদের অফিসারদের খুশি করে দিয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ার এঁরাও যদি খুশি করে দেন তা হলে আমরা কালকেই জাহাজ ধরতে রাজী। ঢের হয়েছে রাজাগিরি। হাতে রাখব সওদাগরি।'

অরাজকতার প্রশ্ন তুললে ইংরেজ আলাপীরা বলেন, 'এসব দাঙ্গাহাঙ্গামার আসল কারণ তো এই যে ইণ্ডিয়ানরা ভাগ না দিয়ে ভোগ করতে চায়। নিজেদের মধ্যে ইণ্ডিয়ার লোক যা হয় একটা মীমাংসা করুক। যে মীমাংসা তারা করবে সেই মীমাংসাই আমরা মেনে নেব। কোনো পক্ষের উপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে যাব না।'

ইংরেজদের বক্তব্য যে তাদের ভাষায় আমরা সবাই ইণ্ডিয়ান। আর আমাদের সকলের দেশ ইণ্ডিয়া। কায়দে আজম কিন্তু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ইণ্ডিয়ান নন। তাঁর স্বদেশের নাম পাকিস্তান। এই যদি হয়ে থাকে তাঁর দলবলের মনের কথা

তবে মীমাংসা হতে পারে না। মীমাংসার ভিত্তিই নেই। এটা হৃদয়ঙ্গম করে গান্ধীজী দিল্লী ছেড়ে নোয়াখালী চলে গেছেন সরাসরি আবেদন করতে দেশের ইসলামপন্থী জনগণের দরবারে। তারা যদি কবুল করে যে তারা ইণ্ডিয়ান তা হলে মীমাংসা হবে নেতায় নেতায় নয়, পার্টিতে পার্টিতে নয়, জনতায় জনতায়। কিন্তু তারাও যদি কায়দে আজমের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে তবে মীমাংসার শেষ ভরসাটুকুও লুপ্ত হবে। নোয়াখালীতে মহাত্মা গেছেন নিশ্চয় করে জানতে ইসলাম যাদের ধর্ম ইণ্ডিয়া কি তাদের দেশ, না দেশ নয়? ইণ্ডিয়ান কি তারা জাতিতে, না ইণ্ডিয়ান নয়?

মেসোমশায় হঠাৎ বলে বসলেন, 'আমিও নোয়াখালী যাব।'

'তুমিও নোয়াখালী যাবে!' মাসিমা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'কেন? মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে? না শুধু একবার দেখে আসতে?'

অবাক হলুম আমিও। ভাবলুম মালার জন্যে তার বাপের মন কেমন করছে। করবে না? আমি কোথাকার কে! আমারি মন কেমন করছে।

'না। সে জন্যে নয়।' মেসোমশায় পরিষ্কার করলেন। 'নোয়াখালী গেলে দেখা হবে বইকি, কিন্তু দেখার জন্যে নোয়াখালী যাওয়া নয়। আর ঘরে ফিরিয়ে আনা তো মালার অনিচ্ছায় হতে পারে না। তার যেদিন ইচ্ছা হবে সে আপনি চলে আসবে।'

একটু থেমে বললেন, 'ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে লণ্ডনে নয়, দিল্লীতে নয়, নোয়াখালীতেই। নোয়াখালীতে যদি আমরা সিদ্ধকাম হই তা হলে দিল্লীতেও আমরা ব্যর্থ হতে পারিনে, লণ্ডনেও আমাদের নিষ্ফলতা ঘটবে না। আর নোয়াখালীতে যদি আমরা অকৃতকার্য হই তা হলে দিল্লীতেও আমাদের অক্ষমতা ঢাকা থাকবে না, লণ্ডনেও সেটা ধরা পড়ে যাবে। শেষ সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে নোয়াখালীর উপর। সে যেদিকে ইঙ্গিত করবে দিল্লী সেই দিকেই চলবে, লণ্ডন সেই দিকেই হেলবে।'

'সব মানলুম। কিন্তু তুমি কেন?' মাসিমা ভুললেন না। ভবী ভোলে না।

'আমি কেন?' মেসোমশায় বললেন, 'কলকাতায় আমি কার কোন্ কাজে লাগছি? কলকাতা এখন মফঃস্বল। নোয়াখালী এখন সদর। ভারতের ভাগ্য তো দূরের কথা, বাংলাদেশের ভাগ্যও এখন কলকাতার হাতে নয়। কলকাতাই বা কার কোন্ কাজে লাগছে? অসতো মা সদ্‌গময়। আনৃরিয়ালিটি থেকে আমাকে রিয়ালিটিতে নিয়ে যাও। কলকাতা থেকে আমাকে নোয়াখালীতে যেতে দাও। যাই, দেখি যদি কিছু করতে পারি। আমার দ্বারা বৃহৎ কিছু হবে না, কিন্তু সামান্য কিছুও তো হতে পারে। রাম যখন সমুদ্রবন্ধন করেন কাঠবিড়ালীও নুড়ি বয়ে এনে সাহায্য করেছিল।'

মাসিমা তা শুনে লাল হয়ে গেলেন। তাঁর মুখে কথা জোগাল না। আমার দিকে তাকালেন। যেন আমিও তাঁর পক্ষে। আমি তাকালুম টোগোর দিকে। টোগো

তাকান নীলির দিকে। আমাদের সকলের ভাবনা মেসোমশায়কে কী করে নিবৃত্ত করা যায়। মাসিমা কখনো তাঁকে যেতে দেবেন না। তিনি রক্তের চাপে ভুগছেন। তাঁকে যেতে দিলে বিপদ। ওদিকে তিনিও প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছেন। নোয়াখালী তিনি যাবেনই। তাঁকে যেতে না দিলেও বিপদ। নজরবন্দী করে তাঁর মতো লোককে কাঁহাতক আটকিয়ে রাখা যায়! তাঁর উপর জোর খাটাতে গেলে ফল খারাপ হবে।

এ এক সঙ্কটময় পরিস্থিতি। মাসিমা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'দেবপ্রিয়, এই সঙ্কটের জন্যে দায়ী তোমার বোন মালা। সে যদি অমন করে নোয়াখালী না যেত ইনিও যাবার জন্যে কোমর বাঁধতেন না। তোমার কি মনে হয় না যে মালাকে টেলিগ্রাম করে ফিরতে বলা উচিত?'

'কোন্ অজুহাতে, মাসিমা?' আমি তটস্থ হই।

'পিতার অবস্থা উদ্বেগজনক। এর মধ্যে মিথ্যা কোথাও আছে?' তিনি ভাষার দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিলেন।

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলি যে মালা যদি টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ী আসে তো উদ্বেগের উপযুক্ত কারণ না দেখে আবার চলে যাবে। সঙ্গে যাবেন তার বাবা। তার চেয়ে অনেক ভালো সত্যের মুখোমুখি হওয়া। মেসোমশায়কে যেতে দেওয়াই শ্রেয়। সাথী হবেন মাসিমা।

'আমি!' তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'তুমি হয়তো মনে করবে আমি ভীতু। প্রাণের ভয়ে যেতে নারাজ। কিন্তু তা নয়। আমার নজর সব সময় পার্ক সার্কাসের বাড়ীখানার উপরে। এইখানে বসেই আমি কড়া পাহারা দিচ্ছি। জানো, ও বাড়ীতে এখন টেলিফোন বসেছে। একদিন হয়তো মিলিটারিও বসবে। আমার বাড়ী আমি বেদখল হতে দেব না। নিজে ঢুকতে না পারি আর কাউকে ঢুকতে দেব না। কিন্তু আমি যদি কলকাতার বাইরে যাই বাড়ীটাও আমার নাগালের বাইরে যাবে। তোমার মেসোমশায়কে এ কথা বোঝায় কে? 'দেশ' 'দেশ' করে তিনি গেলেন। আচ্ছা, দেশ কি একটা নিরাকার বস্তু? দেশ হচ্ছে বাড়ী ঘর বাগান। দেশ হচ্ছে পনেরো কাঠা জমি। এই যদি গেল তো দেশ নিয়ে আমি করব কী, বল।'

এই পারিবারিক সঙ্কটে ডাক্তার বন্ধুরাও হার মানলেন। মেসোমশায় তাঁদের পরামর্শ কানে তুললেন না। বললেন, 'গান্ধীর বয়স সাতাত্তর বছর। আমার বয়স ষাটেরও কম। তিনি তো শুনতে পাই পা দিয়ে নোয়াখালী চষে বেড়াচ্ছেন। বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে হাঁটছেন। আমি কি এতই অথর্ব! আমার কি এটা ইনভ্যালিড দশা!'

॥ নয় ॥

বড়দিনের সময় এক চিত্রপ্রদর্শনীতে নির্মলের সঙ্গে দেখা। এলাহাবাদ থেকে সে কলকাতা এসেছিল কী একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে। মেসোমশায়ের ঠিকানা খুঁজে পায়নি। আমাকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে আবিষ্কার করেছে।

পরিস্থিতির বিবরণ তাকে শোনাই। সে বলে, 'উপায় যে নেই তা নয়। মাসিমা যদি অনুমতি দেন আমিই মেসোমশায়ের যাত্রাসহচর হব। তাঁর স্বাস্থ্যের খবরদারি করার দায় আমার। তাঁর শরীরতত্ত্ব আমার অজানা নয়। নোয়াখালীতে গিয়ে তাঁর যদি ঘুরতে ইচ্ছা হয় আমিও তাঁর সঙ্গে ঘুরব। যদি এক জায়গায় থাকতে ইচ্ছা হয় আমিও তাঁর সঙ্গে থাকব। ছুটি ? ছুটি আমি যেমন করে পারি জোটাব।'

মাসিমার সামনে হাজির করে দিই তাকে। মাসিমা ভুরু কুঁচকিয়ে বলেন, 'তুমি ডক্টরেট পেয়েছ বলে কি ডাক্তার হয়েছ ? অসুখবিসুখ করলে তুমি পারবে চিকিৎসা করতে ? ওষুধ পাবে কোথায় ওই পাণ্ডববর্জিত দেশে ?'

মেসোমশায় কিন্তু নির্মলের প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে ওঠেন। রাতারাতি পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যায়। মাসিমার প্রত্যেকটি আপত্তির খণ্ডন হয়। তিনিও হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'যাচ্ছ, যাও। কিন্তু বেশী দিন থেকো না। শুনছি আবার গোলমাল বাধবে নোয়াখালীতে। মালাকেও টেনে নিয়ে এসো।'

একদিন নির্মলকে সঙ্গে নিয়ে মেসোমশায় নোয়াখালী অভিমুখে যাত্রা করলেন। শেয়ালদায় তাঁকে তুলে দিয়ে এলুম। বিদায়কালে বললেন, 'এ কাজটা আমার কাজ নয়। তবে যাচ্ছি কেন ? যাচ্ছি এইজন্যে যে, নাই কাজের চেয়ে কাণা কাজও ভালো। এখন আমার সত্যি বাঁচতে ইচ্ছে করছে।'

লক্ষ করলুম শুধু বাঁচতে নয়। নাচতেও। মেসোমশায় ইউরোপীয় পোশাক পরে যেন নেচে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখাচ্ছিল। কে বলবে যে তিনি একজন ইনভ্যালিড! অথচ তাই হতো তাঁর দশা আরো কিছুদিন বেকার বসে থাকলে। পরের বাড়ী নজরবন্দী হয়ে পড়ে থাকলে।

এ মানুষ যে খুব শীগগির নোয়াখালী থেকে ফিরবেন আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত নই। কিন্তু কাউকে মুখ ফুটে বলিনে এ কথা। পাছে মাসিমা দুঃখ পান। তাঁর ধারণা মানুষ বাঁচে ডাক্তার দেখালে আর ইনজেকশন নিলে আর ওষুধ খেলে। কিন্তু তাঁকে দোষ দিয়ে কী হবে ? স্বামীকে যেতে দিলে কী নিয়ে তিনি থাকবেন ? তাঁরও তো একটা অবলম্বন চাই। যা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। বাঁচা তো কেবল টিকে থাকা নয়।

মাসিমা এর পরে এক দারুণ দুঃসাহসিক কাজ করেন। সোজা গিয়ে নিজের বাড়ীতে ওঠেন। সেইখানেই বাস করতে থাকেন। অগত্যা আমাকেও প্রাণ হাতে করে তাঁর ওখানে যেতে হয়। যখনি যাই দেখি মাসিমার বাড়ীর ফটকে এক সশস্ত্র গুর্খা খাড়া পাহারা দিচ্ছে। আর একটা গুর্খা খাটিয়ায় শুয়ে বিশ্রাম করছে। তার পাশে শুয়ে আছে তার হাতিয়ার। গুলীভরা রাইফেল। দেখলে গা ছমছম করে।

মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করি, 'এসব তো আগে দেখিনি। কবে লাইসেন্স নিলেন? মুসলিম লীগ সরকার কি হিন্দুকে লাইসেন্স দেয়?'

মাসিমা একটু হাসেন। বলেন, 'গুণ্ডাদের কে লাইসেন্স দিয়েছে? এত হাতিয়ার তারা পায় কোথায়? যত কড়াক্কড় কি শুধু ভদ্র গৃহস্থের বেলায়? গুণ্ডার বিরুদ্ধে গুর্খা লাগিয়ে দিয়েছি। ওদের হাতিয়ার ওরাই যেখান থেকে হোক জুটিয়েছে। আমি চোখ বুজে রয়েছি। টাকা চায়, টাকা দিই। এও একরকম ট্যাক্স। গুর্খাকে না দিলে গুণ্ডাকে দিতে হতো। আগেকার দিনে একটাই গভর্নমেন্ট ছিল। এখন একজোড়া গভর্নমেন্ট। একটা সরকারী। আরেকটা বেসরকারী। দু'দিন সবুর কর। দেখবে দেশে একটা প্রাইভেট আর্মি গড়ে উঠবে। অস্ত্রশস্ত্র ঘরে ঘরে তৈরি হবে। বোমা একদিন আমিই বানাব। এ বাড়ী কি আমি অমনি ছেড়ে দিচ্ছি?

কী পরিমাণ মরীয়া হলে মানুষ এমন কথা মুখে আনে। বিশেষত হিন্দুর মেয়ে। আমি বিমূঢ় হয়ে শুনি। প্রতিবাদ বা সমর্থন কোনোটাই করিনে।

মাসিমা বলে যান, 'বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' পড়েছ? মুসলমানের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে হিন্দুর ছেলে, হিন্দুর মেয়ে সেদিন কী করেছিল? ইংরেজ এসে সুশাসনের আশা দেয়। ইংরেজকে বিশ্বাস করে আমরা আমাদের হাতের অস্ত্র ইংরেজের হাতে তুলে দিই। ইংরেজ এখন আমাদের রক্ষা করতে অক্ষম। তা হলে রক্ষা করবে কে? মুসলমান? সেই তো প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্রধার। আবার 'আনন্দমঠে'র দিন আসছে। গান্ধীজীর অহিংসা কোনো কাজে লাগবে না। তার মহিমা এই গুণ্ডার দল বুঝবে না। নোয়াখালীর বেণাবনে মুক্তা ছড়ালে কী হবে!'

কলকাতা শহরে অকস্মাৎ অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য লক্ষিত হলো। টোগোকে জিজ্ঞাসা করলে সেও হাসে। বলে, 'কোন্‌টা তোমার চাই? পিস্তল? রিভলভার? রাইফেল? স্টেনগান? কত টাকা খরচ করতে রাজী? কাল রাত বারোটার সময় ঘরে বসে পাবে। কোন্‌খান থেকে আসবে জানতে চেয়ো না।'

এই বলে টোগো দুই পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দেয়। সে সুরক্ষিত।

দেখলুম হাতিয়ার চাইলেই পাওয়া যায়। অফুরন্ত সরবরাহ। লাইসেন্স অবশ্য দুর্লভ। কিন্তু কেউ তার অপেক্ষায় বসে নেই। পুলিশ যথারীতি হানা দেয়, খানাতল্লাসী

করে, কিন্তু পুলিশের লোকই দয়া করে জানিয়ে দিয়ে যায় যে হানাদার আসছে, খানাতল্লাসী হবে। হাতী ঘোড়া পার হয়ে যায়। ধরা পড়ে চুনোপুঁটি। স্টেনগান যার হাতে আছে তার কাছে ঘেঁষবে কে? ওই গাদা বন্দুক কি ছোরা উদ্ধার করে। মোদ্দা কথা হিন্দুর স্বার্থ নয় হিন্দুকে নিরস্ত্র করা, মুসলমানের স্বার্থ নয় মুসলমানকে নিরস্ত্র করা। ইংরেজের স্বার্থে তো কেউ বাদ সাধছে না, তাই ইংরেজেরও স্বার্থ নয় কাউকে নিরস্ত্র করা।

দেশ চলেছে গৃহযুদ্ধের অভিমুখে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হইনি। এবার ভারতের গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হব। মনটাকে সেইভাবেই প্রস্তুত করতে আরম্ভ করি। কিন্তু আমার কাজ অসি দিয়ে নয়। তুলি দিয়ে। তবে তুলি ধরার জন্যেও তো বেঁচে থাকা চাই। বেঁচে থাকার জন্যেও কি অসি ধরতে হবে? পাব কোথায়? কী ভাবে? টোগো যেখানে পেয়েছে। যে ভাবে। চিন্তান্বিত হই।

এমন সময় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে মিটমাট করুক আর নাই করুক আটচল্লিশ সালের জুন মাসের মধ্যে ইংরেজ এ দেশ থেকে অপসরণ করবে। আমার কাছে এই সম্ভাবনাটা নতুন নয়। এই তারিখটাই নতুন ইংরেজ তা হলে সত্যি সত্যি চলল। তার যাত্রা শুভ হোক। মনটাকে সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষমুক্ত করি ইংরেজ বন্ধুরা দেখি পরম আশ্বস্ত। চার দিকের বিশৃঙ্খলার দায়িত্ব বইতে তাদের আন্তরিক অরুচি। ক্ষমতার বদলেও না। তারাও নতুন করে জীবন পত্তন করতে চায়।

মেসোমশায় ইতিমধ্যে ফিরেছিলেন। মাসিমা একদিন আমাকে একটা বিচিত্র বার্তা শোনালেন। বললেন, 'দেখ, দেবপ্রিয়, নোয়াখালীর সমস্যা আজকের নয়। তোমার জন্মের আগের। লাট কার্জন বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা কলকাতা থেকে শাসন করা যায় না বলেই তিনি ঢাকা থেকে শাসনের পরিকল্পনা করেন। বঙ্গবিভাগের সেইটেই ছিল প্রাথমিক কারণ। আবার যদি বাংলাদেশ দু'ভাগ হতো আর ঢাকা হতো পূর্ববঙ্গের রাজধানী তা হলে নোয়াখালী শাসন করা সুগম হতো কি না তুমিই বল। যেটা কলমের এক খোঁচায় হতে পারে সেটার জন্যে মহাত্মাকেই বা অমন ভীষ্মের মতো পণ করতে হয় কেন? মালাবই বা অমন তপস্যায় কাজ কী? আর ইনিই বা কেমন করে আমাকে বিপদের মুখে ফেলে অত দিন ওখানে থাকেন?'

বাংলা ভাগ করার এই অভিনব প্রস্তাব দেখতে দেখতে সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। সমস্যা যে অত সহজে মিটতে পারে কারো মাথায় আগে এটা আসেনি। ইংরেজীতে একটি কথা আছে। হেরডকে আউট-হেরড করা। হেরডের উপর টেক্কা দেওয়া। তেমনি এটা হলো জিন্নাকে আউট-জিন্না করা। খোদার উপর খোদকারী করা। তুমি চল ডালে ডালে তো আমি চলি পাতায় পাতায়।

'দেখ, এর মধ্যে একটা মস্ত কূটনৈতিক চাল আছে।' আমাকে বোঝায় আমার রাজনীতিক বন্ধু হারানিধি লাহা। 'বাংলা ভাগ হলে ওরা কলকাতা হারাবে। এটি একটি সোনার খনি। ওদের দশা হবে মণিহারা ফণীর মতো। কিছুতেই ওরা রাজী হতে পারে না। ওরা যদি এতে রাজী না হয় আমরা কেন ওতে রাজী হব? আর ওরা যদি এতে রাজী হয় তা হলে আমরা কেন ওতে নারাজ হব? এসব গুণ্ডাদের পদ্মাপার করতে পারলেই বাঁচি।'

'ও পারের হিন্দুরা কি আরো বিপন্ন হবে না?' প্রশ্ন করি আমি।

'ওরা', হারানিধি অম্লানমুখে উত্তর দেয়, 'এ পারে চলে আসবে।'

বাজিয়ে দেখলুম গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো মেরুদণ্ড একজনেরও নেই। গৃহযুদ্ধ যাতে না বাধে সেই কথা ভেবে আগে থেকেই সন্ধি করতে বুদ্ধিমানরা ব্যগ্র। সন্ধির শর্ত পর্যন্ত তাঁদের জিহ্বাগ্রে। বাকী শুধু জিন্নাকে ঢেঁকি গেলানো। তার জন্যে দরকার ছিল মাউন্টব্যাটেনের মতো এক ওস্তাদের। তিনি যা করলেন তা একপ্রকার অসাধ্য-সাধন। হঠাৎ-নবাবদের কলকাতা ছাড়বার দিন ঘনিয়ে এলো।

সেই যে রাজেক হোসেন সাহেব বা রাজেনদা তিনি মেসোমশায়ের অনুপস্থিতিতে মাসিমার বাড়ী আসতে সাহস পেতেন না। যেই শুনলেন মেসোমশায় ফিরেছেন অমনি ছুটে এলেন দেখা করতে। তখনো মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যান পাকা হয়নি। মেসোমশায়ও বিশ্বাস করেন না যে পাকা হবে। তাঁর ধারণা গান্ধীজী ওটা উলটিয়ে দেবেন। যেমন দিয়েছিলেন ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব। মাউন্টব্যাটেনকেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে।

'ভাই অমল, এ কী শুনছি, ভাই?' রাজেনদা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। 'এ কী আবদার ধরেছিস তোরা? বাংলাদেশ ভাগ করতে হবে! এ কি কখনো ভাবা যায়!'

'তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, রাজেনদা।' মেসোমশায় অভয় দেন তাঁকে। 'দেশ কিছুতেই ভাগ করা হবে না। না ভারতবর্ষ, না বাংলাদেশ। ইংরেজ যাচ্ছে, যাক। ওরা গেলে পরে আমরা যেমন করে পারি মিটমাট করব। মিটমাট না হলে তখন দেখা যাবে। নতুন আবহাওয়ায় নতুন করে ভাবা যাবে। আগে হাওয়া বদল।'

রাজেনদা যে খুব খুশি হলেন তা নয়। তিনি ইংরেজ থাকতেই মিটমাট চান। গান্ধী যেন জিন্নার দাবী মিটিয়ে দেন। চরম মহত্ত্ব দেখান। মুসলমান চিরবাধিত হবে। পাকিস্তান যে সব মুসলমানের মনের কথা তা নয়, কিন্তু সব মুসলমানেরই প্রাণের আশঙ্কা আবার যেন তারা নতুন করে পরাধীন না হয়। তাদের শঙ্কা অমূলক হলে তারা কি এমন মরীয়া হয়ে উঠত? তাদের দিক থেকে এটা একটা জীবনমরণ সংগ্রাম। তারাও শান্তি চায়, কিন্তু স্বাধীনতার বিনিময়ে নয়। ইংরেজ যেদিন যাবে সেইদিনই তারা স্বাধীন হবে। নতুন করে পরাধীন হওয়া একদিনের জন্যেও নয়।

মেসোমশায় নোয়াখালী থেকে বিষণ্ণতর ও বিজ্ঞতর হয়ে ফিরেছিলেন। মাসখানেক পদযাত্রার পরে। মুসলমানদের গৃহে অতিথিও হয়েছিলেন তিনি। বেদনার সঙ্গে বললেন, 'মুসলমানরা নতুন করে পরাধীন হোক একটি হিন্দুর মনেও এ কামনা ভুল করেও ঠাঁই পায়নি কোনো দিন। স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যে সংগ্রাম চলে এসেছে তাতে হিন্দুও অংশ নিয়েছে, মুসলমানও অংশ নিয়েছে, শিখও অংশ নিয়েছে। যে স্বাধীনতা আসন্ন সে স্বাধীনতা আমাদের সকলেরই এজমালী স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পর যদি আমরা সবাই মিলে একে ভোগ করতে না পারি তবে সবাই একসঙ্গে বসে স্থির করব কেমন ভাবে ভাগ করলে সকলের সন্তোষ। সেটা হবে আমাদের ঘরোয়া বন্দোবস্ত। তাতে বিদেশী শাসকের হাত থাকবে না। ভালোবেসে যদি ধরে রাখতে না পারি তবে প্রেমের সঙ্গেই ছেড়ে দেব তোমাদের। তোমরা যদি পাকিস্তান চাও তবে আমাদের হাত থেকেই পাবে, তার সঙ্গে পাবে আমাদের শুভেচ্ছা। আমরাও সে পাকিস্তান রক্ষা করব, তার জন্যে জান দেব। কিন্তু ইংরেজের হাত থেকে নয়।'

রাজ্জেক হোসেন সাহেব মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'না। না। তোদের হাত থেকে নয়। ইংরেজের হাত থেকেই। ওরাই যে আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। ওরাই আমাদের হাতে ফিরিয়ে দেবে।'

মেসোমশায় তেমনি দৃঢ় স্বরে বললেন, 'তা হলে ইংরেজের কাছেই চাও। গান্ধীজীর কাছে মহত্ত্ব প্রত্যাশা করছ কেন?'

রাজ্জেক হোসেন নিরুত্তর। মেসোমশায় বলতে লাগলেন, 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রত্যাহার না করলে জিন্নার সঙ্গে গান্ধীর কথাবার্তার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। হিংসার কাছে নতিস্বীকার করার নাম অহিংসা নয়। গান্ধীজীর দেবার যা আছে তিনি দেবেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তুলে নিলে। ব্রিটিশ অপসরণের পরে। সেটা মহৎ দানই হবে।'

'না। না। তাঁর হাত থেকে দান আমরা চাইনে। তা সে যতই মহৎ হোক না কেন। ব্রিটিশ অপসরণের পরে দান নেওয়া মানে তো দাতার কাছে আগে অধীনতা স্বীকার করা। একদিনের জন্যেও তা করব না। মহত্ত্ব দেখাতে হলে তার সময় ব্রিটিশ অপসরণের পূর্বে।' বলে রাজ্জেক হোসেন আসন ত্যাগ করলেন।

মেসোমশায় তাঁকে ধরে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমরা শুধু চাও গান্ধীজীর সম্মতি। দেবার মালিক ইংরেজ। কিন্তু ইংরেজ যদি তোমাদের আধখানা বাংলা দেয় নেবে?'

রাজ্জেক হোসেন আমতা আমতা করে বললেন, 'কী করে নিই?'

'নিয়ো না।' মেসোমশায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। 'নেওয়া উচিত নয়। এটা একটা খারাপ চালের পাল্টা চাল। এটাও খারাপ। দুই খারাপে এক ভালো হয় না।

এতে তোমাদেরও অমঙ্গল, আমাদেরও অমঙ্গল। আপাত লাভকে প্রকৃত লাভ বলে ভুল করলে আখেরে ঠকতে হয়। কাঁটা একদিন গলায় বিঁধবেই। সেদিন হয়তো আমাদের জীবিতকালে নয়। জাতি হিশেবে আমরা বাঙালীরা তৃতীয় শ্রেণীর হয়ে যাব। আমাদের সব স্বপ্নের, সব ধ্যানের সমাধি হবে। আমাদের হাত দিয়ে আর কোনো মহৎ সৃষ্টি হবে না। এ বেদনা আর কেউ বুঝবে না, বুঝবে শুধু তোমরা আর আমরা। উভয়ের উত্তর-পুরুষ। তাই রাজেনদা, বহু শতাব্দীতে এ রকম মুহূর্ত একবারমাত্র আসে। এটা আমাদের সত্যের মুহূর্ত। মোমেন্ট অফ ট্রুথ। আমরা কি বরাবরের জন্যে দু'ভাগ হয়ে যাব ? **Whom God hath joined let no man put asunder.**'

এর উত্তরে রাজেক হোসেন কী বললেন শুনবে ? বললেন, 'সেইজন্যেই তো বলি, বাঙালী যেন ভাগ হয়ে না যায়, বাংলা যেন ভাগ হয়ে না যায়। পাকিস্তানেই আমাদের সকলের স্থান হবে। ভারতবর্ষ কতবার ভেঙেছে। আবার ভাঙলই বা।'

মেসোমশায় হাল ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'বাংলাকে ভালোবাসি বলে ভারতকেও কম ভালোবাসিনে। এক ভালোবাসার খাতিরে আরেক ভালোবাসাকে ত্যাগ করতে পারি কখনো ? যাদের অন্তরে প্রেম নেই তারাই ভাগ করতে পারে ভারতকে, বাংলাকে।'

'এই যদি হয় নির্যাস কথা তবে ইংরেজ চলে গেলেও তোমরা আমাদের পাকিস্তান দেবে না। বৃথা স্তোক দিয়ে আমাদের শেষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছ। তার চেয়ে ইংরেজ যা দেয় তাই সই। আধখানা বাংলা দেয় আধখানাই নেব।' বললেন রাজেক হোসেন।

ঘটনার গতি গান্ধীর জন্যে অপেক্ষা করল না। ব্রিটিশ অপসরণের সন্ধ্যামুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে দেখে তাঁর সম্মতি না নিয়েই নূতন শাসকরা পুরাতন শাসকদের দিয়ে দেশ ভাগ করিয়ে নিলেন, প্রদেশ ভাগ করিয়ে নিলেন। ভেবেছিলেন সেই উপায়ে অরাজকতা রোধ করবেন। পাঞ্জাবে কিন্তু তার উল্টো ফল হলো। গান্ধী না থাকলে বাংলাদেশেও হতো।

মেসোমশায় অসুখে পড়লেন। আমি গেলুম দেখতে। আমাকে তাঁর বিছানার ধারে বসিয়ে বললেন, 'যে যার এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিল হে। একসঙ্গে দু' দুটো শাইলক। রক্তধারা ঝরবেই তো। এখন একে বন্ধ করবে কোন্ ধন্বন্তরি !'

ভেবেছিলুম মালা ফিরে আসবে। ফিরল না। ফিরল মনোরমা। বলল, 'মালা তো বিশ্বাসই করে না যে মানুষকে হিন্দু বা মুসলমান বলে চিহ্নিত করলে তার সম্বন্ধে সব কথা বলা হয়ে যায়। কিংবা দেশকে হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান বলে চিহ্নিত করলে তার সম্বন্ধে সব কথা বলা হয়ে যায়। নিজেকে হিন্দু বা মুসলমান বলে চিহ্নিত করাটাই যখন ভুল তখন সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শামিল বলে গণনা করাটাও ভুল। যেখানে পনেরো আনা মিল সেখানে এক আনা গরমিলটাই বড় কথা নয়। তেমনি যেখানে এক আনা মাত্র মিল সেখানে সাম্প্রদায়িক নাম ধারণ করাটাই লজ্জার কথা। বিংশ শতাব্দীর

মধ্যভাগে এটা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। বিংশ শতাব্দী যখন শেষ হয়ে আসবে তখন এর অসারতা প্রত্যেকের চোখে পড়বে। তা বলে যেসব মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে গেছে সেসব হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। সেইসব রক্তের নদী আর হাড়ের পাহাড় কোথাও হিন্দুর, কোথাও মুসলমানের, কিন্তু সর্বত্র মানুষের। সর্বত্র আপনার লোকের। মালা ভাবছে কেমন করে ওদের প্রাণ ফিরিয়ে আনবে।'

আমিও বিশ্বাস করিনে যে এই ভূতের লড়াই চিরদিন চলবে বা চলতে পারে। কিন্তু জ্যান্ত মানুষের ঘাড় মটকাবার শক্তি এর অপরিসীম। যা ঘটেছে তা হাস্যকর তো নয়ই। তা ভয়ঙ্কর। যা ঘটবে তা হয়তো আরো ভয়ঙ্কর। মালা পারবে কেন সহ্য করতে? রক্তের নদী দেখতে দেখতে সমুদ্র হবে হয়তো। হাড়ের পাহাড় দেখতে দেখতে হিমালয়। মালা! মালা! তুমি কেন এ পথ দিয়ে যাবে! প্রাণ ফিরিয়ে আনা কি সম্ভব না সহজ! মুক্তা ঝরার জল সোনার শুকপাখী থাকলে তো আনবে।

মনোরমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'মালার সঙ্গে আপনি থাকলেন না কেন?'

'আমি কেন থাকব?' মনোরমা পাল্টা শুধায়। 'কেমন করে থাকব? আমার স্বামী আছে, সন্তান আছে। তাদের কতকাল অবহেলা করব? যদি জানতুম যে এ সঙ্কটের আশু অবসান হবে। তা তো হবার নয়। স্বয়ং মহাত্মাজীকেই দেখলুম অসহায়ের মতো কাঁদতে। তিনিও অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেছেন। মানুষ একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে, ভাইজী। মহাত্মার কথাও তার প্রাণে পৌঁছয় না। কানে পৌঁছলেও তবু কাজ হতো। মহাত্মার সভায় আসবেই না। তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে প্রেম দেন। তাও কি নেয়! অনেকগুলি মেয়েকেই আমরা উদ্ধার করেছি। কিন্তু যেই আমরা সরে আসব আর মিলিটারি সরে যাবে অমনি আরো অনেক মেয়ে বন্দিনী হবে। মালা যদি থাকতে চায় তাকে ওই বিংশ শতাব্দীর শেষদিন অবধি থাকতে হবে। আমি ততদিন থাকতে পারিনে। তবে আর-একজন থাকবেন।'

কৌতূহল দমন করতে পারিনে। জানতে চাই কে তিনি।

'আপনার বন্ধু নির্মলজী,' মনোরমার চোখ হাসে।

'ওঃ! তাই তো! ভুলে গেছলুম তাঁর কথা।' আমি গম্ভীরভাবে বলি।

মেসোমশায় ও মাসিমা দু'জনেই মালার জন্যে দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন। বিশেষত গান্ধীজী বিহারে চলে যাওয়ার পর থেকে। মনোরমা ছিল তাঁদের প্রধান ভরসা। তার স্থান নিল নির্মল। লক্ষ করলুম নির্মলের প্রতি মাসিমার অপার নির্ভরতা।

একদিন কথায় কথায় মাসিমা আমাকে বললেন, 'তা একালের মেয়েরা যখন নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করবেই, গুরুজনের নির্বন্ধ মানবে না, তখন আমরাই বা কেন আপত্তি করি? আপত্তি করলে শুনছে কে? আমি, বাবা, কাউকে বাধা দিতে চাইনে। একটি

মাত্র মেয়ে। তাই আমি ভালো দেখে বিয়ে দিতে চেয়েছিলুম। এই আমার অপরাধ। এর জন্যে আমাকে ত্যাগ করে বনবাসে যাবার কোনো অর্থ হয় ? গেল তো গেল। আর ফিরে আসার নামটি নেই। বাপের সঙ্গেও না। মনোরমার সঙ্গেও না। চিঠি লিখলে জবাব দেয়, আমি যদি যাই তবে একখানা টিকিটে কুলোবে না। কিছু না হোক শত-খানেক মেয়ে আমার সঙ্গে যেতে চাইবে। কোন্ প্রাণে তাদের আমি পিছনে ফেলে যাই ? তুমি তাদের কোথায় জায়গা দেবে বল ?'

আমি আশ্চর্য হলুম। 'আপনার বাড়ীতে জায়গা দিতে হবে এমন কী কথা আছে !'

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আমার এই হতভাগা বাড়ী। দেশ ভেঙে দিয়ে মুসলমানকে যদি বা হটালুম তো বাঙাল উড়ে এসে জুড়ে বসতে চায়। তাও একটি নয়, দুটি নয়, শতখানেক। বলি এদের পিণ্ডি জোগাবে কে !' মাসিমা সুধান।

'সেটা,' আমি সন্তর্পণে বলি, 'দেশ ভেঙে দেবার আগে দু'বার ভেবে দেখা উচিত ছিল আপনার। হিন্দুকে হিন্দু না পুষিলে কে পুষিবে !'

মাসিমা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'বেশ, তা হলে এ বাড়ীও আমি বেচে দেব।'

একটু ঠাণ্ডা হয়ে আবার বলতে লাগলেন, 'হাঁ, মালা আর কী লিখেছে শুনবে ? লিখেছে, মুসলমানরাও আমাকে ছাড়তে রাজী নয়। মুসলমানদের গ্রামশুদ্ধ লোক এসে আমার কাছে দরবার করে, সবাই যাক। আপনি থাকুন। যা করতে বলবেন তাই করব। সত্যি তারা আমার কথা শোনে। তাদের কথা আমি কেমন করে না শুনি ? হাঁ, জনাদশেক মুসলমান যুবক আমার কাছে আবদার জানিয়েছে যে আমি যেদিন যাব সেদিন তাদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। কলকাতা শহর তারা দেখেনি। সেখানে গিয়ে কাজকর্ম করবে। খেটে খাবে। কারো গলগ্রহ হবে না। এই নিরীহ প্রকৃতির মানুষগুলিকে আমি কেমন করে বোঝাই যে কলকাতায় মুসলমান আর নিরাপদ নয় ? সেখানে খেটে খেতে চাইলেও ঠাঁই নেই। অধিকার নেই। তাই যদি হয় তবে কলকাতা ফিরে যাওয়া আমার হবে না। আমি অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করব।'

আমি বেদনা বোধ করি। বলি, 'নিরীহ প্রকৃতির মানুষগুলির কোথাও কি ঠাঁই আছে ? তা বলে মালা কলকাতা না ফিরে কতকাল ও মুলুকে থাকবে !'

'নিরীহপ্রকৃতির মানুষগুলি !' মাসিমা জ্বলে ওঠেন। 'না, হিংস্রপ্রকৃতির বনমানুষগুলি ! যাদের আমি এত কষ্টে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে যাচ্ছি তাদেরি ভাই বেরাদরদের উনি খাল কেটে শহরে ডেকে আনবেন। নয়তো অভিমান করে মোগলের মুলুকে থাকবেন। এখন আমি করি কী ? কেমন করে আমার মেয়েকে উদ্ধার করি ? ও যদি ভালোবেসে কাউকে বিয়ে করতে চায় আমার দিক থেকে বাধা নেই, জেনো। শুধু জামাইটি মুসলমান না হলেই হলো।'

মাসিমার উদারতায় আমি চমৎকৃত হই। এটা কি স্বাধীনতার হাওয়া গায়ে লেগে? না ভাঙনের দৃশ্য দেখে? আঘাতে প্রতিঘাতে দেশ যদিও জর্জর প্রগতির রথচক্র অবিরাম ঘর্ঘর রবে ছুটে চলেছে।

দেশবিভাগের অভাবনীয়তায় হিন্দুরা যত না স্তম্ভিত প্রদেশ-বিভাগের অকল্পনীয়তায় মুসলমানরা ততোধিক। পাকিস্তানের খড়্গ তবু সাত আট বছর ধরে মাথার উপর ঝুলছিল, কিন্তু পশ্চিম বাংলার বজ্রটি অকস্মাৎ আসমান থেকে পড়ল। মুসলমানরা একবার মুর্শিদাবাদের তখ্‌ত হারিয়েছিল। এবার হারালো কলকাতার গদি। এমনিতেই তাদের মন খারাপ। তার উপর শোনা গেল পনেরোই অগাস্টের দিন হিন্দুরা দেখে নেবে। যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, 'দাঁড়ান, মশায়। ক্ষমতাটা একবার আসুক হাতে। এমন শিক্ষা দেব যে চিরদিন মনে থাকবে।' আমি শিউরে উঠি।

ভয়ানক এক ট্র্যাজেডী ঘটে যাবে চোখের উপর। প্রথমে কলকাতায়। তার পরে তার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গের যে-কোনো জায়গায়। খুব সম্ভব নোয়াখালীতেই আবার। মালার জন্যে অস্থির বোধ করি। মুসলমানরা যে তাকে ছাড়তে চায় না এর মানে কি এই যে মালা তাদের হস্‌টেজ? তাকেই তারা নির্যাতন ও হত্যা করবে? হা ভগবান! কেমন করে ওকে নোয়াখালী থেকে পনেরোই অগাস্টের আগে টেনে বার করে আনি? বিপদের কথা শুনে ও যদি উলটে কঠিন হয়? যদি বলে, 'বিপদ যদি আসে তা হলেই জানব যে মায়াপাহাড়ের পথে চলেছি। কোনো দিকে দৃক্‌পাত করব না। পিছন ফিরে তাকাব না। সোজা এগিয়ে যাব তীরের মতো। বীরের মতো।'

রাজেক হোসেন সাহেব একদিন আমাকে তাঁর মর্মবেদনা জানালেন। তিনি সপরিবারে ঢাকা চলে যাচ্ছেন। বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গ কবে থেকে বাংলাদেশ হলো? সে তো পাঠান মোগলদের আমলেই। সাত শ' বছর ধরে যাকে আমরা সৃষ্টি করেছি, লালন করেছি, ঐক্য দিয়েছি, নাম দিয়েছি তাকেই তোমরা আজ কলমের এক খোঁচায় দু'খানা করে দিলে। পাকিস্তানের এতদিন কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। এখন হলো।'

আমরা দু'খানা করে দিয়েছি! তার মানে আমিও! 'না, সার,' আমি প্রতিবাদ করে বলি, 'আমি এর মধ্যে নেই। সারা ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু, এই তথ্যটাই একদল ভারতীয়ের বরদাস্ত হলো না। তেমনি বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু এ তথ্যটাও একদল বাঙালীর সহ্য হলো না। তথ্য দুটোকে উলটিয়ে দিতে না পেরে তারা তথ্যের থেকে পলায়নের পন্থা খুঁজে বার করল। কলমের এক খোঁচায় ভারত হলো দু'খানা। সেই একই খোঁচায় বাংলাদেশও দু'খানা হলো। কলমের খোঁচায় হয়েছে বলেই রক্ষা। নয়তো তলোয়ারের খোঁচায় হতো। হতোই এটা ধ্রুব।'

মেসোমশায়ের ইচ্ছা নয় যে রাজেনদারা পাঠান আমলের ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ববঙ্গে

প্রস্থান করেন। তা শুনে রাজেক হোসেন বলেন, 'বাড়ীর মেয়েদেরও ইচ্ছে নয়। কলকাতার মতো স্বাধীনতা ঢাকায় কোথায়? বাড়ীর ছেলেদেরও ইচ্ছে নয়। পশ্চিমবঙ্গের মতো সভ্যতা পূর্ববঙ্গে কোথায়? বুলি আলাদা, খানা আলাদা। তবু যেতে হবে। হিন্দুস্থানে আমাদের অতীত আছে, ভবিষ্যৎ নেই। আমরা অনধিকারী।

মেসোমশায় যতই বোঝাতে যান কিছুতেই তিনি বোঝেন না। বলেন, 'ওসব কে বিশ্বাস করে? ইণ্ডিয়া সেকুলার স্টেট! তাই যদি হবে তো পনেরোই অগাস্ট আমাদের মেরে সাবাড় করার আয়োজন চলেছে কেন?'

মেসোমশায় জানতেন না। মাসিমা জানতেন। তা শুনে মেসোমশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বলেন, 'ওহে, তোমরা এখানে মাইনরিটি, কিন্তু ওখানে মেজরিটি। আমি যে সর্বত্র মাইনরিটি। টুর্গেনিভের উপন্যাসের সুপারফ্লুয়াস ম্যান। ফালতো মানুষ। আমি তা হলে কোথায় যাই। আমার মনে হয় গান্ধীজীও এখন সুপারফ্লুয়াস ম্যান।'

কিছুদিন পরে গান্ধীজী কলকাতা এসে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি সুপারফ্লুয়াস নন। পাঞ্জাবের রক্তসিন্ধুর মতো রক্তগঙ্গা বাংলাদেশে যে বইল না এর কারণ নোয়াখালীতে ও কলকাতায় তাঁর শান্তিব্রত। মাসারও এতে সামান্য কিছু হাত ছিল। পনেরোই অগাস্ট হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান মাতালের মতো কোলাকুলি করে। আমি তো অবাক! আরেক দিন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল যখন একদল হিন্দু যুবক গিয়ে মহাত্মার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করল।

পনেরোই রাত্রে মাসিমার ওখানে ছোটখাটো একটি ব্যাঙ্কেট। তাঁর বাড়ী তিনি এবার নিষ্কণ্টক হয়ে ভোগ করতে পারবেন। এ যেন দ্বিতীয়বার গৃহপ্রবেশ। তফাতের মধ্যে একজনও মুসলমান অতিথি নেই। নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁরাই আসেননি। তার চেয়েও বড় তফাৎ—মালা নেই। তার অনুপস্থিতিটা সকলের চোখে বাজছিল।

মেসোমশায় স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। নিশ্চল পাষাণমূর্তি। সকলে একে একে বিদায় নিলে আমার প্রণাম নিয়ে বললেন, 'এই দিনটির জন্যে সারা জীবন ধৈর্য ধরেছি। বেঁচে আছি বলে আমি ধন্য। ইন্দ্রত্বের জন্যে তপস্যা করিনি। ইন্দ্র যারা হতে চায় তারা হোক। আমি তপস্যা করেই মুক্ত। হাঁ, একটা মুক্তির স্বাদ আজ পাচ্ছি। আমার দেশ আজ মুক্ত। আমার দেশবাসী মুক্ত। তা হলে এই আনন্দের দিনে প্রাণভরে আনন্দ করতে কেন বাধছে? দেশ ভেঙে গেছে বলে কি? আবার জোড়া লাগতে কতক্ষণ? জুড়তে চাইলে ইংরেজ কি বাধা দিতে আসছে? কিন্তু গায়ের জোরে জোড়া দেওয়া চলবে না। দিতে হবে প্রেমের জোরে। তেমন জোরালো প্রেম আজ তুমি ক'জনের মধ্যে দেখলে? কোলাকুলিকেই প্রেম বলে ভ্রম হতে পারে। সে ভ্রম ভাঙতে কতক্ষণ? প্রেম দিতে হলে প্রাণ দিতে হয়।'

পরিস্থিতি আবার অবনতির দিকে গেল। ভেবেছিলুম ভূতের লড়াই থেমে গেছে। একটুও না। পাঞ্জাবের খবর থেকে বোঝা গেল সমুদ্রমন্থনে শুধু অমৃত ওঠেনি, গরলও উঠেছে। এবং গরলেরই পরিমাণ বেশী। কে ওই বিষ কণ্ঠে ধারণ করবে? নীলকণ্ঠ হবে? দেবতারা সবাই তো সুধাপানে নিবিষ্ট। সে ওই গান্ধীজী। ভারতের ভাগ্য ভালো যে হলাহল পান করার জন্যে শিবও রয়েছেন।

শচীন মিত্র ও স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন শহীদ হন সেদিন চোখভরা জল নিয়ে মেসোমশায়ের কাছে ছুটে যাই। কথা বলতে গিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদি। তিনিও শোকে অভিভূত। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন নীরবে। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'ওরাই আমার অরুণ বরুণ। আমি ধন্য। আমি ধন্য। আমি কৃতার্থ।'

অরুণ বরুণের পর তো কিরণমালা। মালাও কি এমনি করে আমাদের ছেড়ে যাবে? আমি চোখের জল রোধ করতে পারিনে। তিনি মনে করেন ওটা অরুণ বরুণের জন্যেই। আমিও গোপন করি। মালার জন্যে প্রাণটা হায় হায় করে ওঠে।

যা ভয় করেছিলুম তাই। মালা লিখেছে তার মাকে, 'নোয়াখালী থেকে লাহোর যাচ্ছি। পথে একদিনের জন্যে কলকাতায় নামব। ভেবো না। বাবাকে দেখো। আমার সঙ্গে নির্মলদা যাচ্ছেন।'

রোদে ঝলসানো খসখসে মলিন মূর্তি। কোনো এক আধুনিক ভাস্করের হাতে গড়া। চুলে তেল পড়েনি কতকাল। গায়ে সাবান লাগেনি। স্নো পাউডার তো দূরের কথা। পায়ের পাতা ফেটে চৌচির। স্থলে স্থলে ক্ষতচিহ্ন। খালি পায়ে হাঁটা হয়েছে বোঝা যায়। খোস পাঁচড়ারও দাগ ছিল সেরে যাওয়ার পরেও।

মালার মা মেয়েকে দেখে থ। রুদ্র রূপ ধরে বললেন, 'আমিও গান্ধীজীর মতো আমরণ অনশন করতে জানি। দেখি তুমি কেমন করে লাহোর যাও।'

তিনি সত্যি সত্যি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তা দেখে মেসোমশায়কেও একাদশী করতে হলো। তিথিটা যদিও সপ্তমী কি অষ্টমী।

মাসিমা বললেন, 'আমি ঢের সহ্য করেছি। আর না। আমারি ভুল হয়েছিল তোমাকে মনোরমার সঙ্গে নোয়াখালী যেতে দেওয়া। ভেবেছিলুম দিন কয়েকের মধ্যে ঘুরে আসবে। তুমি যা করেছ আর কোনো মেয়ে আর কোনো দিন তা করেনি। আর কোনো মা তা করতে দেয়নি। ইংরেজের গাফিলতির দায় তোমাকে বইতে হবে কেন? আমরা কি ট্যাক্স জোগাইনি যে তার বদলে বেগার দেব আর প্রাণে মরব? মেয়েদের তারও বাড়া বিপদ আছে। যমের হাত থেকে না হয় বাঁচলে। কিন্তু নরপশুর কবল থেকে? বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। জানো না? সীতার দেশের মেয়ে তুমি।'

মালা নিরুত্তর। তার মা তাকে তালাবদ্ধ না করেও যা করলেন তা একরকম তাই।

অনশনেরও সেই একই ফল হলো। মালা কলকাতায় থামল।

আর নির্মল ? সেও বেঁচে গেল মালার জন্তে ভাবনা থেকে। তার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। সে এলাহাবাদ ফিরে গেল। যাবার সময় আমাকে বলে গেল, 'যত রটেছে তত ঘটেনি। তবু যা ঘটেছে তা সাংঘাতিক। এখন না ঘটলে পরে ঘটতই। তখন আমরা তাকে বলতুম শ্রেণীসংঘর্ষ। একদিকে শতকরা আশিজন চাষী, অন্তদিকে শতকরা আশি ভাগ জমি। কায়দে আজমকে ধন্তবাদ যে তিনি সেটাকে একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করতে দিলেন না। এর ফলে হয়তো শ্রেণীসংগ্রামের মাজা ভেঙে গেল। হিন্দু-মুসলমান চাষী-মজুর একজোট হয়ে আর কোনো দিন লড়তে পারবে বলে মনে হয় না। লড়তে গেলে কোমরে জোর পাবে না। একদিন অনুতাপ করতে হবে।'

এক বছরের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ত্রিশ বছরের কাজ মাটি করে দিয়ে গেল। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী ত্রিশ বছরের ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়ে গেল। শ্রমিক কৃষকদের দিক থেকে এই। আর জাতীয়তাবাদীদের দিক থেকে ? সেদিক থেকে জাতির অঙ্গহানি। আর অহিংসাবাদীদের দিক থেকে ? সেদিক থেকে স্বয়ং গান্ধীজীরই মোহভঙ্গ। জনগণ প্রস্তুত নয়।

॥ দশ ॥

মালার মন থেকে কিছুতেই যায় না যে মায়াপাহাড়ের অবস্থান পঞ্চনদীর তীরে। আর কয়েক কদম এগোলেই সেখানে পৌঁছনো যেত। সেই ক'টি পদক্ষেপ থেকে তার মা তাকে বঞ্চিত করলেন। তাই মুক্তা ঝরার জল আর সোনার শুকপাখী হাতের কাছে এসেও হাতের নাগালের বাইরে থেকে গেল।

এ কথা তো সে মাকে বাবাকে খুলে বলবে না। নোয়াখালী সে কেন গেল, সেখানে কী করে এলো তাও তাঁদের জানায়নি। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে সে গান্ধীজীর মতো শান্তিস্থাপনের ব্রতে নিযুক্ত ছিল। গান্ধীজী আপাতত সেখানে নেই বলে চলে এসেছে। গান্ধীজী এখন দিল্লীতে। পরে হয়তো লাহোর যাত্রা করবেন। তাই মালারও গতি সেইদিকে। তাঁদের কিন্তু সম্মতি নেই তাতে। পাঞ্জাবে যা ঘটেছে তা অমানুষিক। যেমন মুসলমান তেমনি শিখ কেউ কম মারেনি, কম ধরেনি, কম কাড়েনি, কম পোড়ায়নি। হিন্দুদের 'অবদান'ও নগণ্য নয়। তারাও কারো চেয়ে কম পালায়নি।

মেসোমশায় মালাকে বোঝান, 'আমরা এখন ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক। সীমান্তের অপর পারে আমরা যেমন অসহায় তেমনি অনধিকারী। তারাও কি এপারে যখন খুশি

আসতে পারে? লাহোর যাব বললেই তো যাওয়া হয় না। তা যদি হতো গান্ধীজী দিল্লীতে পায়চারী করতেন না। সবুর কর। অবস্থা শান্ত হোক। তার পর যাবে।'

তার পরে যাবার দরকার কী থাকবে? মানুষ বিপন্ন বলেই না যাওয়া? মালা আপনাকে বাঁচাতে চায় না। চায় পরকে বাঁচাতে। বিশেষ করে মেয়েদের উদ্ধার করতে। দু'পক্ষই নাছোড়বান্দা। যতক্ষণ এরা না ছাড়ে ততক্ষণ ওরা ছাড়বে না। যতক্ষণ ওরা না ছাড়ে ততক্ষণ এরা ছাড়বে না। দু'পক্ষই রাবণ।

আমিও তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। সে বুঝেও বোঝে না। রূপকথার জগতে সীমান্ত নেই। রাজপুত্র ঘোড়া চালিয়ে দেয় অবাধে। কিরণমালা'কে সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়নি। মায়াপাহাড়ের মায়া সরকার আপত্তি করেনি। বোধহয় টের পায়নি। টের পেলে কি সোনার শুকপাখী বিনা মাশুলে পাচার করতে দিত?

'এটা রূপকথার জগৎ নয়।' আমি ধরো ধরি।

'তা হলে এটা কিসের জগৎ?' মালা প্রশ্ন করে।

মামুলি উত্তর দিতে আমার বাধে। তলিয়ে দেখলে রহস্যের কূলকিনারা পাইনে। কোটি কোটি সূর্য তারা নীহারিকার দিকে তাকাই, যাদের শাদা চোখে দেখা যায় না সেইসব অণু পরমাণুর দিকেও। বাস্তব কি কেবল মানুষের ক্ষুদ্র সংসারযাত্রা? এ বাস্তব কি দিন ফুরোলে অবাস্তব নয়? হাজার হাজার বছর পরে আজকের বাস্তবের মূল্য কী? মূল্য যদি কারো থাকে তবে সে ওই রূপকথার।

'এটা কিসের জগৎ সে কি আমি এক কথায় বলতে পারি, মালা?' আমি সোজাসুজি উত্তর দিতে অক্ষম হয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলি, 'একে প্রকাশ করতে হলে, অমর করতে হলে রূপকথার প্রয়োজন হয়, সঙ্কেতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এতে বাস করতে হলে, প্রাণ ধারণ করতে হলে রূপকথায় বা সঙ্কেতে কুলোয় না। তার জন্যে চাই বাস্তববোধ। পদে পদে খেয়াল রাখতে হয় যে এটা রূপকথার জগৎ নয়।'

উপদেশের মতো শোনায়। যে কোনো সংসারী বিজ্ঞলোক যে ভাষায় কথা বলে থাকেন। মালা বুঝতে পারে যে তাকে প্র্যাকৃটিকাল হতে বলা হচ্ছে। সে আপত্তি করে না। বলে, 'বাস্তববোধ যদি আমার না থাকে তবে আমি তা অর্জন করতে রাজী। তা বলে যেটা আমার আছে সেটা কেন বর্জন করব? বার বার আশাভঙ্গ মোহভঙ্গ ঘটবে। তা সত্ত্বেও পদে পদে স্মরণ রাখব যে এটা রূপকথার জগৎ।'

মালা আমাকে দিনে দিনে তার মায়াপাহাড়ের অভিযান কাহিনী শোনায়। ঘটনা-গুলোর যে অংশটা পার্থিব সে অংশটা আমি বাদ দিই। যেটুকু অপার্থিব সেটুকু নিই। তার সঙ্গে আর কিছু মেশাই, যেটা পার্থিবের দ্যোতনা জাগায়। এমনি করে মায়া-পাহাড়ের অভিযানকাহিনী চিত্রে রূপান্তরিত হয়। নোয়াখালী চাক্ষুষ করিনি। তার

জন্তে ছবি আঁকা আটকায় না। আমি তো নোয়াখালীর বিবরণী সচিত্র করতে বসিনি। আমার পদ্ধতিটাও বাস্তবধর্মী নয়। তার জন্তে অন্য লোক আছে। তাদের বরাত দিলে তারা এমন চমৎকার করে আঁকবে যে মনে হবে যেন অবিকল নোয়াখালীর ঘরবাড়ী পথঘাট ধানক্ষেত মাঠ। আর একালের বর্গীর হাঙ্গামা। আর তারই মাঝে একটি পথচারী বৃদ্ধ। একালের বুদ্ধ।

না। আমার এসব ছবিতে অবিকল বলে কিছু নেই। সেইজন্তে সকলের ভালো লাগে না। সকলের জন্তে আমি বাঁ হাতে পোস্টার আঁকি। বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকি। তা দিয়ে আমার সংসার চলে। আর ডান হাতে আঁকি যা আমাকে অমর করবে। আমাকে না করুক আপনাকে অমর করবে।

মালা আমার ছবিগুলো দেখে বলে, 'হাঁ। হয়েছে।'

এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে? এই তো রসবিচারের শেষকথা। আমি নোয়াখালীও দেখিনি, মালা'ও নই, অভিজ্ঞতাগুলোও আমার নিজের নয়। তবু যা এঁকেছি তা 'হয়েছে'। অন্তত মালার চোখে।

মালাকে আমি ছবি দেখাতে দেখাতে একটু একটু করে ভুলিয়ে নিয়ে যাই লাহোরের পথ থেকে। সে আর বাড়ী ছেড়ে বাহির হবার কথা মুখে আনে না। বোধহয় মনেও আনে না। মাসিমা ও মেসোমশায় তাকে যেতে দেননি বলে সে আর অশান্ত বা বিমর্ষ নয়। মুক্তা ঝরার জল আর সোনার শুকপাখী আনা হলো না বলে বিষাদ বোধ করে না। অরুণ বরুণ পাথর হয়ে গেছে, কত রাজ্যের রাজপুত্র পাথর হয়ে গেছে, তাদের জীবন দিতে হবে বলে ব্যাকুল বোধ করে না। এক কথায়, সে আর কিরণমালা নয়। সে মালা হয়ে গেছে।

তাই যদি হলো তবে আর রূপকথার রাজপুত্রের জন্তে প্রতীক্ষা করা কেন?

একদিন ওকে নিরালায় পেয়ে এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করি আমি। ও চমকে ওঠে। আমি ওকে আরো বড় চমক দিই। বলি, 'তোমার চোখের সামনেই একটা পাথর পড়ে আছে। সে রাজপুত্র না হলেও তুমি তাকে জীবন দিতে পারো। মুক্তা ঝরার জল তোমার ঝারিতেই আছে, মালা। সোনার শুকপাখী আছে তোমার দাঁড়েই। তুমি কি তাকে বাঁচাবে না?'

মালা প্রথমটা বুঝতে পারেনি কার কথা হচ্ছে। কোন্ কথা হচ্ছে। বুঝল যখন তখন তার মুখে সিঁদুর লাগল। সে সলজ্জভাবে মুখ নত করল। তার পর মুখ তুলে চোখের কোণে তাকালো। তার পর আমাকে চমকে দিয়ে বলল, 'তুমি রাজপুত্রই। রূপলোকের রাজপুত্র।'

তা হলে আর কী? আমার আশা আছে। মালার সঙ্গে আর একটি কথাও না।

সেই দিনই মাসিমার সঙ্গে দেখা করি। একটু গৌরচন্দ্রিকার পর নিবেদন করি যে আমি তাঁর কন্যার অযোগ্য পাণিপ্রার্থী।

'তুমি!' মাসিমা বিশ্বাস করতে পারেন না। 'তুমি! দেবপ্রিয়! মালার—' তিনি শেষ না করে কেঁদে ফেলেন।

আমি তো ধরে নিয়েছিলুম যে তিনি পাদপূরণ করবেন এই বলে, 'মতো মেয়ে কি বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা হবে!'

তা নয়। তিনি কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'তুমি যে আমাদের কত বড় বন্ধু তা এই বিপদের দিনেই বুঝতে দিলে। ও মেয়ে কোন্ দিন না লাহোর চলে যায় সেই ভয়ে আমার চোখে ঘুম ছিল না। এ কি সত্যি! তুমি! দেবপ্রিয়! আশ্চর্য! কেন যে এ কথা কোনো দিন মনে হয়নি! কিসে তুমি কম! মালাকে বলেছ? সে কী বলে?'

এর পরে মেসোমশায়ের সঙ্গে কথা। মাসিমাই আমার হয়ে পাড়লেন। তিনিও তেমনি আশ্চর্য। তেমনি প্রীত। তেমনি সম্মত। আনন্দে আমাকে বুকে টেনে নিলেন।

আশ্চর্য হলো না শুধু একজন। সে আমার বোন নীলি। সে নাকি অনেক আগেই টের পেয়েছিল যে এইরকমই হবে। না হয়ে পারে না।

সম্প্রদান করলেন মেসোমশায় যথারীতি। কিন্তু সেইখানেই তাঁর কর্তব্য ফুরোল না। আমাদের দু'জনকে পাশে বসিয়ে তিনি নীরবে উপাসনা করলেন। মনে মনে কী বললেন, কাকে উদ্দেশ করে বললেন তিনিই জানেন। তিনিও ধ্যানস্থ, আমরাও তাই। আমি আমার রূপের দেবতাকে উদ্দেশ করে মনে মনে বললুম, এখন থেকে আমার পূজা তেমন ঐকান্তিক হবে না, প্রেমকে ভাগ দিতে হবে। কিন্তু তোমাকে যা উৎসর্গ করব তার মধ্যে এবার থেকে রসের সঞ্চার হবে, প্রেম মিশিয়ে দেবে রস।

বিয়ের পরে মালা আর আমি মধুমাস যাপনের জন্যে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু পশ্চিম-মুখো হতে আমার ভয়। পাছে মালা বলে বসে, 'দিল্লী চল। গান্ধীজী এখনো সেখানে।' কিংবা 'লাহোর চল। ক্রন্দনের রোল এখনো উঠছে।' তেমনি পূবমুখো হতেও সাহস হয় না। পাছে শুনতে হয়, 'নোয়াখালী চল। যা শুরু করে এসেছি তা শেষ করা চাই।'

তাই দক্ষিণ মুখে যাই। পুরীর সমুদ্রতীরে ডেরা বাঁধি। প্রতিদিন সমুদ্রের স্বাদ নিই। আমার কতকালের সমুদ্র। একই সমুদ্র এ দেশে আর ও দেশে।

সেই মধুরতম দিনগুলিতে আমরা আর কোনো কথা ভাবিনি। ভাবতে চাইনি। ভাবতে দিইনি। খবরের কাগজ পড়িনি। রেডিওর খবর শুনিনি। লোকের সঙ্গে মিশিনি। আমরাই আমাদের সমাজ। চিঠিপত্র যারা লিখত তাদের বলা ছিল দেশের খবর যেন না দেয়। জানতুম সে খবর মালাকে আনমনা করে তুলবে।

আমাদের চারদিকে আমরা এক গজদন্তের মিনার গড়ি। সে মিনারে প্রেম আর

প্রেম এই নামের এক যুগল বসতি করে। বাইরের জগৎ বাইরেই থাকে। ভিতরে প্রবেশ পায় না। সে তৃতীয় পক্ষ। মিনারে বসে আমি অনলসভাবে ছবি এঁকে যাই। মালা অনলসভাবে রাঁধে বাড়ে ধোয় মাজে ঝাড়ে মোছে সাজায় গোছায় কাচে। সময় পেলেই সেতার নিয়ে বাজায়। আমি কখনো শুনি, কখনো শুনিনে। আমাকে যে তন্ময় থাকতে হয় হাতের কাজ নিয়ে। সেও একপ্রকার সঙ্গীত। তাকে শুনতে হয় চোখ দিয়ে আর চোখ ভরে। মালার সেতার যেমন আমার জন্যে বাজে তেমনি আমার তুলিও মালার জন্যে রঙের খেলা খেলে।

দুঃখের দিনে একটা মাস যেন একটা বছর। কিন্তু সুখের দিনে একটা দিনের মতো ক্ষীণ। দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। মাস শেষ হয়ে আসছে দেখে আমি কাতর হই। কী যেন একটা হারিয়ে যাচ্ছে। তাকে ধরে রাখতে পারছিনে। মালা কিন্তু একটুও কাতর নয়। ও জানে যে সুখ ওরই নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। ও যদি না যেতে দেয় তবে যাবে না। যতক্ষণ না যেতে দেয় ততক্ষণ থাকবে। ওর কাছে মধুমাস শুধু প্রথম মাসটাই নয়। পরের মাসগুলোও মধুমাস। একটা ফুরিয়ে গেলেও আর একটা তার জায়গা নেয়। পরম্পরার ছেদ নেই। একটা হারিয়ে গেলেও আর একটা মেলে। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। আমি অকারণে কাতর হচ্ছি। 'নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই ফাগুন তখনো যাবে না।' মহাকবি বচন। আহা! তাই যেন হয়!

বাইরে মহাসিন্ধুর অশান্ত কলরোল। কান বধির করে দেয়। আমাদের গজদন্তের মিনারে বসে আমরা প্রণয় গুঞ্জনের নিরালা পাই। মধুমাস হয়তো কোনো দিন ফুরোবে না। কিন্তু এই ঝড়ঝঞ্ঝার যুগে জীবন নিঃশেষ হয়ে যেতে কতক্ষণ! যৌবন তো এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে এলো আমার। আমিও তাই ইচ্ছা করেই বধির হই বহির্জগতের অশান্ত কলরোলের প্রতি। সে তার গর্জন নিয়ে থাকুক। আমিও আমার গুঞ্জন নিয়ে থাকি। আমি জানি যে আমি যেদিন নিঃশেষ হয়ে যাব সেদিনও এই ঝড়ঝঞ্ঝার যুগ বাইরে ফুঁসতে থাকবে। একবার পা টিপে টিপে পিছু হটবে, তার পর আবার বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মালাকে নিভৃতে কানে কানে বলি, 'দুঃখ পেতে পেতে আমি সুখের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলুম। না দেখলে বিশ্বাস হতো না যে আমার অদৃষ্টে সুখ আছে। এখন আমি সুখের আস্বাদন পেয়েছি। আমার কিন্তু ভয় করছে। এত সুখ কি আমার কপালে সইবে!'

'ভয় কিসের! আমি তো থাকব বলেই এসেছি।' মালা আমার কানে কানে বলে। পাশাপাশি শুয়ে।

'কে জানে কোন্ দিন তুমি আবার রক্তের নদী আর হাড়ের পাহাড় দেখে উতলা হবে! বেরিয়ে পড়বে মরা রাজপুত্রদের বাঁচাতে। পাষাণের গায়ে মুক্তা ঝরায় জল

ছিটোতে। ভুলে যাবে যে যাকে রেখে যাচ্ছ সেও একটা পাষাণ। দুঃখ পেতে পেতে পাষাণ। তোমার কল্যাণে তার শাপমোচন হয়েছে। তোমার অভাবে আবার না পাষাণে পরিবর্তিত হয়।' আমি শঙ্কিত সুরে বলি।

'না। আমি আর বেরিয়ে পড়ব না।' মালা আমাকে অভয় দেয়। 'আমি দেখে এসেছি ও পথে আরো পথিক আছে। আরো পথিক থাকবে। তাদের কেউ না কেউ মায়াপাহাড়ে পৌঁছবে। মুক্তা ঝরার জল আনবে। একদিন না একদিন পাথরের ঘুম ভাঙাবে। হয়তো নিকট ভবিষ্যতে নয়। হয়তো আমাদের জীবনে নয়। কিন্তু আসবে সেদিন। আসবে।'

ও যেন বিশ্বাস ও আশা মূর্তিমতী। অবিচল। অটল। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি। আর মনে মনে ধন্যবাদ দিই। আপনাকে। আমার এ সৌভাগ্য দেবতাদের ঈর্ষা না জাগালে হয়।

'মালা', আমি ওকে নিশ্চিন্ত হয়ে বলি, 'আমরা দু'জনে যদি দু'জনকে সুখী করতে পারি তা হলে এমন কিছু করলুম যাতে জগতে সুখের অনুপাত বেড়ে গেল। তার ফলে জগতে দুঃখের অনুপাত কমে গেল। এ যেন অমাবস্যার রাত্রে একটি রংমশাল জ্বালানো। সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যা হয়ে যায় দেয়ালী। ক্ষণকালের জন্যে হলেও আঁধার আলো হয়ে যায়। আমাদের সুখ আর-কারো সুখে বাদ সাধছে না। বরং আর-সকলের অজ্ঞাতে আর-সকলকে সুখী করছে। একটি পাথরকে প্রাণদানও প্রাণের সর্বতোবিস্তার।'

'আমি কিন্তু', মালা ভেবে বলে, 'সুখী হলেই আরো বেশী করে অনুভব করি যে আমার মতো বহু মেয়ে অসুখী। তাদের অ-সুখ কি লেশমাত্র কমলো!'

'কমলো বইকি।' আমি নিশ্চয়তা দিই। 'স্পষ্ট নয় যদিও। কমতেই হবে। না কমলে জগতের হিশাব মিলবে কেমন করে?'

মালা মৃদু হাসে। 'আমি কি অঙ্ক কষতে বিয়ে করেছি? সুখী করতেই আমার আসা। সুখী না করে আমি যাচ্ছিনে। নিজে সুখী না হলেও তোমাকে সুখী করতে আমি যথাসাধ্য করব।'

'নিজে সুখী না হলেও?' আমি অভিমান করি। 'কেন সুখী হবে না তুমি? আমি তা হলে কী করতে আছি?'

'তুমি?' মালা আমার হাতে হাত জড়িয়ে বলে, 'তুমিও তোমার সাধ্যমতো করবে। তোমার চেষ্টা ব্যর্থ যাবে না। আমি সুখী হব। কিন্তু ঐ যে বলেছি। আমি সুখী হলে তো নোয়াখালীর মেয়েদের পাঞ্জাবের মেয়েদের অ-সুখ লেশমাত্র কমলো না। তাদের অ-সুখ আমার সুখকে লজ্জা দিতে থাকবে।'

আমি ব্যথা পাই। জগতে শয়তান আছে। তারা শয়তানি করবে। আমি তার কী করতে পারি। অভাগিনী মেয়েরা ভুগবে। আমি তার কী করতে পারি! মাঝখান থেকে মালা হবে অসুখী। আমার আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও অসুখী। হায়! এমন কোনো

'কৌশল আমার জানা নেই যা দিয়ে দুঃখিনীদের দুঃখ দূর করতে পারি। থাকলে আমি রাজা ক্যানিউটের মতো ঝড়ের সমুদ্রকে বলতুম, 'সমুদ্র, তুমি হটে যাও।' অমনি সমুদ্র যেত হটে। ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে যারা ঘায়েল হয়েছে তারা আবার উঠে দাঁড়াত। গায়ের বালি ঝেড়ে ফেলত। জল মুছে ফেলত। যেন কিছুই হয়নি। হায়! সমুদ্র হটবে না। ক্যানিউটকেই হটতে হবে।

মালার একটি কথায় আমার একটু আপত্তি ছিল। মুখ ফুটে জানাই, 'সাধ্যমতো সুখী করতে যে কোনো পুরুষ পারে। আমি করব সাধ্যের চেয়েও বেশী। আমি করব অসাধ্যসাধন। তাতে যদি তোমাকে সুখী করতে পারি।'

মালা আমার হাতখানি টেনে নিয়ে মুখে ছুঁইয়ে বলে, 'আমি তা বিশ্বাস করি। তবু তোমাকে বারণ করব সাধ্যাতীতের সোনার হরিণ ধরে আনতে। সীতার উচিত ছিল রামকে নিবৃত্ত করা। তা না করে তিনি প্রবৃত্ত করেন।'

আমার বুকটা কেঁপে ওঠে। তৃতীয় জনকে আমি বড় ভয় করি।

মালা বলে যায়, 'তুমি মহৎ শিল্পী হবে। এটা পুরুষোচিত উচ্চাভিলাষ। আমি তোমাকে বাধা তো দেবই না, বরং তোমার সহায় হব। কিন্তু স্ত্রীকে সুখে রাখার জন্যে প্রাসাদ তৈরি করাই যদি লক্ষ্য হয় তবে সেটা অনুচিত উচ্চাভিলাষ। দাসদাসী দিয়ে ভরিয়ে দেওয়াও তাই। এর জন্যে যদি তুমি চোখ ধাঁধানো তসবির আঁকো আর মুঠো মুঠো মোহর পাও তা হলে তুমি আমার সমর্থন হারাবে।'

মালাকে সুখী করার জন্যে এসবই আমি পারতুম। কিন্তু পারলে অসুখী হতুম। মালা আমাকে এর থেকে মুক্ত করে দিল।

কলকাতা ফিরে আসার পর আমাদের নিজেদের সংসার শুরু হলো। আমার মা রইলেন আমাদের সঙ্গে। ভবানীপুরের বাসাটাতে একে জায়গা কম, তার উপর সেকেলে বন্দোবস্ত। মালার অসুবিধে হবারই কথা। তবু ও হাসিমুখে সহ্য করল। ওর মা ওকে বলেছিলেন তাঁর বাড়ীর এক অংশ ভাড়া নিয়ে নিজের ঘরকন্না পাততে। কিন্তু আমার মাকে সেখানে যেতে বলা যায় না। তিনি নারাজ হতেন। তাঁকে একা ফেলে রেখে আমাকে নিয়ে যেতে মালাও নারাজ।

প্রায়ই মসিমা ও মেসোমশায়ের কাছে যাই। বলা উচিত শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও শ্বশুর মহাশয়। কিন্তু বলতে বাধে। এতক্ষণ যা বলে এসেছি তাই বলে যাচ্ছি। আর বেশী বাকীও নেই। মাসিমার মনে এখন নবীন উৎসাহ। আবার আগের মতো বুধবার-বুধবার পার্টি দিচ্ছেন। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সমাজকল্যাণও করছেন। নতুন গভর্নমেন্টে তাঁর যথেষ্ট খাতির। সে যে কবে অগাস্ট আন্দোলনের সময় ত্যাগস্বীকার করেছিলেন সেটা এতদিন পরে ডিভিডেণ্ড দিচ্ছে।

মেসোমশায় তেমনি চিন্তাকুল। মাসিমার মতে ওটা একটা রোগ। কেননা দেশ স্বাধীন হবার পর চিন্তার আর কী আছে? যেটা ছিল সেটা তো লঙ্কাভাগ করে মিটিয়ে দেওয়া গেল। কেন তা হলে অনর্থক মন খারাপ করা? এই ভালো। ভাগ না দিয়ে যখন ভোগ করা যেত না তখন একভাবে না একভাবে ভাগ করতে হতোই। চাকরি ভাগ করতে হতো, দোকান ভাগ করতে হতো, কারখানা ভাগ করতে হতো, খামার ভাগ করতে হতো। তেমন ভাগাভাগির শেষ কোথায়? তার চেয়ে এই ভালো নয় কি? এর মধ্যে একটা চূড়ান্ততা আছে।

কলকাতাকে শান্ত করে গান্ধীজী নোয়াখালী রওনা হবেন এমন সময় ডাক এলো দিল্লী থেকে। যে মানুষের পূবমুখে যাবার কথা তাঁকে যেতে হলো পশ্চিমমুখে। সেখানে নোয়াখালীর বিপরীত সমস্যা। সংখ্যালঘু মুসলমান বিপন্ন। তাঁর মনে আশা ছিল তাঁর নিকটতম সহকর্মীরাই যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখন তাঁদের ক্ষমতা তাঁর মিশনের সহায়ক হবে। দিল্লীতে সফলকাম হয়ে তিনি নোয়াখালীতেও সাফল্যের জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করবেন। এক সমস্যার সমাধানে অপর সমস্যারও সমাধান হবে। সর্বত্র সংখ্যালঘু সুরক্ষিত হবে। রাষ্ট্রই সুরক্ষার দায়িত্ব নেবে। সংখ্যাগুরুই সদ্‌ব্যবহারের অঙ্গীকার দেবে।

কিন্তু মাসের পর মাস যায়। তাঁর মিশন অসমাপ্ত থাকে। তিনি দেখতে পান দেশ ভাগ হয়ে যাওয়াই চূড়ান্ত নয়। ভাগ হয়ে যাচ্ছে জনগণ। ভাগ হয়ে যাচ্ছে চাষী, কারিগর, মুদি, মজুর, ভিখারী। ভাগ হয়ে যাচ্ছে গরিব দুঃখী সর্বহারা। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে রাষ্ট্র কতবার খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে, কিন্তু জনগণ বরাবরই অবিভাজ্য। তারা যদি স্বেচ্ছায় দু'ভাগ হয়ে যেত তা হলেও তিনি তাদের বুঝিয়ে নিরস্ত করতেন, কিন্তু এ যা হচ্ছে তা ছলে বলে কৌশলে। হতে পারে ওপারের ক্ষমতাশালীদের লক্ষ্য পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করে একই ঢিলে ভারতকেও মুসলিমশূন্য করা, ভারতকে 'হিন্দুস্থানে' পরিণত করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেও পরাস্ত করা। কিন্তু এপারের এঁরাই বা ও খেলায় যোগ দিয়ে পরাস্ত হতে যান কেন? পরকে লক্ষ্যভেদ করতে দেন কেন? ভারত মুসলিমশূন্য ও পাকিস্তান হিন্দুশূন্য হলে চরম পরিণতি তো গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ ও গরুড়ের দ্বারা বিনাশ।

'ওহে দেবপ্রিয়,' মেসোমশায়ই আমাকে সর্বপ্রথম খবর দেন, 'শুনেছ? গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেছেন। আমরণ অনশন।'

'হঠাৎ!' আমি আঁতকে উঠি। এই স্থবির বয়সে আমরণ অনশন!

'হাঁ। হঠাৎ।' মেসোমশায় উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। পাকিস্তান খোলাখুলিভাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতরাষ্ট্রও যদি ভিতরে ভিতরে তাই হয় তবে জিন্নানেতৃত্বেরই জয় হলো। গান্ধীনেতৃত্ব রইল কোথায়! গান্ধীজীর বেঁচে

থেকেই বা কাজ কী! তাঁর চোখের সামনে কোটি কোটি মানুষ উৎপাটিত হতে চলেছে। স্বাধীনতা কি তা হলে সর্বনাশ করার স্বাধীনতা? গান্ধীজী কি তা হলে দেশকে স্বাধীন করে দিয়ে আরব্য উপন্যাসের দৈত্যকে জালার ভিতর থেকে ছাড়া দিয়েছেন? এবার বুঝি সে তার মুক্তিদাতাকেই পেটে পুরবে?'

আমি শিউরে উঠি। মেসোমশায় অস্থিরভাবে পদচারণ করতে করতে বলে চলেন, 'দীর্ঘ যাত্রাপথের শেষপ্রান্তে এসে মহাত্মা দেখছেন প্রত্যুষে যেমন তিনি একা ছিলেন প্রদোষেও তেমনি একা। তাঁর সহযাত্রীরা এখন আর কোটি কোটি নয়, লক্ষ লক্ষ নয়, একটি কি দুটি। অহিংসাকে তো দুর্বলতা বলে দেশের লোক ছেড়েছে। বাকী থাকে সত্য। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে সত্যকেও বিপজ্জনক বলে ছাড়বে। ভারতের জনগণ যে ধর্মনির্বিশেষে এক এই সত্যটাকেও মুসলমানের সঙ্গে সঙ্গে মেরে খেদিয়ে দেবে। সত্য আর অহিংসা যদি না থাকে তবে গান্ধীজী থাকেন কী করতে?'

'তা মুসলমানের আর এ দেশে বসবাস করার অধিকারটাই বা কিসের?' মাসিমা বলেন গম্ভীর ভাবে। 'দেশ ভাগাভাগির দরকারটাই বা কী ছিল, ওরা যদি এ পারেই থেকে যাবে ও আবার আমাদের জ্বালাবে? হিন্দু ও পারে টিকতে না পারলে মুসলমানকেও এ পারে টিকতে দেওয়া হবে না। গান্ধীজী অনশন করলেও না। সেণ্টি-মেণ্টাল না হয়ে দৃঢ় হতে হবে।'

এই মনোভাব থেকে আমার বন্ধুরাও মুক্ত নন। আমি নিজে মুক্ত, তার কারণ আমি বিহারের জন্যে অনুতপ্ত। আমার সে সময় খেয়াল ছিল না যে ভূতের লড়াইতে আমিও পরোক্ষ ভাবে পক্ষ নিচ্ছি। আমি চাই ভূত ছাড়াতে। হিন্দু ছাড়াতে বা মুসলমান ছাড়াতে নয়। কিন্তু যা শুনছি দিল্লীর সরষের ভিতরেই ভূত। সরষেকে শুদ্ধ করতেই গান্ধীজীর অনশন।

মেসোমশায় মাসিমার কথা কানে না তুলে বলেন, 'লবণ যদি তার লবণত্ব হারায় তা হলে তাকে লবণাক্ত করার কী উপায়? এই হলো মহাত্মার অনশনের অন্তর্নিহিত প্রশ্ন। অন্তত কতক লোককে ফিরে যেতে হবে মূলনীতিতে, যে মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে জগতের সমক্ষে, যাকে অনুসরণ করা হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বে। পাকিস্তানের আলপিনের খোঁচা যদি আমাদের নীতিভ্রষ্ট করে তবে সামনে যে মহাযুদ্ধ আসছে, বিপ্লব আসছে, তার সঙীনের খোঁচার সম্মুখীন হব কী করে? জনগণ যদি আজকেই ভেঙে যায় তো কালকে প্রাচীর গড়বে কে? হিন্দু সৈন্য?'

মালা আমাকে পরে একদিন আড়ালে বলে, 'দিল্লী যেতে এত ইচ্ছে করে, কিন্তু তোমাকে আমি কার হাতে দিয়ে যাব?'

'কেন?' আমি ওকে পরীক্ষা করি। 'এতদিন আমি কার হাতে ছিলুম?'

'বিয়ের আগে কী ছিরি হয়েছিল তোমার! দিনমান কফি আর স্যাণ্ডউইচ খেয়ে স্টুডিওতে খাটলে শরীর থাকে!' মালা আমাকে শুনিয়ে দেয়। সত্যি। মালার হাতে পড়ে এরই মধ্যে আমার ওজন বেড়েছে। রংটাও মনে হয় এক পোঁচ ফরসা হয়েছে।

'বিয়ের পরে', আমি রঙ্গ করি, 'সব মেয়েই সমান। মায়াপাহাড় থেকে ফিরে কিরণমালাকেও বিয়ে থা করে স্বামীর জন্যে রাঁধতে হয়েছিল। স্বামীটি তো সেই বেপরোয়া রাজপুত্তুর যে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে এসেছে, তেপান্তরের মাঠে ঘোড়া ছুটিয়েছে। কোথাও তো লেখে না যে তার সঙ্গে রাঁধুনী ছিল বা সে দু'বেলা খেতে পেয়েছে। অথচ বিয়ের পর তারও দেখা যায় বৌয়ের হাতের পঞ্চাশ ব্যঞ্জন না হলে মুখে পলান্ন রোচে না।'

পরিহাসের কথা নয়। সত্যি আমার আশঙ্কা আমিও সেই রাজপুত্রের মতো একটু একটু করে অলক্ষিতে পোষমানা প্রাণী বনে যাব। যাকে বলে ডোমেস্টিকেটেড। সেটা আর কোনো মেয়ের হাতে না বনে মালার হাতে বনলে এমন কী সান্ত্বনা! শিল্পীরাও খেতে ভালোবাসে। কিন্তু তাব জন্যে পোষ মানতে ভালোবাসে না। পোষ মানলে এমন কিছু হারায় যার ক্ষতিপূরণ নেই। মনের ভিতরে আমারও এই অভিলাষটি ছিল যে বিয়ের পরে আমিও যেমনকে তেমন থাকব। সেলিবেট নয়, ব্যাচিলার। আমার জীবনযাপনের ধরন ধারণের উপর বৌ এসে মুরুব্বিয়ানা ফলাবে না। পদে পদে জবাবদিহি চাইবে না। রেঁধে খাইয়ে তৃপ্ত করে দাসখৎ লিখিয়ে নেবে না। আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খাবে না। অথচ মালা একটা দিন বাপের বাড়ী গেলে আমি চোখে অন্ধকার দেখি। বেশ বুঝতে পারি আমার সেই প্রচ্ছন্ন অভিলাষটি বিবাহের সঙ্গে বেখাপ। সেটিকে বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু তা হলে আবার প্রশ্ন ওঠে, আমি শিল্পী থাকব তো? না বিবাহের সঙ্গে বেখাপ বলে আমার শিল্পীসত্তাটিরও বিজয়াদশমী অনিবার্য?

গান্ধীজী সে যাত্রা বেঁচে গেলেন। অনশনে তাঁরই জিত হলো। কিন্তু যাদের হার হলো তারা কেন তাঁকে বাঁচতে দেবে! গয়ায় পিণ্ডি না পাওয়া ভূতকে প্রমাণ করতে হবে যে তারই বয়স বেশী। সে-ই অধিকতর ভূত। মামদো তার কাছে সেদিনকার ছেলে। মামদো বড়জোর একজন গুণীলোকের ঘাড় মটকাতে পারে, কিন্তু একজন মহামানবের বুকে বুলেট বসিয়ে দিতে তারও হাত উঠবে না। ব্রহ্মদৈত্য না হলে কার এত বড় স্পর্ধা হবে!

সে কালরাত্রি কি পোহাতে চায়! মালা মেজের উপর লুটিয়ে পড়ে সারা রাত কাঁদে ও কাঁপে। আমি ওর গায়ে একখানা কম্বল জড়িয়ে দিতে যাই। ও ঠেলে সরিয়ে দেয়। ও যেন কষ্টভোগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি পাহারা না দিলে মাথা খুঁড়ে রক্তপাত করত। এক পেয়ালা দুধও খাবে না। অগত্যা আমারও অনশন। ওই এক পেয়ালা দুধ বাদে। মা ঠাকুরঘরে ঢুকে রামধুন গুন গুন করতে থাকেন। তাঁরও সে রাত্রে একরকম লঙ্ঘন। শুয়ে

শুয়ে আমি সারা ভারতের—সারা ভারতের কেন, সারা জগতের—বিয়োগব্যথা অনুভব করি। আর ভাবি শিল্পী কেমন করে এই অসীম শোককে সীমার মধ্যে এনে রূপ দেবে।

পরের দিন ও বাড়ীতে গিয়ে দেখি মাসিমা মেসোমশায় দু'জনেই অভিভূত। পাড়ার মুসলমানরা অনাথ অনাথার মতো তাঁদের ওখানে এসে নীরবে শোক জানিয়ে যাচ্ছে। মাসিমা উত্তেজনা দমন করে বলেন, 'শুনেছ, দেবপ্রিয় ? কাল রাত্রে অনেক হিন্দুর বাড়ী ভোজ হয়েছে। কেউ কেউ নাকি আগে থেকেই তৈরি ছিল। জানত।'

কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস। আমি ক্রোধে জ্বলি। কিন্তু চোখের জল ধরে রাখতে পারিনে। সারা রাত বাঁধ দিয়ে রোধ করেছিলুম। বৃথা হলো।

মেসোমশায়েরও রাত্রে ঘুম হয়নি। চোখ দুটো ফোলা ফোলা। লালচে। আমাকে পাশে বসিয়ে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ধরা গলায় বলেন, থেমে থেমে, 'ইতিহাসে আমরা আগেও এ দৃশ্য দেখেছি। মানবপুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন আর পুরোহিতদের ঘরে ঘরে ভোজ চলেছে। এমন কি জনতাও তাদের দলে ভিড়ে আনন্দ করেছে। সেদিনকার সেই পাপের ফল এখনো ভুগতে হচ্ছে তাদের বংশধরদের। দেখে দুঃখ হয়। সে রকম দুর্ভাগ্য যেন আমাদের বংশধরদের না হয়। আজকের দিনে এই আমাদের প্রার্থনীয়।' তিনি ধ্যানস্থ হন।

আমরা সকলে মিলে প্রার্থনা করি। অবশ্য এই একমাত্র প্রার্থনীয় নয়। কাকে যেন উদ্দেশ করে মেসোমশায় বলেন, 'জীবন তোমার সহায়তা করতে যতদূর পেরেছে ততদূর করেছে। আর পারছিল না। এবার মৃত্যু তোমার সহায়তা করবে। তোমার কাজ একদিনও বন্ধ থাকবে না। এক মুহূর্তও না। তোমার কাজের মধ্যেই তুমি বেঁচে থাকবে। যে বাঁচায় সে-ই বাঁচে। প্রাণ দিয়ে তুমি প্রাণ দিলে। এ পারের লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভাইকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলে। ও পারের লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভাইকেও বাঁচালে। আমাদের চিন্তায় ও কর্মে, ধ্যানে ও রূপায়ণে তুমি বাঁচবে। আর কারো সাধ্য নেই যে তোমাকে মারে, তোমার গতি রোধ করে। হে পথিক, তুমি অগ্রসর হয়ে আমাদেরও অগ্রসর করে দাও।'

মেসোমশায় পরে একদিন বলেন, 'হিন্দু মুসলমানের এ বিচ্ছেদও সত্য নয়, এ বিরোধও নিত্য নয়। সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক হবে না শুধু এই মহান ট্র্যাজেডী।'

মালার কান্না কি সহজে থামে ! তবু প্রবলতম শোকেরও উপশম আছে। ও একটু একটু করে শান্ত হয়। ও যেন বহুদিনের অসুখ থেকে সেরে উঠেছে। ওর গায়ে এতদিন হাত দিইনি। আদর করি। সুধোই, 'ওগো, তুমি কেন অতটা বিহ্বল হলে ?'

'হব না !' ও বিস্মিত হয়ে বলে, 'মায়াপাহাড়ের পথে যাদের রেখে এসেছি আর কি ওরা সে পথে এগিয়ে যেতে বল পাবে ? একে একে ফিরে আসবে না ?'

'তা হলে', আমি কৌতূহলী হই, 'আবার স্বস্তি পেলে কী করে ?'

'পেলুম এই কথা জেনে যে পথিকদের একজন এতদিনে মায়াপাহাড়ে পৌঁছে গেছেন। নিয়ে এসেছেন মুক্তা ঝরার জল। ছিটিয়ে দিয়েছেন পাথরের গায়ে। তার পর অদৃশ্য হয়ে গেছেন।' মালা বলে প্রত্যয়ের সঙ্গে।

আমি তার সরল বিশ্বাসে কৌতুক বোধ করি। বলি, 'বাকী থাকে সোনার শুকপাখী। সেটি আনতে যাচ্ছে কে?'

'সেটি?' মালা আমার দিকে মধুরভাবে তাকায়। 'সেটি আনতে যেতে হবে মায়াপাহাড়ে নয়। রূপলোকে। সেও এক মায়ার রাজ্য। সেখানে যাবে তুমি।'

'আমি! কী সর্বনাশ!' আমি চমকে উঠি। 'সে কি সোজা রাস্তা! মালা! তুমি কি জানো না যে রূপলোকের মার্গও মায়াপাহাড়ের পথের মতোই বিপৎসঙ্কুল! ছায়ামূর্তিরা আমাকে ভয় দেখাবে। সোনার হরিণরা আমার লোভ জাগাবে। আমার প্রহরী হবে কে?'

'আমি। আমি হব তোমার বিনিদ্র প্রহরী।' মালা আমাকে কথা দেয়।

'তার পর,' আমি আকুল কণ্ঠে বলি, 'সংসারের ধান্দায় আমি ভুলে যেতে পারি কে আমি, কী আমার লক্ষ্য। ওগো, তুমি কি আমাকে মনে করিয়ে দেবে? তোমার নিজেরি মনে থাকবে তো?'

'নিশ্চয়।' মালা প্রতিশ্রুত হয়। 'সংসারের ধান্দা থেকেও যতটা পারি বাঁচাব।'

'তার পর,' আমি চিন্তান্বিত হয়ে বলি, 'মন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে আমার প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু অন্যায় যখন উদ্ধতভাবে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, নিরীহকে আঘাত করে, তখন আমি স্থির থাকতে পারিনে। ফলে বিপদ ডেকে আনি। দেখি, সে সময় তুমি কি আমার পাশে দাঁড়াবে?'

'তৎক্ষণাৎ।' মালা আমাকে শক্ত করে দেয়। 'সৌন্দর্য আর আনন্দ আনতে যাচ্ছ বলে তুমি কি রাজপুত্র নও? রাজপুত্র হয়ে থাকলে রাক্ষসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধবেই। তুমি না চাইলেও আমিই তোমাকে দ্বন্দ্বে নামাব। আমি যে তোমার শক্তি।'

'অবশেষে,' আমি মন খুলি, 'আর একটি কথা। একার সাধনায় আমি রূপদক্ষ হতে পারি। কিন্তু রসবিদগ্ধ হব কী করে? তার জন্যে নিতে হয় নারীর কাছে দীক্ষা। তার জন্যে করতে হয় দু'জনায় মিলে যোগসাধন। সখি, তুমি কি আমাকে রসের দীক্ষা দেবে?'

মালা মৌন থাকে। সম্মতির লক্ষণ দেখে আমি ওকে কোলে টেনে নিয়ে সোহাগ জানিয়ে বলি, 'প্রিয়ে, তবে তাই হবে। আমি যাব আনতে সোনার শুকপাখী।'

শ্রীপঞ্চমী
৭ই মাঘ ১৩৬৭

—

বিশল্যকরণী

সখীর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে মন্দির পরিক্রমা ছিল ছেলেবেলাকার সাধ। পরিক্রমার পর হাত ছাড়াছাড়ি সেও ছেলেবেলার দুঃখ।

বড়ো হয়ে তারই পুনরাবৃত্তি কি এই পশ্চিম পরিক্রমা? এই ভূমধ্যসাগরপ্রান্তে আসন্ন বিদায়?

ওরা দু'জনে ট্রেন থেকে নেমে ট্যাক্সি নেয়নি, হাতে হাত বেঁধে পায়ে পা মিলিয়ে স্টেশন থেকে মোল অবধি পদযাত্রা করেছে তীর্থযাত্রীর মতো। বিশ্বদেবতার মন্দির পরিক্রমার এই যেন অন্ত্য পর্যায়। ওদের মিলিত পদপাতের অবশিষ্ট পদক্ষেপ।

চলতে চলতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। আলোকিত অন্ধকারে শ্বেতহংসের মতো জলে ভাসছে ভারতগামী জাহাজ। লণ্ডন থেকে এসেছে মার্সেলসে। হারীত এখানেই উঠবে।

আর জোন? হারীতকে পৌঁছে দিয়ে সে এখনি ফিরে যাবে স্টেশনে। সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে স্লীপিং কার বিশিষ্ট প্যারিসগামী এক্সপ্রেস। ফ্রান্সের রাজধানীতে দিনকয়েক কাটিয়ে সে লণ্ডন ফিরবে।

কে আগে হাত ছাড়িয়ে নেবে? হারীত না জোন? কে আগে বিদায়বাণী শোনাবে? জোন না হারীত?

বিদায় বলতে গেলে ওরা একদিন পূর্বেই সেরে রেখেছিল। রোমে। ধীরে সুস্থে। নির্জনে। অমন একটা ইমোশনাল ব্যাপার জাহাজঘাটে সবার সামনে ঘটলে বিসদৃশ হতো। তা বলে ওদের হৃদয় একটুও হালকা নয়। রোম থেকে মার্সেলসের পথে দিনভর বিদায়রাগিণী বেজেছে। ঘন নীল উপকূলের মোহিনী মায়া ওদের নয়ন মুগ্ধ করলেও মন ভোলাতে পারেনি। পাশাপাশি আসনে বসে হাতে হাত জড়িয়ে ওরা চুপ করে ভেবেছে।

ইণ্টারন্যাশনাল এক্সপ্রেস অথচ রেস্টোরাণ্ট কার নেই। মধ্যাহ্নভোজনের সময় তাই জোন নেমে যায় মধ্যবর্তী এক স্টেশনে খাবার পেলে কিনতে। ট্রেন ছেড়ে দেয়, সে ফিরে আসে না। উৎকণ্ঠিত হারীত করিডর দিয়ে যতগুলো কামরায় যাওয়া যায় সব ক'টা ঘুরে আসে। জোন কোথাও নেই। ও কি তবে ট্রেনে উঠতে না পেরে পেছনে পড়ে থাকল? ঘননীল উপকূল গাঢ় তমিস্রা দেখায়। জোনের সঙ্গে আর দেখা হবে না,

আজকেই জাহাজ ধরতে হবে। বেচারি জোন! তার সুটকেস, তার টিকিট, তার ট্র্যাভেলার্স চেক সব কিছু হারীতের হেফাজতে। কার কাছে দিয়ে গেলে সে পাবে? না পেলে কেমন করে সে লণ্ডনে ফিরবে? তার ফিরে যাওয়ার ট্রেনও তো আজ রাত ন'টায়।

পরের স্টপের জন্য ঘণ্টা দুই ছটফটানি। ট্রেন থামতেই দেখে জোন। এ যেন হারানিধি ফিরে পাওয়া। ব্যথা যত তার বহুগুণ আনন্দ। এই যে হারানো আর পাওয়া এ কিসের প্রতীক? এ ঘটনা কী বলতে চায়? বলতে চায়, কোনো বিচ্ছেদই শাশ্বত নয়। বিচ্ছেদের পর মিলন সেও এমনি সত্য।

হারীতকে বলা হয়েছে ডিনারের সময় জাহাজে হাজিরা দিতে। জোনকে বলা হয়েছে ন'টার মধ্যে ট্রেনে চাপতে। বিদায়ের ক্ষণ ঘনিয়ে আসে। যারা মাস দুই ধরে প্রতিদিন একসঙ্গে বেড়িয়েছে তারা আর মিনিট দুই পরে দু'জনে দু'জনের চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবে। দু'জনাই দু'জনাকে পেছনে ফেলে চলে যাবে। দু'জনার কাছ থেকে দূরে, আরো দূরে। যেমন দেশের নিরিখে তেমনি কালের নিরিখে। স্বপ্ন হয়ে যাবে এই বিশ্বদেবতার মন্দির পরিক্রমা। ছেলেবেলার সেই মন্দির পরিক্রমার মতো।

সাথীর হাতে চাপ দিয়ে হারীত বলে, 'এর নাম সমাপ্তি নয়, জোন। বিয়াত্রিসের মতো তুমি আমাকে এক তারকা থেকে আরেক তারকায় নিয়ে গেছ, কিন্তু যেখানে পৌঁছে দিয়েছ সেটা এম্পারিয়ান নয়। এই অসমাপ্ত বিশ্বপরিক্রমা কালের কোলে তোলা রইল। আবার আমি এইখানটিতে নামব, আবার তুমি এইখানটিতে আমাকে নিতে আসবে, আবার আমাদের যাত্রা শুরু হবে। দক্ষিণ ফ্রান্স তো ভালো করে দেখাই হলো না। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া গেল রিভিয়েরার উপর, প্রোভাঁসের উপর। তাও তোমাকে হারিয়ে চোখে আঁধার দেখেছি, নিসর্গ দৃশ্য দেখিনি। কিন্তু সেই থেকেই প্রাণে একটা আশ্বাস পেয়েছি যে এই শেষ নয়, আবার আমাদের দেখা হবে, আবার একসঙ্গে চলব।'

'ডারলিং, জীবন আপনার পুনরুক্তি করে না। পুনর্দর্শন, সেটা হয়তো ঘটবে, কিন্তু ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দ্বিতীয়বার মিলবে কি না সন্দেহ। অদ্বিতীয় বলেই এমন আনন্দের হয়েছে এ ভ্রমণ। আমার কাজটি ফুরোল। এবার আমার ছুটি। আমি বেরিয়েছিলুম তোমাকে জাহাজে তুলে দেবার আগে ইউরোপের সৌন্দর্যের ভাণ্ডার প্রদর্শন করতে। প্রোফেশনাল গাইডের কাছে কীই বা তুমি পেতে! আফসোস রয়ে গেল যে তোমাকে রাভেনা দেখানো হলো না। তা বলে তোমাকে কথা দিতে পারব না যে আবার এলে আবার একসঙ্গে দেখতে যাব। তবে পুনর্দর্শন অন্য কথা। কে জানে হয়তো আমিই একদিন ভারতের সৌন্দর্যভাণ্ডার দেখতে এসে তোমাকেও দেখতে পাব।'

'তা হলে তো চমৎকার হয়। এখন থেকে স্বাগতম্ জানিয়ে রাখি। আবার আমাদের দেখা হবে, ডিয়ার। ভুলো না। এসো কিন্তু।'

'ভুলব না, চেষ্টা করব, ডারলিং।'

এর পর বাকী থাকে হাতে হাত ঝাঁকানো, কাঁধে মাথা রাখা, গালে ঠোঁট ছোঁয়ানো আর মুখ ফুটে বলা 'Au revoir !'

বোঝা গেল না কে আগে কে পাছে। কার তাড়া বেশী, কার কম। ট্যাক্সি ধরে জোন ফিরে গেল স্টেশনে। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওয়েভ করল বারবার, কিন্তু যার উদ্দেশে করা সে ততক্ষণে মাশুলঘরে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে জাহাজের গ্যাংওয়ের কাছাকাছি। সে তখন মনে মনে বিদায় নিচ্ছে অবনত হয়ে ইউরোপের মাটির কাছ থেকে। চেনা-অচেনা জানা-অজানা সবাইকে মনে মনে জানাচ্ছে পুনর্দর্শনায় চ।

পার্সারের কাছে সুটকেসটা জমা দিয়ে সে কোথায় ক্যাবিনে যাবে, না তর তর করে ডেকে উঠে যায়। ডেক থেকে চেয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই। জোনকে দেখতে পেলে তো ওয়েভ করবে। ওই একটি করণীয় কাজ করা হোল না। আফসোস রয়ে গেল।

ক্যাবিনে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ডিনার জ্যাকেট পরে তৈরী হয়ে নেয়। নিতে নিতে ডিনার অর্ধেক খতম। ওকে বসিয়ে দেওয়া হয় টেবিলের এক প্রান্তে, এক মার্কিন সহযাত্রীর পাশে। দুপুরে খাওয়া হয়নি বললেও হয়। জোন যা এনেছিল তার জন্যে খিদে ছিল না, মরে গেছল। মার্সেলসে নেমে চায়ের সঙ্গে সারবান কিছু পেটে পড়েছিল বলেই মোল অবধি হাঁটতে পেরেছিল।

'তারপর, হারীত, কখন এলে ?' ডিনারের পর কফির আড্ডায় সৌরীন সুধায়।

'তুমি যখন ডিনারে। তারপর তোমার কী খবর ?'

'তোমাকে আমাকে এক ক্যাবিনেই দিয়েছে তা তো জানো। সেইসঙ্গে দিয়েছে বিমলকীর্তিকে। ও সরাসরি টিলবেরি থেকে জাহাজে এসেছে। আর আমিও তোমার মতো মার্সেলসে উঠেছি।'

গল্প করতে করতে দুই বন্ধু ডেকে গিয়ে ডেকচেয়ার টেনে নিয়ে বসে। বছর দুই আগে ওরা এমনি এক জাহাজে বম্বে থেকে রওনা হয়ে মার্সেলসে নামে ও রেলপথে লণ্ডনে যায়। সেবার যেখানে নামা এবার সেইখানে ওঠা। চক্রাবর্তন। চাকা যদি ফের ঘুরে যায় ফের সেইখানে নামতে পারে।

'হারীত, ভাই, তোমার কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা।'

'ক্ষমা প্রার্থনা। কেন, কী হয়েছে ?'

'আগে বল তুমি ক্ষমা করলে, তারপর আমি বলব কী হয়েছে।'

সৌরীনের মুখে দুঃখের ছাপ দেখে হারীত বুঝতে পারে কিছু একটা হয়েছে। বলে, 'আচ্ছা, ক্ষমা করছি।'

'সহ্য করতে পারবে কিনা জানিনে। হায়, তোমার সেই টেনিস র‍্যাকেটটি—যেটি আমাকে বলেছিলে হাতে করে আনতে—'

'আনতে ভুলে গেলে?'

'আরে না, আমি কি তেমনি ছেলে! আমার ভুল হয় না। কিন্তু—'

'আহা, বলই না কী হয়েছে?'

'সমুদ্রে ভেসে গেছে।'

হারীত তো চিত্তির। টেনিস র‍্যাকেট সমুদ্রে ভেসে যায় কী করে?

'চ্যানেল পার হবার সময় ডেকে আমার পাশেই রেখেছিলুম। সমুদ্র রাফ ছিল। হঠাৎ একটা ঢেউ এসে ওটাকে জিব দিয়ে চেটে নিয়ে যায়। জাহাজ তখন বিষম জোরে দুলছে। আমি দাঁড়াতে গিয়ে দেখি মাতালের মত টলছি। একটা দমকা হাওয়া এসে আমার হ্যাটটাকেও লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল, সেটাকে অতি কষ্টে বাঁচাই।'

হারীত তা শুনে হতাশায় স্তব্ধ হয়ে যায়। এরপর সৌরীন আবার মাফ চাইলে সে বলে, 'তুমি তখন বিভোর হয়ে বৌয়ের কথা ভাবছিলে। আর দুটি সপ্তাহ কোন মতে ধৈর্য ধরতে পারছিলে না। যা হবার তা তো হবেই। যাক, ওটা আমি সমুদ্রকে সম্প্রদান করলুম। দেবতার গ্রাস। এবার আমাদের যাত্রা শুভ হোক।'

বৌয়ের কথা একবার শুরু হলে সৌরীনের মুখে আর কোনো কথা নেই। ওরা দু'বছরের উপর বিরহ ভোগ করছে। মিলন নিকট হয়ে আসছে বলে এখন সে উৎফুল্ল। এরি মধ্যে সে যেন দেশে পৌঁছে গেছে আর তার শ্রীমতীর সঙ্গসুখে সুখী হয়েছে।

'একশ' তেরোটা সপ্তাহ যদি কোনো মতে কেটে গিয়ে থাকে তবে বাকী দুটোও দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কী বল, হারীত?'

'হুঁ।'

'তোমার মুখে কেবল হুঁ আর হাঁ। আর কোন কথা নেই। কেন। কেন, বল তো। সামান্য একটা টেনিস র‍্যাকেটের জন্যে তুমি এমন কাতর! দেশে ফিরে যাচ্ছ বলে তোমার প্রাণ নেচে উঠছে না?'

'দূর! আমি যার জন্যে কাতর সে একটু আগে মার্সেলস স্টেশনে ট্রেনে উঠেছে। তোমার বিরহ শেষ হয়ে আসছে, আমার বিরহ সবে শুরু হচ্ছে। বুঝলে সৌরীন!'

॥ দুই ॥

সমুদ্র যাত্রার সঙ্গে প্রিয়বিরহ বা প্রিয়বিচ্ছেদ জড়িয়ে আছে হারীতের জীবনে এই প্রথম বার নয়। সেবারেও ছিল একই উপলব্ধি, যদিও অবলম্বন ভিন্ন। সেসব কথাও মনে পড়ে যায়। সৌরীনকে কোনোদিন তার ভালোবাসার কাহিনী বলেনি, শুধু আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছে যে তার হৃদয় ভারাক্রান্ত। এবারেও তার বেশী ভেঙে বলে না। সেও সমস্তক্ষণ তার স্ত্রীর চিন্তায় মগ্ন।

মনে মনে ট্রেনের অনুসরণ করতে করতে হারীতও আবার ইংলণ্ডের অভিমুখে চলে, যেপথে চলেছিল বছর দুই আগে সেই পথে। স্মৃতি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় প্যারিস হয়ে ক্যালে। চ্যানেল পার হয়ে ডোভার। সেখান থেকে লণ্ডন।

কোথায় উঠবে স্থির ছিল না। তার বন্ধু নিলয় তাকে রিসিভ করতে আসে। নিলয়ের প্রস্তাবে রাজী হয় হারীত ও সৌরীন। হ্যাম্পস্টেডে যে বাড়ীতে জামাইবাবুর ফ্ল্যাট সে বাড়ীতে দু'জনে মিলে আর-একটা ফ্ল্যাট নেয়। মানাদি ও অনিমেষদা দু'দিনেই তার ও সৌরীনের আপনার হয়ে যান। আর তাঁদের সে মিষ্টি দুষ্টু খোকা। ভোজন একসঙ্গেই হয়। মানাদি রাঁধেন।

লণ্ডনের বাঙালী মহলে ওঁদের অসামান্য জনপ্রিয়তা। প্রায়ই বেড়াতে আসতেন দেশ থেকে আগত তরুণ তরুণী, প্রবীণ প্রবীণা। কেউ কেউ হয়তো বহুদিনের বাসিন্দা। বাড়ী বসেই এঁদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যেত। কারো কারো সঙ্গে আলাপের চেয়ে বেশী। বন্ধুতা বা আত্মীয়তা। তাঁরাও বাড়ীতে যেতে বলতেন। পার্টি দিলেই নিমন্ত্রণ করতেন। দুই বন্ধু যেত।

একদিন মানাদি বলেন, 'সুজাতাদি তোমার উপর রাগ করেছেন বলে মনে হলো, হারীত। তুমি তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেও নিমন্ত্রণ রক্ষা করনি। আগে বা পরে চিঠি লিখে মাফ চাওনি। আমাকে বললে আমি তোমার হয়ে বলতে পারতুম। আচ্ছা, ভাই, এটা কি ভালো হলো?'

হারীত লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। 'সত্যি, মানাদি, আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না। সৌরীনও মনে করিয়ে দেয়নি।'

'সৌরীন মনে করিয়ে দেবে কেন? সে তো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অক্ষমতা জানিয়ে রেখেছিল। আর তুমিই বা একটা এনগেজমেন্ট ডায়েরি রাখ না কেন, যখন জান যে রোমে বাস করলে রোমানদের মতো আচরণ করতে হয়।'

'ডায়েরিও রাখি, নোটও করি, কিন্তু, মানাদি, লেখা নিয়ে বসলে আমার হুঁশ থাকে

না যে এন্‌গেজমেন্ট আছে, যেতে হবে। বোধহয় অবচেতন বাধা দেয়।'

'আজকাল ওই হয়েছে এক রেওয়াজ। কোথাও ঠেকে গেলে দোহাই দেয় অবচেতনের। তোমরা যারা দেশের শাসনভার নিতে যাচ্ছ তাদের মুখে এটা শোভা পায় না।'

হারীতের লজ্জার সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'চললুম মাফ চাইতে।'

'আরে, কর কী! কর কী, হারীত!' অনিমেষদা শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন। 'পুডিংটা শেষ না করেই চললে।'

'না, অনিমেষদা, আর খেতে ইচ্ছে করছে না। সত্যি আমার ঘাট হয়েছে। এখন সুজাতাদি ভুল না বুঝলে হয়।'

'না, না, ভুল বুঝবেন না।' মানাদি বলেন। 'আমি ওঁকে তোমার হয়ে কৈফিয়ৎ দিয়েছি যে এদেশে এসে অবধি তুমি দারুণ হোমসিক।'

ডিনারের পর গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে পায়ে হেঁটে বেড়ানো হারীতের নিত্যকৃত্য। সাধারণত হ্যাম্পস্টেড টিউব স্টেশনের দিকে যায়, তারপর একটা চক্কর দিয়ে ফেরে। সেদিন কিন্তু দিক পরিবর্তন করে প্রিমরোজ হিল অঞ্চলে যায়।

দু'জনের দুই কানে ইয়ারফোন, সুজাতাদি আর তাঁর স্বামী লেফটেন্যান্ট কর্নেল মল্লিক বসে রেডিও শুনছিলেন। সামনে কফির পেয়ালা। হারীতের জন্যেও কফি আসে। প্রোগ্রাম সারা হলে অন্য ঘরে যান।

'তারপর, হারীত? এমন অসময়ে?' সুজাতাদির প্রশ্ন।

'একটু আগে মানাদির কাছে শুনতে পেলুম আপনি আমার উপর রাগ করেছেন। পত্রপাঠ চলে এলুম আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে। নইলে রাতে ঘুম হতো না, সুজাতাদি।'

'ওহ্! সেদিনকার জন্যে! আচ্ছা, বল দেখি, ছেলে, আমি কার জন্যে এতকিছু করে মরি। আমার আপনার কি ছেলে আছে না মেয়ে আছে? তোমাদের জন্যেই করা। তোমরা একালের ছেলেমেয়েরা মিলেমিশে আনন্দ করবে বলেই পার্টি দেওয়া। যদি কাউকে কারো ভালো লেগে যায় তবে বিয়ের ফুল ফুটলেও ফুটতে পারে। আমার কী! আমার দেখেই আনন্দ। এলে না, তুমিই পশতালে। অবশ্য তুমি বলতে পারো, দিল্লীকা লাড্ডু, যে খায় সেও পশতায়।'

'না, না, আমার জীবনদর্শন অমন নিরানন্দ নয়। আনন্দ করতে আমি ষোল আনা প্রস্তুত। কিন্তু সেদিন আমাকে মেল ধরার জন্যে একটা লেখা নিয়ে উঠে পড়ে লেগে থাকতে হয়েছিল। নইলে মাসিকপত্রের একটা সংখ্যা ফাঁক যেত।'

'ওমা তাই বুঝি!'

'এদেশে এসে আমি যা আস্বাদন করছি তার ভাগ দিতে হয় আমার দেশবাসীকে। রূপের আস্বাদন, রসের আস্বাদন। ওটা আমার দেশকৃত্য বা জনকৃত্য। তা বলে নিমন্ত্রণের অঙ্গীকার করে অঙ্গীকার রক্ষা না করা সেটা একটা অপরাধ বইকি। বিশেষত আপনার মতো স্নেহশীলা দিদির কাছে।'

'থাক, হারীত। আমি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম তা ঠিক। কিন্তু পরে যখন মান্থুর মুখে শুনি যে ছেলেটা বড়ো হোমসিক তখন আমার ক্ষোভ জল হয়ে যায়। তখন মান্থুকে বলি, ওকে হোমের বদলে হোম দাও। ছোট ভাইয়ের মতো।'

'আপনার মহত্ত্ব। কিন্তু সুজাতাদি, মানাদি যা ভেবেছেন তা ঠিক নাও হতে পারে। আমি সিক হতে পারি, কিন্তু হোমসিক নই। একটার পর একটা কঠিন পরীক্ষায় বসে আমি ক্লান্ত, অপরিসীম ক্লান্ত। শরীরের দিক থেকে আমি নিঃশেষিত। তেমনি হৃদয়ের দিক থেকেও আমি নিঃশেষ। যাকে বলে, ইমোশনালি এগ্‌ঝস্টেড। আমার মোমবাতি পুড়তে পুড়তে এতটুকু, আমার পেয়ালা উজাড় হয়ে তলানিতে ঠেকেছে।'

সুজাতাদি মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে শুনতে থাকেন।

'আনন্দ করতে কার না ভালো লাগে, দিদি? আনন্দ করতে আর দেখতে? কিন্তু আমার যে বুকভরা বিষাদ। কী করে খাপ খাওয়াব আর দশজনের হালকা মন হালকা কথাবার্তার সঙ্গে? মানাদি আমাকে স্নেহ করেন বলে হোমসিকনেসকে দোষ দেন। অন্তেরা ভাবে আমি অসামাজিক বা অহঙ্কারী।'

সুজাতাদি মৌনভঙ্গ করে বলেন, 'তা অহঙ্কারী ভাববে না-ই বা কেন? তোমার মতো সফল ছাত্র ক'জন। কিন্তু আমার গোড়া থেকেই তোমাকে দেখে মনে হয়েছে, হারীত, যে তুমি একটুও সুখী নও। যেন একটা রাজত্ব হারিয়েছ। রাজ্যহারা হয়ে নির্বাসনে এসেছ। নির্বাসিত যক্ষ নও তো?'

'না, সে রকম কিছু নয়, সুজাতাদি। ছেলেবেলা থেকে এদেশে আসতে চেয়েছি। অবশেষে আসতে পেরেছি। এদেশও আমার দেশ। নির্বাসন নয়। তবে ওই যে বললেন, যেন একটা রাজত্ব হারিয়েছি, এর একটা নিগূঢ় অর্থ আছে।'

কথাটা ওইখানেই থামে। এর পরে সুজাতাদি ওকে একদিন ডিনারে আসতে বলেন। এনৃগেজমেন্ট ডায়েরি মিলিয়ে দেখা যায় যে পরবর্তী বৃহস্পতিবার দু'পক্ষেরই সুবিধে। হারীত রাজী হয়।

ডিনারে অবশ্য আরো কয়েকজন অতিথি ছিলেন। মিস্টার ও মিসেস লাল। নিকটতম প্রতিবেশী ও ব্রিজ খেলার নিয়মিত পার্টনার। পাঞ্জাবী। এছাড়া একটি বাঙালীর মেয়ে। কুমারী পার্বণী হালদার। না, পার্বতী নয়। পার্বণী। পার্বণের দিন জন্ম। ডে

ট্রেনিং কলেজে পড়ে। থাকে ওয়াই ডব্লিউ সি এ'তে।

'জানো, হারীত, ও আমার গানের ভাণ্ডারী। সব রকম মিলিয়ে শ' তিনেক গান আছে ওর ভাণ্ডারে। গান শুনতে সাধ গেলে ওকে খেতে ডাকি। তোমার যদি বিশেষ কোনো গান পছন্দ থাকে তো ওকে বল, ওর হয়তো জানা আছে। কী শুনতে চাও? রবীন্দ্রসঙ্গীত? অতুলপ্রসাদী? দ্বিজেন্দ্রগীতি? নজরুলী গজল? মীরার ভজন? কীর্তন?'

'বিশ্বাস করবেন না, মিস্টার নিয়োগী।' পার্বণী সলজ্জ প্রতিবাদ জানায়।

'পার্বণী, সেবার যেটা গেয়েছিলে আবার সেটা গাইতে হবে, বলে রাখছি।' ডিনারের পর ব্রিজের টেবলে জাঁকিয়ে বসে লেফটন্যান্ট কর্নেল মল্লিক ফরমাস করেন।

'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, পিয়ো হে পিয়ো।'

সুজাতাদি হেসে উঠে বলেন, 'নিয়ো হে নিয়ো। তোমার ফরমাস পরে হবে। আগে হারীতের ফরমাস। হারীত, কী তোমার মর্জি?'

'আমার নিবেদন, বলুন। মিস হালদারের যদি কষ্ট না হয় তবে আমার পছন্দ—মধুর, তোমার শেষ যে না পাই।'

সুজাতাদি বলেন, 'ওটা আমারও ফেভারিট। পার্বণীও ভালো জানে।'

সেই যে শুরু তারপর গানের বিরাম নেই। যদিও সঙ্গে সঙ্গে তাসও চলেছে। পার্বণীকে ও হারীতকে বাদ দিয়ে। ওরা দু'জনে আলাদা একটি সোফায় পাশাপাশি বসে।

'এইখানেই ইতি। আর না। আমাকে এবার দৌড় দিতে হবে। সাড়ে ন'টা তক আমার মেয়াদ।' পার্বণী ওঠে। সবাইকে নমস্কার করে।

'আমি ধন্য।' হারীত ওর কানে কানে বলে। সে সত্যিই অভিভূত।

'পার্বণী, দেখছ তো এঁরা খেলায় মত্ত। তোমাকে মোটরে করে পৌঁছে দিতে পারছিনে, মেয়ে। হারীত, তুমি কি দয়া করে পার্বণীকে পৌঁছে দেবে?'

'নিশ্চয়। সানন্দে।' হারীত ছুটে গিয়ে পার্বণীর কোট এনে পরিয়ে দেয়।

'কাউকে পৌঁছে দিতে হবে না, মাসি। আমি টিউবে করে যেতে পারব।'

রাস্তায় পা দিয়ে দেখা গেল বৃষ্টি। হারীতের ছাতা ছিল না, পার্বণীর ছিল। সেই ছাতা ভাগাভাগি করে ওরা টিউব অবধি যায়। হারীত বলে, 'আসব নাকি সঙ্গে? হারিয়ে যাবেন না তো?'

'লণ্ডনে আমি এক বছরের উপর আছি, আর আপনি তো এই সেদিন এসেছেন। হারিয়ে যাবার ভয় কার? আপনার নয়তো? বলেন তো আমি আপনাকে এগিয়ে দিই।'

॥ তিন ॥

সুজাতাদির পরবর্তী পার্টিতে হাজির হতে হারীতের ভুল হয় না। সত্যি কথা বলতে কি সে পার্বণীর সঙ্গে দেখা হবে ভেবেই যায়। যাদৃশী ভাবনা তাদৃশী সিদ্ধি।

সেখানেও গানের জলসা বসে। পার্বণী ছাড়া আরো জনাকয়েক গায়ক-গায়িকা। একটা কি দুটো কমিকও শোনা গেল। হাসতে হাসতে সভাভঙ্গ। দুর্গাগতি লাহিড়ীর ওস্তাদের মার।

'সেদিন হারিয়ে যাননি তো?' হারীত গিয়ে পার্বণীর সঙ্গে আলাপ ঝালিয়ে নেয়।

'না, আমার কিছু হারায় নি। আপনার যদি কিছু হারিয়ে থাকে বলুন।'

'আমার আর কী হারাবে? আমি হৃতসর্বস্ব। কী করে ফিরে পাই সেই আমার চিন্তা। ফিরে পেলে তো নতুন করে হারাব?'

ওদের কাছে কেউ ছিল না। থাকলেও সাঙ্কেতিক ভাষা বুঝত কি বুঝত না।

'ওহ্! তাই আপনাকে অমন সার্থকনামা মনে হয়? হারিয়ে গেছে বলে হারীত, না হেরে গেছেন বলে হারীত?'

'হেরেছি, হারিয়েছি। আপনার অনুমান অযথা নয়।'

ওভাবে বেশীক্ষণ কথা বলা যায় না। অন্তেরা এসে পড়ে। পার্বণীকে ধরে নিয়ে যায়। হারীতও সামাজিকতার খাতিরে পরিবেশন করতে নামে। কিন্তু সে যে ও-কাজে আনাড়ি এটা চাপা থাকে না। কে একটি মেয়ে এসে তার হাত থেকে ট্রে কেড়ে নিয়ে বলে, 'কিছু মনে করবেন না, আমিই এর ভার নিচ্ছি।'

সুজাতাদির সঙ্গে দেখা হয়। 'এই যে, তুমি আজ সময় করে আসতে পেরেছ, হারীত। কিছু খেয়েছ না আমার সঙ্গে পরে খেতে বসবে?'

'ধন্যবাদ, দিদি। আমি একটু আগে বেরোতে চাই। এখনি খেয়ে নিচ্ছি।'

'তা হলে আজকের এই সন্ধ্যাটি কেমন লাগল, হারীত?'

'অপূর্ব! এখন আমার আফসোস হচ্ছে কেন সেবার আসিনি।'

'হাঁ, তোমার আসা উচিত ছিল। মনে রাখবে যে তোমার স্থান আর কেউ পূরণ করতে পারে না। তোমাকে যারা দেখতে চায় তারা নিরাশ হয়। আজকেও নিরাশ হতো। আমি তো পারতপক্ষে কোনো নিমন্ত্রণ বাদ দিইনে। খাওয়াটা কিছু নয়, আসল হচ্ছে দেখাসাক্ষাৎ, মেলামেশা, মানুষের সঙ্গ। হয়তো তোমার একটা দুঃখ আছে। তা বলে যদি কারো সঙ্গে না মেশ তবে সুখ আসবে কোন সূত্র ধরে?'

'আপনার দয়া আমি জীবনে ভুলব না, সুজাতাদি। কিন্তু আমার যে ভিতরে বাধা।

আমার সমবয়সিনী বিবাহযোগ্যা কন্যাদের দিকে আমার যে তাকাতেই ভয় করে। এ ভয় ভেঙে দেবে কে?'

'অ্যাঁ!' সুজাতাদি শুনে থ। 'কী যা তা বকছ?' তিনি শাসিয়ে ওঠেন।

'থাক, আরেকদিন হবে,' বলে হারীত চটপট সরে পড়ে।

পরে একদিন সে তার নৈশ প্রদক্ষিণের সময় দিক পরিবর্তন করে প্রিমরোজ হিল অঞ্চলে হাজির হয়। তার আগে টেলিফোনে খবর নেয় দিদি বাড়ী থাকবেন।

'এসেছ? কী শীত! কি শীত! চল, আগুন পোহাবে চল। এক পেয়ালা খুব গরম কফি চাই তো?' সুজাতাদি ওকে লাউঞ্জে নিয়ে যান। মল্লিক সেখানে ছিলেন না।

'তারপর ব্যাপারটা কী, খুলে বল তো, হারীত। কেন তোমার অমন অযৌক্তিক ভয়? কর্ণেল মল্লিককে তোমার কেসটা বলি, অবশ্য তোমার নাম গোপন রাখি। ওঁর মতে ওটা সাইকো-প্যাথলজিকাল। একজন স্পেশ্যালিস্টের নাম করলেন।'

হারীত হো হো করে হাসে। 'বাউলরা কী বলে, শুনবেন?

কমলবনে কে আসিল সোনার জহুরী
নিকষে পরখে কমল আ মরি আ মরি!'

সুজাতাদি বুঝতে পারেন না ওর অর্থ বা তাৎপর্য। তখন হারীতকে বুঝিয়ে দিতে হয়।

'কেসটা সাইকো-প্যাথলজিকাল নয়, সুজাতাদি। বরং বলতে পারেন সাইকো-এথিকাল। এটা একটা মনোনৈতিক সমস্যা। একজন প্রেমের ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌ অপসরণ করেছে। তা সে করেছে বলেই আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে মিশতে পারছে। নইলে মিশতে পারত না। বিয়েব কথাই উঠত না। এখন সে ভাবছে জীবিকার ক্ষেত্রেও পশ্চাদ্‌ অপসরণ করবে। কারণ এটা সে প্রেমের জন্যেই অর্জন করেছিল। কিন্তু তা যদি সে করে তবে তার সমবয়সিনী বিবাহযোগ্যা কন্যারা তাকে আমল দেবে না। তাঁদের চোখে তার মূল্য তো ওই জীবিকাটির দর। তার নিজের দর আর কতটুকু! তার নিজস্ব দর নিয়ে সে এই উঁচু দরের পাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে গেলে কাঁপে। তার একমাত্র ভরসা এই যে কোন একটি মেয়ে তাকে তার নিজের জন্যে ভালোবাসবে, তার জীবিকার জন্যে নয়। জীবিকা যদি সে ছেড়ে দেয় তবে মেয়েটি তার জীবিকার জন্যে কেয়ার করবে না, করবে তার নিজের জন্যে। মেয়েটি মনে রাখবে যে একটি পশ্চাদ্‌ অপসরণ ঘটেছে বলেই না ও তাকে পাচ্ছে। নইলে কি পেতো? তাই আরেকটি পশ্চাদ্‌ অপসরণ ঘটলে একটা অপরটার সিকুয়েল বলে ধরে নেবে। একটি পশ্চাদ্‌ অপসরণ তাকে মুক্ত করেছে। আরেকটি তাকে আরো মুক্ত করবে। সে মুক্ত পুরুষ।'

কফিটা ওদিকে জুড়িয়ে যাচ্ছে, সুজাতাদির লক্ষ্য নেই। তাঁর লক্ষ্য হারীতের

মুখের উপর। শুনছেন তার কথা, শুনে অবাক হচ্ছেন, সেই সঙ্গে উত্তেজিত। ও ছেলে চুপ করতে তিনি যেন ফেটে পড়েন।

'তা হলে রক্ত জল করে পরীক্ষা দেওয়া কেন? শরীরটা তো প্রায় ধ্বংস করে আনা হয়েছে। পশ্চাদ্‌ অপসরণ করলে কি হাড়ে মাস লাগবে, না গায়ে রক্ত আসবে? তোমার বরাত ভালো যে তুমি আমার পেটের ছেলে নও। তা যদি হতে তোমাকে ধরে মার লাগাতুম। চাকরি ছেড়ে দিলে তুমি বাঁচবে কী করে, বাছা! কে তোমাকে বাঁচাবে! তুমি তো পরের দাসত্ব করবে না। তুমি মুক্ত পুরুষ। তা হলে কি তোমার বৌ তোমার জন্যে দাসীবৃত্তি করবে?'

হারীত চমকে ওঠে। 'না, না, তা কেন করবে?'

'তা হলে কী করবে, বোঝাও আমাকে। আমার সন্ধানে এমন মেয়েও আছে যে তোমার জীবিকার জন্যে কেয়ার করে না, তোমার জন্যেই কেয়ার করে। সে যদি তোমার ভার নেয় তুমি বাঁচবে। তার একটা চাকরি আছে, সেটা সে বিয়ের পর ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু ছাড়বে কী করে যদি তোমাকে বহন করার দায় নিতে হয়?'

হারীত নিরুত্তর। নরম হয়ে আসা আগুনের উপর কয়লা চাপায়।

'তুমি কিন্তু এখনো আমার সেই কথার জবাব দাওনি, ছেলে। রক্ত জল করে পরীক্ষা দিলে কেন, যদি পশ্চাদ্‌ অপসরণই করবে!'

'ওটা আরেকজনকে মুক্ত করার জন্যে, সুজাতাদি। যখন তাকে মুক্ত করতে পারলুম না, যখন দেখলুম সে আরো জড়িয়ে পড়েছে, তখন আমার ওই তপস্যা তার দিক থেকে নিরর্থক হলো। আমার দিক থেকেও সার্থকতা রইল না। আমি তো লক্ষ্মীর ঘরের লোক হতে চাইনি। আমি সরস্বতীর ঘরানা হলেই সুখী।'

'তার মানে কী হলো, হারীত?'

'তার মানে জীবিকা আমার কাছে বড়ো নয়। জীবন আমার কাছে বড়ো। অবশ্য জীবিকাকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। একমুঠো অন্নের জন্যে মানুষকে কত ঘর্ম ঝরাতে হয়। আমি কি বড়লোকের বেটা যে অন্নের অভাব আমার হবে না? কিন্তু অমৃত না পেলে আমি বাঁচব না। ওর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্নের অন্বেষণ করব। করতুমও, যদি না হঠাৎ প্রেমে পড়তুম। সে পাট যখন চুকে গেছে তখন তার জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া কেন?'

কফিটা জুড়িয়ে হিম হয়ে গেছে দেখে সুজাতাদি আবার গরম করে নিয়ে আসেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে নীরবে পান করেন। হারীত যে এক পেয়ালার বেশী খায় না এটা তিনি জানেন বলেই তাকে দ্বিতীয়বার অফার করেন না।

খেতে খেতে সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন, 'আচ্ছা, বল দেখি সত্যি করে, তোমার মনের কথাটা কি এই যে, একজনের জন্যে যা অর্জন করছি আরেকজন কেন তা ভোগ করবে ? আরেকজনের জন্যে নতুন তপস্যা, নতুন অর্জন।'

'আহ্, সুজাতাদি ! আপনি কি অন্তর্যামী ?' হারীতের মুখ আলো হয়ে ওঠে।

'কিন্তু ক'বার রক্ত জল করবে, বাছা ! জীবনটা কি এই করতে করতেই ফুরিয়ে যাবে ! যে যাকে চায় সে তাকে পায় রূপকথায় এমন কথা লেখে বটে, কিন্তু পুরাণে ইতিহাসে নাটকে কাব্যে কোথাও কি এর বিপরীতটা লেখেনি ? জীবনে বরং বিপরীতটাই দেখি। কার সঙ্গে কার বিয়ে হবে, দেবতারাও তা জানেন না। মানুষ কী করে জানবে ? মানুষ একজনকে লক্ষ্য করে তপস্যা করে যায়, তপস্যার ফল ভোগ করে আরেকজন। তাতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে তুমি নতুন জনের জন্যে নতুন তপস্যায় নামো। কিন্তু পরে হয়তো তাকেও পাবে না। তখন ?'

হারীত স্বীকার করে যে বার বার তপস্যা করা তার সামর্থ্যের অতীত।

'তাহলে,' সুজাতাদি বলেন, 'মানতে হয় যে আসলে ওটা বিবাহিত জীবনের জন্যে প্রস্তুতি। যার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হবে তার জন্যে তৈরি হওয়া। তবে তোমার যদি মনে হয় যে এ জীবিকা তোমার জন্যে নয়, তুমি চাও সরস্বতীর কাজ, তা হলে বিয়ের আগেই তোমাকে মুক্ত হতে হবে, নয়তো পরে আর বেরোতে পারবে না। আর নয়তো এমন কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে হবে যে তোমাকে অবসর দিয়ে নিজেই উপার্জনের দায় নেবে। আছে এরকম মেয়ে।'

হারীত একটু দমে যায়। বলে, 'সুজাতাদি, আপনি কেন ধরে নিচ্ছেন যে লেখা দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়া যায় না ?'

'হাজারে একজন। সেখানেও লাক। তার মানে লক্ষ্মী। তোমার ওই সরস্বতী এক নিষ্ঠুরা দেবী। যাকে বর দেন তার সব কেড়ে নেন। ওঁকে নিয়ে যদি থাকবে তো বিয়ের কথা কেন ভাববে ?'

'না, বিয়ের জন্যে আমি কোনো রকম আপস করব না। বিয়ে না হয় নাই হবে। কিন্তু প্রেম ? প্রেমও কি হবে না ?' হারীত কাতর স্বরে শুধায়।

'হবে। কিন্তু সুখের হবে না। কত দেখলুম।' সুজাতাদি অন্যমনস্ক হন।

॥ চার ॥

পার্বণীকে এরপরে দেখতে পাওয়া যায় বাঙালীদের আর একটি অনুষ্ঠানে। সেখানেও সে রবীন্দ্রনাথের ও অতুলপ্রসাদের কয়েকখানি গান গেয়ে শোনায়।

হারীতের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পার্বণী স্মিত হেসে মাথা একপাশে নোয়ায়। দূর থেকে হারীতও সেইভাবে অভিবাদন জানায়। তারপর ভিড় ঠেলে দু'জনের সঙ্গে দু'জনের আলাপ। হারীত পার্বণীর গানের প্রশংসা করে।

'কোন্‌খানা আপনার সব চেয়ে ভালো লাগল?' পার্বণী জানতে চায়।

হারীত একটু আমতা আমতা করে বলে, 'কে তুমি গো বিরহিণী আমারে সম্ভাষিলে?'

'এই দেখুন, এত গান থাকতে ওটাই আপনার মনে ধরল? কত গান তো হলো গাওয়া—' পার্বণী গুনগুনিয়ে ওঠে।

'কে কখন কোন্ মুডে থাকে, মিস হালদার, তার উপর নির্ভর করে ভালো লাগা না লাগা। এবপর আপনাব সঙ্গে কবে কোথায় দেখা হচ্ছে, বলুন।'

'কেন, কিছু দবকার আছে, নাকি?'

'ইংরেজরা বলে, প্রশ্ন করবে না, মিথ্যা শুনবে না। আপনাব প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' হলেও মিথ্যা, 'না' হলেও মিথ্যা।'

পার্বণী হাসি চাপতে পারে না। তারপরে দু'জনে একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে। ডবল ডেকার বাসেব পিঠে চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ানো। একদিন বিকেলবেলা বাস ধরতে হবে রিজেণ্টস পার্ক চিড়িয়াখানা থেকে।

ওদের ওই বাসযাত্রা বেশ প্রীতিকর হয়। কোনো গভীর বিষয়ের আলোচনা নয়, কোনো ব্যক্তিগত উপলব্ধিব অবতারণা নয়। কে ক'বাব থিয়েটার দেখেছে, কনসার্টে গেছে, ব্যালে দেখেছে কিনা, অপেরা শুনেছে কিনা, ভোড্‌ভিল ব্যাপারটা কী, এইসব খবরা-খবর।

'এত কিছু দেখবার আছে, এত কিছু শোনবার আছে যে সপ্তাহের সাতটা দিনও যথেষ্ট নয়। সেইজন্যে বেছে বেছে দেখতে শুনতে হয়। তাছাড়া তহবিলও তো অঢেল নয়। বেহিসাবী হলে পরে টান পড়বে। কোথায় পাব?' হারীত আক্ষেপ করে।

'ছেলেরা তবু একা একা যেতে পারে, আমরা মেয়েরা রাতে একা কোথাও যাইনে, ফেরার সময় ভয়ে মরি। কে কখন মদ খেয়ে গায়ে এসে পড়ে। সেদিন মাসি আপনাকে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন, আমি ইচ্ছে করেই আপনাকে ছেড়ে দিই। যাতে আমার আত্মনির্ভরতার বিকাশ হয়। যা আশঙ্কা করেছিলুম তাই। একটা লোক আমার পিছু নেয়।

আমি রাস্তা পার হলে সেও রাস্তা পার হয়। আমি মোড় ফিরলে সেও মোড় ফেরে। শেষে আমি একটা সাহসের কাজ করি। ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলি, আমি ওয়াই ডব্লিউ সি এ'তে থাকি। আপনিও কি সেইদিকেই যাচ্ছেন? আমাকে দয়া করে পৌঁছে দেবেন?'

'তারপর?'

'ঘাবড়ে যায়। সৌজন্য করে পার্শ্ববর্তী হয়। কী আশা করেছিল জানিনে। অজস্র ধন্যবাদ দিই। কৃতার্থ হয়ে যায়।'

'আপনার সাহসকে অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু, মিস্ হালদার, আর ওরকম ঝুঁকি নেবেন না। না হয় নাই হলো থিয়েটার অপেরা।'

'সে কী কথা! এদেশে এসেছি, নিজেকে ভরিয়ে নেব না? সঙ্গিনী জোগাড় করি। কখনো কখনো সঙ্গীও। কিন্তু আপনি যেমন যখন খুশি যেখানে খুশি যেতে পারেন আমি তেমন পারিনে। আমাকে অন্যের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হয়। আমার সঙ্গে হিলডা যাবে বলে হিলডার সঙ্গে আমি যাই। যদিও হিলডার রুচি অনেক সময় আমার রুচি নয়। সাথীর অভাবে কত ভালো জিনিস বাদ দিয়েছি।'

'কী আফসোসের কথা। কিন্তু আপনার যদি এরপর কখনো সাথীর অভাব হয় একজনকে স্মরণ করবেন। তার ওখানে টেলিফোন নেই, এই যা মুশকিল। তাকে পোস্টকার্ড লিখলে সে-ই আপনাকে টেলিফোন করবে।'

'না, না, পোস্টকার্ড না। আমাকে ওঁরা চেনেন।'

'চেনেন? তাহলে আপনি ও-বাড়ী আসেন না কেন? ধরুন, আমি যদি একটা আসরের আয়োজন করি আপনি আসবেন?'

'না, না, আমার লজ্জা করবে। ওঁরা ভাববেন আপনার আকর্ষণে এসেছি।'

হারীত চুপ করে যায়। তখন পার্বতী বলে, 'নির্জলা মিথ্যাও নয়।'

বিদায়ের সময় হারীত বিনা বাক্যে ওয়াই ডব্লিউ সি এ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে। পার্বতীর প্রত্যাশাও তাই। বোধহয় আত্মনির্ভরতার ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছা।

'অনেক, অনেক বছর পরে আপনি যখন এই সন্ধ্যাটি ভুলে যাবেন, মিস্টার নিয়োগী, তখনো আমার এটি মনে থাকবে। আর মনে থাকবে যে কত বড়ো একজন অফিসার সামান্য একটি স্কুল মিস্ট্রেসকে নিরাপদে বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলেন।'

হারীত প্রতিবাদ করে। 'অফিসার না বলে কবি যদি বলতেন তাহলে কত বড়ো না বললেও চলত। আর সামান্য একটি স্কুল-মিস্ট্রেস না বলে স্বনামধন্য এক সুগায়িকা বললে আরো ঠিক হতো। কেন যে আমাদের আসল পরিচয়গুলো ঢাকা পড়ে যায়!'

'মেয়েদের আসল পরিচয়টা কী?' এই বলে পার্বতী পালিয়ে যায়। দুয়ার খুলে

ঢোকবার সময় পেছন ফিরে বলে, 'নমস্কার।'

রয়াল আলবার্ট হলে ক্রাইসলার বেহালা বাজাবেন। খবরের কাগজে যেদিন এ-খবর পড়ে সেই দিনই হারীত তার পাড়ার থিয়েটার এজেন্টের কাছে গিয়ে দু-খানা আসন বুক করে। কে জানে পার্বণী রাজী হবে কিনা। যদি না হয় নিলয়কে সঙ্গে নেওয়া যাবে। সে বেচারা কায়ক্লেশে চালায়। কোথাও যেতে পারে না, যদিও অসীম কৌতূহল তার।

পার্বণীকে টেলিফোন করতে সে বলে, 'আমার যে হাত এখন খালি।'

'তা বলে ক্রাইসলার তো সবুর করবেন না। আমিও আমার থলে উজাড় করে দিলুম। এটা একটা স্মরণীয় উপলক্ষ। আপনি যদি ঋণী হতে না চান তো পরে শোধ করে দেবেন।'

'এমনি করেই মেয়েরা মরে। এটা আমার নীতিবিরুদ্ধ। শেষে একদিন এমন হবে যে ঋণ শোধ করার মতো সঙ্গতি থাকবে না। শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।'

'তখন মহাজনকে গোটাকতক গান শুনিয়ে দেবেন। আপনার কণ্ঠে শেষ পারানীর কড়ি থাকতে আপনার ভয় কিসের?'

'আমার এ গান বিনা মূল্যে পাবার। আসনমূল্যে নয়। কত গান শুনতে চান, বলুন। মাসির বাড়ী আরেকদিন গিয়ে শোনাব। নয়তো আমার এক বান্ধবী আছে, তার বাড়ী। আপনার মতো শ্রোতা শুনবেন, এতেই আমি পুরস্কৃত।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস হালদার। তাহলে আমি আসনখানা বেহাত করছি। না, এখন করব না। আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করব। কে জানে হয়তো কেমন করে আপনার হাতে টাকা আসবে। আপনাকে আমি রিসাইটালের একদিন আগে আবার টেলিফোন করব।'

পরের বার জানা গেল যে পার্বণী আসনখানা রাখবে। নগদ দাম দেবে।

হারীত তা শুনে খুশি হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দেয় যে একটি সুখ থেকে সে বঞ্চিত হলো। নারীর প্রতি পুরুষের চিরাচরিত শিভালরি।

'হাঁ, কিন্তু তার মাশুল তো নারীর চিরাচরিত কোকেটরি।'

ক্রাইসলার তাঁর শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। কারো মুখে একটি কথা নেই। থাকলে উৎকর্ষবাচক বিশেষণ। হারীতের এক পাশে তো পার্বণী, অন্য পাশে অচেনা এক ইংরেজ মহিলা। তিনি একবার বলেন, 'ওয়াণ্ডারফুল' তো একবার বলেন, 'মার্‌ভেলাস'। একবার 'গ্রেট' তো একবার 'সুপ্রীম'।

আবেগে হারীতের মুখ দিয়ে কথা সরে না। পার্বণীরও সেই দশা। একটার পর একটা পীস্‌ শেষ হয় অমনি করতালির ঝড় ওঠে। ওরাও পাগলের মতো করতালির

করতাল বাজায়। পাশের মহিলাও আত্মহারা।

সুজাতাদিরাও এসেছিলেন, ওরা জানত না। হল থেকে বেরোবার সময় সাক্ষাৎ।

'ও কী! তোমরা! কোথায় বসেছিলে দেখতে পাইনি।' সুজাতাদি বলেন।

'আশ্চর্য! আমরাও লক্ষ্য করিনি। কেমন লাগল, মাসি?' পার্বণী বলে।

'তিন বছর আগেও শুনেছি। ছ'বছর আগেও। ওর মাধুরী কি ফুরোবার! তবে এবার মনে হচ্ছে ওঁর বয়স হয়েছে। বেশীর ভাগই ছোট ছোট পীস্।'

কর্নেল মল্লিক ঠোঁটে পাইপ চেপে নীরব ছিলেন। তিনিও প্রশংসায় সরব হন। তারপর হারীতের পিঠে চাপড় মেরে বলেন, 'অর্ধেক মাধুরী তো একসঙ্গে বসে শোনার।'

পার্বণী ও হারীত দু'জনেই আরক্ত হয়।

'তোমরা এখন কেমন করে ফিরবে? না আমরা পৌঁছে দেব!'

'না, মাসি। পৌঁছে দিতে হবে না। আমরা বাসে করে ফিরে যাব।'

যেতে যেতে হারীত বলে, 'অনুরণন চলতে থাকে, আলোড়নও থামে না।'

'গভীরকে গভীরের আহ্বান। কথাটা আমার নয় কিন্তু।' পার্বণী বলে।

সঙ্গীতের আলোচনা ক্রমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নামে।

'আপনি আমার উপর রাগ করেছেন। আসনের দাম মিটিয়ে দিয়েছি বলে। খোঁজ নিয়ে দেখবেন এদেশের মেয়েরাও তাই করে। তবে যারা বহুদিনের বন্ধু তাদের কথা আলাদা। তারও অন্য কোনো উপলক্ষে প্রতিদান দেয়। একজন থিয়েটারের টিকিট কাটলে আরেকজন অপেরার টিকিট কাটে। ওরা প্রায় সমান সমান যায়। আমি যে সমান সমান যেতে পারব না। মাসি আমাকে কতবার বলেছেন ওঁর সঙ্গে থাকতে। আমার আপন মাসি। সঙ্কোচের কারণ নেই। তা সত্ত্বেও আমি নারাজ। আমার বাবা সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, মেসোমশায়ের মতো সম্ভ্রান্ত নন। বলতে নেই, কুলের দিক থেকে আমরাই বড়ো। কিন্তু কাঞ্চন কুলীন নই। তার জন্যে দুঃখিতও নই। তবে অনেক কিছু বাদ দিতে হয়। এই যেমন ক্রাইসলারের রিসাইটাল।'

॥ পাঁচ ॥

এরপরে হারীত যখন যেখানে যায় একজনের জন্যে আসন বুক করে, নয়তো কোন পুরুষ বন্ধুকে সঙ্গী হতে বলে। পার্বণীর উপর ট্যাক্স চাপাতে কুণ্ঠিত হয়। যখন জানে তার সে ক্ষমতা নেই।

তা বলে পার্বতীর সঙ্গে ওর দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যায় না। সুজাতাদির পার্টিতে ওরা অংশ নেয়। অনিমেষদার মতে ওটা একপ্রকার স্বদেশীমেলা। ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশিনী বিয়ে করা সুজাতাদির পছন্দ নয়, তাই তিনি স্বদেশীমেলার আয়োজন করে তার প্রতিরোধ করেন। ভারতীয় ছাত্ররা স্বদেশিনী ছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশার প্রভূত সুযোগ পায়।

'আপনার রাগ কি পড়েনি ? কই, একবার জানতেও তো দেন না কবে কোথায় কী দেখতে যাচ্ছেন। জানলে পরে মনঃস্থির করা সম্ভব হতো।' পার্বতী বলে।

'রাগ আমি কোনদিনই করিনি। কিন্তু স্বভাবটা আমার মধ্যযুগের নাইটদের বা ক্রবাদুরদের মতো। নারীর জন্যে আমি অকাতরে আত্মদান করতে পারি। কিন্তু নারী না চাইলে নয়। আমার ইতিহাস আপনি জানেন না। জানলে আমাকে সাধারণ একজন গ্যালান্ট ঠাওরাতেন না। ও কথা যাক। আবার কবে দেখা হচ্ছে, বলুন। সিভিল থর্নডাইকের নার্স ক্যাভেল ভূমিকায় চিত্রাভিনয় দেখেছেন ?'

'না, দেখতে চাই। যাবেন ? কবে ? কোন্ শো'তে ?'

দু'জনের সুবিধা অনুসারে দিনক্ষণ ফেলা হয়। টিকিট কেনার প্রসঙ্গ উঠতেই হারীত বলে, 'এখন থেকে একটা নিয়ম করা যাক। প্রস্তাবটা যার টিকিট দু'খানা তার। প্রস্তাবটা গ্রহণ করলেই টিকিট একখানা গ্রহণ করা হয়ে যায়। কিন্তু দাম দিতে হয় না। দিলে নিয়মভঙ্গ হয়। কেমন ? একমত ?'

পার্বতী সায় দেয়। বলে, 'আমিও এখন থেকে প্রস্তাব করে রাখছি যে সিবিল থর্নডাইকের অভিনয় যখন দেখা হচ্ছে তখন ইডিথ ইভান্সেরও হোক। মঞ্চাভিনয়। লেডি উইথ এ ল্যাম্প। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জীবন।'

'তা হলে তো চমৎকার হয়। আমি গ্রহণ করছি। তবে আণ্ডার প্রোটেস্ট। থিয়েটার টিকিটের দাম বেশী।'

'নাইটের দেখছি লেডির হাত থেকে ধন নিতে আপত্তি। অথচ দেশে ফিরে গিয়ে আর একটি লেডীর বাপের হাত থেকে পণ নিতে বাধবে না।'

'আপনি যদি আমাকে চিনতেন তা হলে অমন অবিচার করতেন না, মিস হালদার।'

টিউবের আওয়াজে কেউ কারো কথা শুনতে পায় না বলে আবার ওরা ডবল ডেকার বাসের উপরতলার যাত্রী হয়।

পার্বতী বলে, 'আপনাকে দেখে মালুম হয় যে আপনার কী একটা দুঃখ আছে। সেটা আছে বলেই আপনার প্রতি আমার দরদ আছে। কিন্তু সাকসেসফুল ছেলে তো ঢের দেখলুম। চুম্বকের মতো ওরা ঠিক ওইখানেই গিয়ে আটকে যায় যেখানে স্ত্রীভাগ্যে ধন। কিংবা অসামান্য রূপ। একটি সাকসেসফুল মেয়ের কোনো আশাই নেই একটি

সাকসেসফুল ছেলের সহধর্মিণী হবার। তাকে তার চেয়ে কম বিদ্বান বা প্রতিভাবান নিয়েই সন্তুষ্ট হতে হয়। দেশে ফিরে গিয়ে দেখব যে আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের বা জজের স্ত্রীর কাছে প্রত্যেকটি ফ্যাংশনে খাটো হতে হচ্ছে, যদিও তারা কেউ আমার সমকক্ষ নয়।'

'কিন্তু আপনার গানের জন্যে আপনি যথেষ্ট সম্মান পাবেন।'

'সম্মান পেতে পারি, কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে চাকরিও করতে হবে। আর সে চাকরি এমন চাকরি যে তার সঙ্গে বিবাহের সঙ্গতি নেই। আপনি সেদিন সুগায়িকা বলে ফুলের তোড়া দিচ্ছিলেন, কিন্তু আপনি কি জানেন না যে সুগৃহিণী ও সুজননী না হলে মেয়েদের জীবনের সাধ মেটে না? ঘুরে ফিরে সেই বিয়ের ভাবনাই আসে।'

হারীত জানে বইকি। জানে এবং বোঝে। কিন্তু চুপ করে থাকে।

'আপনি হঠাৎ মৌনব্রত নিলেন যে? অন্যায় কিছু বলেছি?'

'না, মিস হালদার। আমি ভাবছিলুম কী করে আপনাকে বোঝাব যে আমি ওঁদের একজন নই। চাকরিটা পেয়েছি বলে যে রাখবই এমন কোনো কথা নেই, বিকাশের পথে অন্তরায় হলে ছেড়ে দেব। তার আগে যদি আমার বিয়ে হয়ে থাকে তবে স্ত্রী বেচারির অবস্থা কল্পনা করুন। তার চেয়ে বিয়ে না করাই ভালো নয় কি? নয়তো এমন জনকে বিয়ে করতে হয় যিনি তেমন অবস্থার জন্যে প্রস্তুত। প্রেমের জন্যে যদি বিয়ে হয়ে থাকে তো প্রেমই পারে সব রকম দুঃখদৈন্য সইতে। কিন্তু প্রেম তো সম্বন্ধ করে বিয়ে করলেই হয় না। কার সঙ্গে কার হয়, কেন হয়, কী করলে থাকে, কতদিন থাকে—সব রহস্যময়। হৃদয় একবার দিলে তাকে ফিরে পাওয়া শক্ত। একজনের কাছ থেকে ফিরে না পেলে আরেকজনকে দেওয়া আরো শক্ত। ঘুরে ফিরে সেই ফিরে পাবার ভাবনাই আসে।'

পার্বতী বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে সুধায়, 'আপনি কি মুক্ত নন?'

'প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্ত। দায়িত্ব থেকে মুক্ত। সেদিক থেকে আমি আরামে আছি, নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচছি। কিন্তু নতুন করে ভালোবাসতে পারছিনে। সে আমার ইচ্ছাধীন নয়। প্রেমে পড়লে প্রেমের অগাধ জল থেকে উঠে আসা ইচ্ছা করলেই হয় না।'

পার্বতী বিমূঢ়ের মতো তাকায়।

হারীত বলে, 'আমি যেন জালে পড়া পাখী। উড়তে গিয়ে দেখছি জালশুদ্ধ উড়ছি। আমি কি মুক্ত না আমি অমুক্ত?'

পার্বতী এ ধাঁধার জবাব জানে না। চুপ করে ভাবে।

'মোট কথা, আগে ডিস্‌এন্‌গেজমেন্ট। তারপরে নতুন করে এন্‌গেজমেন্ট। যদি আরেকজনের হৃদয় পাই।'

পরে যখন ওদের দেখা হয় তখন আবার এ প্রসঙ্গ ওঠে। নার্স ক্যাভেল দেখে সিনেমা থেকে বেরিয়ে রেস্টোরান্টে বসে।

'সেদিন জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমি কি মুক্ত নই? তার উত্তরে আর একটা উপমা দিই। আমি যেন লঙ্কাকাণ্ডের লক্ষ্মণ। আমার বুকে যেন একটা শেল বিঁধে রয়েছে। সেই শেল থেকে আমাকে বিশল্য করবে কে? কোথায় পাব আমার বিশল্যকরণী?'

'বিশল্যকরণী!'

'হাঁ, বিশল্যকরণী। কিন্তু গন্ধমাদন পর্বতের ওষধি নয় যে হনুমানকে পাঠালে খুঁজে পাবে। তাই লক্ষ্মণকেই তার সন্ধানে বেরোতে হয়েছে।'

'তা হলে বিশল্যকরণী বলতে কী বোঝায়, মিস্টার নিয়োগী?'

'বিশল্যকরণী বলতে কী বোঝায় তা লক্ষ্মণ নিজেই কি জানে! এই শুধু জানে যে শল্য যখন আছে তখন বিশল্যকরণীও আছে।'

পার্বণীর মন সমবেদনায় ভরে যায়। সে তার শুভকামনা জানিয়ে বলে, 'লক্ষ্মণের মতো আপনিও বিশল্য হবেন। এটা ধ্রুব।'

'আপনার আশীর্বাদে।'

'কী যে বলেন, মিস্টার নিয়োগী। আমি কি আপনাকে আশীর্বাদ করার যোগ্য? না হয় বয়সে কিছু বড়ো।'

'আর কলাবিদ্যায়? সেদিক থেকে আপনার পাশে দাঁড়াতে পারি এমন সাধনা কি আমার আছে? লিখি তো কাঁচা হাতের গদ্য আর পদ্য। ক'জনই বা পড়ে! আর আপনার গান শোনবার জন্যে চারদিক থেকে লোক জড়ো হয়।'

'তা হলেও আশীর্বাদ কথাটা আপনি ফিরিয়ে নিন। নইলে আমার মনে হবে যে, আপনি আমাকে গুরুজনের পর্যায়ে ফেলে দূরে ঠেলে দিলেন।'

হারীত হাসিমুখে ফিরিয়ে নেয়। 'আপনি তা হলে কোন্ পর্যায়ে?'

'বন্ধু পর্যায়ে।'

'বন্ধু কি বন্ধুকে 'আপনি' বলে, না 'তুমি' বলে। না অতবার মিস্টার মিস্টার করে?'

'না। আমার লজ্জা করবে।' পার্বণী রাঙা হয়ে ওঠে।

সুজাতাদি বোধ হয় আশা করেছিলেন যে, ওরা দু'জনে যখন একসঙ্গে থিয়েটারে কনসার্টে সিনেমায় যাচ্ছে তখন ওদের এনগেজমেন্ট একরকম হয়েই রয়েছে, শুধু ঘোষণা করাটাই বাকী। একটু ধৈর্য ধরতে হবে এই যা। মাসের পর মাস চলে যায় ওরা আপনি থেকে 'তুমি'তে পৌঁছয় না। লক্ষ্য করে তিনি বিচলিত হন।

পার্বণীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা, হারীত ছেলেটির মনে কী আছে? ও কি কোনোরকম আভাস ইঙ্গিত দিয়েছে?'

'তা তো বলতে পারব না মাসি। আমি শিশু মনস্তত্ত্ব শিক্ষা করছি। পুরুষ মনস্তত্ত্ব আমাদের পাঠমালায় নেই।'

'তা হলেও কী রকম মনে হচ্ছে?'

'যতদূর বুঝি ওঁর চাকরি করতে রুচি নেই, বিয়ে করতে চাড় নেই, ভালোবাসতে সাহস নেই, অঙ্গীকার করতে আগ্রহ নেই। উনি এখনো পুরোপুরি মুক্ত নন। ইমোশনালি ফ্রী নন। একদিন বলছিলেন ওঁর বুকে যেন একটা শেল বিঁধে রয়েছে। সেই শল্য থেকে তিনি বিশল্য হতে চান। তাই বিশল্যকরণী খুঁজছেন।'

'হুঁ। তোমার মেসোর মতে সাইকোপ্যাথলজিক্যাল কেস। স্পেশালিস্টের সাহায্য দরকার। কিন্তু কিছুতে কি শুনবে? তুমি যদি পারো তো ওকে একটু বুঝিয়ে রাজী করাও, পার্বণী।'

'না, মাসি। আমার তা মনে হয় না। ব্যর্থ প্রেমের কোনো চিকিৎসা নেই। সময়ে সারবে। তার চেয়ে যেটা সিরিয়াস সেটা জীবিকা সম্বন্ধে অনীহা। সংসার সম্বন্ধে বৈরাগ্য। ধাঁ করে যদি চাকরিটা ছেড়ে দেন, যদি বোহিমিয়ান হয়ে ঘুরে বেড়ান তার কী প্রতিকার আছে? একদিন বললেন উনি লণ্ডন প্যারিসের আর্টিস্টদের মতো স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চান। পরাধীন দেশের পরাধীন চাকুরিজীবী হলে জীবনটার অপচয় হবে।'

সুজাতাদি দুঃখিত হন। কিন্তু হাল ছেড়ে দেন না। কে জানে কেন ওই ছেলেটিকে তাঁর ভালো লেগেছে। ওর সঙ্গে একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে, যেটা স্বার্থগন্ধহীন। পার্বণীকে না করে ও যদি আর কাউকে বিয়ে করত তা হলেও তিনি আনন্দিত হতেন। ছেলেটার একটা স্থিতি হতো। কিন্তু বিদেশিনীকে নয়।

॥ ছয় ॥

সরোজিনী নাইডুর দেশী ও বিদেশী ভক্তরা তাঁর সম্বর্ধনার জন্যে যে মধ্যাহ্নভোজ দেন তাতে অনিমেষদার ও মানাদির নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু সেদিন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় দাদা স্বয়ং নিমন্ত্রণরক্ষা করতে পারেন না, তার হয়ে হারীতকে যেতে বলেন। নইলে দিদি একা একা পিলোলির রেস্টোরান্টে যেতে নারাজ।

হারীত বলে, 'প্রবেশদ্বারে পৌঁছে দিতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু ভিতরে গিয়ে ভোজের টেবিলে বসি কী করে? লোকে ভাববে হংসো মধ্যে বকো যথা।'

'কে হংস আর কে বক সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে।' অনিমেষদা তার আপত্তি হেসে উড়িয়ে দেন।

ভোজের টেবিলে মানাদিকে ও হারীতকে আলাদা আলাদা করে বসানো হয়। সে দেখে তার দুই পাশে দুই অপরিচিতা মহিলা। তাঁদের সামনে রাখা প্লেটের ওধারে তাঁদের নাম লেখা কার্ড। মিসেস চিটনিশ। মিস মিডলটন। সে উভয়কেই মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানায়। তাঁরাও প্রত্যভিবাদন করেন।

'আপনাকে দেখে সুখী হলুম।' বলেন বাম পার্শ্ববর্তিনী মিসেস চিটনিশ। 'আপনার স্ত্রীকে আমি চিনি। কিন্তু আপনার সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ, ডক্টর দেব।'

কী সর্বনাশ! হারীত শিউরে ওঠে। তার নজরে পড়ে যায় তার নিজের তথাকথিত নামের কার্ড। ডক্টর এ সি দেব! সে মনে মনে মা ধরণীকে স্মরণ করে, আর এদিক ওদিক তাকায়। প্রকৃত পরিচয় দিলে ওঁরা যদি ওকে গেট ক্র্যাশার বলে ঘাড় ধরে বার করে দেন তাহলে কী উপায়! না সে সমস্তক্ষণ ভান করবে যে সে-ই ডক্টর দেব ও মানাদি তার স্ত্রী? হা ভগবান!

'মিসেস চিটনিশ, আপনি তো জানেন আমাদের দেশে কেউ যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারেন তো ভাইকে বা ছেলেকে পাঠান। ডক্টর দেবও তাই করেছেন। তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত। আমি মিসেস দেবের এস্কর্ট হয়ে এসেছি।'

'ওই, তাই বলুন। আমি ভাবছি আপনি কি যোগী যে বয়সটাকে বাড়তে দেননি। আর নয়তো স্ত্রীর সঙ্গে বয়সের অত তফাৎ কেন হয়।'

হারীত একটু সাহস পেয়ে বলে, 'যোগী নই, নিয়োগী আমার নাম।' তারপর নিজের তথাকথিত নামের কার্ডখানা টেনে নিয়ে তাতে লেখে মিস্টার এইচ কে নিয়োগী।

তা লক্ষ্য করে মিস মিডলটনের কৌতূহল। তিনি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন।

'আই ওয়াণ্ডার, মিস্টার নিয়োগী', তিনি তার চোখে চোখ রেখে বলেন, 'আমাদের কি আগে কখনো দেখা হয়েছে?'

'আমিও আপনাকে সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম, মিস্ মিডলটন।'

'কিন্তু আমার যে কিছুতেই মনে পড়ছে না কোথায়, কবে, কোন্ অবস্থায়।'

'আমারও।'

'আপনি কি এদেশে অনেকদিন আছেন, মিস্টার নিয়োগী?'

'না, মিস মিডলটন। আমি নবাগত। এখনো এক বছর হয়নি।'

'তা হলে এদেশে নয়।'

'তা হলে কোন্ দেশে? আপনি কি ভারতবর্ষে গেছেন?'

'না, যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যদিও আমার ভারতীয় বন্ধুবান্ধবরা বার বার বলেছেন।'

'তবে কি গত বড়দিনের সময় আপনি সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন ?'

'না, মিস্টার নিয়োগী। বড়দিনে আমি বাড়ী থাকি। মার সঙ্গে কাটাই। ভাই সাত সমুদ্র ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু বড়দিনে বাড়ী আসে।'

'তা হলে পূর্বজন্ম মানতে হয়, মিস মিডলটন।'

'পূর্বজন্ম !' তিনি চোখ কপালে তোলেন। 'পূর্বজন্ম যদি সত্য হয়ও তার কথা মানুষের মনে থাকবে কী করে। যখন ছেলেবেলার কথাই মনে থাকে না। এক বছর বয়সের কথা কি আপনার মনে আছে না আমার ?'

এরপরে আর যুক্তি জোগায় না। হারীত কিছুক্ষণ ভেবে বলে, 'জীবনে যারা পরস্পরকে এই প্রথম দেখছে তাদের এক মুহূর্তের দেখাও একযুগের মনে হতে পারে। তাই পরের মুহূর্তে ধাঁধা লাগে যে আগে তাদের দেখা হয়েছে।'

কল্পনার দৌড়ে হারীতের দোসর নেই। এরপরে বোধহয় আধুনিক স্বপ্নতত্ত্ব আসত, কিন্তু মিস মিডলটন হঠাৎ কী যেন আবিষ্কার করে পুলকিত হয়ে ওঠেন।

'টেট গ্যালারিতে আপনাকে দেখেছি। কেমন, ঠিক কিনা ?'

'টেট গ্যালারিতে আমি গেছি বইকি। আপনার মতো একজনকে ছবির সামনে ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। কিন্তু আপনিও কি আমাকে লক্ষ্য করেছেন ?'

'তা না হলে এমন চেনা চেনা ঠেকত কেন ?'

হারীত এইবার নিরস্ত হয়। ওদিকে মিসেস নাইডুর বক্তৃতা শুরু হয়েছিল। সে তো শুধু বাগ্মিতা নয়, শাড়ীর আঁচল ধরে বিচিত্র ভঙ্গিমা। আর এমন প্যাশনপূর্ণ দেশপ্রেম ! মাঝে মাঝে ভারতবন্ধু ইংরেজদের প্রতি এমন শ্লেষ ! প্যান্সবেরী তো লজ্জায় অধোমুখ। ভারতীয়দের উল্লাস দেখে কে !

মিসেস চিটনিশ উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন, 'এমন বাগ্মী ইংরেজদের মধ্যে আছে ?'

'না, ইংলণ্ডে আর নেই।' তাঁর অপর পার্শ্বে সমাসীন বিশিষ্ট ইংরেজ সাংবাদিক মন্তব্য করেন। 'সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির, বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা এককালে শুনেছি। তাঁদের বাগ্মিতার ধারা লোপ পায়নি দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। মিসেস নাইডুই বোধহয় শেষ বাগ্মী। ইংরেজী ভাষায়।'

হারীত মন দিয়ে শোনে না। তার মন তখন অন্য জগতে। যে জগৎ রূপের জগৎ। যার রূপ কেবল বিধাতার নয়, মানবেরও সৃষ্টি। মিস মিডলটন যে একজন আর্টিস্ট বা আর্ট রসিক তাঁর দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। তেমনি হারীত যে একজন কবি।

'এ কেমন করে হয় যে আপনি এ হেন জায়গায় !' হারীতের বিস্ময়।

'আমারও তো সেই প্রশ্ন।'

'আমি আমন্ত্রিত হয়ে আসিনি। এসেছি বন্ধুর দিদির এস্কর্ট হয়ে, তাঁর স্বামী অন্য কাজে ব্যাপৃত বলে।'

'তাই আপনি অমন অস্বস্তি বোধ করছেন।'

'আর আপনি ?'

'আমি! আমি ভারতীয়দের আমন্ত্রণ মাঝে মাঝে পাই। পেলে গ্রহণ করি। বিনা ভ্রমণেই কতকটা ভারতের স্বাদ মেলে। বাকীটা পুষিয়ে নিই ভারত সম্বন্ধে বই পড়ে। এই তো সেদিন কুমারস্বামীর বই পড়ে মুগ্ধ হলুম।'

'কোন বই ? ডান্স অফ শিব ?'

'হ্যাঁ, মিস্টার নিয়োগী। মিউজিয়ামেও মাঝে মাঝে যাই। ভারতীয় শিল্পকর্মের বিকাশের দৃষ্টান্ত দেখি। মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়।'

'তা হলেও দেশভ্রমণের বিকল্প নেই। ইউরোপ সম্বন্ধে আমারও তো কিছু পড়াশুনা ছিল। কিন্তু এসে যা দেখছি তার সঙ্গে তুলনাই হয় না। আপনাকে সশরীরে ভারত সন্দর্শনে যেতে হয়, মিস মিডলটন।'

'তার চেয়ে পাহাড়কে মহম্মদের কাছে যেতে বলা সহজ।' তিনি হাসেন।

সেদিন বিদায় নেবার আগে মিস মিডলটন তাঁর নামের কার্ডখানার পেছনে তাঁর বাড়ীর ঠিকানা লিখে হারীতের হাতে দিয়ে বলেন, 'আমরা শুক্রবার সন্ধ্যায় রিসিভ করি। আমন্ত্রণ রইল।'

হারীত ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, 'কন্টিনেন্টে যাবার আগে দেখা করতে আসব। কী কী দেখতে হবে সে বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাইব।'

'অনেকদিন যাইনি। বাসি খবর শুনবেন। তবু আসবেন।'

এর কিছুদিন পরে হারীত হ্যাম্পস্টেড গার্ডেন সাবার্বের একটা লাল রঙের দোতালা বাড়ীর বাগানে ঢুকে সদর দরজার বেল টিপতেই কপাট খুলে যায়। তার সামনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হাসছেন মিস মিডলটন।

'বাড়ী খুঁজে পেতে কষ্ট হয়নি ?'

'কিছুমাত্র না। আপনার আঁকা মানচিত্রকে ধন্যবাদ।'

তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় প্রথমে গৃহকর্ত্রী লেডী মিডলটনের সঙ্গে, তারপরে সেদিনকার অতিথিদের সঙ্গে। কেউ আত্মীয়, কেউ বন্ধু! হারীত এঁদের মণ্ডলীর কেউ নয়, তা হলেও সাদর অভ্যর্থনা পায়।

'শুনছি আপনি ইউরোপে যাচ্ছেন, মিস্টার নিয়োগী।' আপ্যায়নের পর লেডী মিডলটন বলেন, 'সেকালের সেসব গথিক ক্যাথিড্রাল দেখতে ভুলবেন না। আর সুযোগ

পেলে শুনবেন বাখ-এর ওরাটোরিও।'

'আমি হলে বায়রয়ঠে যেতুম ভাগনারের অপেরা পর্যায় শুনতে।' বলেন মিস ডিকসন।

এক অস্ট্রিয়ান ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর সুপারিশ ভিয়েনার ফিলহারমনিক অর্কেস্ট্রা। এমনি আরো কয়েকজনের আরো কয়েকরকম সুপারিশ বা সাজেশ্চন।

হারীত মনোযোগী ছাত্রের মতো সব একে একে লিখে নেয়। যদিও তার সঙ্গতি সীমাবদ্ধ। সেই কারণে সময়ও সসীম।

মিস মিডলটন তাকে একখানা পুরাতন বেডেকার দিয়ে বলেন, 'অনেক কিছু বাসি হয়ে গেলেও মোটের উপর কাজে লাগবে আপনার।'

হারীত তাঁকে ধন্যবাদ দেয়। 'পরে একদিন এসে ফেরৎ দিয়ে যাব।'

'ফেরৎ না দিলেও চলবে, কিন্তু কেমন লাগল আপনার ইউরোপ ভ্রমণ সেকথা এমনি এক বৈঠকে শুনিয়ে গেলে খুশি হব।'

'কিন্তু আপনার নিজের কোনো সাজেশ্চন জানালেন না যে?'

'আমি অনেকদিন ইউরোপে যাইনি। গেলে শান্তিবাদীদের সঙ্গে মিশতুম ও তাঁদের কাজ দেখতুম। সাম্য আর স্বাধীনতা নিয়ে দু' শতাব্দী কেটে গেল, এখন মৈত্রীর পালা। মৈত্রী নিয়ে যাঁরা দিন-রাত তৎপর তাঁদের সঙ্গে যোগ রাখতে ইচ্ছে।'

হারীত বলে, 'সেটা'ও একটা দিক। কিন্তু আমার এযাত্রা অত সময় নেই, মিস মিডলটন। আমি সব দিক দেখতে পারব না।'

তিনি তাকে শুভযাত্রা জানান।

॥ সাত ॥

কি ভাগ্যি, দিব্যকান্তিকে পাওয়া গেল সারল্যাণ্ডের এক গ্রামে। তিনি সেখানকার বিশিষ্ট ডাক্তার পরিবারের অতিথি। হারীতকেও তাঁরা অতিথি করে নেন। তখন দুই বন্ধুতে মিলে একসঙ্গে বেড়ানোর প্রোগ্রাম ছকা হয়।

দিব্যকান্তি একদিকে যেমন স্বপ্নবিলাসী রোমান্টিক ও বিদ্বান অন্যদিকে তেমনি ঘোরতর প্র্যাকটিকাল ও হিসাবী। হারীতের তিনি বন্ধু ও দার্শনিক ছিলেন, এবার হলেন গাইড। বেডেকার তাঁর নখদর্পণে, টমাস কুকের টাইমটেবল তাঁর কণ্ঠে। জেনেভায় তাঁর সদর, সেখান থেকে তিনি মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েন সরকারী কাজে বা

ছুটিতে। কী করে অমন একটি সুখের চাকরি তিনি জোটালেন তাঁর বন্ধুরা ভেবে অবাক হয়। কিন্তু তাঁর মতে ওটা সুখের নয়। আন্তর্জাতিক হিংসাদ্বেষ সমস্ত আবহাওয়া-টাকে বিষাক্ত করে রেখেছে।

দেশে থাকতে কথায় কথায় তিনি বলতেন, 'আচ্ছা, এ জাতের কিছু হবে!' তিন বছর সুইজারল্যাণ্ডে বাস করে আজকাল তিনি বলেন, 'আচ্ছা, এ মানুষ জাতটার কিছু হবে!' তারপর নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেন, 'কিছু হবে না। বৃথা স্বপ্ন!'

এর থেকে মনে হতে পারে তিনি মানুষ জাতটার উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন, ফলে মদ, মুদ্রা আর মহিলা নিয়ে আছেন। না, সেরকম লোক তিনি নন। কবে কিশোরবয়সে প্রেমে পড়েছিলেন, প্রণয়প্রতিমার অন্তত্র পরিণয়ের পর দেওয়ানা হয়ে বিদেশে চলে আসেন। দেশ তাঁর কাছে বিষবৎ লাগে। হাইডেলবার্গে ও প্যারিসে পড়াশুনা করে কৃতী হন। তারপর জেনেভায় লীগ অফ নেশনসের অধীনে কাজ পান।

হারীতকে কোনোদিন তিনি মুখ ফুটে বলেননি। বয়সের তফাৎ অনেক। তা সত্ত্বেও সে জানত যে তিনিও একদিন বিশল্যকরণীর অন্বেষণে পাড়ি দিয়েছিলেন। তখনকার সেই ভগ্নদশা আর নেই। ইউরোপে বাস করে তাঁর চেহারা ফিরে গেছে। কিন্তু অন্তরঙ্গ-ভাবে মিলে মিশে হারীতের সন্দেহ হয় যে এখনো তিনি বিশল্য হননি। বহন করে চলেছেন অন্তর্বেদনা। হয়তো তিনি বিশল্য হতে চানই না। তাঁর সেই মৌন মূক মূঢ় প্রেম ইহলোকে ব্যর্থ হলেও দান্তের প্রেমের মতো পরলোকে সার্থকতা প্রত্যাশী। এ জীবনটা প্রতীক্ষায় কাটবে।

মেয়েদের সঙ্গে তিনি যেমন সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে মেশেন ও কথা বলেন হারীত তেমন পারে না। এর কারণ তিনি আর প্রেমের আশা পোষণ করেন না। হারীত যাই বলুক না কেন সে আবার প্রেমে পড়ার আশায় বেঁচে আছে।

সারল্যাণ্ড থেকে রাইনল্যাণ্ড, সেখান থেকে রাইন নদ দিয়ে যাত্রা, তারপর দক্ষিণ জার্মানী ও অস্ট্রিয়া। সেখান থেকে হাঙ্গেরি। কিন্তু বুডাপেস্ট পর্যন্ত গিয়ে দেখা গেল তহবিল ফুরিয়ে এসেছে। আরো আগে ফুরিয়ে যাবার কথা, যদি না দিব্যকান্তি সতর্ক হতেন। ফোর্থ ক্লাসে চড়তে তাঁর বাধে না, খিদে পেলে শুওরের মাংসের ভূর্স্ট খান, তেষ্টা পেলে বীয়ার। যেখানে যান সেখানে খ্রীস্টান সাধু বা সাধ্বীদের পরিচালিত হস্‌পিস খুঁজে বার করেন। হোটেলের চেয়ে সস্তা। ভাণ্ডারফ্যোগেল বা উড়োপাখীর ঝাঁকের সঙ্গে পিঠে রুকসাক বেঁধে পদযাত্রা করতেও তাঁর উৎসাহ, কিন্তু হারীতের শরীর অত শক্ত নয়। শরীরকে কষ্ট দিয়ে খরচ কমাবার জন্যে বাড়াবাড়ি করাও তাঁর নীতি-বিরুদ্ধ। ক্লান্ত লাগলে হোটেল বা পাঁসিঅঁতে ওঠেন, সেকেণ্ড ক্লাসে চড়েন। দু'চারদিন আয়েস করে দেখেন। ঘোড়দৌড় করতেই হবে, এমন কোনো মাথার দিব্যি নেই।

সত্যিকার ইউরোপ বলতে গেলে ভিয়েনাতেই শেষ। বাকীটা ইউরোপ ও এশিয়ার সন্ধিস্থল। হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ যে খেয়েছে সে বুঝেছে যে ইউরোপের সাধ্য নেই ও পদ বানাবার। ভীনার স্নিটজেল যে চেখেছে সে জেনেছে ও জিনিস এশিয়ার অসাধ্য।

'হারীত', দিবুদা হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে বলেন, 'রেলিশ করে খাচ্ছ তো। কিন্তু কিসের মাংস সেটা মালুম আছে কি?'

'কিসের মাংস!' মুখ শুকিয়ে যায় বেচারার।

'দেশে ফিরে গিয়ে বোলো না কাউকে। গোবর খেয়ে শুদ্ধ হয়ে নিয়ো।'

'অ্যাঁ!' হারীতের হিন্দু সংস্কারে বিষম আঘাত লাগে। প্রায়শ্চিত্তেও তার মতো সংস্কারকের প্রবল আপত্তি।

'কাজ কী, বাবা, হিন্দুর ছেলের দেশ-বিদেশ দেখার, যদি পদে পদে খাওয়া ছোঁয়ার বিধিনিষেধ মানতে হয়! আর যদি মনে কর এটাও একটা করবার মতো কাজ তবে নির্ভয়ে খাও। এরা ভেজাল দেয় না। যা খাবে তাতে তোমার পুষ্টি হবে। আর পুষ্টি যে তোমার কত দরকার সে তোমার চেহারার দিকে তাকালেই বোঝা যায়।'

হারীতকে খাওয়ানোর জন্যে দিব্যকান্তি ইচ্ছা করেই বাছা বাছা পদের অর্ডার দেন। আর পরে তার ভয় ভাঙিয়ে দেন। মাঝে মাঝে প্যারডি করেন—

'ত্রিশ কোটি সন্তানেরে, ভারতজননী,
রাখিয়াছ হিন্দু করে, মানুষ করনি।'

হারীত তাঁর অঙ্কের ভুল দেখিয়ে বলে, 'ত্রিশ কোটির পাঁচভাগের একভাগ মুসলমান।'

তিনি হেসে বলেন, 'ওঃ! তাই তো! কিন্তু তা হলে ছন্দোহানি হবে।'

ভিয়েনায় ওরা এক অভিজাত পরিবারে পেয়িং গেস্ট হয়। যুদ্ধের আগে এ ভবনে অভিজাত ভিন্ন আর কারো প্রবেশ ছিল না, এখন দুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিদেশীকে আপ্যায়ন করতে হচ্ছে সামান্য কিছু বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে। এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে হচ্ছে কাউন্টকে, কাউন্টেসকে। মনের জ্বালা মনে চেপে রেখে সৌজন্যের অভিনয় করতে হচ্ছে। না, অভিনয় নয়। ওটাই চিরাচরিত রীতি। শুধু শ্রেণী বদল হয়েছে। আর অর্থের প্রত্যাশা এসেছে। তা না হলে অত বড়ো ভবন বেমেরামত পড়ে থাকবে, ট্যাক্সের দায়ে বেহাত হয়ে যাবে।

কিন্তু একটি জায়গায় ওঁরা ঠিক আছেন। একটু ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেছ কি, অমনি সাদা মুখ লাল হয়ে ওঠে। সমঝিয়ে দেয় যে তুমি সমান নও। তুমি নিম্নতর শ্রেণীর।

হারীতের মনে লাগে। তখন দিব্যকান্তি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'জানো তো,

অস্ট্রিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের সামনে প্রাশিয়ান ডিপ্লোম্যাটরাও সিগার খেতে সাহস পেতেন না। বিসমার্কই প্রথম যিনি সমান চাল দিয়ে সিগার ধরান। একটা যুদ্ধ বেধে গেল কে বড়ো কে ছোট তা প্রমাণ করতে। এই শ্রেণীটাকে জব্দ করেছিলেন নেপোলিয়ন, কিন্তু তিনিও শেষে এই শ্রেণীতেই বিয়ে করলেন আর এদের নীতিগতভাবে জিতিয়ে দিলেন। তোমার লেবার পার্টিরও সেই দশা হবে।

হারীতের মনে একটা আতঙ্ক ছিল যে মহাযুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন মাত্র দশ বছরে মিলিয়ে যেতে পারে না, সেসব দৃশ্য তার চোখে পড়বে ও তাকে বিহ্বল করবে। কই, না, তেমন কিছু তো নজরে এলো না। হাত কাটা, পা কাটা ভিক্ষুক বাদে।

'ক্ষতচিহ্ন দেখতে চাও তো স্থূল অর্থে দেখতে পাবে না, হারীত। সারল্যাণ্ডের সেই ডাক্তার পরিবারের প্রত্যেকটি শিশুরই হাড যক্ষ্মা। এ তোমার ইংরেজদের কীর্তি। যুদ্ধের পরেও ওরা জার্মানদের সাজা দেবার জন্যে ব্লকেড করেছিল, যাতে খেতে না পেয়ে শিশুরা অক্কা পায়। একটা জেনারেশনের হাড়ে ঘুণ ধরেছে। কিন্তু তার ফল হয়েছে উল্টো। প্রতিশোধ না নিয়ে কি জার্মানরা ছাড়বে? গায়ে জোর না থাক, মাথায় শয়তানি বুদ্ধি তো আছে।'

হারীত শিউরে ওঠে। 'তার মানে আরো একটা মহাযুদ্ধ?'

'মহামারীও বলতে পারো। মধ্যযুগের ইতিহাসে মহামারীর বিবরণ পড়েছ। মনে কর মহামারী ফিরে এসেছে মহাযুদ্ধ রূপে। একবারই যথেষ্ট নয়। শয়তানির সঙ্গে শয়তানির প্রতিযোগিতায় কে কতদূর যায় বিংশ শতাব্দী জুড়ে তারই অলিম্পিক চলবে। না, আমি কোনো সহজ সমাধান দেখতে পাচ্ছিনে।'

এত সৌন্দর্য, এত ঐশ্বর্য, এমন অফুরন্ত আনন্দ! অথচ তার অন্তরালে অপেক্ষা করছে কী ভয়ঙ্কর অপঘাত ও অন্ধকার! যদি না ইতিমধ্যে শান্তিকামীদের শক্তি প্রবলতর হয়।

লীগ অফ নেশনসের উপরে হারীতের একপ্রকার মিষ্টিক বিশ্বাস। লীগ যদি সচেষ্ট হয় যুদ্ধ আর কোনোদিন বাধবে না। তখন সবাই উঠবে, উন্নতি করবে, সকলের সঙ্গে সকলের সামঞ্জস্য হবে, শান্তি বিপন্ন হবে না।

'দূর থেকে ওরকম মনে হয় বটে, কিন্তু লীগ যাদের সৃষ্টি তারা স্থিতাবস্থার পরিবর্তন চায় না। শান্তি বলতে তারা বোঝে স্থিতাবস্থার নিরাপত্তা। স্থিতাবস্থার পরিবর্তন যাদের কাম্য তারা যুদ্ধ করবে না তো কী করবে? অহিংস অসহযোগ?'

মনটা খারাপ হয়ে যায় শুনে। হারীতের সঙ্গে যতজনের আলাপ হয় তাঁদের একজনও যুদ্ধের পক্ষে নন, অথচ একথা কি সত্য যে, স্থিতাবস্থার পরিবর্তন তাঁদের কাম্য নয়?

'আমরা একটা ডাইনামিক যুগে জন্ম নিয়েছি, হারীত। হয় পরিবর্তন নয় যুদ্ধ।

যুদ্ধও পরিবর্তন ঘটাতে পারে। পরিবর্তনও যুদ্ধ ডেকে নিয়ে আসতে পারে। মানুষ তো সহজে নিজের সুখ-সুবিধে বিসর্জন দিতে রাজী হবে না। স্বার্থত্যাগ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সম্ভব, কিন্তু জাতিগত বা শ্রেণীগত ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। অন্তত ইতিহাসে তার কোনো নজীর নেই।'

নতুন ইতিহাস রচনা করতে হবে। যে জাতি তা করবে সে জাতি অমর হবে। কিন্তু কোথায় সে জাতি! যে শ্রেণী তা করবে, সেই শ্রেণীই বা কোথায়! অগত্যা ব্যক্তির স্বার্থত্যাগই ভরসা। ব্যক্তির স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত যীশুর ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ। হারীত যেখানেই যায়, যেদিকেই তাকায় সেই পরম আত্মদানের দৃশ্য দেখতে পায়। সে প্রেমের তুলনা নেই। তার চোখ দিয়ে জল ঝরে। সে প্রেমকে অবলম্বন করে সঙ্গীত ও চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য কত মহান হয়েছে।

সাধারণ মানুষের হৃদয় বিকল নয়। আর মহত্ত্ব মানবমাত্রেরই সহজাত বৃত্তি। এইখানেই আশাবাদীর আশার গভীরতর ভিত্তি। সাময়িক বৈকল্যের জন্যে ইতিহাসের কয়েকটা পৃষ্ঠা ছেড়ে দিতে হবে। সব মানুষই কিছুকালের জন্যে পাগল হতে পারে। কিছু মানুষ হয়তো চিরকালের জন্যে। কিন্তু সব মানুষ চিরকালের জন্যে পাগল হতে পারে না। তা যদি হয় তবে জাতকে জাত নির্বংশ হবে।

বুডাপেস্ট থেকে উল্টোরথ। হারীতের তার জন্যে খেদ নেই। ইউরোপ বলতে যা বোঝায় তা ভিয়েনার পরে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে। এ যাত্রা ইটালী বাদ পড়ে। তেমনি উত্তরের দেশগুলো। পরের বার দেখা যাবে।

জেনেভায় দিব্যকান্তি বিদায় নেন। তখন হারীত আবার একা। প্যারিসে দিন কয়েক কাটিয়ে সেই অনন্তযৌবনা উর্বশীর সান্নিধ্য পেয়ে স্বস্থানে ফেরে।

ফিরে এসে দেখে মানাদিরা দেশে ফেরার উদ্যোগ করছেন। ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়া হবে।

॥ আট ॥

ওদিকে সুজাতাদিদের কার্যো ফুরিয়ে এসেছিল। ওঁরাও প্রস্থানোন্মুখ। মল্লিককে বদলি করেছে বেলুচিস্থানে। তা শুনে দিদির ধারণা এটা তাঁরই স্বাদেশিকতার শাস্তি। ইংলণ্ডে বাস করে ইংরেজদের তিনি 'নেটিভ' বলতেন। যদিও মিশতেন ওদের সঙ্গেই বেশী ও খরচ করতেন ওদের চেয়েও বেশী।

'তোমার সঙ্গে এক স্টেশনে থাকার সুযোগ পেলে খুশি হতুম, হারীত। কিন্তু বেঙ্গলে আমাদের উপযুক্ত স্টেশন কলকাতার বাইরে মোটে দুটি কি তিনটি। এদেশের নেটিভরা কি ওদের মনোপলি ছাড়বে? শেষকালে কি সেকেণ্ড ক্লাস স্টেশনে পচে মরব? তার চেয়ে কোয়েটা ঢের ভাল।'

'কিন্তু বড্ড দূর যে! যোগাযোগ থাকবে না ভেবে দুঃখ হচ্ছে আমার।'

'আমারও। বেশ কাটল কিন্তু বছরটা তোমাদের সঙ্গে। আট মাসের বেশী ছুটি পুরো বেতনে দেয় না, তাই শেষের দিকে আধা বেতনে চালাতে হয়েছে। সেই জন্যে পার্টিগুলো ইদানীং বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া গ্রীষ্মকালে লণ্ডন তো খালি। যা হোক, আমার চিরকাল মনে থাকবে তোমাকে। ওসব পাগলামি ছেড়ে কাজকর্মে মন দিয়ো। খবরদার, বিদেশিনী বিয়ে কোরো না।'

হারীতের হাসি পায়। 'বিয়ে তো একজনের ইচ্ছায় হয় না, সুজাতাদি। আরো একজনের ইচ্ছার ধার ধারে। কী-ই বা আছে আমার, যা দেখে কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাইবে? আমিই বা কেন আমার স্বাধীনতা সাধ করে হারাব?'

সুজাতাদি গম্ভীর হয়ে বলেন, 'ওই তো একালের ছেলেদের দোষ। স্বাধীনতা হারাবার ভয়ে বিয়ে করতে রাজী নয়। তা হলে মেয়েদের কী দশা হবে! আমার নিজের মেয়ে নেই বলে কি আমি বুঝিনে মেয়েদের দুঃখ। বিয়ে হচ্ছে না বলে চাকরি করে মরছে, এ দৃশ্য কি ভালো লাগে দেখতে! পার্বতীর জন্যে আমার ভাবনা কম নয়। ও কি শেষে ওল্ড মেড হবে! ওর বোনেদের বিয়ে আমিই দিয়েছি, কিন্তু ওর বেলা আমি ব্যর্থ।'

হারীতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'ওর স্বাধীনতা ওর কাছে মূল্যবান।'

'মেয়েদের স্বাধীনতা!' সুজাতাদি কী বুঝতে গিয়ে কী বোঝেন, 'এই বিদেশিনী মেয়েদের মতো। না, বাবা, ভারতের মেয়েদের তুমি রক্ষা কর! আমরা সমান অধিকার চাই, সেকথা ঠিক। কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা ভয় করি। বিবাহই আমাদের ভালো। আর কে না জানে যে বিবাহ মানে অধীনতা!'

হারীতকে চমক দিয়ে তিনি বলডউইনের ভাষায় বলেন, 'সেফটি ফার্স্ট।'

মানাদিরা ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে হারীত সৌরীনও ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। রাঁধবে কে? ঘরকন্নার দায়িত্ব নেবে কে? সৌরীন উঠে যায় সুইস কটেজের এক বোর্ডিং হাউসে। ওখানে ভারতীয় স্টাইলে রান্না হয়। আর হারীত উঠে যায় বেলসাইজ পার্কেরই এক বোর্ডিং হাউসে। সেখানে ইউরোপীয় স্টাইল।

এই বোর্ডিং হাউসের টেলিফোনে পার্বতীকে খবরটা দিতেই সে দীর্ঘ নীরবতার পর প্রগল্ভ হয়ে ওঠে। একবার ডাকে আর এতক্ষণ ধরে কথা বলে যে বোর্ডিং হাউসের ইংরেজ নিবাসী ও নিবাসিনীরা কী ভাবেন কে জানে! যদিও সে ভুলেও ভালোবাসার

কথা মুখে আনবে না তবু সব জড়িয়ে ওটা ওর প্রেমালাপের রীতি।

অথচ দেখা হলে ও যেন ভিজেবেড়ালটি। টেলিফোনের পার্বণী আর সাক্ষাৎকারের পার্বণী যেন দুই স্বতন্ত্র মানুষ। একজন যা বলেছে আরেকজন তা জানে না বা স্বীকার করে না। পার্বণী বোধহয় আশা করে যে, হারীত প্রপোজ করবে, অন্তত তার আভাস দেবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটে না। হারীতের দিক থেকে সে যা পায় তা বন্ধুতার বেশী নয়। ও ছেলে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে যে দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়বে না, যতদিন না বিশল্য হয় বা বিশল্যকরণীর সন্ধান পায়।

পার্বণীর উৎসমুখ খুলে যাবার কারণ সুজাতাদির অপসরণ। পাথরের মতো চেপে রয়েছিলেন তিনি। তাঁর কাছে জবাবদিহির দায় ছিল। পার্বণী এখন স্বাধীন। এতখানি স্বাধীনতা দেশেও সে পায়নি। কিন্তু এর নির্গমনের পথ এই টেলিফোনই। নিজেও বকবক করে, হারীতকেও বকবক করায়। একশ'বার বলে, 'আসি তাহলে।' 'তাহলে আসি।' 'আসি, কেমন?'

কোথায় কী দেখেছে তার একটা ফিরিস্তি দিতে হয় হারীতকে। এই যেমন বুডাপেস্টে 'লা বোহেম।' পুচ্চিনির অপেরা। কোলোনে 'উর ফাউস্ট'। গ্যেটের নাটকের পুতুল দিয়ে অভিনয়। ম্যারিয়নেট। মিউনিকে 'মাইস্টারসিঙ্গার'। ভাগনারের অপেরা। পার্বণী পরের মুখে ঝাল খায়। নিজের মুখে খেতে পায়নি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করে। মেয়েরা তো একা একা বেড়াতে পারে না। কার সঙ্গেই বা যেত?

'তা যদি বলেন,' হারীত সাহস পেয়ে বলে, 'জার্মানীতে এক সঙ্গে বেড়াতে দেখে এলুম এমন সব ছেলেমেয়েকে যারা স্বামী-স্ত্রী নয়। বন্ধু-বান্ধবী। দু'জনেই আর্টিস্ট এমন দুটি তরুণ-তরুণীর সঙ্গে আলাপ হল, যারা একটা পরিত্যক্ত টাওয়ারে আশ্রয় নিয়েছে। অথচ সম্পর্কিত নয়।'

পার্বণী ঠেস দিয়ে বলে, 'আপনি নিশ্চয়ই তারিফ করলেন। না, মিস্টার নিয়োগী? আপনার আদর্শ তো আপনি উদ্‌যাপন করতে পারলেন না, ওরাই করছে দেখে সুখী হলেন। কেমন, ঠিক বলেছি কি না?'

হারীত রাঙা হয়ে বলে, 'যাঃ!'

'যাঃ। তার মানে হাঁ!' পার্বণী বকুনির স্বরে বলে. 'আমরা ভারতের মেয়েরা ওসব অনুমোদন করব মনে করে থাকলে ভুল করেছেন।'

'জার্মানরাও সকলে কিছু অনুমোদন করেন না। ধারাটা নতুন ও যুদ্ধোত্তর। তা বলে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দোষের নয়। অলীক সন্দেহ।'

'হুঁ! অলীক সন্দেহ!' পার্বণী ফোঁস করে ওঠে। 'সব জানেন আপনি।'

সুজাতাদির বোনঝি সুজাতাদিরই মতোই পিউরিটান, এটা উপলব্ধি করে হারীত

নিরস্ত হয়। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। গ্যেটের জন্ম যে ভবনে সে ভবনের কাহিনী বলে। রাইন নদের তীরে ফ্রাঙ্কফুর্ট নগরের।

'ওহো, গ্যেটে! আপনার আদর্শ পুরুষ!' পার্বতী বাঁকা হাসি হাসে। 'ফ্রাউ ফন স্টাইন। ইটালী প্রবাস। ক্রিস্টিয়ানে ফুলপিউস।'

হারীতের জীবনও কতকটা সেই রকম। বাকীটাও কি সেইরূপ হবে? সে মনে মনে বিব্রত হয়। পার্বতী কি মুখ দেখে ভূতভবিষ্যৎ বলতে পারে? না সে পরের চিন্তা পড়তে পারে? হারীতের অনেক রকম খেয়ালের মধ্যে এটাও একটা যে সে চাষানী বিয়ে করবে। মাটির মেয়ের কাছে কায়িক শক্তি পাবে, যা তার মানসিক শক্তির পরিপূরক। তেমনি করে প্রাণশক্তির সঙ্গে মনঃশক্তির সমন্বয় হবে।

'জীবন যদি সমৃদ্ধ হয়, পরিপূর্ণ হয়, কাব্য যদি প্রেরণা পায়, শতধারে ঝরে পড়ে,' হারীত গ্যেটের পক্ষ নেয়, 'তবে সেই যে বর্ধিত দান তার জন্যে সব মানুষের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। গ্যেটের কাছে আমরা যদি কিছু পেয়ে থাকি তবে কোথায় সেটা তিনি পেতেন, যদি না বুই লটে ও ক্রিস্টিয়ানে ও আরো অনেকে তাঁর শিক্ষার ভার নিতেন? ওঁরাই তাঁর গুরু।'

পার্বতীর নিঃশ্বাস উড়ে যায়। সে স্তম্ভিত হয়ে বলে, 'আপনি তাহলে পাপপুণ্যের ভেদ মানেন না? পাপ থেকেও তো কিছু শেখা যায়।'

'খ্রীস্টীয় নীতিশাস্ত্রের সাদা-কালো সতরঞ্চের ছক গ্যেটের জন্যে নয়, এইটুকু আমার বক্তব্য। নিজের কথা আমি বলিনি, মিস হালদার। গ্যেটের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দেখবেন না। আমার প্যাটার্ন আমি নিজে বুনে চলেছি। মিল আছে, অমিলও আছে।'

পার্বতী আরো উত্তেজিত হয়। 'মিল আছে?'

'একটু আছে।'

'ছি ছি! আপনিও।' পার্বতী এমন স্বরে বলে যেন সীজার বলছেন ব্রুটাসকে।

এর পরে কারো মুখে কথা জোগায় না। দু'জনেই নির্বাক।

হারীত ভাবতেই পারেনি যে, পার্বতী ওতে আঘাত পাবে। সে কি ওর বন্ধু হবারও যোগ্য নয়? না ওর বন্ধুতাই যথেষ্ট নয়? কে একজন কোথায় যেন লিখেছেন যে, ছেলেতে-মেয়েতে বন্ধুতা হয় না। হবার নয়। বন্ধুতা হলেই তার রঙ আর রূপ ক্রমে বদলে যায়। তখন বন্ধুতার ছলে হয় প্রেম। পার্বতীর সঙ্গে সম্পর্কটা কি সেই অভিমুখে যাচ্ছে? সেই জন্যে এই নীতিনিপুণতা? ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা এমনিতেই নীতিনিপুণা। যেমন মানাদি আর সুজাতাদি।

বন্ধুতা, বন্ধুতার ছলে প্রেম, এ অভিজ্ঞতা তো হারীতের জীবনে নতুন নয়। এখনো তার বুকে শেল বিঁধে রয়েছে। তার থেকে মুক্ত না হয়ে আর মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা

নয়। পার্বণী যদি প্রেমে পড়ে তবে সাড়া না পেয়ে দুঃখ পাবে।

পার্বণী পরে একদিন টেলিফোন করে। কোথায় তার সেই প্রগল্‌ভতা! সে একবার যদি একটি কথা বলে তবে তার পরে দীর্ঘ বিরতি দেয়। সে যেন আপনার সঙ্গে আপনি লড়ছে। হারীতের বেলা কড়া হবে না নরম হবে? সেকালের লোক এ বিষয়ে একটা মীমাংসায় উপনীত হয়েছিল। পুরুষ হয়ে জন্মালে সাত খুন মাফ। নারী হয়ে জন্মালে হাত-পা বাঁধা। পুরুষের চরিতার্থতার জন্যে কৌলীন্য প্রথা। নারীর অচরিতার্থতার জন্যে সহমরণ বা চিরবৈধব্য। ব্যতিক্রম হিসাবে এক পাল সন্ন্যাসী ও এক দল বেশ্যা। এর নাম ছিল দোরোখা নীতি। জন্ম অনুসারে কর্ম। এতদিনে সেটা প্রতিপত্তি হারিয়েছে। নর ও নারী একই রকম সুযোগ পাচ্ছে বা পেতে চাইছে, না পেলে আন্দোলন করছে। সাফ্রাজেটদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি, এই তো সেদিন আইন পাশ হয়ে গেছে যে মেয়েদের সকলের ভোটদানের সমান অধিকার।

এতদিনে একটা সমতার ভাব এসেছে, কিন্তু এখনো বৈষম্যের জড় রয়ে গেছে। পুরুষ শৃঙ্খলা মানতে রাজী নয়। তা বলে কি নারী উচ্ছৃঙ্খল হবে? মা গো! সাফ্রা-জেটদের নেত্রী মিস সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট সম্প্রতি মা হয়েছেন। মা হওয়ার অধিকার সব নারীরই আছে। বিয়ে হোক আর নাই হোক। হারীতের বোর্ডিং-হাউসের মিসেস ওয়েস্ট সেদিন তাকে বলছিলেন যে, পুরুষসংখ্যা কম বলে যে সব মেয়ের বিবাহ হবে না তারা তা বলে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। অথচ তিনি বেশ রক্ষণশীল পরিবারের মহিলা। পার্বণীর ব্রাহ্ম সংস্কার শুনলে শক পাবে। তার সমাধান হচ্ছে পুরুষকে সতী করা, পত্নীব্রত করা। পাবে, পাবে সে তার মনোমতো স্বামী।

॥ নয় ॥

মিস মিডলটন জানতেন না যে হারীত কন্টিনেন্ট থেকে ফিরেছে। এক শুক্রবার সন্ধ্যায় অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করে তিনি আশ্চর্য হন। 'ও কী! আপনি মিস্টার নিয়োগী? কবে ফিরলেন?'

'বেশ কিছুদিন। আসি আসি করে আসা হয় না। এই নিন আপনার বেডেকার। তার সঙ্গে আমার ধন্যবাদ।'

'আশা করি কাজে লেগেছে।'

'কিছুদূর পর্যন্ত।' হারীত হেসে বলে, 'আমার বন্ধু মিত্তিরের সঙ্গে দেখা হবার পর

থেকে তিনিই আমার রেফারেন্স। আমাকে আর বই পড়ার কষ্ট করতে হয় না। আমি নয়ন ভরে দেখি। শ্রবণ ভরে শুনি। প্রাণ ভরে ঘুরি। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হই। ওদিকে বাজেটেও টান পড়ে। তাই অনেক কিছু হাতে রেখে ফিরে আসতে হয়।'

তিনি তাকে ভিতরে নিয়ে যান। লেডী মিডলটন তাকে স্বাগত জানিয়ে পাশে বসতে বলেন ও তার ভ্রমণকাহিনী শোনেন।

'মোস্ট ইন্টারেস্টিং। আশা করি আপনি খুব উপভোগ করেছেন।' এই বলে তিনি তাকে উৎসাহিত করেন, কিন্তু আসলে ওটা বিদায়ের ইঙ্গিত। হারীত না বুঝে জমিয়ে বসতে চায়। তখন মিস মিডলটন তাকে ইশারায় ডেকে নিয়ে যান।

অন্য ঘরে অল্প কয়েকজন ছিলেন যাঁরা উচ্চগ্রামের আলোচনায় আগ্রহী। হারীতকে তাঁরা ঘিরে বসেন। সে ভ্রমণকাহিনী ছেড়ে তার ভাবনার ভাগ দেয়।

'কতকাল ধরে কতলোকের তপস্যায় গড়ে উঠেছে ফ্রান্স। বেড়ে উঠেছে জার্মানী। আমি কে যে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে বিচার করব। আমি চেষ্টা করেছি জানতে, বুঝতে, ভালোবাসতে। আমি চেষ্টা করেছি আপনার করতে ও আপনার হতে। ওই ক'টা দিনে কতটুকু সফল হওয়া যায়?'

ওদের কৌতূহল জাগে মিস পাওয়েলের প্রশ্নের উত্তরে হারীত বলে, 'ভূগোলের চেয়ে ইতিহাসের উপরে আমার নজর বেশী। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে জার্মানদের ভাগ্য কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে? ওরা কি ওদের নবলব্ধ গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে? কেউ কি ওদের রক্ষা করতে দেবে? আর ফরাসীদের ভাগ্য? ওরা কি আরো দক্ষিণে যাবে না বামদিকে মোড় নেবে?'

'উত্তর তো নয়, পাল্টা প্রশ্ন।' মিস পাওয়েল পরিহাস করেন।

'বেশ তো, তুমিই উত্তর দাও, ডরোথি।' মিস মিডলটন বলেন। তাঁর সহানুভূতি হারীতের প্রতি।

'জোন, তুমি তো জানো আমি যুদ্ধের পর জার্মানীমুখো হইনি। আমার বিরাগ এখনো যায়নি। বিরাগকে অনুরাগ দিয়ে জয় করার দায় তুমিই নিয়েছ, আমি নিইনি। আর ফ্রান্সে যদি বা গেছি ওদের অদম্য প্রতিশোধস্পৃহা আমাকে পীড়িত করেছে। স্বাস্থ্যের জন্যে গিয়ে অসুস্থ হয়ে ফিরেছি।'

বৃদ্ধ সিমনসন কণ্ঠক্ষেপ করেন। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর লিবারল আমি, আমার বদ্ধমূল ধারণা মানুষের ভাগ্য মানুষের নিজের হাতে। মানুষই নিয়ন্ত্রণকর্তা, নিয়তি নয়। তাই ঐতিহাসিক নিয়তিবাদে আপত্তি করেছি। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমাকে এমন নাড়া দিয়েছে যে আমার সে ধারণা অবিকল সেরকম নেই। সেই জন্যে এখন আমার মনে হচ্ছে জার্মানীর ভাগ্য কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেটা কেবল জার্মানদের স্বাধীন

ইচ্ছার ব্যাপার নয়। ইচ্ছা করলেও তারা তাদের নবলব্ধ গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না, যদি অন্যেরা প্রতিকূল হয়।'

'অন্যেরা বলতে যদি ইংরেজ ফরাসী মার্কিন বোঝায় তা হলে অন্যেরা প্রতিকূল হবে কেন, বুঝতে পারছিনে, আঙ্কল চার্লস।' মিস পাওয়েল জানতে চান।

'অন্যেরা বলতে সোভিয়েট রাশিয়াও বোঝায়। গণতন্ত্রে বা ব্যক্তিস্বাধীনতায় তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা পড়েছে উভয়সঙ্কটে। কারণ পাশ্চাত্য শক্তিদেরও আবার সমাজতন্ত্রে বা সামাজিক ন্যায়ে লেশমাত্র সমর্থন নেই। সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা যদি সোশিয়ালিজম ছাড়ে তা হলে নির্জলা ডেমোক্রাসী চালাতে পারবে না। যদি ডেমোক্রাসী বাদ দেয় তা হলে নির্জলা সোশিয়ালিজম চাপাতে পাববে না। আর ওরা যদি ফেল করে তবে জার্মানীর মতো দেশে না চলবে ডেমোক্রাসী, না চাপবে সোশিয়ালিজম। বিকল্প যে কী তা আমি কল্পনা করতে পারছিনে। এই শুধু বলতে পারি যে রাশিয়ার মতো কমিউনিজম নয়, আমাদের মতো গণতন্ত্র নয়। কে জানে হয়তো ইটালীর মতো ফাসিজম।' এই বলে সিমনসন স্তব্ধ হয়ে যান।

'তার আমি কোনো লক্ষণ দেখলুম না, মিস্টার সিমনসন।' হারীত বলে।

'শুনছি হিটলার বলে কে একটা ডেমাগগ জার্মানদের ক্ষ্যাপাচ্ছে।' মিস পাওয়েল অবজ্ঞার স্বরে বলেন।

'এক জায়গায় একটি সস্তার হ্যাণ্ডবিলে ওরকম একটা লোকের নাম দেখেছি বটে। কিন্তু কেউ ওকে সিরিয়াসলি নেয় না। পাগল না ছাগল!' হারীত উপহাস করে।

'না, ওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।' রায় দেন সিমনসন। 'হিণ্ডেনবার্গ থাকতে হিটলার। তার চেয়ে ওই য়ুঙ্কার গোষ্ঠীই ব্যাঙ্কার গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতা আত্মসাৎ করবে।'

সেদিন বিদায়ের সময় মিস মিডলটন বলেন হারীতকে, 'যতসব অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ। আপনাকে আজ একটু আনন্দ দিতে পারলুম না, মিস্টার নিয়োগী। আরেকদিন আসবেন, বাজিয়ে শোনাব। বাখ্, মোৎসার্ট, বেঠোফেন, ব্রাহমস, এঁরাই আমার জার্মানী। এ জার্মানী চিরকাল থাকবে। আর যেটা দেখে এলেন সেটা যদি থাকে তো ভালোই, না থাকলে বুঝবেন যে সোশিয়ালিজম ও ডেমোক্রাসীর সামঞ্জস্য অত সহজে হবার নয়, তার জন্যে আরো কঠিন সাধনা করতে হবে। ক্ষুরধার পন্থা।'

হারীত বলে, 'আচ্ছা, আমি আরেকদিন আসব। আপনি বাজাবেন তো?'

'শুক্রবারেই আসতে হবে এমন কোনো কথা নেই কিন্তু। যেদিন আপনার সুবিধে হবে সেদিন আসবেন। শুধু আসার আগে একটা রিং করবেন।'

'যদি মনে থাকে। আপনাকে বলে রাখি যে আমি স্বভাবত অন্যমনস্ক। সংসারের

উপযুক্ত হতে চেষ্টা করতে হচ্ছে, কিন্তু স্বভাবত আমি অসংসারী।'

মিস মিডলটন হেসে বলেন, 'তার মানে আপনি রিং করতে চান না। রিং না করে যদি আসেন আমার দিক থেকে কোনো অসুবিধে নেই, আমি যদি সেদিন বাড়ী না থাকি আপনারই সময় নষ্ট।'

হঠাৎ হারীতের মাথায় খেলে যায় যে কাছাকাছি কোনো এক পরিবারে একখানা ঘর নিয়ে থাকলে কেমন হয়। গার্ডন সাবার্ব অতি মনোরম অঞ্চল। আর বোর্ডিং হাউসে যদিও আরামের অভাব নেই তবু হারীতের মতো মানুষ কেবল আরামের দ্বারা বাঁচে না।

'আমার সময় সবচেয়ে কম নষ্ট হয় যদি এপাড়ায় একখানি ঘর পাই। আপনার জানাশুনা কোনো পরিবারে যদি পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকি।'

মিস মিডলটন এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। এক মিনিট ভেবে বলেন, 'আচ্ছা। আমার মনে হয় আমি আপনাকে সন্ধান দিতে পারব।'

এরপরে তিনি একদিন তাকে টেলিফোন করে বলেন যে তাঁর প্রতিবেশিনী মিসেস ব্যাসেট কাছাকাছি একটি রাস্তায় বাড়ী কিনে শীগগির উঠে যাচ্ছেন। নতুন বাড়ীতে একখানা ঘর বেশী আছে। তিনি পেয়িং গেস্ট আগে কখনো নেননি বলে একটু ইতস্তত করছেন, কিন্তু বাড়ী কেনার কিস্তি শোধ করতে হলে ওছাড়া আর কোনো উপায় নেই। হারীত যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে। সব নির্ভর করছে পারস্পরিক পছন্দের উপর।

হারীতকে দেখে মিসেস ব্যাসেট সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান। হারীতও এককথায় রাজী। গোল্ডার্স গ্রীন স্টেশন থেকে বিশ মিনিটটাক পায়ে হাঁটতে হয়, এই যা দুঃখ। শুধু যে বাড়ী নতুন তাই নয়, রাস্তাও নতুন। অপর পক্ষে লণ্ডনে থেকেও লণ্ডনে আছি বলে মনে হয় না। পা বাড়ালেই কেনউড। নির্জন তপোবন।

মিস মিডলটনের বাড়ী স্টেশনের পথে পড়ে। কিছুদিন পরে হারীত আবিষ্কার করে যে আরেকটা শর্টকাট আছে, সে পথ দিয়ে গেলে তাঁর বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে হয় না, কিন্তু কোনো কোনো দিন সন্ধ্যা হয়ে যায়, মাঠ ভেঙে শর্টকাট দিয়ে যেতে ভরসা হয় না, সেদিন বাইরে থেকে শুনতে পায় পিয়ানো বাজছে। সারাদিন দোতলার স্টুডিওতে ছবি আঁকার পর একতলায় নেমে এসে তিনি পিয়ানো বাজান। এক-একদিন হারীত তাঁর পিছনে বসে শোনে। দু'জনেই তন্ময়।

তিনি বলেন বেশীক্ষণ বাজাতে গেলে তাঁর হাত ব্যথা করে। এককালে ভূতের মতো বাজিয়েছেন, কিন্তু যুদ্ধের সময় দিনের পর দিন চ্যানেলের ওপার থেকে কামানের গর্জন শুনে তাঁর নার্ভ বিগড়ে যায়। বাজানো ছেড়ে দিয়ে ছবি আঁকা শুরু করেন, তাই নিয়ে আছেন, কিন্তু সঙ্গীতই তাঁর পুরাতন প্রেম, একেবারে ভুলতে পারেননি তাকে। তাছাড়া তাঁর ধরনই এই যে সূর্যের আলো যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তিনি ছবি এঁকে তার

সদ্ব্যবহার করেন। আজকাল দিন ছোট হয়ে আসছে বলে কৃত্রিম আলোর সাহায্য নিতে হয়, এতে তাঁর চোখের আপত্তি। রং আর রেখা নাকি সূর্যের আলোয় যেমন হয় কৃত্রিম আলোয় তেমন হয় না।

তিনি প্রকৃতিপন্থী। তাঁর পোশাকেও প্রাকৃতিক রং। সে পোশাক তাঁর নিজের ডিজাইন। হাতে বোনা কাপড় দিয়ে তৈরি। সুতি বা পশমের। জুতো তাঁর নিজের ফরমাসী। তিনি হাই হিল পছন্দ করেন না। মোজাও বেশ পুরু।

'আমাদের গান্ধীবাদীদের সঙ্গে আপনার মিল আছে দেখছি।' হারীত বলে।

'না, আমি উইলিয়ম মরিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। জানেন তো মরিসও এক অর্থে সোশিয়ালিস্ট ছিলেন। গান্ধীমার্গের সঙ্গে এর মূলগত বিভেদ নেই। তবে গান্ধী বড়ো বেশী রুক্ষ, বড়ো বেশী অষ্টিয়ার। ওঁর কাছে রূপ ও বর্ণের মান নেই। আমি কিন্তু ও না হলে বাঁচব না।'

'আমিও কি বাঁচব!' হারীত তাঁর সঙ্গে একমত হয়।

'সভ্যতাকে সরল করে আনতে হবে, সমাজকে শোষণমুক্ত করতে হবে, প্রকৃতির কাছে পাঠ নিতে হবে, সব মানি। কিন্তু ইন্দ্রিয়নিগ্রহের খাতিরে রূপরস বর্ণ গন্ধ ধ্বনি বর্জন করতে নারাজ। তা বলে উচ্ছৃঙ্খলার পক্ষে নই।'

হারীত চুপ করে যায়। যেন তাব উপরেই কটাক্ষ করা হয়েছে।

॥ দশ ॥

বার বার আসা-যাওয়া করার ফলে এই পরিবারের সঙ্গে হারীতের ভাব হয়ে যায়। এঁদের ঘরের খবর শোনে। লেডী মিডলটন স্বামীর সঙ্গে নানা দেশ ও উপনিবেশে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কাটিয়ে ওঁর অবসরগ্রহণের পর থেকে স্বদেশে বাস করছেন। উনি এখন পরলোকে। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটি জাহাজের ডাক্তার। সাত সমুদ্র পাড়ি দেয়, বছরে একবার কি দু'বার বাড়ী আসে। বিয়ে করেনি, করবে কিনা সন্দেহ। সমবয়সিনী কুমারীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে ওরা নাকি ওকে ভাইয়ের মতো দেখে, সম্ভবপর স্বামীর মতো দেখে না।

আর মেয়েরও বিয়ের বয়স পেরিয়ে যেতে বসেছে। মা যে এর জন্যে বিশেষ চিন্তিত তা নয়। বৃদ্ধার ওই একমাত্র যষ্টি। কথাপ্রসঙ্গে হারীতকে একদিন বলেন, 'আমি নিজে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করি। বিয়ে করতেই হবে এমন কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণ আমার

ছিল না। মনের মতো স্বামী না পেলে বিয়ে না করাই শ্রেয়। তা নয়তো সারাটা জীবন জ্বলতে হয়। আমার মেয়ে জোন আমার ধারা ধরেছে।'

একদিন তাঁদের পারিবারিক অ্যালবাম হারীতকে দেখতে দেওয়া হয়। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক অশ্বারোহিণী মূর্তি দেখে সে জিজ্ঞাসা করে, 'ইনি কে?'

'কেন, চিনতে পারছেন না?' মিস মিডলটন বলেন।

'না তো!'

'কেন, আমাদের কারো সঙ্গে চেহারার মিল নেই?'

হারীত আঁধারে ঢিল ছোড়ে। 'লেডী মিডলটন? অল্প বয়সে?'

'হা হা! চিনতে পারলেন না। মা নন, আমি।'

ওই শক্ত সমর্থ বীরাঙ্গনা কি এই জোন। না সেই জোন অফ আর্ক? হারীত অবাক হয়ে বলে, 'আপনি কি কোনদিন জোন অফ আর্ক ছিলেন?'

'কেউ কেউ রসিকতা করে ওকথা বলেননি তা নয়। সাফ্রাজেট আন্দোলনে আমিও ছিলুম। কী অপূর্ব স্বাস্থ্য ছিল আমার! যুদ্ধের চার বছর আমাকে কাবু করে দিয়ে যায়।'

'কেন, আপনিও কি যুদ্ধে নেমেছিলেন নাকি? মেয়েদের ক্যাভালরি?'

'দূর! যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের যেতে দেবে কেন? দিলে নার্স হিসাবে। আমার তেমন কোনো অভিলাষ ছিল না। মার দেখাশুনা করবে কে? কিন্তু ভাইয়ের কথা, বন্ধুদের কথা ভাবতে ভাবতে আমার মন ভেঙে যায়। কত ছেলে যে হাসতে হাসতে গেল, কিন্তু আর ফিরে এল না।'

তাঁর কণ্ঠস্বরের কারুণ্য হারীতকে স্পর্শ করে। যুদ্ধ যাদের টেনে নিয়ে যায় তাদের সবাইকে ফিরিয়ে দেয় না। মা বোনের অশ্রু, প্রিয়ার অশ্রু মোছবার নয়।

'জার্মানীতে যে পরিবারে দিন কয়েক ছিলুম সেখানেও শুনে এলুম এই কথা। কত ছেলে যে হাসতে হাসতে গেল, কিন্তু আর ফিরে এল না।'

'ওরা বোধ হয় আমাদের দোষ দিচ্ছে।'

'না, ওরা ইংলণ্ডের মা বোনদের দোষ দিচ্ছে না, যুবকদেরও না। ওরা দোষ দিচ্ছে যুদ্ধ জিনিসটাকে। যুদ্ধ যদি বাধে তো এসব অনিবার্যভাবে ঘটবে। ভালো হয়, যদি না বাধে। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন ওঠে, না বেধে কি পারত?'

মিস মিডলটন চিন্তাকুল হন। 'জানি নে। কিন্তু আর যেন না বাধে। ওই যেন হয় শেষ যুদ্ধ। দ্বিতীয়বার যেন ও জিনিস দেখতে না হয়।'

হারীত বলে, 'সে আর বলতে!'

প্রসঙ্গ ক্রমে গভীরতর হয়। 'কারো স্থান অপূর্ণ থাকবে না, যারা গেল তাদের জায়গায় নতুন মানুষ ভূমিষ্ঠ হবে, জার্মানীও ভরে উঠবে, ইংলণ্ডও ভরে যাবে। কিন্তু যারা গেল

তারা কোথায় গেল ? তারা কি পরপারে বেঁচে আছে ? এই জীবনই কি সব ? এর পরে আর কিছু নেই ?' বলতে বলতে মিস মিডলটনের চোখ ছল ছল করে।

'এ কি আজকের প্রশ্ন ! এ জিজ্ঞাসা আদিকালের। হাজার বছর পরেও কি এর নিষ্পত্তি হবে।' হারীত ঘাড় নাড়ে। বলে, 'সারল্যাণ্ডের গ্রামে মাদাম স্মিটও এই প্রশ্ন আমাকে করেন। তিনি নিজেই উত্তর দেন, মৃত্যুর ওপার থেকে কে ফিরে এসেছে যে কী আছে বলবে !'

'আপনি তা হলে অজ্ঞেয়বাদী ?'

'না, মিস মিডলটন। আমি ভগবানের কোলে আছি। ভগবানের কোলেই থাকব। তাঁর কোল থেকে আমাকে হরণ করে নিয়ে যাবে কে ? নিয়ে যাবে কোথায় ? আমার দেহ চলে গেলেও আমি থাকব। যে আমি দেশকালনিবদ্ধ তার অন্ত আছে, আমি দেশকাল-নিরপেক্ষ তার অন্ত কোথায় ?'

মিস মিডলটনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি প্রীত হয়ে বলেন, 'আমিও তাই ভাবি। তবে আপনার মতো বুঝিয়ে বলতে পারিনে। আমি জানি যে, আমার একটা অংশ অমর। মৃত্যু তার কিছু করতে পারবে না। আমার সমস্তটাই নশ্বর নয়।'

'না, সমস্তটা নশ্বর নয়। যে অংশটা জন্মের অধীন সেই অংশটাই মরণের অধীন। যেটার জন্ম হয়নি সেটার মরণ হবে না। আলো হাওয়া আগুনের সঙ্গে তার তুলনা।'

অমরত্বের থেকে ওঠে জন্মান্তরের প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, 'খ্রীষ্টীয় মতে জন্মান্তর নেই। কিন্তু এ-দেশের বেশ কিছু লোক তলে তলে পুনর্জন্ম মানে। মনে হয় ওটা পেগান যুগের সংস্কার। আমার নিজের ভালো লাগে ভাবতে যে আবার যদি জন্ম নিই তো এ-জন্মের ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করিনে। বরঞ্চ তার সংশোধনের একটা সুযোগ পাই।'

'তারপর সে-জন্মের ভুলভ্রান্তির সংশোধনের জন্যে আবার জন্মাতে হয়। এর অন্ত কোথায় ! অন্তহীন জন্মান্তর হিন্দুরাও মানে না। তারা চায় জন্মপরম্পরা থেকে মুক্তি।'

'ক্রমেই আমি এত বিজ্ঞ হব যে, নতুন কোনো ভুলভ্রান্তি ঘটবে না। পারফেকশনই আমার কাম্য। সেখানে যেদিন পৌঁছব, সেদিন পুনর্জন্ম চাইব না, মুক্তিই চাইব।'

'তাহলে', হারীত বলে, 'আপনি এই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সবটা পথ চলতে চান না। এর থেকে একদিন না একদিন সরে দাঁড়াতে চান। বিশ্বসৃষ্টি থাকবে, কিন্তু আপনাকে না নিয়ে থাকবে। আপনিও থাকবেন, কিন্তু বিশ্বসৃষ্টিকে বাদ দিয়ে থাকবেন। আমি এই দ্বৈত স্বীকার করিনে, মিস মিডলটন। আমি ভাবতেই পারিনে যে, আমাকে না হলে এ-জগতের একটা দিনও চলে বা চলতে পারে বা চলবে বা কোনোদিন চলত। যেদিন থেকে সৃষ্টি, সেইদিন থেকেই আমি। যতদিন সৃষ্টি ততদিন আমি।'

তিনি এসব প্রত্যাশা করেননি। অভিভূত হন।

'এর থেকে মনে হতে পারে সৃষ্টির আদি-অন্ত আছে। না, সৃষ্টির আদি-অন্ত নেই। যেমন স্রষ্টার আদি-অন্ত নেই। স্রষ্টা এক। সবকিছু এক। তিনিই সবকিছু। সবকিছুই তিনি। তিনি আমার মধ্যে আছেন। আমি তাঁর মধ্যে আছি। অনাদিকাল। অনন্তকাল। কেন আমি তাঁর কোল থেকে আর কোথাও যেতে চাইব? তাঁর কোলেই যদি থাকি তো জন্মজন্মান্তরে ক্ষতি কী? নিখুঁত হলে যদি জন্মাতে না হয় তবে আমি বরং প্রত্যেকবারেই একটু খুঁত রেখে দেব। পারফেকশন আমার কাম্য নয়, মিস মিডলটন। আমার কাম্য তাঁর কোলে থাকা।'

'মিস্টার নিয়োগী', ভদ্রমহিলা চমৎকৃত হয়ে বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ। এভার সো মাচ।'

এরপর আরো দু'চারটি কথা। হঠাৎ ঘড়ির উপর নজর পড়ায় হারীত লাফ দিয়ে ওঠে। মিডলটনদের ডিনারের সময় হয়েছে। তার নিজের কথা স্বতন্ত্র। সে আজকাল হাই টী খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। ফিরে গিয়ে সাপার। মিসেস ব্যাসেটের এতেই সুবিধে।

হারীতকে উঠতে দেখে মিস মিডলটন এগিয়ে আসেন আর তার দুটি গালে দুটি চুমো খান। সে স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ করে তাঁর চোখে জল। কিন্তু চোখদুটি উজ্জ্বল।

উত্তেজনায় সে-রাত্রে ওর ঘুম হয় না। কেন ওই চুম্বন? কিসের ইঙ্গিত বা সূচনা? নতুন ভালোবাসার? না, না, না। ওটা হয়তো বিদায়কালীন চুম্বন। অমন তো কত দেখা যায়। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে। হারীত কী তবে নিকট আত্মীয়?

হারীত এ-রহস্যের কূলকিনারা পায় না। জোন, জেন, জেনি। একই নামের রকমফের। জপ করতে করতে সহসা মনে পড়ে যায় লী হান্টের কবিতা:

'Jenny kissed me when we met,
Jumping from the chair she sat in ;
Time, you thief, who love to get
Sweets into your list, put that in !
Say, I'm weary, say I'm sad,
Say that health and wealth
have missed me,
Say I'm growing old, but add,
Jenny kissed me.'

তার আনন্দ করা উচিত, কিন্তু কী জানি কেন তার অন্তর বিষাদে ভরে যায়। এখনো একটি প্রেমের জের মেটেনি। এখনো তার শল্য বয়ে বেড়াচ্ছে। আবার প্রেম! তাহলে পার্বতীকে এড়াতে চায় কেন?

ব্যাসেটদের বাড়ীতে টেলিফোন নেই বলে পার্বণীর সঙ্গে আর কথাবার্তা হয় না। চিঠিপত্র কেউ কাউকে লেখে না। দেখা সাক্ষাৎ? তাও অনেকদিন থেকে নেই। তবু পার্বণীর জন্যে তার মন কেমন করে। তার নিয়তি যেন তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে পার্বণীর দিক থেকে জোনের দিকে।

যদি প্রেম হয়ে থাকে। কিন্তু কী করে জানবে যে প্রেম!

এর পরে আবার যেদিন জোনের সঙ্গে দেখা হয় সেদিন হারীত লক্ষ করে, তাঁর মুখে আনন্দের উল্লাস। তিনি তাকে 'হারীত' বলে সম্বোধন করেন। তখন হারীতও তাঁকে 'জোন' বলে ডাকে। আর লী হান্টের কবিতার একপ্রস্ত নকল পকেট থেকে বার করে তাঁর হাতে গুঁজে দেয়। তিনি সেটা পড়ে হো হো করে হেসে ওঠেন।

'তুমি আমাকে কী পরিমাণ রিলিফ দিয়েছ তা কি তুমি জানো? মনে হচ্ছে যেন কতকালের একটা বোঝা নেমে গেছে। ওটা আমার কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।' জোন বলেন।

'এখন আমাকে রিলিফ দেয় কে? দিলে আমিও কি অকৃতজ্ঞ থাকি?' হারীত হেঁয়ালির মতো করে বলে। 'আমারও একটা বোঝা আছে, জোন। বোঝা নয়, ব্যথা। একটা শেল বিঁধে থাকলে যেমন হয়।'

॥ এগারো ॥

হারীতের কথা শুনে জোন বিমর্ষ হন। কিন্তু জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন না কিসের ব্যথা। অত কম আলাপে অপরের প্রাইভেট ব্যাপারে কৌতূহল ভালো দেখায় না। হারীত যদি আপনা হতে বলতে চায় বলতে পারে। কিন্তু অত অল্প পরিচয়ে সেও ভরসা পায় না।

তিনি ওকে ইউরোপীয় মিস্টিকদের কয়েকখানি বই পড়তে দেন। একখানির নাম 'ক্লাউড অফ আনুনোয়িং।' চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা। লেখকের নাম অজ্ঞাত।

'জোন,' হারীত ওই মিষ্টি নামটি আস্বাদন করতে করতে বলে, 'এসব বই যদি তুমি আমাকে চার পাঁচ বছর আগে দিতে তা হলে আমি আমার অন্তর্দৃষ্টির দীপ জেলে পড়তুম ও বুঝতুম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি ইনটেলেকচুয়াল হয়েছি। পণ্ডিতদের কাছে পড়াশুনা করে পরীক্ষা পাশ করেছি। যেটা দুর্বোধ্য ছিল সেটা এখন বোধগম্য। কিন্তু যেটা সহজবোধ্য ছিল সেটা আর সহজ নয়। অক্ষর অনায়াসে বুঝতে পারব, কিন্তু স্পিরিট বুঝতে পারব বলে মনে হয় না। এক যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

'হারীত, আমি অবশ্য গর্ব করতে অক্ষম যে আমি তোমার মতো ইনটেলেকচুয়াল। তা বলে আমার এমন কোনো যোগ্যতা নেই যে, তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি। আমি তো দেখছি তুমিই আমার চেয়ে এগিয়ে রয়েছ। না, তুমি শুধু ইনটেলেকচুয়াল নও। আরো কিছু। সেই আরো কিছুই তোমার সহায় হবে।'

সেই আরো কিছু যে কী তা নিয়ে হারীত প্রায়ই ভাবে। সে একজন কবি ও প্রেমিক। তার এই পরিচয়ই প্রাথমিক। সে যে একজন ইনটেলেকচুয়াল এটা দ্বিতীয়-স্থানীয়।

'জীবনযুদ্ধে সফল হবার জন্যেই আমাকে প্রাণপণে ইনটেলেকট চর্চা করতে হয়েছে, জোন, এদিক দিয়ে সফল হয়েছিও। কিন্তু ঈশ্বরের উপর থেকে দৃষ্টি সরে গেছে, পড়েছে ঐশ্বর্যের উপরে। এটাও একপ্রকার পরীক্ষা। এতে আমি বিফল হব কি না কে জানে? আমার নিজের কথা বলে তোমাকে আমি বোর করতে চাইনে, জোন। ক্ষমা করবে তো?'

'কী যে বল, হারীত।' জোন তাকে অভয় দেন। 'ক্ষমা করার কী আছে! তুমি কি আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিতে চাও যে তোমার সঙ্গ আমার ভালো লাগে? শুধু তোমার সঙ্গ নয়, তোমার বাণী। তুমি যখন যেটা বলতে চাইবে আমি কান পেতে শুনব, হারীত। বলতে বলতে যদি তোমর দুঃখভাব একটুও লাঘব হয় তবে তাতেই আমার সার্থকতা। জানি, তোমার একটা কিছু বলবার আছে। বোলো, যেদিন তোমার অভিরুচি।'

'ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ' এই বলে হারীত তার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে। মুখের ভাষায় নয়। অধরের ভাষায়। এর জন্যে মনে মনে সে অধীর হয়ে উঠেছিল। সেটা তার ব্যবহারে ধরা পড়ে।

জোন হেসে ওঠেন। 'তা হলে লী হান্টের ওই কবিতাটা একটু শুধরে দিতে হয়। কই, কলম কোথায়?'

শোধরানো হলে পরে কবিতাটি হারীতের পকেটে গুঁজে দিয়ে জোন বলেন, 'আজকের মতো এই যথেষ্ট। কেমন?'

হারীতের দিকে চেয়ে আবার হাসেন। 'কী! এই যথেষ্ট নয়! আচ্ছা, তা হলে—' ওকে আরো দুটি চুম্বন উপহার দেন।

আনন্দ আর বিষাদ হারীতের দিনগুলিকে মিশ্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে রাখে। সে বুঝতে পারে তার জীবনে পুনর্বার প্রেমের পদপাত ঘটেছে। কিন্তু স্বাগত জানাবার মতো স্বচ্ছন্দ মনোভাব তার কই?

যে হৃদয় যে একদিন একজনকে দিয়েছিল সে হৃদয় কি সে ফিরে পেয়েছে? বলেছে

বটে, 'এখন থেকে আমার হৃদয় আমার তোমার হৃদয় তোমার, প্রেমের সম্পর্ক চুকে গেল, ভাইবোনের সম্পর্ক ফিরে এল।' কিন্তু সত্যি কি তাই?

তারপরেও বকুল তার সুন্দর কালো কুন্তল কেটে পার্সেল করে পাঠিয়েছে। তার প্রেমপত্র এক সপ্তাহও বন্ধ হয়নি। তবে সে আর প্রেমের কথা লেখে না। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেয়। ইউরোপ সম্বন্ধে তার অফুরন্ত ঔৎসুক্য। উত্তর লিখতে হয় সাহিত্যের মতো করে, যাতে পত্রিকায় প্রকাশ করা যায়। হারীতের দিক থেকে কোনোরূপ উৎসাহ নেই। সে আবার সেই 'তোমার স্নেহের হারীতদা'।

অভিনয়? না, অভিনয় নয়। তবে অভিনব, সন্দেহ নেই। স্নেহ একটু একটু করে প্রেমে পর্যবসিত হয়, কিন্তু প্রেম একদিনের একটা সঙ্কল্পের ফলে স্নেহে পর্যবসিত হয় না। প্রেম ভেঙে যায়, প্রেম হারিয়ে যায়, প্রেম থেকে আসে ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা। কিন্তু প্রেম থেকে স্নেহ, এটা একটু অভিনব বইকি। হারীত এখন পুনর্মূষিক হবার জন্যে তপস্যায় রত। সে বলে এসেছে যে, সে স্বাধীন পুরুষ, প্রেমে একবার পড়েছিল বলে পরাধীন নয়, নতুন করে প্রেমে পড়ার স্বাধীনতা তার আছে। কিন্তু বলে এলে হবে কী, হৃদয়ে যেন একটা শেল বিঁধে রয়েছে। কী অপরাধ করেছিল বকুল যার জন্যে সে তাকে ছেড়ে এসেছে? অপরাধ যদি কেউ করে থাকে তবে সে বকুল নয়, বকুলের নিয়তি। সেইজন্যে হারীতের বিবেক তাকে সহজে রেহাই দিতে চায় না। প্রেমে পড়ার নতুন উপক্রম দেখলেই মনে পড়িয়ে দেয় যে, সে এখনো স্বাধীন নয়।

বিলেত আসার সময় তার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে পৃথকভাবে কথাবার্তা হয়। দু'জনের দুইমত। অমিয়দা বলেন, 'তোমার দূরে সরে যাওয়াই শ্রেয়। তুমি যতদিন কাছাকাছি থাকবে ও ততদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে না, নিজের হাতে লড়তে শিখবে না। সমস্তটা দায়িত্ব যেন তোমার একার। তিন বছর আগে তোমাদের যখন আলাপ হয় তখন কিন্তু দায়িত্বটা ছিল ওর নিজের। ওই ওর অবাঞ্ছিত বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিল। একা পেরে উঠছিল না বলে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করছিল। তোমাকেই ওর সকলের চেয়ে পছন্দ। মুক্তির পরে তোমার সঙ্গেই ও মিলিত হতো। সেইজন্যে আমরা একে একে সরে যাই, তুমিই ওর জন্যে তৈরি হও। তৈরি হয়ে এখন দেখছ ওর তেমন কোনো প্রতিরোধস্পৃহা নেই। ইতিমধ্যে ওর সন্তান হয়েছে। সন্তানের খাতিরে ও এখন ওর স্বামীর সঙ্গে বনিবনা চায়, বিচ্ছেদ চায় না। তা হলে তোমার ভূমিকাটা নিছক ইমোশনাল। তুমি ওকে মুক্ত করতে পারছ না, মুক্ত না করলে মিলিত হতে পারছ না, মাঝখান থেকে তোমার আপনার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলছ। হারীত, তোমার স্বাধীনতাও মূল্যবান। বকুলের স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে, তোমার স্বাধীনতা পারে না।'

'কিন্তু, অমিয়দা, আমি যে কমিটেড।'

'জানি। কিন্তু ও যতদিন ওর স্বামীকে স্বামী বলে স্বীকার করত না ততদিন তুমিই ছিলে ওর সম্ভবপর স্বামী। এখন তো স্বীকার করে নিয়েছে। কবে আবার অস্বীকার করবে কে জানে? একটি নারীর মর্জির সঙ্গে তুমি তোমার জীবনের বিকাশকে কতকাল জড়িয়ে রাখবে? তুমি তোমার স্বকীয় নিয়মে বিকশিত হবে।'

'কিন্তু অমিয়দা, নিয়তি বলেও তো একটা কথা আছে। বকুল অতখানি প্রতিরোধের পর অমন করে তলিয়ে যাবে আর আমি সাত সমুদ্রের তীর থেকে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব, এই কি আমাদের নিয়তি? এর জন্যেই কি আমার অত কষ্ট করে তৈরি হওয়া? এমন হবে জানলে কি আমি এই জীবিকা বেছে নিতুম? এখন এর সার্থকতা কোথায়, যদি বকুলের কাজে না লাগে?'

'লাগতে পারে। এখনো সে সম্ভাবনার দ্বার খোলা আছে, হারীত। কিন্তু কত দেরি হবে কেউ বলতে পারে না। ওরই তাড়া ছিল সব চেয়ে বেশী। ওর এখন সংসারধর্মে মন। ওর ছেলের ভবিষ্যৎ ঘিরে ওর স্বপ্ন। নিজের কথা এখন পেছনে পড়ে গেছে।'

হারীত মরীয়া হয়ে ওঠে। 'তার মানে আমার কথা এখন পেছনে পড়ে গেছে। আমি এখন ব্যাক নাম্বার। কবে আবার পয়লা নম্বর হব তা একটি শিশুর ভবিষ্যতের উপর নির্ভর। যার উপর তার পিতার দাবীই সর্বপ্রধান। অথচ কী করে অস্বীকার করি যে, আমি কমিটেড?'

'কমিটেড তো তুমি একতরফা নও। আরেকজন যদি পেছিয়ে যায় তুমি কি ওর জন্যে অনির্দিষ্টকাল পায়চারি করবে? না ওকে ফেলে এগিয়ে যাবে? এগিয়ে যাও। পেছনে ফিরে তাকিয়ো না। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

ওদিকে সুদেব বলে, 'তা হলে, কৃষ্ণ তুমি মথুরায় চললে। একবার ভেবে দেখলে না বৃন্দাবনে অভাগিনী রাধার কী দশা হবে আমরা ওকে কী বলে সান্ত্বনা দেব!'

'কার সঙ্গে কার তুলনা!' হারীত এর উত্তরে বলে, 'কৃষ্ণ যখন মথুরায় যান তখন তাঁর ভোগের পেয়ালা পরিপূর্ণ। আর আমার? বিরহ ছাড়া আর কীই বা আমি ভোগ করেছি? চিঠি লেখাকে যদি বাঁশি বাজানোর সঙ্গে তুলনা কর তবে তিন বছরকাল প্রতিদিন বাঁশি বাজিয়েছি, সাড়াও পেয়েছি, কিন্তু কাছে পাইনি। মাঝে মাঝে চোখের দেখা হয়েছে, কিন্তু ধরাছোঁয়া নয়। তবু তার জন্যে আমি ধন্য। আমার দৃষ্টি খুলে গেছে, আমার হৃদয় ভরে গেছে, আমার অনুভূতি গভীরতর হয়েছে, আমি আমার বয়সের অনুপাতে পরিণত হয়েছি। তা বলে আমি পায়চারি করতে পারি নে। ও যদি না আসে আমাকে একলা চলতে হবে। য়েটসের কবিতা মনে আছে?'

'কোন কবিতা, বল তো?' সুদেব শুনতে চায়।

হারীত তাকে আবৃত্তি করে শোনায়।

'Pardon, old fathers,
  if you still remain
Somewhere in ear-shot
  for the story's end,...
Pardon that for
  a barren passion's sake,
Although I have come
  close on forty-nine,
I have no child,
  I have nothing but a book,
Nothing but that to prove
  your blood and mine.'

স্বদেব স্তব্ধ হয়ে শোনে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'জানতুম না যে তোমার মধ্যে এই বয়সেই সন্তান কামনা জেগেছে। ঊনপঞ্চাশের এখনো ছাব্বিশ বছর দেরি। বকুলকে সময় দাও। এত দিনের হাতে গড়া প্রেম এখনি ভেঙে দিয়ে যেয়ো না। ও কেবলি কাঁদছে আর বলছে ওর অপরাধ কী? ছেলে কি ও চেয়েছিল? ভগবান দিয়েছেন। তাঁর দান মাথা পেতে নিয়েছে। তুমিও তো সেই উপদেশই দিয়েছিলে। ছেলে যতদিন না বড়ো হচ্ছে ততদিন ওর হাত পা বাঁধা। তা বলে তোমাকে ও বেঁধে রাখছে না। তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও, কিন্তু ওর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ কোরো না। ও তোমার, তুমি ওর।'

হারীত বিদ্রোহ করে। 'ভাই স্বদেব, একজনকে ভালোবাসা, আরেকজনের সঙ্গে শোওয়া, দুই একসঙ্গে চলতে পারে না। চলতে দিলে আমাকেও সে অধিকার চাইতে হয়। অমন অধিকার চাওয়া অশুচিত। একজনকে ভালোবাসা ও আরেকজনকে বিয়ে করা অন্যায়।'

'আমার ধারণা ছিল,' স্বদেব তার বিমূঢ়ভাব কাটিয়ে উঠে বলে, 'তোমার আদর্শ অহেতুক প্রেম। যে প্রেম শর্তসাপেক্ষ নয়। যে কেবল দিয়েই তৃপ্ত, পাবার জন্যে সতৃষ্ণ নয়। একবার ভেবে দেখবে কি, হারীত, কোনখানে তুমি ছিলে, কোনখানে এসে পৌঁছেছ? আর সকলের মতো তুমিও হিসাব মেলাতে চাও। ওর একটি স্বামী থাকলে তোমার একটি স্ত্রী থাকা চাই। নয়তো ওকে স্বামীসঙ্গ ছাড়তে হবে। ও কি ছাড়তে চায় না, মনে করেছ? কিন্তু ছাড়লে ভদ্রলোক আরেকটি বিয়ে করবেন। ছেলেটা পড়বে সৎমার কবলে। বকুল এখন ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে আসতেও পারে না। স্বামী

কেড়ে নিয়ে যাবেন। ওর যা পরিস্থিতি তাতে ওছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তোমার পরিস্থিতি কি তাই ?'

'আমার পরিস্থিতি,' হারীত অসহায়ের মতো বলে, 'ছেড়ে দে, মা, কেঁদে বাঁচি। শ্যামও রাখব, কুলও রাখব, একথা তো ইতিপূর্বে শুনিনি। শুনলে আরো আগে মথুরা-যাত্রা করতুম। এখন বুঝতে পারি শ্যাম কেন অমন নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিলেন। না, ওছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তাঁর উচ্চাভিলাষ তাঁকে টেনে নিয়ে গেল, ওটা আপাত সত্য। আসলে তাঁর বুঝতে বাকী ছিল না যে রাধার দোটানা সারাজীবন গড়াবে, ততদিন অপেক্ষা করা অনর্থক। রাধার পক্ষে ট্র্যাজেডি, সন্দেহ নেই। অন্যথা শ্যামের পক্ষে ট্র্যাজেডি।'

'অমন সুন্দর একটি প্রেমের এমন করুণ পরিণতি !' সুদেব হায় হায় করে।

'কী করব, বল। দুটি আত্মা এক হয়ে গেলে তারই নাম প্রেম। প্রেমের মাধুর্য আমি আস্বাদন করেছি। কিন্তু এখনো কি আমরা এক ? মাঝখানে দাঁড়িয়েছে সন্তান। সে আমার নয়। সে তার এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে মাকে, আরেক হাত দিয়ে বাবাকে। দেখে এলুম তিনজনের সুখের নীড়। ওদের সুখের সংসার ভেঙে দিলে প্রেম জমবে না। সেটা মায়া। তার চেয়ে ভেঙে যাক প্রেম।'

যেদিন সে বকুলের কাছ থেকে বিদায় নিতে যায় সেদিন ওর স্বামী বিলাসবাবুর সঙ্গেও দেখা হয়। কে বলবে যে তাঁরা একটি সুখী দম্পতী নন ? বকুলের স্বাধীনতার প্রশ্ন অবশ্য মেটেনি, তবে তার স্বামী নাকি কথা দিয়েছেন যে ছেলে একটু বড়ো হলে তিনিই ওর ভার নেবেন। সে তখন যত খুশি যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে সাহিত্য করতে রাজনীতি করতে পারবে। শুধু বিবাহবিরোধী কিছু না করলেই হলো। মুখ ফুটে না বললেও আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়ে রেখেছেন যে তাঁর তূণে একটি ব্রহ্মাস্ত্র আছে। দায়ে পড়ে দারান্তরগ্রহণ।

বকুলের সে তেজ আর নেই। স্বামীর কাছে একান্ত নিরীহ মনে হয় ওকে। দেহ যুদ্ধে তিনিই জিতেছেন। যুদ্ধজয়ের পর তিনি অত্যন্ত উদার ব্যবহার করছেন। সম্রাট মহানুভব।

॥ বারো ॥

একটি নারীর হৃদয় যেন একটি রাজ্য। হারীতের বিশ্বাস ছিল সে তেমনি একটি রাজ্য জয় করেছে। কিন্তু হৃদয়ই তো সবখানি নয়। দেহ বলে আরো এক রাজ্য আছে। সে রাজ্যের রাজা আরেকজন। তাহলে কি দ্বৈরাজ্য মেনে নিতে হবে? না, হারীতের তাতে আপত্তি। সুদেব যাই বলুক, এমন একটা আপসের নাম অহেতুক প্রেম নয়। হৃদয় যার দেহ তার। আর নয়তো দেহ যার হৃদয় তার।

বকুল তার স্বামীকে হৃদয় দিতে পারেনি, যদিও তাঁদের বিয়ে সাত আট বছরের। দেহ দেবে না বলে দ্বন্দ্বে নেমেছে। দুঃখ দিয়েছে। দুঃখ পেয়েছে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। হেরেছে। তা বলে হৃদয় সমর্পণ করেনি। হারীত সে রাজ্যের রাজা। বকুলের কাছে এ দ্বৈরাজ্য অসহন নয়। এমন তো সে বহু ক্ষেত্রে দেখেছে ও দেখছে। সে দুই রাজ্যকে খাজনা দিয়ে নির্বিবাদে বাঁচতে চায়। বিলাসবাবু এটা জানেন। তাঁর এতে বিশেষ কোনো আপত্তিও নেই, যদি তাঁর রাজ্যে হারীত বা আর কেউ অনধিকার প্রবেশ না করে। জোর করে নারীর হৃদয় জয় করা যায় না এটা তাঁর অজানা নয়। তা ছাড়া তাঁর নিজের হৃদয়ও তো অন্যত্র ন্যস্ত। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বয়সের তফাৎ ঢের। বিয়ের আগেই তিনি হৃদয় হারিয়ে ছিলেন। শুধু হৃদয় নয়।

সম্পত্তির সঙ্গে সম্পত্তির পরিণয়। উদ্দেশ্য উত্তরাধিকারী লাভ। বিলাসবাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তাঁর মতো সুখী কে? বকুলও সুখী। তার মাতৃত্বের পুলক দেখে কেউ কি বিশ্বাস করবে যে একদা সে প্রতিরোধ করেছে? আকাশের চাঁদকে পৃথিবীতে পেড়ে এনেছে বলে এখন সে সকলের প্রশংসা কুড়োচ্ছে। বিয়ের ছ'সাত বছরেও সন্তান হয়নি বলে যারা ধরে নিয়েছিল সে বন্ধ্যা তাদের মুখ এতটুকু। তারা লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। কাজেই জয়টা শুধু বিলাসবাবুর নয়, বকুলেরও। তার স্বামীর কাছে সে হেরেছে, কিন্তু পারিবারিক মহলে জিতেছে।

কোথায় ট্রাজেডি! বাজে কথা। নারীজীবনের পরিপূর্ণতাকে ট্র্যাজেডি বলে কেউ! শুধু হারীত ও তার বন্ধুরা জানে যে সমস্যাটা ঘোরালো হলো, বকুলের মুক্তি সুদূরপরাহত। সুতরাং হারীতের সঙ্গে মিলন আরো দূরের কথা। ওদের চোখে মুক্তি আর মিলনই কমেডি। তাই তার বিপরীতটা ট্র্যাজেডি। বকুলের অনুরোধ হারীত যেন তাকে সময় দেয়, অপেক্ষা করে। সে একদিন মুক্ত হবে ও মালা দেবে। হারীত কিন্তু দ্বৈরাজ্যে রাজী নয়। তাছাড়া বকুল মা হয়েছে, সে বাপ হয়নি, দু'জনের মধ্যে এই যে বৈষম্য এই উপসাগরের উপর সেতুবন্ধন কোনো মতেই সম্ভব নয়। বাপ হলেও সে পরের ছেলেকে

নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতে পারবে না। অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী।

বকুল যেমন তার স্বামীর কাছে হেরে গেছে হারীত তেমনি তাঁর ছেলে রণুর কাছে। যার ভালো নাম রণজয়। যতই দিন যায় ততই প্রত্যয় হয় যে বকুল তার স্বামীকে ছাড়লেও ছাড়তে পারে, কিন্তু তার ছেলেকে ছাড়তে পারবে না, ছাড়লে বাঁচবে না। ছেলে যতদিন না বড়ো হচ্ছে, বড়ো হয়ে মাকে অনুমতি দিচ্ছে ততদিন বকুলের স্বাধীনতা শিকেয় তোলা। সে দ্বিতীয়বার পরাধীন হয়েছে। এটা বরাবরের মতো। কারণ ছেলে কখনো মাকে অমন অনুমতি দেবে না। বকুলের পুত্রগত প্রাণ। সে প্রাণ কি কেবল হারীতের প্রেম পেয়ে শান্ত হবে? না তার অশান্তি তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে আনা কারেনিনার পরিণামের অভিমুখে?

ভ্রনৃস্কির ভূমিকায় অভিনয় করতে হারীতের মনে ভয়। তেমন জয় সাময়িক ও আংশিক। সামগ্রিক ও চিরস্থায়ী নয়। ওর শেষ অধ্যায় ট্র্যাজিক। কিন্তু তার অপরাজেয় আত্মা এ পরিণাম অনিবার্য বলে স্বীকার করে না। বকুলকে তেমন পরিণাম থেকে রক্ষা করার মতো বলবান প্রেম তার অন্তরে আছে। কিন্তু সে প্রেম এত বলবান নয় যে বকুলের জীবনকে অবিভক্ত করতে পারে। বকুল যেমন স্বামীর ঘরে থেকে হারীতের ধ্যান করছে তেমনি হারীতের ঘরে থেকে পুত্রের ধ্যান করবে। আর পুত্রের ধ্যানও প্রকারান্তরে তার পিতার ধ্যান। দ্বিধাবিভক্ত জীবন জোড়া লাগবে কোন মন্ত্রবলে? হারীতের প্রেমের মন্ত্র বিলাসবাবুর পরিণয়ের মন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে।

কল্পনার পক্ষীরাজে চড়ে সে এত দূর উড়ে যায় যে রূপকথার রাজপুত্রের মতো একে একে সব বাধা অতিক্রম করে। আইনের বাধা, সমাজের বাধা, গুরুজনের বাধা। পরিশেষে ওদের বিয়ে। বিয়ের পর মনের সুখে চিরকাল একসঙ্গে বাস। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই দেখে সে আকুল হয়। আমার স্ত্রী আরেকজনের ঘর করছে, আরেকজনের সন্তানের মা হয়েছে। একথা ভাবতেই রক্ত গরম হয়ে ওঠে। পুরুষের রক্ত। ও কেন প্রতিরোধ করে না? ও কি প্রতিরোধ করেছে? এ চিন্তা এমনি উদয় হয়। আরো রাগিয়ে দেয়। সন্দেহ জাগিয়ে দেয়।

না, ও পারবে না। রক্তমাংসের শরীর। হারীত হাল ছেড়ে দেয়।

তিন বছর আগে বকুল ছিল আগুনের ফুলকি। বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি। তখন যদি ওরা ইলোপ করত তা হলে একরকম হতো। হঠাৎ জানা যায় সে মা হতে যাচ্ছে। তার স্বামী তাকে বেঁধে রাখছেন না, কিন্তু তাঁর প্রতিভূ তার হাতে পায়ে সোনার শিকল পরিয়ে দিতে আসছে। সে বাপের বাড়ী যায়। হারীতকে বলে, 'তুমি তৈরি হও।' যথাকালে মা হয়। কিন্তু স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায় না। বাপ মা বিব্রত। শ্বশুর-শাশুড়ী বিরক্ত। স্বামী ক্রুদ্ধ। ছেলেকে তিনি যেমন করে হোক নিয়ে যাবেন। দরকার

হলে আইনের শরণ নেবেন। বাছুরকে কোলে নিয়ে গেলে তার মাও পিছু পিছু দৌড়য়। বেচারি বকুল!

তাকে দেখে দুঃখ হয়। কোথায় বিদ্রোহ! কোথায় নতুন জীবনের স্বপ্ন! সেই সনাতন মাতৃত্ব ও গৃহিণীত্ব। স্বামী অবশ্য স্বামীজী ছিলেন না। তাঁর একটি আশ্রিতা ছিল। বকুল তাকে বিদায় করে দেয়। না করলে তার কাছে খাটো হয়ে থাকতে হতো। কিন্তু করার ফলে স্বামীকে বিকল্প জোগাতে হয়। নইলে তিনি আবার বিয়ে করবেন। চতুর লোক। মুখে বলেন না, কাজে বলেন। প্রাপ্তবয়স্ক কুমারীদের ফোটো তাঁর নামে আসে। বকুলের নজরে পড়ে। তার নারীসংস্কার শিউরে ওঠে। লোকটা যদি সত্যিসত্যি ক্ষেপে যায় তো কোনদিন একটা কাণ্ড করে বসবে! সুরুচি এসে সুনীতিকে বনবাসে পাঠাবে। সঙ্গে ধ্রুব।

মাতৃত্বের সুখ বকুলকে অমৃত দিয়েছে, তবু তার অন্তরে সুখ নেই। সে সুখের কাঙাল। তার একমাত্র আশা হারীত। কিন্তু দু'জনের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান। সে ব্যবধান শুধুমাত্র ভৌগোলিক নয়। এক এক করে সমস্ত বাধা কাটানো যায়, কিন্তু নিজের ভিতরের দ্বিধা কাটাবে কী করে? বকুলের মতো অবস্থায় পড়লে হারীত কী করত বলা শক্ত। সে তো সংস্কারবদ্ধ হিন্দু কুলবধূ নয়। হয়তো সেও তেমনি দ্বিধাদীর্ণ হতো। এক পা এগোত, দু পা পেছোতো। সেইজন্যেই বকুলকে সে বিচার করতে চায় না। বকুল হয়তো ঠিকই করেছে। তার দিক থেকে সে-ই ঠিক।

আর হারীতের দিক থেকে? হারীতও ঠিক। হারীত জানে যে বকুল তাকে ভালোবাসে ও তার ভালোবাসার জন্যে চাতকের মতো উন্মুখ। কিন্তু ঐ যে এক কথা, 'অপেক্ষা করো', এতে তার অরুচি ধরে গেছে। তারও সর্বাঙ্গে আগুন জলছে। তারও সন্তানকামনা জেগেছে। কতকাল সে আত্মসংবরণ করবে! কার জন্যেই বা করবে! বকুল কি সত্যি কোনোদিন মনঃস্থির করতে পারবে? যখন পারত সে লগ্ন বয়ে গেছে। তখন কারো খেয়াল হয়নি যে সেটাই শেষ লগ্ন।

তাহলে প্রেম প্রত্যাহার করতে হবে? হৃদয় ফিরিয়ে নিতে হবে? সে যে কী ব্যথা, কী যাতনা তা বাক্যে বোঝানো যায় না। অধর্মও হতে পারে। রাধা পরিত্যাগের মতো।

একদিন আগেও যা কল্পনার বাইরে ছিল হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে তাই মনে হয় একমাত্র করণীয়। তাতে হৃদয় ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়, যাবে। কিন্তু জীবনের প্রবাহ এমনভাবে অবরুদ্ধ হবে না। কী একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে বকুল হারীতকে ঝাঁজালো চিঠি লিখেছিল। সেও দিয়েছিল তেমনি ঝাঁজালো জবাব। কখনো যা সে করে না। আরো ঝাঁজালো প্রত্যুত্তর পেয়ে সে মনঃস্থির করে ফেলে। লেখে, কাজ কী এমন

ঝগড়াঝাটি করে। এর চেয়ে হাসিমুখে বিদায় ভালো। লেট আস পার্ট অ্যাজ ফ্রেণ্ডস।

'আমি কী করেছি যে তুমি আমাকে ছাড়তে চাও? তুমি না বলেছিলে কোনদিন তুমি আমাকে ছাড়বে না।' বকুল আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে। সে নাকি সারা রাত কেঁদেছে।

'তোমাকে ধরতে পারলুম কবে যে তোমাকে ছাড়ার কথা উঠবে?' হারীত পালটা দেয়। 'জীবনে একজনকে ছাড়লেই আরেকজনকে পাওয়া যায়। তুমি যদি তোমার স্বামীকে ছাড়তে আমাকে পেতে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তোমার স্বামীকে তুমি ছাড়বে না। এর অর্থ তোমার চাই একের অধিক পুরুষ। একটি দেহের জন্যে, আরেকটি মনের জন্যে। তোমার জন্যে আমি কেন আধখানা পুরুষ হতে যাই, যার খালি হৃদয় আছে, দেহ নেই, দেহের ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই? আর নয়তো আমিও কি আমার দেহের জন্যে আরেকটি নারীর মুখাপেক্ষী হব? আমার শয্যায় আমি একা। তোমার শয্যায় তুমি একা নও। তুমি কি বুঝবে আমার কী বিপদ? কেউ যদি আমাকে একা পেয়ে আমার পাশে এসে শোয় কী করে আমি তাকে ঠেকাই? আমি তো ওকে ডাকিনি? যাই হোক আমি এর জন্যে লজ্জিত। আমিই স্বতঃ তোমাকে জানিয়েছি ও তোমার ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু নিশ্চয়তা দিতে পারব না যে আর কখনো এমন ঘটনা ঘটবে না। একে রোধ করার শ্রেষ্ঠ উপায় সন্ন্যাস নেওয়া নয়, বিয়ে করা। তোমাকেই, তুমি যদি আমার সঙ্গে বিলেত চল।'

বকুল এর উত্তরে যা লেখে তা পাগলের প্রলাপ। অমন একটা চরমপত্র সে প্রত্যাশা করেনি। হারীতের মতো প্রেমিক কখনো এত নিষ্ঠুর হতে পারে! কোলের ছেলেকে ফেলে কেমন করে সে ওর সাথী হবে? পাপ হবে না? প্রেমের ধর্ম হচ্ছে প্রতীক্ষা। হারীত যদি ওই প্রতীক্ষা না করে বকুল প্রতীক্ষা করবে। শবরীর প্রতীক্ষা। তার রাম একদিন তার কাছে ফিরবেন।

তার মানে বকুল ওকে ছাড়বে না। ছাড়লে হারীতই ছাড়বে। ঝগড়াঝাটির বাইরের কারণ যাই হোক না কেন ভিতরের কারণ বকুল এক হাতে স্বামীকে ও আরেক হাতে হারীতকে ধরবে, কাউকে ছাড়বে না। অপর পক্ষে হারীত আর অপেক্ষা করতে রাজী নয়, অন্য কোনো নারী এলে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে অক্ষম। এই পরিস্থিতিতে হারীত লেখে, 'ছাড়বে না তো এখন থেকে তুমি আমার বোন, আমি তোমার ভাই। গোড়ায় আমরা যা ছিলুম।'

বৌকে 'মা' বলে ডাকা যেমন অমার্জনীয় অপরাধ প্রিয়াকে 'বোন' বলে ডাকাও কি তেমনি? হারীত কী করে বুঝবে! শেলী যদি বুঝতেন তো তাঁর 'আত্মার বোন' হ্যারিয়েট সার্পেন্টাইনে ডুবে মুখের মতো জবাব দিয়ে যেতেন না।

বকুল ঝগড়া করতে ভালোবাসে, ঝগড়াটে চিঠি প্রত্যাশা করেছিল। তারপর

যথারীতি মানভঞ্জন। তা তো নয়। এ যে সম্পর্কচ্ছেদ। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে। এক-আধবার আত্মহত্যার কথাও যে তার মনে উদয় হয়নি তা নয়, কিন্তু কোলের ছেলেকে সে কোন্ ডাইনীর হাতে সঁপে দিয়ে যাবে। ঘরে খিল দিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

সেইদিন সে তার স্বামীর কাছে সবকথা খুলে বলে। তার কনফেসন। তিনি উল্লাসে উদ্বাহু হয়ে ভোজের হুকুম দেন। গদগদ কণ্ঠে বলেন, 'আঃ! আজ আমার বড়দিন। ঈদ। বিজয়াদশমী। হারীত আমাকে ভগ্নীপতি বলেছে।'

তিনি এমনি এক ভোজ দিয়েছিলেন দু'বছর আগে যেদিন শোনেন যে বকুল বাঁচতে রাজী হয়েছে, বাঁচতে আর মা হতে। হারীত এসে বকুলকে না বোঝালে কী যে অঘটন ঘটত, ভাবতে গেলে গায়ে কাঁটা দেয়।

বকুলের চিঠি পেয়ে হারীত বিদায় নিতে গেলে সে ওর দুটি হাত ধরে কাঁদে। 'এ তুমি কী করলে, হারু! ওকে দ্বিতীয়বার জিতিয়ে দিলে। প্রথমবারও তোমার জন্যেই আমার হার। তুমি আমার জীবনে হার নিয়ে এসেছ। তাই বুঝি তোমার নাম হারীত!'

'তোমার জীবনে আমি দুটি শুভ কাজ করে গেলুম, বকুল। পরে এরজন্যে তোমরা আমাকে ধন্যবাদ দেবে। তোমরা তিনজনে মিলে একটি ত্রয়ী। একে আমি ভেঙে দিতে পারতুম, কিন্তু এর বদলে আর একটি ত্রয়ী গড়ে তুলতে পারতুম না। তার মানে তুমি, আমি, আমাদের সন্তান। চতুর্থ কেউ নেই। তা তো হবার নয়। রণু এসে ঠিক করে রেখেছে কার সঙ্গে তুমি ত্রয়ী রচনা করবে। তাঁর সঙ্গেই বনিবনা কোরো। আমাকে ছুটি দাও।'

বকুল সান্ত্বনা মানে না। 'আপনার নারী তুমি পরের হাতে তুলে দিয়ে গেলে! আপন হাতে করে। এই কি তোমার প্রেম!'

'এ আমার পাশমোচন। তোমাকে পাশমুক্ত করতে এসে নিজেই জড়িয়ে পড়েছিলুম। তুমি যদি মুক্ত হতে চাও নিজের শক্তিতে মুক্ত হবে। আমি দূর থেকে সাহায্য করব। নিঃস্বার্থ বন্ধু হিসাবে। কিন্তু প্রিয় সম্পর্কের এইখানেই ইতি।'

বকুল জ্বলে ওঠে। 'কেন তুমি আমাকে জোর করে হরণ করে নিয়ে গেলে না! কেন তুমি আমার জন্যে যুঝলে না! কেন তুমি এমন ভীরু, এমন দুর্বল! কেন এমন মিন্‌মিনে, মেয়েলি ও অসমর্থ! তুমি কি ভেবেছ আর কোনো মেয়ে তোমাকে ভালোবেসে বিয়ে করবে! করলে তোমাকে নয়, তোমার চাকরিকে!'

॥ তেরো ॥

অভিশাপের মতো শোনায়। বিদায় অভিশাপ। কচের মতো হারীতও বর দেয় যে, বকুল মুক্ত নারী হবে ও তার জীবনে মহান প্রেম আসবে, যার তুলনায় হারীতের প্রেম নিষ্প্রভ।

একটা ব্যথাবোধ নিয়েই হারীত জাহাজে ওঠে। ব্যথাটা নিছক বিদায়ব্যথা বা বিরহব্যথা নয়। সব ছাপিয়ে যে ভাবনা তাকে বিধুর করে সেটা তার প্রেমের ব্যর্থতা। অথচ কী করলে তার প্রেম সফল হতো, স্থায়ী হতো সেটাও তার কাছে পরিষ্কার নয়। প্রেমের পাশাখেলায় তার হার হয়েছে, কিন্তু কোন দান পড়লে তার জিৎ হতো? ট্র্যাজেডিকে কমেডি করা কি তার হাতে ছিল? সে কি সর্বশক্তিমান?

না, সে সর্বশক্তিমান নয়। কিন্তু প্রেম সর্বশক্তিমান। গান্ধী যেমন বলেন অহিংসা অমোঘ। এই বিশ্বাসের উপর সে নির্ভর করেছিল, কিন্তু এর কাছে সে যে ফল আশা করেছিল সে ফল পায়নি। এতদিনের সাধনার অন্তিম নিষ্ফলতাই তাকে বিধুর করেছে। কিন্তু নিষ্ফলতা বা সফলতা কবে কোন সাধক দাবী করতে পেরেছেন? গীতায় তো স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, মা ফলেষু কদাচন।

অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, প্রেমের পরীক্ষায় সিদ্ধিলাভ না করলেও জীবিকার পরীক্ষায় সে সিদ্ধার্থ হয়েছে। লোকে ভাবছে, কী ভাগ্যবান ছেলে! জানে না যে এটা বকুলের জন্যে। যাকে সে পায়নি ও পাবে না। তার বাবা, তার কাকা, তার অধ্যাপক ও সতীর্থরা এই ভেবে হৃষ্ট যে সে লক্ষ্যভেদ করেছে। কী করে তাঁরা জানবেন যে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট! সে কি অভিনন্দনের যোগ্য? না সমবেদনার?

জাহাজের বেশ কিছুদিন সী সিকনেসে শয্যাশায়ী হয়ে কাটে। সেটা বোধহয় অন্য কোনো সিকনেসের প্রতীক। যে পুরুষ রাজকন্যার জন্যে ধনুর্ভঙ্গ করেছে সে রাজকন্যাকে পায়নি, তার পরিবর্তে পেয়েছে মানদক্ষিণা। তবু ভালো। ধনুর্ভঙ্গ না করতে পারলে বকুলের কাছেও মুখ থাকত না। তা হলে সেটা হতো আরো দুঃখের কথা।

জীবনদেবতা যেন বলতে চান, ভালোবাসা কেবল ভালোবাসার জন্যেই। তুমি ভালোবেসেছ, ভালোবাসা পেয়েছ। সেদিক থেকে তোমার নালিশ করার কী আছে? তবে প্রেম পাওয়া আর প্রেমিকাকে পাওয়া এক জিনিস নয়। তুমি প্রেম পেয়ে সন্তুষ্ট হওনি। প্রেমিকাকেও পেতে চেয়েছিলে। তোমার মূলমন্ত্র, যাকে ভালোবাসব তাকে বিয়ে করব। তার সঙ্গে মিলিত হব। নীতি হিসাবে সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু জীবনে সেরকম যোগাযোগ আশা করলেই মেলে না। ওটা তোমার বা তোমাদের হাতে নয়, ওটা আমার করুণা।

সী সিকনেস থেকে ওঠার পর সে নতুন উদ্দীপনা বোধ করে। বিশেষত সুয়েজের পরে। গায়ে লাগে ইউরোপের হাওয়া। কতকালের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। কিন্তু ব্যথাটাও তার সঙ্গে সঙ্গে চলে। আহা, বকুল বেচারি দেখতে পারছে না। আমিই স্বার্থপরের মতো দেখছি। ও কী করে দেখবে যদি আমি না দেখাই, যদি না লিখি?

এর থেকে আসে নতুন এক ব্যথা। বকুলের ব্যর্থতা। ও বেচারি ব্যর্থ হয়েছে। মুক্তি পেলে কত দেশ-দেশান্তর দেখতে পেত। পড়ত শুনত, যোগ্য হতো, উপার্জন করত, স্বাবলম্বী হতো। এখন পরনির্ভর হয়ে ওর জীবন কাটবে। তার উপর আঁটা হবে জমিদারবধূর মুখোস ও মিথ্যা সম্মান। যৎকিঞ্চিৎ স্বদেশী রাজনীতির প্রলেপ বোলানো হবে। বিপ্লবী নায়িকা। ওর মাথা খাবার জন্যে একদল 'দাদা' আছেন। আর ও যাদের মাথা খাবে তেমন একদল 'ভাই'। আবার একটা আন্দোলনের জোয়ার এলে ও ঝাঁপিয়ে পড়বে ঠিক। সেইভাবে ঢাকা দেবে ওর জীবনের ব্যর্থতা।

'আমি দায়ী। আমিই দায়ী। ওর ব্যর্থতার জন্যে। অমন করে হাত ধুয়ে ফেলে ভালো করিনি। আর এই যে সাফল্যের রথে চড়ে মথুরাযাত্রা এটা কি ওকে চাকার তলায় গুঁড়িয়ে নিয়ে যাওয়া নয়? ভোগের সত্র মেলে দিয়ে বসে আছে ইউরোপ। তাতে আমার জীবন ভরে উঠতে পারে। কিন্তু বকুলের কী। একঘেয়ে বিরক্তিকর জীবনযাত্রা আছে ওর কপালে। আর নয়তো তীব্র উত্তেজনা ও আপাতবিস্মৃতি।' হারীত ভাবে ও আফশোস করে।

কিন্তু হাজার ভেবেও এমন কোনো বিকল্প খুঁজে পায় না যাতে সবদিক রক্ষা হতো, সকলে সুখী হতো। বকুল, বকুলের স্বামী, বকুলের ছেলে, হারীত, হারীতের গুরুজন। রূপকথায় বা উপন্যাসে হয়তো সম্ভব। জীবনে নৈব নৈব চ। সামান্য বিষয়জ্ঞান যার আছে সে বলবে যে সবাইকে খুশি করতে পারা যায় না। 'যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি' একটা কবিকল্পনা। জীবনে সবদিক মেলানো যায় না। অতএব, হে অর্জুন, যুদ্ধ কর। ওসব মায়ামমতায় কী হবে? যেটা ঠিক পথ সেইটেই তুমি নেবে। তাতে আর কী এল গেল সে চিন্তা তোমার নয়। এইটেই ঠিক পথ। তুমি ঠিক পথই নিয়েছ।

তা সত্ত্বেও শল্য তার বুক থেকে যায় না। আর তার হৃদয় তার কাছে ফিরে আসে না। বিশল্যকরণী কোথায়? তার স্বরূপ কী? তাতে কি তার ব্যথাবোধ দূর হবে? অধর্মবোধ লোপ পাবে? পদত্যাগ করাই কি তার কর্তব্য? তেমনি করেই কি সে তাপমুক্ত হবে? শাপমুক্তও বলা যায়।

না, ওসব কিছু নয়। বকুল যে বলেছিল অপেক্ষা করতে সেইটেই আসল। অপেক্ষা করতে রাজী হলে মুহূর্তে সব যন্ত্রণার অবসান ঘটে। হারীত কিন্তু অপেক্ষা করতে রাজী

নয়। অপেক্ষা মানে অন্তহীন পদচারণ। পদচারণ প্রগতি নয়। বকুলের তাতে কী? হারীতেরই অস্থিরতা। অপেক্ষা করলে সে যে বকুলকে পেতই এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। অথচ অপেক্ষা করলে পার্বণীর সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিশতে পারত না, জোনের সঙ্গে চুম্বন বিনিময় করতে পারত না। বকুলের প্রতি বিশ্বস্ততার দায় থাকত। তাকে লিখতে হতো, মাফ চাইতে হতো। নয়তো বিবেকের খোঁচায় জর্জর হতে হতো।

জোনের দেওয়া বই ফেরৎ দেবার জন্যে পরে যেদিন তাঁদের ওখানে যায় সেদিন কথা না বলে হারীত মৌন থাকে। যেন গভীর মননে মগ্ন।

'কী হয়েছে, হারীত? আমি কি তোমার কোনো কাজে লাগতে পারি?' জোন তার কাছে এসে বসেন।

'তাহলে শুনতে হয় আমার জীবনের কথা। কার অত ধৈর্য আছে?'

'আমার আছে। আজ আমার হাতে আর কোনো কাজ নেই।'

হারীত গম্ভীর হয়ে বলে, 'আমাদের দেশে রাজা মহারাজার কাছে কিছু বলার আগে হাত জোড় করে বলতে হয়, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?'

'আমি রানী মহারানী নই। তুমি নির্ভয়ে বল।' তিনি মিষ্টি হেসে অভয় দেন।

'পরীক্ষার ফল জানিয়ে বাবাকে একখানি চিঠি লিখি। তার এক জায়গায় ছিল, 'বাবা, আমি সংসারী হতে চাইনে। আমার জীবনের লক্ষ্য সংসারী হওয়া নয়।' বাবা নাকি আমার চিঠি পড়ে কেঁদেছিলেন। সেটা ছেলের সাফল্যে আনন্দাশ্রু নয়। আমার মা নেই। তিনি থাকলে তিনিও তাই করতেন। আমাদের দেশের ধরনই ওই। ছেলে সংসারী হবে না শুনলে মা বাপ বোঝেন ছেলে সন্ন্যাসী হবে। আমি কিন্তু সে অর্থে বলিনি। সংসারী না হওয়া মানে সন্ন্যাসী হওয়া এটা আমার ব্যক্তিগত অভিধানে লেখে না। সংসারীও নয়, সন্ন্যাসীও নয়, তৃতীয়পন্থী কি নেই? কেন, বাউলরা? বোহিমিয়ানরা?

আসলে আমাদের দেশের সামাজিক মানুষ নারীকেই মনে করে সংসার। সংসার করা মানে নারী গ্রহণ করা, বিবাহ করা। সন্ন্যাস নেওয়া মানে নারী বর্জন করা, নারী সঙ্গ না করা। কামিনীর সঙ্গে কাঞ্চনকেও বন্ধনীভুক্ত করা হয়। সন্ন্যাসী যে হবে সে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করবে। সংসারী যে হবে সে কামিনীকাঞ্চন ভোগ করবে।

হাজার হাজার বছর পরে এই লাইনে চিন্তা করতে করতে শেষে এমন হয়েছে যে, ত্যাগী কথাটার মানে দাঁড়িয়েছে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী, আর ভোগী কথাটার মানে কামিনীকাঞ্চনভোগী। ভারতের চিন্তাজগতে বিপ্লব আনতে হলে এর গোড়া ধরে টান মারতে হবে।

ধন অর্জন করা, সম্পত্তির মালিক হওয়া ইত্যাদি কর্মে আমার কোনোদিনই উৎসাহ ছিল না। আমি দিনমজুর। খাটি, মজুরি নিই। দিন আনি, দিন খাই। আমার খাটুনিটা

সৃষ্টি। যে খাটুনি সৃষ্টি নয়, তাতে আমার আত্মার অ-সুখ। তারপর নারী আমার কমরেড, আমার সঙ্গিনী, আমার শক্তি। তার প্রেরণা আমাকে অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত করে। একের যা অসাধ্য দুজনে মিলে তা সাধ্য। সে মিলন যে সাধুসম্মত হবেই এমন কী কথা আছে? তবে হলে ভালো হয়। অনেক অশান্তি বাঁচে।

এককথায় আমার জীবনদর্শন হচ্ছে অনুরাগবৈরাগ্য। আমি একজনকে অবলম্বন করে সর্বজনকে ভালোবাসব। আর সব বিষয়ে উদাসী হব। খাব কী, মাথা গুঁজব কোথায়, আজ বাদে কাল কী দশা হবে, এসব চিন্তা আমার নয়, বিধাতার। আমার ভাবনা কেমন করে ভালোবাসব। তার মধ্যে সৃষ্টির কথাও আসে। ভগবান তো ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি এসেছে প্রেম থেকে। আমার প্রেমও সৃষ্টির রূপ নেবে।

অনুরাগের সাধনায় আরেক জনের দরকার। একা একা বৈরাগ্যসাধন চলে, অনুরাগ-সাধন চলে না। সেই একজনের প্রত্যাশায় ছিলুম। কবে আসবে জানতুম না। কে তা জানতুম না। এল যখন তরবারি নিয়ে এল। বিষম সমস্যায় পড়লুম। একটি নারীকে তার স্বামীগৃহ থেকে উদ্ধার করতে হবে। সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাল্যবিবাহিতা। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক নয়। সমস্ত সমাজ একদিকে, সে একা আরেক দিকে। তার অনেক বন্ধু, অনেক ভক্ত, কিন্তু কেউ সমর্থন করে না বিবাহের থেকে মুক্তি। করি আমি ও আমার দুচারজন বন্ধু। সেই সেতু দিয়েই আলাপ হয়। ইলোপমেণ্টের উদ্যোগ চলে। খুব একটা রোমান্টিক ঘটনার জন্যে আমরা দিন গুনছি এমন সময় আনরোমান্টিক ফ্যাসাদ। সে আবিষ্কার করে যে মা হতে যাচ্ছে। তার আগে সে আত্মহত্যা করবে। কারণ মা হলে তার মুক্তি অসম্ভব।

আমি তাকে বোঝাই যে, মুক্তি তা সত্ত্বেও সম্ভব। আশা দিই, অঙ্গীকার করি। তখন সে বাঁচতে রাজী হয়। এরপর সে তার বাপের বাড়ী যায় মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হতে। আর আমি আমার পড়াশুনায় ফিরে যাই সংসারের জন্যে প্রস্তুত হতে। অনুরাগ-বৈরাগীর পক্ষে সে এক সঙ্কট। আমার অনুরাগই আমার বৈরাগ্যের অন্তরায় হয়। আদর্শে ও কাজে সঙ্গতি থাকে না। ওকে মুক্ত করব বলে আমি বন্দী হতে যাই। বন্দিত্বের পরীক্ষায় সফল হবার জন্যে সব শক্তি নিয়োগ করি। ওদিকে ও যথাকালে সন্তানবতী হয়। তারপরে যা ঘটে তা এক অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স। বেশ কিছুকাল 'যাব না', 'যাব না', করার পর বাধ্য হয়ে স্বামীর কাছে ফিরে যায়। কী করবে, শিশুর স্বার্থে সন্ধি করে। মুক্তির স্বপ্ন পেছিয়ে যায়। আমাকে বলে অপেক্ষা কর। আমি পরীক্ষায় সফল হই। অপেক্ষার কোনো মানে খুঁজে পাইনে। যার মুক্তির জন্যে আমি বন্দী সে যে করে মুক্ত হবে, আদৌ হবে কিনা, তা সে নিজেই জানে না। ছেলে বড়ো হলে তারপরে সেকথা উঠবে।

আমি তো বালজাক নই যে কাউন্টেস হানৃস্কার জন্তে আঠারো বছর ধরে অপেক্ষা করব আর বিয়ের মাস তুয়েকের মধ্যেই মারা যাব। আরম্ভটা প্রায় একই প্রকার। শেষটাও সেই প্রকার হতো। যদি অপেক্ষা করতুম।

সম্পর্কচ্ছেদ করে চলে এসেছি। কিন্তু বুকে শেল বিঁধে রয়েছে। অসহায় প্রেমবতী নারীকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করিনি তো? এ কেমনতর প্রেম যে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার চেষ্টা না করে অত সহজে হাল ছেড়ে দিয়ে পালায়? আর তাই যদি কর্তব্য হয় তবে পরীক্ষার ফল সেই সঙ্গে বিসর্জন দিইনি কেন? কেন এই ফলাসক্তি? ও যখন মুক্ত হলো না, হবেও না, তখন আমি কেন আবদ্ধ থাকি এই যুক্তি থেকেই না সম্পর্কচ্ছেদ? এখন এর স্থায়সঙ্গত পরিণতি কি আমার জীবিকাঘটিত বন্ধনমুক্তি নয়?

তারপরে হৃদয়ের মুক্তি আরো কঠিন। হৃদয়কে একবার জড়িয়ে পড়তে দিয়ে ছাড়িয়ে আনা ইচ্ছাশক্তির বাইরে। আমার তো মনে হয় আরেকজন যদি আসে ও আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় তা হলেই আমি ছাড়ান পাই। আমার শক্তি নয়, আরেকজনের শক্তি আমাকে ইমোশনের দিক থেকে মুক্ত করবে। তারই প্রেম হবে আমার বিশল্যকরণী। আমাকে শল্যহীন করবে। নতুন জীবন দেবে।'

জোন এতক্ষণ নীরবে শুনছিলেন। অখণ্ড মনোযোগে। হারীতের কাহিনী শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে মন্তব্য করেন, 'তার জন্তেও তোমাকে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে হবে।'

'তাব জন্তে আমি অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করব।' হারীত তার সংকল্প ব্যক্ত করে। 'কিন্তু তাহলে আমার শল্য দেখছি নম্রভাবে বহন করে যেতে হবে।'

'না। তেমন কী কথা আছে? ইচ্ছে করলে আজকেই তুমি ওর থেকে রিলিফ পেতে পারো।'

হারীত আশ্চর্য হয়ে বলে, 'এত কি সহজ হবে!'

'হবে, যদি আমার কথা শোন।' জোন তাকে আশ্বাস দেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'স্বামীর সঙ্গে সন্ধি যখন হয়েছে, তখন ওকে একটা সুযোগ দিয়ে তুমি ঠিকই করেছ। মা হবার পরে পরিস্থিতি একই রকম থাকে না। শিশুর মুখ চেয়ে ও যা করেছে ঠিকই করেছে। তোমার পরিতাপের কোনো সঙ্গত কারণ নেই। কে তোমার কাছে আত্মত্যাগ প্রত্যাশা করছে যে তুমি তোমার জীবিকা ত্যাগ করে প্রত্যাশা পূর্ণ করবে? তবে তোমার সৃষ্টির সঙ্গে বিরোধ বাধলে অন্ত কথা। তোমার আত্মার অ-সুখ দেখলে যথাকালে পদত্যাগ কোরো। এখন নয়।'

হারীত উচ্ছ্বসিত হয়ে ধন্তবাদ দেয়। 'তুমি আমাকে যথেষ্ট রিলিফ দিলে জোন।'

'আর ও নিয়ে তোলাপাড়া কোরো না, হারীত। ওই অধ্যায়টা সমাপ্ত।'

॥ চোদ্দ ॥

এরপরে আবার যখন দেখা হয় জোন রসিকতা করে বলেন, 'তারপর শ্রীমদ্ অনুরাগ-বৈরাগী ! তোমার নবতম অনুরাগের সমাচার কী ?'

হারীত কিন্তু ওটা সীরিয়াসভাবে নেয়। 'আমার নবতম অনুরাগের সমাচার তোমার চেয়ে কে বেশী জানে ?'

জোন তা শুনে তাজ্জব বনে যান। 'কবে তুমি আমাকে বললে যে জানব !'

'মুখের ভাষায় বলিনি, অধরের ভাষায় বলেছি। এবার মুখের ভাষায় বলি ! আই লাভ ইউ, জোন।'

জোন রঙিন হয়ে ওঠেন। হারীতের একখানি হাত মুঠোর মধ্যে ধরে ধীরে ধীরে চাপ দেন। তারপর তুলে নিয়ে মুখে ছোঁয়ান। তাঁর চোখে জল।

'তোমাকে না জেনে আঘাত করিনি তো, জোন ? আমার যেমন বরাত। প্রিয়জনকে আঘাত দিতেই আমার জন্ম।'

'তা নয়। তা নয়। তুমি আমাকে অসীম আনন্দ দিলে। কিন্তু এই আনন্দ নিয়ে আমি কোথায় রাখব ? কী করে এর যথাযোগ্য প্রতিদান দেব ? বয়স বেশী, নার্ভ খারাপ, মা যতদিন আছেন তাঁর কাছে থাকা দরকার। তোমার ওই জলন্ত যৌবন আর আমার এই নিবন্ত আগুন, কী করে এদের মিল হবে ?'

হারীত নিরুত্তর থাকে। তার মনে তরঙ্গ উঠতে থাকে। কী করে এদের মিল হবে !

'তুমি তোমার অত কম বয়সে অত গভীর বেদনা পেয়েছ। কিন্তু তোমাকে বিশল্য করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। সেদিন প্রেমশক্তির কথা উল্লেখ করেছ। সে শক্তি কি আমার আছে ! আমি ভালোবাসতে পারি, কিন্তু সব দিতে পারিনে। যে নারী সব দিতে পারে তার জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, হারীত। এর থেকে মনে কোরো না যে আমি তোমাকে ভালোবাসিনে। আই লাভ ইউ, ডিয়ার।'

হারীত তাঁর একখানি হাত তুলে নিয়ে মুখে ছোঁয়ায়। 'বয়সের ব্যবধানটা বিষম নয়। আমার দেহের বয়সের চেয়ে মনের বয়স বেশী। প্রেমের তাপ আমাকে অকালে পাকিয়েছে। আমার সমবয়সী ছেলেরা আমাকে প্রবীণের মতো সমীহ করে। আর সমবয়সিনীরা তো এড়াতে পারলেই বাঁচে। আমিও ওদের এড়িয়ে চলি। দু'দিকেই জলন্ত যৌবন। তবু মিল হবার নয়। ওরা কেউ আমার মতো অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যায়নি। বিদগ্ধ হয়নি। বড় জোর একটু ফ্লার্ট করেছে। প্রেমের বর্ণ পরিচয়ের অ আ যার নাম। এদিকে আমি প্রথমভাগ শেষ করে যুক্তাক্ষর শুরু করতে যাচ্ছি।'

'তা হলেও তোমার বয়স বাড়েনি, হারীত। আমরা অসমবয়সী।' জোন দুঃখ করেন।

হারীত মেনে নেয় না। তর্ক করে। 'তুমি যদি পুরুষ হতে, আর আমি নারী, তাহলে তো বয়সের ব্যবধানটা এমন মারাত্মক মনে হতো না।'

'তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ যে পুরুষের যৌবন সুদীর্ঘকাল থাকে? নারীর যৌবন ততদিন নয়। দশ বছর বাদে তোমার সূর্য মধ্যগগনে। আর আমার সূর্য অস্তাচলে। তখন তোমাকে বেঁধে রাখব কী দিয়ে? তুমি ছেড়ে গেলে আমি কী নিয়ে থাকব? কয়েকটি সোনালী বছরের স্মৃতি?'

হারীত এখন এর কী উত্তর দেবে? বকুলকে যেমন বলেছিল, 'তোমাকে আমি কোনোদিন ছাড়ব না।' কথা দিলে কথা রাখতে হয়। পারবে রাখতে? সত্যি?

'প্রকৃতির অবিচার। এর বিরুদ্ধে নারীর কি কিছুই করবার নেই, জোন? বিজ্ঞানের সাহায্যে যৌবনচর্চা?'

'প্রকৃতির অবিচার নারীকে মেরে রেখেছে। বিদ্রোহ নিষ্ফল। এই দেখ না কেন, প্রতি মাসেই কয়েকদিন বর্ষাকাল। পুরুষের তেমন কোনো ঝঞ্ঝাট আছে? কিংবা, ধরো, একযাত্রায় পৃথক ফল। পুরুষের কাছে যা পাঁচ মিনিটের সুখ নারীর কাছে তাই দশ মাসের অসুখ। এসব অবিচারের বিরুদ্ধে করবার কী আছে, হারীত? আজকালকার যৌবনচর্চায় আমার আস্থা নেই। জন্মাবধি আমি প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়েছি। বস্ফোরাসের ধারে। বার্মুডা দ্বীপে। কর্নওয়ালের পল্লীতে। এখনো দিনে পাঁচ-সাত মাইল হাঁটি। বিশেষ একরকম ব্যায়াম করি। ইউরিথমিকস। মাঝে মাঝে সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটি। ছোটখাটো পাহাড়ে উঠি।'

হারীত চুপচাপ শুনে যায়। কী বলবে জানে না। শ্রদ্ধা বোধ করে।

জোন স্মিত হেসে বলেন, 'তোমার মতো আমিও অনুরাগবৈরাগী। তোমাকে আমি ভালোবাসি। এর নাম অনুরাগ। কিন্তু তোমার জন্যে সংসারী হতে পারব না। তোমার কর্মস্থলে যেতে পারব না। তোমার জন্যে একটি হোম রচনা করতে পারব না। এর নাম বৈরাগ্য। আর ওই যে একটা তৃতীয় পন্থার আভাস দিয়েছ সেদিন, ওটা পুরুষদের পক্ষেই সুবিধের। মেয়েদের পক্ষে নয়। পুরুষদের চেয়ে ওতে মেয়েদের ঝুঁকি শতগুণ। হয়তো আর কোনো বান্ধবী ওতে রাজী হবে। আমাকে যদি ভালোবাস তো আত্মার আত্মীয়-রূপেই পাবে। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি সেদিন থেকেই তোমার সঙ্গে একটা অ্যাফিনিটি বোধ করেছি।'

'তা হলে কি নিয়তি বলে কিছু আছে? অথবা পূর্বজন্মের সংস্কার? হয়তো চান্স একটা অংশ নেয় মানবিক ব্যাপারে। যেটাই হোক তোমার আমার সম্পর্ক সহজে কাটবার নয়, জোন। আমরা অনুরাগবৈরাগী। যে অর্থে তুমি ব্যাখ্যা করেছ। অন্য

কোনো বান্ধবী আমার নেই, থাকলেও তোমাকে অতিক্রম করব না। তুমি যা স্বেচ্ছায় দেবে আমি তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব। আর নয়তো তোমাকে জানাব ও জানিয়ে বিদায় নেব।'

'আশা করি আমাদের বন্ধুতা অনেকদিন থাকবে।' জোনের মুখ ভাস্বর।

হাবীত অভিমান করে বলে, 'বন্ধুতা বলেছ। প্রেম বলনি। বেশ, সেই ভালো। প্রেমের দহন থেকে উঠে এসে দ্বিতীয়বার সে আগুনে পোড় খেতে কে চায়। তুমি যেন শীতল দীঘি আর আমি যেন তাপিত পথিক। প্রাণ জুড়িয়ে যায়।'

জোন স্নিগ্ধ স্বরে বলেন, 'তোমার জন্যে কী করতে পারি, ডিয়ার?'

'কী করতে পারবে? তুমি তো বিশল্যকরণী এনে দিতে পারো না। তার জন্যে কে জানে কতকাল অপেক্ষা করতে হবে। কে জানে কতদূর চলতে হবে। কিন্তু তোমার প্রীতি পাবার পর থেকে আর ও নিয়ে ভাবছিনে, ভাবতে চাইনে, ডিয়ার। তুমি তো জানো মিস্টিকদের বলা হয় 'ফুল্‌স্ অফ্ গড'। আমি তেমনি 'ফুল অফ লাভ'। প্রেমের জন্যে বোকা বনেছি। প্রেমের নির্বোধ। আমার ভয় করে, এর পরে না 'ফুল অব আর্ট' বলতে হয়! শিল্পের নির্বোধ।'

জোন একটু বিস্মিত হয়ে বলেন, 'ওকথা কেন মনে এল?'

'আজ এল তা নয়। জীবিকার সঙ্গে সঙ্গে এল। যে জীবিকা আমি বরণ করে নিয়েছি তার দাবী মেটাতে গেলে আমার হাত দিয়ে না হবে কবিতা, না অন্য কোনো প্রকার শিল্পকর্ম। মেজাজটাই ভিন্ন।'

জোন শুনে দুঃখিত হন। কিন্তু পরিত্রাণের উপায় জানেন না। ভারতবর্ষের জীবিকার বাজার তাঁর অজানা। একটা চাকরি গেলে আরেকটা পাওয়া ইংলণ্ডেও যথেষ্ট শক্ত। কত লোক বেকার বসে আছে। লেখকদের সংসার বিনা চাকরিতে চলে এরূপ দৃষ্টান্ত ঝুড়ি ঝুড়ি নয়। আর কত আজে বাজে জিনিস লিখতে হয়। সাড়ে বত্রিশ ভাজা। কবিতা কেউ ছাপতেই চায় না। কবিকেই ছাপার খরচ জোগাতে হয়। ছোটগল্পের চাহিদা সাময়িক পত্রিকায় আছে, কিন্তু সংক্ষেপে সারতে হয়। বই করে বার করতে গেলে প্রকাশক বিমুখ হন। হাবীত যদি ইংলণ্ডে থেকে ইংরেজীতে ভাগ্যপরীক্ষা করতে যায় নেহাৎ সাংবাদিক হবে। সাহিত্যিক বা শিল্পী নয়। তা যদি হয় তবে 'ফুল অফ আর্ট' নয় তো কী?

'না, তোমার শঙ্কা অকারণ নয়। আর্টের ভাবনা প্রেমের ভাবনাকেও ছাড়িয়ে যায়। ভাগ্যিস আমার কিছু প্রাইভেট ইনকাম আছে। নইলে আমাকেও সংগ্রাম করতে হতো।'

'সংগ্রামে আমি বিমুখ নই। এতকাল সংগ্রাম ছাড়া আর কী করেছি? কিন্তু কথা হচ্ছে সংগ্রাম আমাকে কোন লক্ষ্যে নিয়ে যাবে? এমন কিছু রেখে যেতে পারব কি যা

কেউ কোনো দিন দেখেনি, কেননা কোনোদিন দেখেনি, কেননা কোনোদিন দেখতে চায়নি? জানতে পারব কি মানুষের অন্তরে কী আছে? আর কী আছে বিধাতার মনে? বুঝতে পারব কি কোন ঘটনার কী তাৎপর্য? সব ঘটনার অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ? সমগ্রের উপর দৃষ্টি স্থির থাকবে তো? না কেবল খুঁটিনাটির উপরে টর্চ ফেলব? একটুখানি আলো, বাকীটা আঁধার? সৌন্দর্যের পশ্চাদ্ধাবন করে আমি কি তাকে ধরতে পারব? সে কি আমাকে ধরা দেবে?' হারীত ঠিকমতো বোঝাতে না পেরে ব্যাকুল হয়।

জোন সহানুভূতি দিয়ে তার কথা বোঝেন। 'সংগ্রাম তোমাকে কোন লক্ষ্যে নিয়ে যাবে তা যতদিন না পরিষ্কার হয় ততদিন যে পাখীটা হাতে আছে সেটাকে হাতছাড়া কোরো না। এটাও তো অনায়াসলব্ধ নয়। শেষপর্যন্ত তুমি 'ফুল অফ আর্ট' হবে কি লক্ষ্যভেদ করবে তা দীর্ঘ জীবনের অপেক্ষা রাখে। তোমাকে বাঁচতে হবে, বাঁচতে হলে প্রাণধারণের রসদ জোগাড় করতে হবে। শিল্প যদি তা জোগাতে না পারে তবে তার বৃত্তের বাইরে যেতে হবে। কিন্তু দিনের বেলা গেলে রাতের বেলা ফিরে আসবে। সপ্তাহে পাঁচদিন গেলে উইক-এণ্ডে ফিরে আসবে। কথা হচ্ছে কোনটা তোমাকে বেশী টানবে? বৃত্তি না শিল্প? বৃত্তিও শিল্পের পরিপূরক হতে পারে। গ্যেটে যদি রাজকার্য না নিতেন তা হলে কি 'ফাউস্ট' লিখতে পারতেন? এর বিপরীত উদাহরণও আছে। সেইজন্যে এঁর মতো বা তাঁর মতো হতে বলব না তোমাকে। তুমি তোমার নিজের মতোই হবে। তাছাড়া—'

'বল, বল কী বলতে চাও।' হারীত তাঁকে ইতস্তত করতে দেয় না।

'তা ছাড়া তোমাকে তোমার ওই আত্ম অনুকম্পা বর্জন করতে হবে। তুমি 'ফুল অফ লাভ' নও। প্রেমের জন্যে বোকা বনে যাওনি। বোকা বনতে, যদি আরো পাঁচ বছর ওই মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে। প্রত্যেক প্রেমেই খানিকটে করে বোকামি থাকে। সোনার সঙ্গে খাদের মতো। তোমার প্রেমেও ছিল। নইলে তুমি ইলোপমেন্টের প্রস্তাবে সায় দিতে না। খুব বেঁচে গেছ। কিন্তু 'ফুল অফ লাভ' তুমি নও। যদি তার নমুনা দেখতে চাও একদিন তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাব। আমার এক পুরাতন বন্ধুকে। লণ্ডনের বাইরে এক গ্রামে। যাবে?'

হারীত রাজী হয়। রেলপথে কিছুদূর, বাকীটা পদব্রজে।

'হাঁ, যা বলতে যাচ্ছিলুম। শেষ করিনি। 'ফুল অফ আর্ট' তুমি হবে না। ওটা অমূলক ভীতি। হয় কারা, জানো? যারা বহুপ্রসবিনী হয়েও বন্ধ্যা।'

'ফুল অফ আর্ট' হবে না শুনে হারীত কৃতার্থ হয়। কিন্তু জানতে চায়, বহুপ্রসবিনী হয়েও বন্ধ্যা, এর অর্থ কী?

'প্রেমের আগুনের মতো সৃষ্টির আগুন যাকে অহরহ দগ্ধ করছে না সে বস্তুত

উৎপাদন করলেও সৃষ্টিশীল নয়। আগুন না হলে সৃষ্টি হয় না, হারীত। যা হয় তার নাম প্রোডাকশন। তার জন্যে বিস্তর লোক আছে। তোমাকে যা করতে হবে তার নাম ক্রিয়েশন। এ পথে ভিড় কম।'

'তুমি কী করে জানলে যে সৃষ্টির আগুন আমাকে অহরহ দগ্ধ করছে?' হারীত জেরা করে। 'তুমি কি অন্তর্যামী?'

জোন মিষ্টি হাসেন। 'তোমার চোখ দেখে বোঝা যায়। চোখ তো নয়, আকাশের তারা। তুমি কি আমার কাছে বসে আছো, না তুমি লক্ষ যোজন দূরে মিটমিট করে জলছ। তারাও তো একদিন নিবে যায়, নিবে গ্রহ হয়ে যায়। কে জানে, তোমারও হয়তো সেই পরিণাম হবে। কত কবির হয়েছে। কত শিল্পীর। চিরজীবন দগ্ধ হতে কেই বা চায়!'

হারীত ভেবে বলে, 'হাঁ, সেইখানেই বিপদ। আরাম আমাকে দায়হীন করতে পারে। ব্যসন আমাকে দীপ্তিহীন করতে পারে। সম্পদ আমাকে নির্বাপিত করতে পারে। আর সমাজ আমাকে নখদন্তহীন করতে পারে।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ফস্‌ করে বলে বসে, 'জোন, আমি বরঞ্চ বোহিমিয়ান হব।'

জোন এটা প্রত্যাশা করেননি। চমকে ওঠেন। তারপর স্নিগ্ধ স্বরে বলেন, 'তুমি কি কোথাও দেখেছ যে বোহিমিয়ানরা দারুণ শ্রমসাধ্য কাজ দীর্ঘকাল করতে পেরেছে? ওদের হয়তো আর-সব আছে, কিন্তু দম নেই। আর আর্ট মাত্রেই প্রাণায়াম।'

'আর্ট মাত্রেই প্রাণায়াম! বল কী, জোন!' এবার চমক লাগার পালা হারীতের।

'বাখ্‌-এর জীবন, বেঠোফেনের জীবন, মাইকেল এঞ্জেলোর জীবন কিসের সাক্ষ্য দেয়? উচ্ছৃঙ্খল, অনিয়মিত জীবনযাত্রা যাদের তারা তাদের মোমবাতি দুদিক থেকে জ্বালায়, তাই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, দিয়ে দুদিনেই খরচ হয়ে যায়। ওদের উপর নির্ভর করলে সভ্যতাও কয়েক শতাব্দীর মধ্যে দেউলে হয়ে যেত। যারা শত শত বর্ষের জন্যে গড়ে তারা হাউইয়ের মতো দপ করে জলে উঠে দপ করে নিবে যায় না। বোহিমিয়ানরা স্বাধীন, কিন্তু কিসের জন্যে স্বাধীন? প্রাণপাত সৃষ্টির জন্যেই কি? সে স্থৈর্য কোথায়? ব্রিলিয়ান্ট, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই যথেষ্ট নয়। তোমাকে বরঞ্চ সংসারী হতেই পরামর্শ দেব। অসংসারী হতে গিয়ে তুমি যে কোন অতলে গিয়ে ঠেকবে তার নমুনা দেখতে চাও তো দেখাতে পারি।'

হারীত বলে, 'থাক। আমি তোমার মতো অনুরাগবৈরাগী হয়েই সৃষ্টিশীল থাকব।'

॥ পনেরো ॥

প্রেমের মূলে কী? আত্মার সঙ্গে আত্মার অ্যাফিনিটি। না দেহের প্রতি দেহের মাধ্যাকর্ষণ? না হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের টান? না মনের সঙ্গে মনের মিল?

হারীত এ রহস্যের মর্ম জানে না। এ এক চিরন্তন রহস্য। ক্লাউড অফ আননোয়িং বলে সেই যে বইখানি জোন তাকে পড়তে দিয়েছিলেন তার অজ্ঞাত লেখক একজন উঁচুদরের সাধক। তিনি বলেন, দুটি শব্দ আছে। দুটিই এক সিলেবলের। 'গড' আর 'লাভ'। দুটির যে কোনো একটিকে বেছে নিয়ে অন্তরে ধারণ করলে একই উপলব্ধি।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, দুটি শক্তি আছে মানুষের। জ্ঞানশক্তি ও প্রেমশক্তি। জ্ঞানশক্তি দিয়ে ভগবানের উপলব্ধি হয় না, তিনি অনধিগম্য। কিন্তু প্রেমশক্তি দিয়ে তাঁর পূর্ণ উপলব্ধি হয়, তিনি পূর্ণ অধিগম্য। আমাদের সাধকরাও তো বলেন, বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা। চৈতন্য সেইজন্যে জ্ঞানমার্গ ছেড়ে প্রেমমার্গ ধরেন।

অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য। মধ্যযুগের মরমী সাধনা কি সব দেশেই এক? এ যুগের বিজ্ঞান সাধনার মতো? হারীত উচ্চ স্বরে ভাবে।

'কাল বিভাগ, দেশ বিভাগ এগুলো কৃত্রিম।' জোন বলেন। 'বিমান থেকে বোঝা যায় না কোনটা বেলজিয়াম, কোনটা ফ্রান্স। তেমনি উপলব্ধির উচ্চতর স্তর থেকে কোনটা মধ্য যুগ বা কোনটা আধুনিক যুগ।'

পাশের সেলফ থেকে হাত বাড়িয়ে একখানা আর্টের বই পেড়ে এনে হারীতকে দেখতে দেন। একটা ছবির তলায় কাগজ চাপা দিয়ে বলেন, 'এটা কোন দেশের ও কোন যুগের ছবি? ধাঁ করে জবাব দাও।'

'আধুনিক যুগের নিশ্চয়, তবে কোন দেশের তা বলা শক্ত। ইটালীরও হতে পারে, স্পেনেরও হতে পারে।'

'তাহলে দেখ কী লেখা আছে ছবির তলায়।' এই বলে কাগজ তুলে নেন জোন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিসহস্র অব্দের ও মিশর দেশের। তার মানে চার হাজার বছর আগে আঁকা। কেমন করে কালপারাবার পার হয়ে এসেছে ও অক্ষত রয়েছে।

'ইমপসিবল!' বলে হারীত গালে হাত দিয়ে বসে। রদ্যাঁর সেই ভাবুকমূর্তির মতো।

'এখন বল দেখি আমাকে আজকের দিনের ক'খানা ছবি চার হাজার বছর পরেও তখনকার দর্শকের কাছে আধুনিক মনে হবে?' জোন জিজ্ঞাসা করেন ও মৃদু মৃদু হাসেন।

'তা হলে আধুনিকতা নিয়ে এত ঝম্ফঝম্প কেন? আমাকে তো আমলই দিতে চায় না।' তিনি বলেন।

হারীত জানতে চায়, 'তুমি কি মরিসের মতো প্রিরাফেলাইট, না তুমি প্রিমিটিভ ?'

তিনি এর কোনটাই নন। 'আমি খোলা চোখে দেখি কিন্তু দেখেই ভুলে যাই। পরে যখন আঁকি তখন স্মৃতি থেকে আঁকিনে। ইমপ্রেসন থেকেও না। আমার ভাবনার সঙ্গে কল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে আঁকি। তাতে যা দেখেছি তারও ভাগ থাকে। বস্তুজগৎকেও চেনা যায়। তোমাকে বোধহয় ঠিক বোঝাতে পারলুম না, হারীত।'

'আমি বুঝেছি। একটা কোনো দৃশ্যকে বা দৃষ্ট পদার্থকে চিত্রণ করা তোমার রীতি নয়। সমুদ্রটা বা মেঘটা তুমি আঁকবে না। যা আঁকবে তাতে সমুদ্রের বা মেঘের ভাগও থাকবে। কিন্তু সেটা মানসচিত্র বা কল্পচিত্র। কেমন ?' দেয়ালের দিকে তাকিয়ে হারীত বলে।

'আরো অনেক কথা আছে। রেখা আর রং নিয়ে আমি আমার খেয়ালমতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি। ওসব রং তুমি বাইরে কোথাও দেখতে পাবে না। সমুদ্রেও না। মেঘেও না। আর ওই যে সূর্যের আলো ওটাও আমার নিজের পদ্ধতিতে আঁকা।' বলতে বলতে তিনি অন্যমনস্ক হন।

'জোর করে নূতনত্ব আনা আমার উদ্দেশ্য নয়, হারীত।' তিনি বলে যান। 'আমি সেকেলে নই, এটা জাহির করার জন্যেই আমার তুলি ধরা নয়। সেকালের সঙ্গে অন্বয়-রক্ষা কি শিল্পগত অপরাধ ? অনুকরণ তো আমি করছিনে। না প্রকৃতির, না অতীতের। আমি মডেল ব্যবহার করিনে। পুরাতনও আমার মডেল নয়।'

হারীত যদিও চিত্রকর নয়, লেখক, তবু এসব শোনা ও মনে রাখা তারও দরকার। আর্টের এক মহলের সঙ্গে আরেক মহলের যোগাযোগ রাখতে হলে যোগসূত্র চাই। এগুলি তাই। আজকাল চিত্রকলার 'ইজম' সাহিত্যেরও ইজম হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রিরাফে-লাইট রসেটি, মরিস এঁরা কবিতাও লিখতেন। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

'তুমি ছবি আঁকতে জানো ? আঁকতে শিখবে ?' জিজ্ঞাসা করেন জোন।

'আমি আমার লেখার হাতই রাখতে পারছিনে। এই হাত দিয়ে পরীক্ষার উত্তর লিখতে হয়। তাও পরের ভাষায়। এখন থেকে ভয়ে কাঁপছি। তার উপর ছবি আঁকার নেশা চাপলে উটের পিঠে শেষ কুটো হবে, জোন।'

'পুঅর হারীত।' ওকে তিনি সমবেদনা জানান।

'তোমার সমবেদনার জন্যে ধন্যবাদ, ডিয়ার।'

'তোমার জন্যে কী করতে পারি আমি ? এদেশে থাকলে তুমি বেকার হবে। আর তোমার ওই বোহিমিয়ান হওয়া আমি একেবারেই সহ্য করতে পারিনে। দেশে ফিরে গিয়ে চাকরি করা ছাড়া আর যদি কিছু করতে চাও তবে আপাতত সেটা শিকেয় তোলা থাক।'

হারীত একমত হয়। কিন্তু জোনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরতে তার মন চায় না।

যদি সম্ভব হতো তবে সে বিলেতেই বসবাস করত, যাতে তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য পায়। কত কী শেখবার আছে যা পুঁথি পড়ে হয় না, যার জন্যে চাই প্রেমমার্গে স্থিতি। আর উচ্চকোটির প্রেমবতী নারী। বহুভাগ্যে তাঁর ভালোবাসা পেয়েছে, এখন বাকি রয়েছে তাঁর কাছে শেখা।

জোন অবশ্য বলেন, 'প্রেম নয়, বন্ধুতা। প্রেমের দায়িত্ব বহন করবে কে? সে শক্তি কি আমার আছে? কতকাল হলো ও শব্দ আমি শুনিনি। তুমি কোনখান থেকে এসে শোনালে। হায়, আমি কি আর সেই আমি?'

হারীত সসঙ্কোচে শুধায়, 'কী হয়েছিল? বিয়ে হলো না কেন? যুদ্ধে নিহত?'

'না, তা নয়।' জোন চুপ করে থাকেন। তারপর হারীতের দিকে চেয়ে সসঙ্কোচে বলেন, 'উনি স্ত্রী ছিলেন না।'

তার মানে তাই। বকুল যে অর্থে স্ত্রী ছিল না। হারীত ওর চাউনি দিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করে। কিন্তু তার দরকার ছিল না। কবেকার কথা! জোন ওটা কাটিয়ে উঠেছেন। অসম্ভবের জন্যে নির্বোধের মতো অপেক্ষা করেননি। প্রথমে তাঁর অভিলাষ ছিল সঙ্গীত নিয়ে থাকবেন। পরবর্তীকালে চিত্রকলায় আপনাকে পান।

হারীতের কানে বাজছিল, প্রেমের দায়িত্ব বহন করবে কে? 'প্রেমের দায়িত্ব বলতে কী বোঝায়, জোন? যার ভয়ে তুমি ভীত।'

'সবকিছুই বোঝায়। সব দিতে পারা। সব নিতে পারা। প্রেমের দাবীর কি সীমা আছে না শেষ আছে না সংজ্ঞা আছে? প্রেম যেন সর্বগ্রাসী হুতাশন। তাতে আহুতি দেবার মতো অফুরন্ত সামগ্রী এ বয়সে আমি পাব কোথায়?'

হারীত ধ্যান দিয়ে শোনে। তিনি বলতে থাকেন, 'তারপর প্রেমের দায়িত্ব মানে প্রেমিকের দায়িত্ব। কায়া আর মন আর প্রাণ দিয়ে প্রেমিকের দায়িত্ব নিতে ও বহন করতে হয়। প্রেম আর প্রেমিক অভিন্ন। প্রেমিকের দায়িত্ব বইতে না পারলে প্রেমের দায়িত্ব বইতে পারা যায় না। আমি যে অক্ষম তা আমি ভালো করেই জানি। বন্ধুতাও কঠিন।'

'হাঁ, বন্ধুতাও কঠিন।' হারীত সে বিষয়ে নিশ্চিত।

'তবে বন্ধুতা তেমন সর্বগ্রাসী নয় বলে আমার সাধ্যে কুলোতে পারে। কিন্তু বন্ধুতা হলেও এটা একটা বিশেষ রকমের বন্ধুতা। এরকম বন্ধুতা আমি দেখিনি। এটা আমার কাছে বিস্ময়কর। হারীত, তোমার বন্ধুতায় আমি মুগ্ধ।'

ওঁদের ওখানে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ থাকে। ব্রাউন ব্রেডই ওঁদের পছন্দ, শাদা পাঁউরুটি ওঁরা খান না। চিনিটা পরিহার করতে চান, তার বদলে খান চাকভাঙা মধু। মিষ্টির পাট সামান্যই। আর মাছ মাংস একান্ত পরিমিত। সিদ্ধ কিংবা ঝলসানো। প্রচুরের মধ্যে রকমারি সালাড ও সিদ্ধ আলু কপি গাজর বীন। ডিমেরও আদর খুব। কিন্তু ফলমূলের সমাদরই বেশী। মশলার ব্যবহার নেই।

বিশিষ্ট অতিথি এলে অষ্টাদশ শতাব্দীর ওলড্ চায়না বেরোয়। পোর্সিলিনের উপর নীল রেখাচিত্র। সার অলিভার মিডলটন একদা চীনের উপকূলে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরই সংগ্রহ। হারীত অবাক হয়ে যায় মহাচীনের শিল্পনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করে। শুধু পোর্সিলিনের উপর নয়, ল্যাকারের উপর।

লেডী মিডলটন মূল্যবান বাসনে আহার করলেও সাদাসিধের পক্ষপাতী। হারীতকে একদিন বলেন, 'মিস্টার নিয়োগী, আমরা খাবার জন্যে বাঁচিনে, বাঁচবার জন্যে খাই।'

হারীত তা শুনে পাল্টা দেয়, 'আমিও। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, পুষ্টি বা পূর্তি ছাড়া আরো একটা তত্ত্ব আছে। আস্বাদন। জিব আমাদের দেওয়া হয়েছে কেন যদি জিবকে ডিঙিয়ে যেতে হয়?'

লেডী মিডলটন সদয়ভাবে বলেন, 'জোন, মিস্টার নিয়োগীর জন্যে স্পেশাল দুটো একটা পদ রাঁধতে বলবে মিস জেমসনকে। মিস্টার নিয়োগী, কারী আমাদের পক্ষে রিচ।'

'না, না, আমার জন্যে আলাদা করে রাঁধতে হবে না। দুঃখ পাব। কী খাব, কী পরব, এসব চিন্তা আমার কাছে অগ্রগণ্য নয়, নগণ্য। এসবের বেলা আমি অনাসক্ত। এক টেবিলে বসে একসঙ্গে খাওয়া, এতেই আমার আনন্দ, এর জন্যে আমি আমার আস্বাদনসুখ ত্যাগ করতে রাজী। লেডী মিডলটন, আস্বাদন আমি এমনিতেই কিছু কম পাচ্ছিনে। মিস জেমসন রাঁধেন ভালো।'

মিস জেমসন ভদ্রঘরের প্রৌঢ়া। রান্নার কাজ নিয়েছেন অবস্থার ফেরে। তিনি কেবল রাঁধুনী নন, লেডী মিডলটনের বৃদ্ধবয়সের সহায়। নয়তো জোনের উপর আরো চাপ পড়ত। এক একটা পার্টি দেওয়া তো চারটিখানি কথা নয়।

অভ্যাস হয়ে গেলে ইংরেজদের খানার মতো পুষ্টিকর আর কিছু নয়। জিবকে তালিম দিলে স্বাদও অনুভব করে। সব চেয়ে উপাদেয় পদগুলি হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। অথচ একবার সংস্কারমুক্ত হলে হিন্দুও কি ফুর্তি করে খায় না? হিন্দুকে জানতে না দিলেই হলো কী খাচ্ছে। শুধু ওর দিকে বাড়িয়ে দাও ডিশটা। ও চোখ বুজে তুলে নেবে।

জোন কিন্তু বাড়িয়ে দেন না। হিন্দুকে হিন্দু রাখতে চান। বিকল্প ব্যবস্থা করেন। ও আলাদা খাবে না বলে নিজে ওর সঙ্গ রাখেন।

॥ ষোলো ॥

হারীতও কখনো কখনো জোনকে নিমন্ত্রণ করে রেস্টোরাণ্টে বা কফি হাউসে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়। আর্ট গ্যালারি বা আর্ট এগজিবিশন দেখার পরে। ভিড় তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না ; শব্দ তিনি সহ্য করতে পারেন না। অগত্যা তাঁরই উপরে ছেড়ে দেয় মনোনয়ন। যেখানে বসে নিরিবিলিতে দুটো কথা বলা যায় সেইখানে তিনি থামেন।

'এই যে ছবি দেখে বেড়ানো,' হারীত বলে, 'এটাও কি জ্ঞানমার্গে পর্যটন নয়? জ্ঞানশক্তির পরিশীলন নয়? তা যদি হয় তবে এ পথেও ভগবানকে পাওয়া যায়।'

'হঠাৎ একথা তোমার মনে এল কেন?'

'এল এই জন্যে যে মধ্যযুগের সাধকরা জ্ঞানমার্গের চেয়ে প্রেমমার্গকে বড়ো করতে গিয়ে জ্ঞানশক্তিকে আড়ষ্ট করেছেন। রেনেসাঁস এসে জ্ঞানশক্তিকে মুক্তি দিয়েছে, স্ফূর্তি দিয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়ে আমরা ধাঁধায় পড়েছি। জ্ঞানমার্গ কি আমাদের ভগবানের অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছে, না, ভগবানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে? আমার নিজের মধ্যেও দো'টানা। এক এক সময় মনে হয় আমি ইনটেলেকটের পথ ধরে যতদূরেই যাই না কেন, যতকিছুই পাই না কেন, পরম সত্যের সাক্ষাৎ পাব না। আর তাই যদি আমার কাম্য হয় তবে এসব নিয়ে কী হবে? এই পথটাই বা কোন কাজে লাগবে!'

জোন স্থির হয়ে শোনেন। 'তা হলে তুমি করতে চাও কী? এ পথ ছেড়ে দিয়ে কোন পথ ধরবে? প্রেমমার্গ?'

'আহ্! সেইখানেই তো সঙ্কট। রেনেসাঁসের মানুষের মতো আমি আমার সমস্ত শক্তির বিকাশ চাই। তিন চারটে কলেজে যাই লেকচার শুনতে। দু' তিনটে ছোট বড়ো আদালতে যাই নোট নিতে। উলউইচে গিয়ে সৈন্যদলের ঘোড়ায় চড়ি। এসব আমার জীবিকার শিক্ষানবীশীর অঙ্গ। সেইসঙ্গে জীবনের শিক্ষানবীশীরও। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে গিয়ে বিশেষ অধ্যয়ন করি, ওদের একটা চোরা কুঠরি আছে সেখানে গিয়ে নিষিদ্ধ গ্রন্থ পড়ি। মিউডির সারকুলেটিং লাইব্রেরীতে গিয়ে হালফিল বই ধার করি। ওয়াই এম সি এ'তে গিয়ে সাঁতার কাটি। হাইগেটে গিয়ে টেনিস খেলি। দিনে হোক রাতে হোক থিয়েটার দেখা আমার চাইই। কনসার্ট আমাকে টেনে নিয়ে যায়। আর আর্ট গ্যালারি আমাকে হাতছানি দেয়। কিন্তু একটি রসে আমি বঞ্চিত।' হারীতের কণ্ঠস্বরে খেদ।

জোন শুনতে উৎসুক হন। 'সেটি কোন রস?'

'নৃত্য।' হারীত সলজ্জভাবে বলে, 'নাচতে শিখিনি। শিখেই বা করব কী? কাকে আমন্ত্রণ করব নাচতে? তেমন কেউ নেই। থাকলেও সাহস হয় না।'

জোন গম্ভীর হয়ে বলেন, 'তোমার বয়সে ওটা স্বাভাবিক, কিন্তু আমি ওর থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। সত্যিকারের নৃত্য তো তুমি দেখনি। ইসাডোরা ডানকান তো আর নেই।'

'কেন, পাভলোভার নৃত্য দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।' হারীত সগর্বে বলে।

'ইসাডোরা নাচতেন ক্লাসিক ছাঁদে। গ্রীকদের মতো। রাশিয়ান ব্যালে আমাদের ততখানি অনুপ্রাণিত করে না। আর ইসাডোরার নৃত্য প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া। রাশিয়ান ব্যালে প্রাণপূর্ণ হলেও সভ্যতার ফুল।'

হারীত তো ইসাডোরার নৃত্য দেখেনি, তুলনা করবে কী করে? তার ইউরোপে পদার্পণের অব্যবহিত পরে তিনি মোটরে স্কার্ফ আটকে মারা যান। তাঁর আত্মজীবনীখানা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের চোরা কক্ষে বসে পাঠ করা হয়েছে। জোনকে সেসব কথা বলবার নয়। বিদ্রোহিণী ইসাডোরা জীবনশিল্পী ছিলেন, শুধু নৃত্যশিল্পী না।

'তা তুমি যদি লোকনৃত্য শিখতে চাও তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। মরিস নৃত্য শিখবে? না, শিল্পী মরিসের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। অতি প্রাচীন নৃত্য।'

জোনের এই প্রস্তাবে হারীত রাজী হয়ে যায়। পরে একদিন মরিস নৃত্যে অংশ নেয়। মিলিত নৃত্য, অথচ যুগল নৃত্য নয়। নারী পুরুষ উভয়েই যোগ দেয়, কিন্তু সংস্পর্শ বাঁচিয়ে। মাদকতা নেই বলে তরুণতরুণীরা ভেড়ে না। হারীত যেন একটি ব্যতিক্রম।

জোন সেদিন তার সঙ্গে যান না। বলেন, 'একটা বিশেষ বয়সের পর মানুষ বাঁচে তার কাজের জন্যে। যে কাজ তার জীবনের কাজ। আমারও তেমন কোনো কাজ থাকতে পারে। হয়তো শিল্পের কাজ। নয়তো শান্তির কাজ। জানো তো আমরা কয়েকজন বন্ধুতে মিলে শান্তির কাজে শক্তি ও সময় নিয়োগ করতে কৃতসংকল্প। আমাদের বয়সের যুদ্ধে নিহত যুবকদের স্মৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় যুদ্ধ নিবারণ।'

এককালে যাঁরা সাফ্রাজেট ছিলেন, জানালা দরজা ভেঙেছেন, তারপর যুদ্ধ বাধলে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কর্মে অগ্রণী হয়েছেন এখন তাঁরাই হয়েছেন যুদ্ধবিরোধী ও যুদ্ধনিরোধী। তার জন্যে, যীশুর মতো, শত্রুকেও ভালোবাসতে হয়। এখন এঁরা জার্মানদের ভালোবাসেন। এঁরা বিশ্বাস করেন যে, ভালোবাসার উত্তরে ভালোবাসা পাবেন। জার্মানরাও ইংরেজদের ভালোবাসবে। তাই যদি হলো তবে আর লড়াই করবে কে? প্রেম থেকে আসবে শান্তি। খ্রীস্টপ্রদর্শিত পন্থায়।

কোয়েকার না হলেও কোয়েকারদের সঙ্গেই জোন প্রার্থনায় মিলিত হন। প্রতি রবিবার। শান্তির জন্যে কোয়েকারদের প্রয়াস আজকের নয়। বহু শতাব্দী ধরে ওঁরা যীশুর শিক্ষা হাতে কলমে পালন করে আসছেন। প্রেমমার্গে অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে যুদ্ধকালেও শত্রুকে ভালোবাসো। জনমতের বিপরীত স্রোতে যাওয়া। এতে বিপদ আছে। কারাবরণ তো আছেই, আছে নির্যাতন।

যে যার দেশ জয় করেছে সে তার হৃদয় জয় করবে, হৃদয় জয়ের অসংখ্য উপায় খুঁজে বার করবে, তার জন্যে নিত্য সচেষ্ট হবে, জোন ও তার বান্ধবীদের এই মতবাদ হারীত সমর্থন করে। কিন্তু স্বার্থের বিরোধ যদি থেকে যায় তবে এতে কোনো ফল হবে কি? আর স্বার্থের বিরোধ হলো রাজনীতি অর্থনীতির এলাকার ব্যাপার। জোন সেসব বিষয়ে অজ্ঞ অথবা উদাসীন। তাঁর বান্ধবীরাও তাঁরই মতো। তাঁদের কারো কারো সঙ্গে হারীতের আলাপ হয়েছে। মানবপ্রেমে পরিপূর্ণ হৃদয়, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের ঐতিহাসিক কারণ অনুধাবনে অক্ষম।

ইনটেলেকচুয়ালরা কী করেছেন? না তাঁরা কাল ছেড়ে দিয়ে 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' লিখছেন?

এই প্রসঙ্গে ভার্জিনিয়া উলফের কথা উঠে। লেখিকাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হারীতের প্রিয় লেখিকা। তেমনি প্রিয় ছিলেন ক্যাথরিন ম্যান্সফীল্ড। তাঁর অকালমৃত্যু ওর কাছে দুঃখের।

'ভার্জিনিয়া উলফ? আমার মনে হয় আমি ওঁকে দেখেছি। সুন্দর, ইথিরিয়াল চেহারা। কেমন? তাই না?' জোন মন্তব্য করেন।

'আমি ওঁকে চাক্ষুষ করিনি। তবে আমারও সেইরূপ ধারণা।' হারীত বলে।

জোন জানতে চান সে ডি এইচ লরেন্সের সঙ্গে পরিচিত কি না। এই সেদিন যাঁর আঁকা ছবি নিষিদ্ধ হয়েছে।

'ওই ম্যাজিস্ট্রেটকে আমি চিনি। ওঁর আদালতে বসে নোট লিখেছি। বাহাত্তুরে বদমেজাজী বুড়ো। আর্টের ভালোমন্দ বিচার করার জন্যে ইংলণ্ডে আর লোক পাওয়া গেল না। ওঁর কাছে একটা সিঁদেল চোরও যা একজন প্রতিভাশালী লেখক বা শিল্পীও তাই।'

জোন জানতে চান লরেন্সের বই তার কেমন লাগে।

হারীত বলে, 'সম্প্রতি তিনি একখানা উপন্যাস লিখেছেন, সেখানা পড়তে হলে প্যারিসে যেতে হবে। ভাবছি একদিন গিয়ে পড়ব।'

লরেন্সের পূর্ব জীবনের কথা হারীত অল্পস্বল্প জানত, এবার জোনের মুখে সবিস্তারে শোনে।

জোন বলেন, 'ফ্রীডাকে নিয়ে সেই যে তিনি দেশত্যাগ করেছেন তারপরে আর দেশের মাটি মাড়াননি। তোমারও হয়তো সেই দশা হতো। বইখানা শুনেছি অপাঠ্য।'

'শুনেছি। লরেন্সের মতো লেখক তো শুধু ইংরেজদের জন্যে লিখছেন না, যেমন রুশো লিখতেন না শুধু ফরাসীদের জন্যে। রুশোর মতো ইনিও এক বিপ্লবের প্রবক্তা। সে বিপ্লব হয়তো অর্ধশতাব্দী সময় নেবে পাকতে। তার নাম—' হারীত জোনের মুখের দিকে চেয়ে ইতস্তত করে বলে 'সেক্স রেভোলিউশন।'

জোন ভয় পেয়ে যান। 'কী সর্বনাশ! না, না, হতেই পারে না।'

হারীত এতটা প্রত্যাশা করেনি। সে ক্ষমাপ্রার্থীর মতো বিনীতভাবে বলে, 'কথাটা শুনতে যত ভয়ানক আসলে তত নয়। অরাজকতা নয়, নতুন শৃঙ্খলা। রেনেসাঁসের পর থেকে যতরকম মানবিক ব্যাপার প্রত্যেকটাতে পরিবর্তন বা বিপ্লব এসেছে, এটাই বা কেন বাকী থাকে? আমি তো মনে করি লরেন্স একজন প্রোফেট।'

জোন তা মনে করেন না। 'প্রোফেট যাঁরা হন তাঁরা প্রথম ও শেষ জিনিসগুলো নিয়ে সারাজীবন ব্যাপৃত। লরেন্স কি তেমনি একজন?'

'লরেন্সের কাছে প্রেমই প্রথম ও শেষ জিনিস। আর সেই নিয়ে তিনি ব্যাপৃত।'

'আদি খ্রীস্টানরা ভগবান কথাটির পরিবর্তে প্রেম কথাটির ব্যবহার করতেন। এ কি সেই প্রেম? না তার নামে অন্য জিনিস?' জোন প্রশ্ন করেন।

'ভাব বৈচিত্র্য। ভগবানের যেমন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না প্রেমেরও তেমনি। আমিও তোমাকে পাল্টা প্রশ্ন করব, এ যদি অন্য জিনিস হতো তবে একে একই নামে অভিহিত করা হয়ে আসছে কেন? আজকে নয়, আদিকাল থেকে।'

জোন নিরুত্তর। তা দেখে হারীত আরো বলে, 'শুধু তাই নয়। মিস্টিকদের পরমাত্মার সঙ্গে মিলনকল্পনার প্রতীকও তো প্রেমিক-প্রেমিকার পূর্ণ মিলন।'

জোন ভেবে বলেন, 'খ্রীস্টীয় জগৎ এখনো এই দুই অর্থের জোড় মেলাতে পারেনি। রেনেসাঁস গ্রীক অর্থকে ফিরিয়ে এনেছে, কিন্তু তার ফলে প্রেমের কল্পনা থেকে ভগবানকে বাদ দিতে হয়েছে। এ যেন শুধু নরনারীর একার।'

হারীত চুপটি করে শোনে। জোন বলে যান, 'সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে সেকালের সব বিধিনিষেধ উঠে যাচ্ছে। আরো যাবে। কিন্তু নতুন যুগের প্রোফেটরা কী করে জোড় মেলাবেন? না তাঁদের প্রেমের কল্পনা থেকে ভগবানকে বাদ দেবেন? বিশুদ্ধ মানবিকবাদ এসে খ্রীস্টীয় প্রেমবাদকে বনবাসে পাঠাবে? আর তাই যদি হয় তবে আমরা শত্রুকেও ভালোবাসব কিসের প্রেরণায়? দেশে দেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে শান্তি আসবে কিসের সাধনায়?'

ভাববার কথা বইকি। হারীত বলে, 'আছে উত্তর। এই মুহূর্তে দিতে পারছিনে।

হয়তো সারাজীবনেও দিতে পারব না। আমি যদি না দিই আর কেউ দেবেন।'

'এদিকে ভগবানকে বাদ দিতে গিয়ে যা হয়েছে তার জন্যে রেনেসাঁস কম দায়ী নয়। প্রেম চলে যাচ্ছে মানুষের জীবন থেকে। সেই জন্যে এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, এমন ভয়াবহ বিপ্লব। এই হিংস্র প্রাণীকে নিত্য খোরাক জোগাবে কে? কোন নারী? কোন পুরুষ?'

হারীত নিরুত্তর থাকে। কিন্তু তার মন বলে যে, আছে। আছে উত্তর।

॥ সতেরো ॥

পার্বতীর কথা হারীতের মনের এক কোণে ছিল। কিন্তু যোগাযোগের তেমন সুবিধা ছিল না। বাসায় টেলিফোন নেই।

বাংলা নাটকের অভিনয়ের দিন পার্বতীর সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ। সে ছিল অভিনয়ের দলে নয়, গানের দলে। আর হারীত ছিল প্রথম সারির দর্শকদের একজন। অভিনয় সারা হলে হারীত গিয়ে পার্বতীকে নমস্কার করে। হল থেকে গল্প করতে করতে দু'জনে বেরোয়।

'আমি তো ধরে নিয়েছিলুম যে যাবার আগে তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। ভালোই হলো যে দেখা হলো, হারীত।' পার্বতী তাকে এই প্রথম 'তুমি' বলে। উৎফুল্ল হয়ে।

'ব্যাপার কী, পার্বতী? কোথায় যাচ্ছ তুমি?' হারীত চমকে ওঠে।

'শ্বশুরবাড়ী নয়। বাপের বাড়ী।' সে ফিক করে হেসে বলে, 'সেখান থেকে শ্বশুর-বাড়ীও যেতে পারি, যদি মা-বাবা এ বিয়েতে মত দেন। না দিলে সেই সনাতন কর্মস্থল। ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী স্কুল। যেখানে তোমার সঙ্গে একদিন না একদিন দেখা হবে, যখন তুমি রাজকর্মচারী হয়ে শুভাগমন করবে পুরস্কারবিতরণী সভায়।'

তখনো রাত হয়নি। হারীত বলে, 'তা হলে চল কোথাও গিয়ে সেলিব্রেট করা যাক। তোমারি আমাকে খাইয়ে দেওয়া উচিত, কিন্তু আমিই এবারকার হোস্ট। না, না, আপত্তি শুনব না। আমি যে কত খুশি হয়েছি তা কী করে প্রকাশ করব।'

'হবেই তো। ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেই বাঁচো।' পার্বতী খোঁচা দেয়।

'তোমার পরীক্ষার কী হলো? তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ ভেবে তোমাকে আমি বিরক্ত করিনি।' কথাটা মিথ্যেও নয়, সত্যও নয়।

'কোনো রকমে মুখরক্ষা হয়েছে। দেশে ফিরে গিয়ে কালো মুখ দেখাতে পারব মনে করে আনন্দ হচ্ছে। তোমার চাঁদমুখ দেখে নয়। কই, অভিনন্দন জানালে না যে?'

'আন্তরিক ও অজস্র অভিনন্দন। কিন্তু ওই যে বললে চলে যাচ্ছ তার জন্য আমি বিমর্ষ। যদিও দেখাসাক্ষাৎ হতো না, তবুও তো তুমি ছিলে এদেশে।'

'তুমি যে কিছুমাত্র বিরহ বোধ করবে তা তোমার মুখ দেখে বিশ্বাস হয় না। ও মুখের কোনোখানেই আমার নাম লেখা নেই। আছে অন্যজনের।'

হারীত আরক্ত হয়। ইতিমধ্যে ওরা একটা ইটালিয়ান রেস্টোরেন্টে সমাসীন হয়েছিল। জানতে চায় পার্বণী কী খাবে।

'শ্যাম্পেন। কাভিয়ার। মক টার্টল স্যুপ। স্যামন। স্টেক—' পার্বণী একে একে ফর্দ দিয়ে যায় আর ওয়েটার টুকে নিতে থাকে।

ওদিকে হারীতের মুখখানা লোহিত। বাপ রে, কী উড়নচণ্ডী মেয়ে! পকেট খালি করেও বিল মেটাতে পারা যাবে না। তার উপর অন্তত দুটি আইটেম তো নিষিদ্ধ মাংসের।

পার্বণী আর হাসি চাপতে পারে না। খিল খিল করে হাসে। তারপর ওয়েটারের দিকে চেয়ে বুঝিয়ে বলে, 'আমরা কেউ এসব খাইনে। আমরা হিন্দু। আমি একটু কৌতুক করছিলুম। তবে স্যামনটা চলবে। হারীত, তুমিই অর্ডার দাও না, ভাই।'

'ভাই' শুনে হারীত খুব যে খুশি হয় তা নয়। কিন্তু ওই ফর্দটি যে বাতিল হলো এতে তার রক্তের চাপ নেমে স্বাভাবিক হয়। সে আর দ্বিরুক্তি না করে মেনু দেখে কয়েকটা পদ ফরমাস করে, যাতে কেবল রসনা'র নয় পকেটেরও সায় আছে।

এরপর পার্বণী তাকে ওর মনের কথা শোনায়। এক ব্যারিস্টার ওকে বিয়ে করতে চেয়েছেন।

'হঠাৎ এমন একটা অফার আমি প্রত্যাশা করিনি, হারীত। এ যেন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি। কিন্তু পৃথিবীতে নির্ভেজাল সুখ কোথায়। গোলাপ থাকলেই তার সঙ্গে কাঁটাও থাকবে। তা হলে কী করতে বল? কাঁটার ভয়ে প্রত্যাখ্যান করব?'

'কেন, কাঁটা কিসের?' হারীত নিঃশ্বাস রোধ করে শুধায়।

'অনেকদিন থেকেই ওঁর ইচ্ছে। কিন্তু এতদিন প্রস্তাব করেননি এইজন্যে যে ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছিল। এখন উনি মুক্ত। আইনে বাধবে না। কিন্তু সমাজে বাধতে পারে। আমার মা বাবা সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না। জানি তো ওঁদের মনোভাব। ভরসা হচ্ছে না যে সমর্থন পাব।'

'সুজাতাদি থাকলে ওঁর কাছে পরামর্শ চাওয়া যেত। কিংবা মামাদির কাছে।' হারীত তাঁদের অভাব বোধ করে।

'ওঁরাও কম গোঁড়া নন। দোজবরে ওঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু ডিভোর্স ওঁরা ভালো চোখে দেখেন না। যদিও বেচারার কোনো দোষ নেই। কেবল শিভালরির খাতিরে

দোষটা গায়ে পেতে নিতে হয়েছে।'

'হুঁ!' হারীত সন্দিগ্ধ স্বরে বলে। 'পুরুষের রচা উপন্যাস।'

'ওঃ! তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না!' পার্বণী কঠোর কণ্ঠে বলে, 'ইংলণ্ডে এ রকম হামেশা হয়। শিভালরির খাতিরে পুরুষই দোষ স্বীকার করে। যদিও দোষ তার নয়। এতে অবশ্য তারও লাভ। সেও তার স্বাধীনতা ফিরে পায়। নতুন করে আরম্ভ করতে পারে।'

হারীত ভেবে চিন্তে পরামর্শ দেয় যে বিয়েটা রাতারাতি রেজিস্ট্রি করে সেরে ফেলাই শ্রেয়। মা বাবা পরে জানতে পেরে রাগ করতে পারেন, কিন্তু বন্ধ করতে পারবেন না। হারীতও সাক্ষী হতে রাজী আছে, যদি দেশে ফেরার আগে পার্বণী বিয়ে করে যায়।

'ছি, ছি! সে কি আমি পারি। মা বাবাকে না বলে জীবনে একটি কাজও করিনি। তাঁদের আশীর্বাদই আমার পাথেয়। ব্যারিস্টার শুনে তাঁরা মুগ্ধ হবেন না। কেরানী শুনলেও তাঁরা ক্ষুব্ধ হতেন না। কিন্তু চরিত্র তাঁদের কাছে প্রথম ও শেষ কথা। তাঁরা কেমন করে বিশ্বাস করবেন যে উনি এত বড়ো অপবাদ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছেন শিভালরির খাতিরে?' পার্বণী ঠোঁট উলটিয়ে বলে।

'শিভালরির খাতিরে অত বড়ো অপবাদ আমি হলে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতুম না, পার্বণী। উনি দেখছি একজন 'ফুল অফ লাভ।' প্রেমের জন্যে কলঙ্কভাগী।' হারীত উচ্ছ্বসিত হয়।

'না, না', তুমি ভুল বুঝেছ। প্রেম বলে কারো হৃদয়ে কিছু অবশিষ্ট ছিল না। বিবাহবিচ্ছেদটা চেয়েছিলেন ওঁর স্ত্রী। যাতে অন্য একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়। ওঁদেরি এক বন্ধু। আইনটা এমন যে হয় স্ত্রীকে দোষী সাজতে হয়, নয় স্বামীকে। তিনজন মানুষ অসুখী হওয়ার চেয়ে একজন অসুখী হওয়া ভালো। এই কথা ভেবে উনিই দোষী সাজেন। একটি কল্পিত স্ত্রীলোকের নাম দেওয়া হয়।'

হারীত দুঃখিত হয়ে ভাবে পার্বণী যদি ওঁকে বিয়ে করে তবে ত্যাজ্যকন্যা হবে। না করলে ওল্ড মেড। উভয় সঙ্কট।

'কী ভাবছ, হারীত? কোনো উপায় আছে?

'উপায় যেটা বলেছি সেটাই একমাত্র। তুমি সাবালিকা হয়েছ। যা ভালো বুঝবে তাই করবে। মা বাবাকে জানিয়ে-শুনিয়ে করতে পারো, কিন্তু তাঁদের অমত দেখলে পেছিয়ে যেয়ো না। তোমার জীবনে দ্বিতীয় সুযোগ নাও আসতে পারে।'

'তাঁদের অমতে বিয়ে করব এতখানি বুকের পাটা আমার নেই, হারীত। কাজেই ধরে নাও যে এ বিয়ে হবে না। অকারণে সেলিব্রেট করা গেল।' পার্বণী নিষ্প্রাণভাবে বলে।

'অকারণে' কেন বলছ? পরীক্ষায় পাশ করেছ সেটাও তো উৎসবের যোগ্য। তাছাড়া আবার কবে আমাদের দেখা হবে, আদৌ হবে কি না কে জানে। মনে রাখার মতো একটি মনোরম সন্ধ্যা একসঙ্গে কাটানো গেল।'

'তারপর তোমার নিজের খবর কী?' পার্বণী প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে।

'খবর বলতে যদি হৃদয়ের খবর বোঝায় তবে নতুন কিছু ঘটেছে বইকি। নামধাম বলতে পারব না, শুধু এইটুকু বলব যে এটি একটি সুন্দর বন্ধুতা।' হারীত ভাবাকুল হয়।

'ওঃ তাই নাকি!' পার্বণী ম্লান মুখে বলে, 'বন্ধুতা! সুন্দর বন্ধুতা। বেশ, আমাদের শুনেই সুখ! আমার শুভকামনা জেনো। আর জানিয়ো। হয়তো তাঁর সঙ্গেও দেশে একদিন দেখা হবে। যদি তিনি আসেন।'

হারীত হাসে। 'আর যদি না আসেন?'

'তা হলে দেখা হবে কী করে? আমি যে আগামী সপ্তাহেই জাহাজ ধরছি। তা ছাড়া কী দরকার! তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে আনন্দ কর। আমি আমার নিরানন্দ নিয়ে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরি।' পার্বণী একটু হেসে বলে, 'কিন্তু—'

'কিন্তু কী?' হারীতের কৌতূহল জাগে।

'সেই জাহাজেই দেশে ফিরছেন মনসবদার। —লণ্ডনে এসেছিলেন প্রিভি কাউন্সিলের একটা মামলায়।'

'কার কথা বলছ? ওঃ বুঝেছি।' হারীত প্রীত হয়ে বলে, 'জাহাজের দিনগুলি নিঃসঙ্গে কাটবে না। আট ন' মাস পরে আমি যখন দেশে ফিরব তখন দেখব মিস্টার ও মিসেস মনসবদার মনের সুখে ঘর করছেন।'

'আর মিস্টার ও মিসেস নিয়োগী?' পার্বণী কৌতুক করে।

'সেদিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো, পার্বণী। মিসেস নিয়োগীর সন্ধান এখনো কেউ পায়নি। আমার চাকরি অনিশ্চিত, আমার বিয়ে অনিশ্চিত, আমার সবকিছুই অনিশ্চিত। নিশ্চিত শুধু এই যে মুক্ত হয়েও আমি অসুখী। কোথায় পাব সেই বিশল্য-করণী যাতে আমার অ-সুখ সারবে!' হারীতের মুখ বিষাদে ছেয়ে যায়।

পার্বণী তাকে আশ্বাস দেয়। 'একদিন না একদিন পাবেই। না পেলে আশ্চর্য হব। খুঁজলেই মিলবে তা নয়। দৈবাৎ মিলতে পারে। কিন্তু তখন যেন তুমি ক্ষ্যাপার মতো আনমনে পরশপাথর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ো না। এরই মধ্যে দিয়েছ কি না কে জানে।'

প্রতিধ্বনি ওঠে, 'কে জানে।'

আবো বলে পার্বণী, 'মনে রেখো মানুষ মানুষকে সুখী করতে পারে না, সুখী করতে পারে প্রেম। প্রেমই মানুষের রূপ ধরে আসে। তাকে কখনো চেনা যায়, কখনো চেনা যায় না। সাড়া না পেলে সে ফিরে যেতেও পারে। তবে যাবার আগে সে কিছু দিয়ে

যায়। কোনো প্রেমই ব্যর্থ নয়।'

হারীত অভিভূত হয়ে শোনে। মনে মনে প্রণাম করে প্রেমদেবতাকে। যিনি মানুষের রূপ ধরে লীলা করেন। সুখ দেন, দুঃখ দেন। একটা কিছু দিয়ে যান। নিঃশর্তে দান।

অনেকক্ষণ মৌন থাকে দু'জনে চোখে চোখ রেখে। চোখের ভাষায় চিরজীবনের মতো বিদায় নেয়। তারপর হেসে উঠে বলে, 'বেশ সেলিব্রেট করা গেল কিন্তু!'

॥ আঠারো ॥

জোনের দ্বিতীয় নাম যে হ্যারিয়েট এ কি হারীত জানত? নামে নামে কত মিল।

'হ্যারিয়েট,' দুই হাত ধরে সাদরে অভ্যর্থনা করেন তাঁর প্রাচীন বন্ধু এডউইন অ্যাশলী।

'হ্যারিয়েট, কতকাল পরে দেখা।'

'এক যুগ পরে!' জোন স্মরণ করে বলেন, 'শেষের বার দেখা হয় যুদ্ধবিরতির আনন্দ উৎসবের সময়।'

'হাঁ, মনে আছে। সেই তুমি আর সেই আমি, মাঝখানে কালের প্রাচীর। তবু যে এতদিন বাদে মনে পড়ল আমাকে এতেই আমি খুশি।'

'তুমি তো শহরে আসবে না। অগত্যা মহম্মদকেই পর্বতের সমীপে আসতে হয়। আমার নিজের বলতে একটি উট নেই। এই মরুভূমি পার হতে আমাদের কম বেগ পেতে হয়নি, আমাকে আর আমার ভারতীয় বন্ধুকে।'

হারীতকেও তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানান। বলেন, 'এখন বুঝতে পারছি কার কাছে আমি ঋণী। আমার পুরাতন বন্ধু হ্যারিয়েটকে দেখছি আপনিই মরুপ্রান্তর পার করে নিয়ে এসেছেন। ধন্যবাদ, মিস্টার নিয়োগী।'

'মরুপ্রান্তর কেন বলছেন, মিস্টার অ্যাশলী! শহর থেকে বেরিয়ে ঘন সবুজ উপবনে আমি তো নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচছি।'

মিস্টার অ্যাশলী তাঁর কটেজে একাই থাকেন। তাকে সাহায্য করে একটি বুড়ী। অতিথিদের অগ্নিস্থলীর পাশে বসিয়ে ফলের রসের মদিরা দিয়ে আপ্যায়িত করেন। আর কোনো মদ তাঁরা খাবেন না।

'ওহ্, লণ্ডনের সেই ধু ধু মরুপ্রান্তর দিন দিন এগিয়ে আসছে আমার গ্রামের দিকে

বাহু বাড়িয়ে। এটাও একদিন একটা শহরতলী হবে, মিস্টার নিয়োগী। ইতিমধ্যেই বাংলো উঠছে এলোমেলো ভাবে। চারদিক থেকে আমাকে চেপে ধরবে, আমার শ্বাস রোধ করবে এই ক্রমবর্ধমান বন্ধ্যাত্ব। যার পোশাকী নাম সভ্যতা।'

এই নিঃসঙ্গ শিল্পী বোধহয় রাজা ক্যানিউটের মতো সমুদ্রকে পিছু হটতে বলে ব্যর্থ হয়েছেন। সমুদ্র ছুটে আসছে। অথচ পলায়নের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

'ইচ্ছে করলে আপনি আরো উত্তরে যেতে পারতেন, মিস্টার অ্যাশলী।'

'উত্তরে গেলে দেখতুম সেদিকেও এক মরুভূমি। সেও তেমনি বিস্তার চাইছে। পূবে পশ্চিমে যেদিকেই যাই সেদিকেই মরুপ্রান্তর। সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই আমার। এসব ওয়েসিস ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে আসছে মিস্টার নিয়োগী।'

হারীত জোনের দিকে তাকায়। তিনি হাসেন। 'এডউইন, এখনো তুমি এই নিয়ে কাতর। ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল এদিক থেকে একটা তেমাথা। মানুষ ইচ্ছে করলে সিদ্ধান্ত নিতে পারত সে কৃষি ও কারুশিল্প অবলম্বন করে পল্লীভিত্তিক সভ্যতায় স্থিতিশীল হবে। মানুষ তার বদলে অন্য রাস্তা ধরেছে। এখন আর ফিরে যাবার কথা ওঠে না। তবে ভারত প্রভৃতি দেশ এখনো মনঃস্থির করতে পারেনি, সে স্বাধীনতা তাদের নেই। সেইজন্যে মনে হচ্ছে এ রাস্তা সব মানুষের নয়।'

'সব মানুষের হলে পৃথিবীটাই হবে সাহারা মরুভূমি। সেখানে কে কী ফোটাবে কে কী ফলাবে। সৃষ্টির নামে অনাসৃষ্টি চলবে, যতদিন না মানুষের প্রতিভা তার উপযুক্ত আবেষ্টন পায়।' এডউইন তাঁর নিজের হাতে তৈরি পাইপ ধরান।

'বুঝি সব কিন্তু জীবনটা এত দীর্ঘ নয় যে এই নিয়ে গুমরে মরি। মনে রাখতে হবে যে আমরা মুষ্টিমেয় একটি মাইনরিটি। অধিকাংশকে প্রভাবিত করা আমাদের সাধ্যাতীত। আত্মরক্ষা ছাড়া আমাদের আর কোনো ধর্ম নেই। আমরাও যেন অধিকাংশের দ্বারা প্রভাবিত না হই।' জোন আত্মস্থ হয়ে বলেন।

হারীত ওটাকে আরো বিশদ করে। 'আমরা আমাদের পদতলভূমি থেকে বিচ্যুত হব না। কেউ যেন আমাদের বিচ্যুত করতে না পারে।'

'তা না হয় হলো। কিন্তু আবেষ্টনের কী হবে? এই আবেষ্টনে কী বা গজাবে? আগাছা আর পরগাছা?' এডউইন আক্ষেপ করেন।

'আমরা উঠোনের দোষ ধরব না। আমরা নাচতে জানি।' হারীত উত্তর দেয়। 'ওটা একটা বাংলা প্রবাদ।'

রেলপথে জেরার্ডস ক্রস। বাকীটা পদব্রজে। আসবার পথে জোন হারীতকে এডউইনের উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন। অল্প কথায়।

বাজার চলতি ছবি আঁকতে আঁকতে এডউইন বিদ্রোহী হন। বলেন, এ তো

ব্যবসাদারি ! এক হাতে অভাব বাড়িয়ে যাওয়া আর সেই বর্ধিত অভাব মেটাতে গিয়ে অন্য হাতে তুলি তুলে ধরা। ফাঁকতালে বা প্রতিভার গুণে দু'চারখানা ছবি উতরে যেতে পারে, কিন্তু সমগ্র জীবনের তুলনায় তার কতটুকু মূল্য ! কাঞ্চনমূল্যই কি সব !

এর পরে তিনি বাজার থেকেই সরে দাঁড়ান। লণ্ডন থেকে বিদায় নেন। যদিও লণ্ডনেই তাঁর নিবাস। বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। পারিবারিক মহলে কেউ কোনো-দিন ছবি আঁকেনি, ওটা ওঁদের মতে পাগলামি। তবু ওর থেকে দুটো পয়সা আসছিল বলে ওঁরা সহ্য করেছিলেন। কিন্তু তাও যখন গেল তখন ওঁরা হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, নির্বোধ !

অভাবকে যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনাই হয় তাঁর প্রথম কাজ। গ্রামে গিয়ে কটেজ কেনেন। নিজের হাতেই মেরামত করেন, সাজান গোছান। খাপ খাইয়ে নিতে কয়েক বছর লাগে। ছবি আঁকা অবশ্য বন্ধ থাকে না। ব্যবসাদারি নয়। আত্মতৃপ্তি। সমঝদারদের চোখে তারও একটা দাম আছে। একজন মানুষের পক্ষে যথেষ্ট আয়, যদি ব্যয়ের উপর কড়া শাসন থাকে।

ওদিকে তিনি বারো বছর ধরে কোর্টশিপ করছিলেন। সেও এক বিচিত্র ব্যাপার। পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত না হয়ে তিনি বিয়ের মন্ত্র পড়বেন না। আর প্রস্তুতি কেবল আর্থিক প্রস্তুতি নয়। তার চেয়ে বড়ো কথা আত্মিক, মানসিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক না বললেও চলে, কায়িক। সন্তানকামনা তাঁদের দু'জনেরই ছিল।

যে নারী বারো বছর অপেক্ষা করতে পারে সে নারীও সামান্য নারী নয়। এডউইনের বাগ্‌দত্তা গুণবতী মহিলা। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। শিল্পের উপর অনুরাগ থেকে শিল্পীর উপর অনুরাগ। কিন্তু নিজে শিল্পী নন ও শিল্পীর সমস্যা বোঝেন না। এডউইন যে কেন বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে আপনাকে আপনি একঘরে করলেন সেটা তার কাছে দুর্বোধ্য। তারপর গ্রামে চলে গিয়ে নির্জনবাস ওটা একটা খেয়াল ছাড়া আর কী। ওরকম একটি কটেজে মাঝে মাঝে উইকেণ্ড কাটানো যায়, কিন্তু বারো মাস বাস করা পামেলার অসবর্ণের অসাধ্য।

এনগেজমেণ্ট ভেঙে যায়। এরপরে এডউইন এক গ্রামবাসিনীকে বিয়ে করে কটেজে নিয়ে আসেন। প্রেমে পড়ে বিয়ে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত কোর্টশিপ। মেয়েটি সমান ঘরের নয়, শিল্পেরও বিন্দুবিসর্গ বোঝে না। বয়সেও অনেক ছোট। ও যাদের সঙ্গ ভালোবাসে এডউইন তাদের সঙ্গে মিশতে জানেন না। ওকে ছুটি দিলে ও ছুটে বেরিয়ে যায়, ফেরার সময় মনে হয় পা চলছে না। ওদিকে এডউইনের ত্বরা সেই সন্তানের জনক হতে। মেরীরও যে ত্বরা ছিল তা নয়। কিন্তু এড়ানোর জন্যে কী করা উচিত তা নিয়ে মতভেদ ছিল। আবার সেই রাসকিন এফি দ্বন্দ্ব। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। মেরীর গৃহত্যাগ ও

এডউইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে বিবাহের কনসামেশন হয়নি, হবেও না, কারণ— ।

বেচারার মাথা কাটা যায়। গ্রাম অঞ্চলের লোক তো ভিতরের কথা বুঝবে না। তাদের চোখে লোকটা পুরুষত্বহীন। আর কোনো মেয়ে তাঁকে বিয়ে করবে না। একটু একটু করে তাঁর ধারণা জন্মায় যে বিয়ে জিনিসটার দেয়াল আর থাম আর ছাদ যাই হোক না কেন, অদৃশ্য বুনিয়াদ হচ্ছে এই। এর জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, যদি শিল্প থেকে বিত্তবান হতেন ও সন্তানের দায় বহন করতে পারতেন। তাঁর সে প্রস্তুতি কোনো কর্মেই লাগে না, যখন তিনি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কুটিরে আশ্রয় নেন। এখন আর পিছু হটার জো নেই। সমস্ত মন দিয়ে নিজস্ব ধ্যান দিয়ে ছবি আঁকতে হবে। আর সব অবান্তর। কুটিরের বাইরে বড়ো একটা বেরোন না। কুকুর ছাড়া আর কোনো সঙ্গী নেই। একটি বুড়ী দেখাশুনা করে। তবে তাঁর বরাত ভালো যে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ভোলেননি। উইকেণ্ডে প্রায়ই অতিথি আসেন, আর তাঁরা সবাই যে পুরুষ তা নয়। এমন মহিলাও আছেন যিনি তাঁকে উদ্ধার করতে ইচ্ছুক, কিন্তু অলিখিত শর্ত হচ্ছে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে ব্যবসাদারি করতে হবে। এডউইন তাঁর বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচা রাখতে চান, এর জন্যে যা যা ত্যাগ করতে হবে তা তিনি করবেন।

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে জোন বলেন, 'হারীতও একজন শিল্পী। তার সমস্যাগুলোও কতকটা তোমারই মতো। সেও প্রেমে পড়ে অসুখী হয়েছে।'

এডউইন তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঝাঁকানি দেন। 'অভিনন্দন। কে বলে পৃথিবীতে অবশিষ্ট একমাত্র ফুল। কিন্তু, মাই ডিয়ার চ্যাপ, তুমি আমার অনুসরণ করতে যেয়ো না। বিয়ে যদি করবেই তো সংসারী মানুষের মতো সব দিক ভেবে চিন্তে করবে প্রেমিকদের মতো দিশাহারা হয়ে করবে না।'

হারীত শেক্সপীয়ার থেকে আওড়ায়। পাগল আর প্রেমিক আর কবি সবটাই কল্পনা দিয়ে গড়া।

'সে তো হলো পুরুষপক্ষের কথা। নারীপক্ষের কথা হচ্ছে ওরকম পুরুষকে বিয়ে করা চলে না। প্রেম যদি বিয়ের জন্যেই হয়ে থাকে তবে নারীপক্ষের কথা অযৌক্তিক নয়। নারীর সঙ্গে বনিবনা করতে চাও তো আমার অভিজ্ঞতা থেকে শেখ।'

হারীত ঘাড় নেড়ে বলে, 'আমার আপন অভিজ্ঞতাই আমার শিক্ষক। আর কারো অভিজ্ঞতা নয়। আমি বার বার বোকা বনতে রাজী।'

এডউইন তাকে শুভকামনা জানিয়ে বলেন, 'মাই ফ্রেণ্ড, আমার চেয়ে তুমি ভাগ্যবান হতে পারো। সমস্ত জীবন তোমার সামনে পড়ে রয়েছে।'

এডউইনের আঁকা ছবি চারদিকে সাজানো বা ছড়ানো। তাঁর সঙ্গে তাঁর তত্ত্ব, রীতি ও বিষয় নিয়ে আলোচনা করে হারীত বিশেষ উপকৃত হয়। এরপরে তিনি ওদের গ্রাম

ঘুরিয়ে দেখান। হারীত লক্ষ করে যে, গ্রামের পুরুষরা তাঁকে টুপী তুলে অভিবাদন জানায়। আর মেয়েরাও সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ করে।

জোনের সঙ্গে আড়ালে এক বৃদ্ধার আলাপ। বৃদ্ধা বলেন, 'উনি একজন সেণ্ট।'

'আপনি ওকথা বললেন শুনে আমি খুশি হলুম, ম্যাডাম।' জোন সহাস্যে বলেন।

ফেরবার পথে হারীত মৌন থাকে। সে যেন এডউইনের অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন করে ভেবে দেখছে। জোনের প্রশ্নের উত্তরে বলে, 'নারীকে আমি ছেড়েছি। নারীও আমাকে ছাড়তে পারে। এমন সম্ভাবনা থাকতে কারই বা বিয়ে করতে রুচি হবে! বৌ যদি ছেড়ে যায় ও অমন একটা অপবাদ রটায় তা হলে আমি মুখ দেখাব কী করে?'

'তা বলে তুমি বিয়ে করবে না?' জোন হাসেন। 'এডউইনটা পাগল। তুমি তা নও।'

॥ উনিশ ॥

বেশ কিছুদিন চিন্তাকুল থাকার পর হারীত উপলব্ধি করে যে, এডউইন পাগল নন। যে দেবীর তিনি উপাসক সেই দেবীই ঈর্ষাপরায়ণা। শিল্পের দেবতাই প্রথমবার তাঁকে বিয়ে করতে দেন না, দ্বিতীয়বার তাঁর বিয়ে ভেঙে দেন।

দৃশ্যত মনে হয় বারো বছর তপস্যার পর পামেলাকে হতাশ করেন যিনি তিনি এডউইন। কিন্তু প্রকৃত সত্য তা নয়। আর্ট অসপত্ন হতে চায় বলেই অমন অঘটন ঘটে। তেমনি বাইরে থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মেরীকে দাম্পত্য সুখ থেকে বঞ্চিত করেন যিনি তিনি তাঁর স্বামী। কিন্তু প্রকৃত সত্য অত সরল নয়। আর্টই নিষ্কণ্টক হতে চায় বলে ওরকম কলঙ্ক রটে।

আসলে উনি একজন 'ফুল অফ আর্ট'। জোন যে বলেছিলেন 'ফুল অফ লাভ' সেটা বিশ্লেষণে টেকে না। প্রেম নয়, আর্টই তাঁর এ হাল করেছে।

তা হলে হারীতের কপালে কী আছে? সেও কি আর্টের জন্যে এমনি অসুখী হবে? সেই ঈর্ষাপরায়ণা দেবী কি তাকেও নিজের জন্যে রাখবেন, আর কারো জন্যে ছেড়ে দেবেন না? নারীর ঈর্ষার মতো দেবীর ঈর্ষাও সপত্নীকাতর?

তার উস্কোখুস্কো চুল লক্ষ করে জোন কোথা থেকে একটা ব্রাশ এনে যত্ন করে আঁচড়ে দেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে তার সিঁথি ভেঙে দেন। আয়নায় নিজের মুখ দেখে সে তো অবাক। আলের উপরে যেন মই চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'সিঁথি তোমায় মানায় না, হারীত। ওর চেয়ে ব্যাকব্রাশই ভালো মানায়। দেখ দেখি কেমন চমৎকার দেখাচ্ছে।' জোন স্বয়ং ব্যাকব্রাশ করেন বলে সেই তাঁর পছন্দ। তাতে একটা পুরুষালি ভাব ফোটে।

দু'জনের মধ্যে আরো একটা মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। হারীত এটা শিরোধার্য করে।

কেশসংস্কারের পর সে আবার সেই তর্কে ফিরে যায়। 'কথা হচ্ছে কার কাছে কোনটা মুখ্য, কোনটা গৌণ। কারো কাছে আর্টই মুখ্য, কারো কাছে প্রেম। এডউইনের কাছে আর্ট। আমার কাছে প্রেম। আমি যদি 'ফুল' হই তো প্রেমের জন্যেই হব, আর্টের জন্যে নয়। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আর্টকে আমি কম ভালোবাসি। ভালোবাসি খুবই, কিন্তু অমন ঈর্ষাপরায়ণা দেবীর খাতিরে আমি প্রেমের অমর্যাদা করব না।'

জোন ক্ষণকাল নীরব থেকে বলেন, 'প্রেমের অমর্যাদা কি এডউইনও করেছেন? আমি তো ওঁকে চিনি। এটা একটা সত্যিকার বিরোধ। সুতরাং সত্যিকার ট্র্যাজেডি। তুমিও যদি তোমার জীবিকা ত্যাগ করে অরণ্যবাস কর তোমার জীবনেও বিরোধ আসবে, ট্র্যাজেডী আসবে। তোমার শেষ অবলম্বন তো চাষানী। তা হলে তোমাকেও লাঙল ধরতে হবে।'

হারীতই একদিন তাঁকে ওকথা বলেছিল। তাঁর মনে ছিল কথাটা।

ইনটেলেকচুয়ালকে প্রাণশক্তি জোগাতে পারে, পরিপূরকতা দিতে পারে মাটির মেয়ে। কিন্তু মাটির মেয়েকে আদিম সুখ দেবে কে? ইনটেলেকচুয়াল? হারীত ভয়ে সেকথা ভাবতে চায় না। নিরুত্তর থাকে।

জোন তাঁর বন্ধুর প্রসঙ্গে বলে যান, 'বিদ্রোহী না হলে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতও হতেন, বিয়েও করতেন, সুখীও হতেন, কেউ তখন বলত না যে তিনি পাগল। সব তছনছ হয়ে যায় ম্যামন আর্টের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে।'

হারীতের মনে পড়ে আপটন সিনক্লেয়ারের 'ম্যামন আর্ট'। তেমন আর্টের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াতে পারে সেই তো পুরুষ। অথচ অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে তারই নামে রটনা সে নাকি পুরুষত্বহীন।

'তারপর, হারীত, ফুল হওয়াটা সব ক্ষেত্রে লজ্জার কথা নয়। তা যদি হতো মিস্টিকদের বলা হতো না 'ফুলস অফ গড'। সেণ্টরাও কি তাই নন? তার থেকে বোঝা যায় কে কিসের জন্যে বা কার জন্যে সর্বস্ব সমর্পণ করেছে। আর্টের জন্যে, না প্রেমের জন্যে, না ভগবানের জন্যে। আমার বন্ধু এডউইন কাকে সবচেয়ে বড়ো বলে জেনেছেন ও কার জন্যে সবচেয়ে বেশী দান করেছেন? আমার তো মনে হয় প্রেমের জন্যেই। কিন্তু তুমি যদি বল আর্টের জন্যে সেটাও ভুল হবে না। আর ভগবানের জন্যে নয়ই বা কেন? ভগবান কি প্রেমের বাইরে বা রূপের বাইরে কোথাও আছেন? এডউইনের মতো কে

তাঁকে এমন ভালোবেসেছে? সেই বৃদ্ধা যথার্থই চিনেছেন, উনি একজন সেণ্ট।' জোন জোর দিয়ে বলেন।

হারীতও স্বীকার করে যে রসের সাধনায় বা রূপের সাধনায় ভগবানকে পাওয়া যায় ও সন্ত হওয়া যায়। 'হাঁ, উনি একজন সেণ্ট।'

হারীতের চিন্তা কোন খাতে বইছে তার নিশানা পাওয়া যায় অন্য একদিন। সে বলে, 'আমি আমার শর্তে লিখব। ম্যামনের শর্তে না। ম্যামন আর্ট আমার হাত দিয়ে হবে না। তেমনি, যদি নিজের শর্তে বিয়ে করতে পারি তা হলেই করব। নইলে নয়।'

জোন তো শুনে বলেন, 'লেখার বেলা তুমি যা খুশি করতে পারো, পাঠকরা না-হয় পড়া বন্ধ করে দেবে। কিন্তু বিয়ের বেলা তোমার একার খুশিই যথেষ্ট নয়, হারীত। অপরপক্ষের খুশিকেও সমান মূল্য দিতে হবে। লেখার বেলা তুমি নিরঙ্কুশ. কিন্তু বিয়ের বেলা নিরঙ্কুশ নও। তার দরুন যদি তুমি বিয়েই না কর তবে সেটাও বিজ্ঞতা নয়। প্রেম যদি পাও বিনা শর্তে বিয়ে কোরো। আর বয়স থাকতেই কোরো। আমার ভাইয়ের মতো বয়স গড়িয়ে যেতে দিয়ো না। অবশ্য অন্য কারণও ছিল মেয়েরা বলত ওকে দেখলে নাকি ভ্রাতৃভাব জাগে।'

হারীত হেসে বলে, 'কোনটা অধিকতর কাম্য? বিশটি বোনের ভালোবাসা, না একটি বৌয়ের প্রেম? আর্থার বুদ্ধিমানের মতো বেছে নিয়েছেন। আমি ঈর্ষান্বিত।'

'ওহ্! তাই নাকি!' জোন আমোদ পান। 'আর্থারের জন্যে আমার মনে করুণা ছিল। এখন দেখছি সে ওদের ভাই হয়ে ভুল করেনি।'

'আমার তো মনে হয় বৌভাগ্যের চেয়ে বোনভাগ্য কোনো অংশে খাটো নয়, জোন। দুঃখ শুধু এই যে, বোনদের ভালোবাসা ভাইকে কেন্দ্র করে নয়। তার অপর কেন্দ্র আছে। কোনো একটি মেয়ের ভালোবাসার কেন্দ্র না হতে পারলে আমার সৌরমণ্ডল তার গুরুত্ব হারায়। তার তেজ থাকে না, উত্তাপ থাকে না। এই দেখ না কেন, আমার কি আর সেই জ্যোতি আছে যা ছিল বছর দুই আগে?'

'কী করে বলব, হারীত! তখন তো আমি ছিলুম না। কিন্তু যে জ্যোতি অপর সত্তে নিস্তেজ হয় বা নিবে যায় সেটা কি সূর্যের মতো স্বকীয়, না চন্দ্রের মতো প্রতিফলিত? তার জন্যে আফশোস না করে তুমি বরং তোমার ধ্রুব জ্যোতির কথা ভাবো। কতই বা বয়স তোমার! কী-ই বা হয়েছে! সামান্য তিনটে বছরের অতীতকে তুমি তোমার জীবনের নিয়ামক হতে দিচ্ছ কেন? তোমার এই শল্য হয়তো এককালে বাস্তব ছিল, এখন ওটা নিছক কল্পনা। যেমন পায়ের কাঁটা বেরিয়ে যাবার পরেও পা ফেলতে ভয় হয়। যেন কাঁটা এখনো ফুটে রয়েছে।'

হারীতকে স্পর্শ করে তাঁর যুক্তি। 'তা যদি হয় তবে বিশল্যকরণীর অন্বেষণ করে

মরি কেন ? তাকে আমার জীবনমরণের প্রশ্ন করি কেন ?'

'কে তোমাকে বলেছে ওর অন্বেষণ করতে ? বিশল্যকরণী নয়, বিস্মরণী তোমার চাই। ভুলতে জানাও একটা আর্ট। ভুলতে পারাও একটা বিদ্যা। শিখতে হয় তো এইসব শেখো। আমি যদি তোমাকে ভুলিয়ে দিতে পারতুম তা হলে নিশ্চয়ই দিতুম, কিন্তু সেটা আমার সাধ্যের বাইরে।'

হারীত তাকে ধন্যবাদ দেয়। কিন্তু সে জানে তার কাঁটা কোনখানে। ভুলে গেলেও সে কাঁটার নাস্তিত্ব হবে না। প্যাশন ছাইচাপা পড়তে পারে, নিবে আসতেও পারে, তবু সে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ করে। আর সেই দহন থেকেই আসে জ্যোতি। সামান্য ব্যক্তিকেও অসামান্য করে। হারীতও অসামান্য হয়ে গেছে। এখন আর সামান্যের পর্যায়ে ফিরে যেতে চায় না। সে তার ব্যথাকে সযত্নে লালন করছে। ভুলবে !

এসব কথা জোনকে বলা যায় না। অপর কোন বন্ধুকেও না। বোনেদের তো নয়ই। জানে একমাত্র বকুল। তাও মুখের কথায় নয়। আগুনে আগুনে কথা।

'হাঁ। সেটা তোমার সাধ্যের বাইরে।' হারীত অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর খাপছাড়া ভাবে বলে।

ইতিমধ্যে বসন্তের সমাগম হয়েছে। গাছে গাছে নতুন পাতার ভোজবাজি। দিকে দিকে অজস্র ফুল। রঙের আতশবাজি। আর এত পাখীও আছে। হারীত পাগলের মতো পাখীর ডাক শুনে ঘুরে বেড়ায়। কুকু ও ব্ল্যাকবার্ড ওর চেনা।

জোনকেও ধরে নিয়ে যায় কখনো কেনউডে, কখনো হ্যাম্পস্টেড হীথে। তাঁকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দেয় না।

'ওই পাখীটার নাম কী ?' হারীত প্রশ্ন করে।

'ওটার নাম উড পিজন।' জোন উত্তর দেন।

'আর ওটার ?'

'য়েলো হ্যামার।'

তেমনি ফুলের বেলা।

'এই ফুলটার নাম ?'

'জানো না ? ব্লু বেল।'

'আর এটাকে কী বলে ?'

'মার্গেরিট। একজাতের ডেজী।'

একসঙ্গে এতখানি নীল আকাশ কতকাল হারীতের চোখে পড়েনি। আকাশের দিকে চেয়ে কেবলি দেখেছে মেঘ বা কুয়াশা বা কলের ধোঁয়া বা ধোঁয়াশা। বৃষ্টি এখনো হয়, কিন্তু আকাশের আঙিনা নিকিয়ে সাফ করে দিয়ে যায়।

একদিন ওরা লণ্ডনের বাইরে গিয়ে এক ফার্ম-হাউসে উইকেণ্ড কাটিয়ে আসে। চমৎকার একটি অ্যাডভেঞ্চার। আগে থেকে কিছুই ঠিক ছিল না। কৃষকগৃহিণীর আতিথেয়তা দৃশ্যত অর্থের বিনিময়ে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্তরের বিনিময়ে। গোরুর সঙ্গে, ঘোড়ার সঙ্গে, শুওরের সঙ্গে ভাব। আর শিশুদের সঙ্গে তো রীতিমতো দুষ্টুমি।

রাত্রে যে যার শোবার ঘরে শুলেও দিনের বেলা গর্সের ঝোপঝাড়ের কাছে পাইনের ধারে কাঁটাবনের বিছানায় গা ঢেলে দেয়। একই বালিশে উল্টোদিক থেকে মাথা রাখে। ঘুম আসে না। গল্প করে। আকাশের দিকে চেয়ে কোন লোকান্তরে দৃষ্টির দূত পাঠায়।

জোন তার বন্ধু, দার্শনিক তথা গুরু। একটি সুন্দর আত্মার কাছে তার শিক্ষানবীশী। শিক্ষানবীশীর কথায় মনে পড়ে, ভিল্‌হেল্‌ম মাইস্টারের শিক্ষানবীশী। সেই সূত্রে গ্যেটের শিক্ষা। সবাই তাকে এগিয়ে দিচ্ছে। যে যতদূর পারে। বকুল, পার্বতী, জোন। সবরকম রসই তাকে বিকশিত করছে। পরিণত করছে একটি চারাগাছকে বনস্পতি করে তুলতে ঝড় বৃষ্টি সূর্যের আলো প্রখর শীত ও রাতের অন্ধকার লাগে। তেমনি একটি মানুষকে সৃজন করতে সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ সবরকম অভিজ্ঞতাই আবশ্যক।

॥ বিশ ॥

জোন মাঝে মাঝে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে হারীতকেও সঙ্গে নিয়ে যান। তাঁদের কেউ শান্তির কাজ করছেন, কেউ সমাজের কাজ। সমাজের কাজও প্রকারান্তরে শান্তির কাজ। শ্রেণীগত শান্তির। বিগত সাধারণ ধর্মঘটের পর থেকে ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে সেই ঘটনার প্রতিক্রিয়া চলেছে। শ্রমিকদের হারিয়ে দেওয়া গেছে, এবার তাদের হৃদয় জয় করতে হবে। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে মধ্যবিত্তদের একভাগ শ্রমিকদের সঙ্গে ভোট দিতে ইচ্ছুক। তাতে যদি শ্রমিকদলের জয় হয়।

হারীতের ল্যাণ্ডলেডী সোজাসুজি লেবার পার্টির পক্ষে। বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড এক ফোটো রাখা হয়েছে। এ-পাড়ার শ্রমিক প্রতিনিধিরূপে যিনি দাঁড়াবেন, তাঁর ফোটো। কিন্তু মিডলটনরা যে কার পক্ষে সেটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। একদিন হারীত লক্ষ করে, তাঁদের ম্যান্টেলপীসে তিন প্রধানের তিনখানা ফোটো। লয়েড জর্জ, বলডউইন, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড।

'তিনজনের কোনজনের হাতে দেশের ভার সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, মিস্টার

নিয়োগী ?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেন লেডী মিডলটন।

হারীত ভোটার নয়, সাধারণ নির্বাচনের আগে ছ'মাস একটানা এক জায়গায় থাকেনি। তার কোনো দায়িত্ব নেই। সে স্ফূর্তি করেন বলে, 'লয়েড জর্জকেই আমার সবচেয়ে পছন্দ।'

লেডী মিডলটন তা শুনে একটু আশ্চর্য হন। 'কেন বলুন দেখি ?'

হারীত কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। জোন মুচকি হাসেন। লয়েড জর্জকে যে তাঁরা চান না এটা আন্দাজে বোঝা যায়। তবে কি তাঁরা রক্ষণশীলের পক্ষে ? কিন্তু তাঁদের আচরণ সেরকম নয়। তাহলে কি তাঁরা সোসিয়ালিস্ট ? তারও কোনো লক্ষণ নেই। এ-রহস্য ভেদ করতে হলে সরাসরি প্রশ্ন করতে হয়। হারীত পেছিয়ে যায়। নির্বাচনে কে কাকে ভোট দেবে সেটা গোপন রাখাই ভালো।

'কিন্তু লয়েড জর্জ কি দোষ করলেন, জোন ?' হারীত পরে জানতে চায়। 'অত-বড়ো ব্যক্তিত্ব আর কার আছে ?'

'যুদ্ধজয়ের পর শান্তিজয় করতে হয়। তা তো তিনি করেননি। কেবল তিনি নন, ক্লেমাসোঁ আর উইলসন। তাঁকে দিয়ে ও-কাজ হবার নয়। তবে কোন্ কাজটা হবে ? শ্রেণীশান্তি ? মনে রেখো, সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে ভাগ্যনির্ধারণ। আমরা আমাদের ভাগ্যনির্ধারণ করতে পারি, এই তার মূল প্রতিজ্ঞা। লয়েড জর্জ একবার আমাদের বোকা বানিয়েছেন। আর না।'

'একদিন আমরা ভারতীয়রাও আমাদের ভাগ্যনির্ধারণের অধিকার পাব। তখন এ সমস্যা আমাদের জীবনেও উদয় হবে। কতবার কতজনের দ্বারা বোকা বনতে হবে, কে জানে। কিন্তু ভুল করব, যদি এই অধিকারটাকে হাতে পেয়েও হাতছাড়া করি। ইটালিয়ানদের মতো। তা বলে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসীর কাছে আমি খুব বেশী প্রত্যাশা রাখিনে, জোন। যেখানে অমীমাংস্য বিরোধ সেখানে এ-ব্যবস্থা ঠিক কাজ দেয় না। তখন পার্লামেন্টের বাইরে গিয়ে ক্যাভালিয়ারদের সঙ্গে রাউণ্ডহেডদের লড়াই বাধে।' হারীত যখন এ-কথা বলে, তখন তার মাথায় ঘুরছে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা।

সমসাময়িক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালেও হারীত এ বোঝা ইতিহাসের ঘাড়ে চাপিয়ে হাল্‌কা হতে চায়। তার আপনার বোঝাটিও তো হাল্‌কা নয়। যার জন্যে সে বিশল্যকরণীর সন্ধানরত। তার উপর আর্টের ভাবনা। যদি কিছু সৃষ্টি করে যেতে না পারে তাহলে সে কেউ নয়, সে কিছু নয়।

যৌবন হচ্ছে সেই সময় যখন মহৎ সৃষ্টির পরিকল্পনা করতে হয়, ভিত্তিস্থাপন করতে হয়। 'ফাউস্ট' শেষ করতে ষাট বছর লেগেছিল। হারীতেরও কয়েকটি স্বপ্ন আছে। সে

সব স্বপ্ন কি চিরকাল স্বপ্নই থেকে যাবে, না, স্বপ্নলোক থেকে নেমে আসবে রূপলোকে? তাহলে এখন থেকেই নীল নক্শা নিয়ে বসতে হয়।

না, তার আগে আরো প্রস্তুত হতে হবে। জোনের সঙ্গে বন্ধুতা তার প্রস্তুতির সহায়ক। আর্ট নিয়ে ওরা কে কী ভাবে, তা পরস্পরকে বলে।

ছবিই হোক আর কবিতাই হোক, ওর তলদেশে একটা শক্ত পাথর আছে। তার নাম অনুভূত সত্য। যে সত্য শিল্পীর বা কবির নিজের অনুভবলব্ধ। ওই পাথরটা না থাকলে সৃষ্টি নিরালম্ব। ওটা কী করে পাওয়া যাবে, কোথায় পাওয়া যাবে, প্রত্যেক শিল্পীকে বা কবিকে তার খোঁজ নিতে হবে। শক্ত হলেও পাথরটা নিরেট নয়। জলের মতো চপল, নীহারিকার মতো ধোঁয়াটে। অস্পষ্টকে স্পষ্ট করতে হয়, নইলে তা রূপধারণ করে না। রূপাতীত হলে সিম্বল দিয়ে ব্যক্ত করতে হয়।

তেমনি ছবিই হোক আর কবিতাই হোক, তার অন্তরে থাকবে ডিলাইট প্রিন্সিপ্ল। এঁকে আনন্দ, লিখে আনন্দ, দেখে আনন্দ, শুনে আনন্দ, পড়ে আনন্দ, অংশ নিয়ে আনন্দ। বিষয়টা হয়তো অতি করুণ, তবু তাতেও আনন্দ। যেখানে আনন্দ নেই সেখানে এমন একটা জিনিস কম পড়েছে যার অভাবে আর সব বিস্বাদ। তুমি হয়তো ওস্তাদ রাঁধুনি, তবু তোমার রান্না কেউ মুখে দেবে না। পুষ্টিকর পথ্য, তবু রসনায় রুচবে না। কিন্তু আনন্দের অর্থ বিনোদন নয়। লোকে অবশ্য বিনোদন চায়, তাদের সঙ্গে সন্ধি না করলে হয়তো জীবনযাত্রাই দুষ্কর, তবু আনন্দদান ও বিনোদনে প্রভেদ আছে।

'কমিউনিকেশন নিশ্চয়ই অত্যাবশ্যক, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা কমিউনিয়ন। প্রথমটাই প্রধান নয়। আমি যখন বাজাই আর তুমি যখন শোন তখন তোমার আর আমার দু'জনেরই লক্ষ্য কমিউনিয়ন। ছবির বেলাও সেই কথা। কবিতার বেলাও কি তাই নয়? তুমি একটা কিছু বলতে চাও তোমার পাঠককে, সেটা ঠিক। কিন্তু সেইখানেই যদি তোমার কাজ ফুরিয়ে যায় তো তুমি শেষপর্যন্ত পৌঁছলে না। প্রাণে প্রাণে এক হয়ে যাওয়া চাই। সেখানেই আর্টের সার্থকতা। সেটা তো বিনা সাধনায় হবে না। তোমাকে দীর্ঘকাল লেগে থাকতে হবে। আশু সাফল্য আশা করতে নেই। চমকের পর চমক দিয়ে বেশ কিছুদূর এগোনো যায়। কিন্তু একদিন দেখবে ওতে চলবে না। ওই-খানেই থেমে যেতে হবে।'

জোনের এ সব কথা হারীতের মনে বসে। এখন পর্যন্ত সে তার বক্তব্য পেশ করার কথাই ভেবেছে। সেটা আর্ট হলো কি না, কারো অন্তরে স্পন্দিত হলো কি না, তার প্রতি ধ্যান দেয়নি। এখন থেকে দিতে চেষ্টা করবে।

জীবন তাকে হাজার দিক থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তার ধ্যানভঙ্গ করে।

আর্টের প্রতিদ্বন্দ্বী জীবন। এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর্ট কী করে জিতবে? দেশে ফিরে গিয়ে আর্টের যা হবার তা হবে। আপাতত জীবনের দাবী আগে। ইউরোপের জীবন তো চাইলেই ফিরে পাওয়া যাবে না। বলতে গেলে এই শেষ সুযোগ।

সে প্রাণভরে দেখে ও সবক'টা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে। কিন্তু লেখার প্রেরণা পেলে যখন যেটুকু পারে লেখে।

জীবন থেকে যা পাওয়া যায় তাই তো লেখকের পুঁজি। জীবন যদি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় তাহলে সে কেন ভুলবে না? তবে সে ফিরে আসবে ঠিকই। আসবে তার লেখার টেবিলে। জীবনের কাছে যা পেয়েছে তাকে সাহিত্যের পাতে তুলে দেবে। তার সঙ্গে মিশিয়ে দেবে তার মনের মাধুরী। যদি মেশানোর কৌশল জানে।

কিন্তু জীবনের আড়ালে কী আছে, সেটাও সে ভেদ করতে চায়। দৃশ্যমান জীবনে সে বিভ্রান্ত নয়। যদিও রূপমুগ্ধ। এক এক সময় সে মায়াবাদীর মতো বোধ করে। বাস্তবকেও মনে করে মায়া। দেয়ালকে ছুঁয়ে ভাবে, এটা কি দেয়াল? টেবিলকে ছুঁয়ে ভাবে, এটা কি টেবিল?

সাধারণ অর্থে রিয়ালিস্ট হতে তার উৎসাহ নেই। লোকে যাকে রিয়াল বলে ধরে নেয় তা কি রিয়াল না আনরিয়াল? এর নিষ্পত্তি না করে লিখতে বসলেই লেখা শাশ্বত হবে কেন? নিছক সাময়িক হলে সে সন্তুষ্ট হবে না। তবে এটাও সে জানে যে, প্রথমে তাকে যুগের সঙ্গে পা মেলাতে হবে। আধুনিক না হয়ে চিরন্তন হওয়া যায় না।

'আমার মনে হচ্ছে' জোন একদিন বলেন, 'তোমার সৃষ্টিই তোমার বিশল্যকরণী। তুমি তার সন্ধান ইতিমধ্যেই পেয়েছ। আর পাবার কী আছে? ব্যথা অবশ্য রাতারাতি দূর হবে না। কিন্তু ওই তার ভেষজ।'

হারীতের কাছে এটা একটা বিস্ময়। সে অবাক হয়ে ভাবে। কই, কখনো তো একথা তার মনে উদয় হয়নি যে তার লেখাই তার বিশল্যকরণী।

'জোন, তুমি যা বললে তা কি সত্যি? আমার বিশল্যকরণী আমারি হাতে? আমিই তাই দিয়ে আপনাকে বিশল্য করতে পারি?'

'দীর্ঘমেয়াদী মহৎ কোনো প্রয়াস হাতে নাও দেখি। যা তোমাকে দিনরাত নিবিষ্ট রাখবে, জ্বালাবে, পোড়াবে, নিঃশেষ করবে। তখন দেখবে তোমার ব্যথাবোধ কোথায় চলে গেছে। তবে ব্যথা যেতে আরো সময় লাগবে।'

এটা যেন একটা প্রেসক্রিপশন। হারীত ধন্যবাদ দেয়। তার ধন্যবাদের ধরনই তো সেই অবরের ভাষায়।

'কেমন? আমার কথা মনে থাকবে?' জোন তার দিকে প্রীতিভরে তাকান।

'নিশ্চয় মনে থাকবে। তুমি আমাকে পথ দেখালে। জীবনে যদি মহৎ কিছু গড়ি

সেটা তোমারি প্রবর্তনায়।'

'কিন্তু ততদিন তুমি কোথায় আর আমি কোথায়! তোমার ফিরে যাবার সময় তো ঘনিয়ে এল। অক্টোবরেই জাহাজ ধরছ তো?'

'হাঁ, জোন। কিন্তু এখন থেকে ওকথা কেন? এখনো মাস চারেক দেরি। এ ক'মাস যেন তোমাকে আরো নিবিড় করে পাই।'

এর কিছুদিন পরে হারীত বলে, 'আমার ইচ্ছে করছে শিক্ষাসমাপনের পূর্বে গ্র্যাণ্ড টুর করতে। একবছর ধরে করাই রীতি, কিন্তু আমার হাতে অত সময় নেই। আর টাকাই বা এত কোথায়।'

'বেশ তো, দেশে ফেরার আগে কন্টিনেন্ট ঘুরে দেখো।' জোন সমর্থন করেন।

'কিন্তু সেবার আমার বন্ধু দিব্যকান্তি ছিলেন। তিনি দেশে ফিরে গেছেন। এবার আমার বেডেকার হবে কে?'

জোন একমুহূর্ত ভেবে বলেন, 'তুমি যদি চাও আমি হতে পারি। কিন্তু তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি কি দৌড়তে পারব?'

'কল্পনাতীত সৌভাগ্য! জোন, তুমি! তুমি যাবে আমার সঙ্গে! এ কি সম্ভব! লেডী মিডলটন কী মনে করবেন। আর তোমার অন্যান্য বন্ধুরা।' হারীত পরম কৃতার্থ হয়।

'সে ভার আমার উপরে ছেড়ে দাও।' জোন তাকে অভয় দেন।

॥ একুশ ॥

বসন্তর পর নিদাঘ। রাত এগারোটার আগে অন্ধকার হয় না। রাত তিনটের সময় চারদিক ফরসা। মানুষ ঘুমোবে কখন? আর ঘুমিয়ে থাকা মানে তো প্রকৃতির প্রতি চোখ বুজে থাকা। হারীত যতক্ষণ পারে নয়ন ভরে দেখে। পাখীরা যখন স্তব্ধ হয় তখন সেও প্রকৃতির কাছ থেকে ছুটি নিয়ে স্বপ্নলোকে পাড়ি দেয়।

সেই যে একটা অদৃশ্য ভার চেপে বসেছিল তার বুকে, সেটা আর তেমন ভারী লাগে না। বিশল্যকরণীর কল্যাণে। লেখার যেন জোয়ার এসেছে আর সে জোয়ার তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রূপের ঘাট থেকে ঘাটে। যে রূপ সে দৃষ্টিযোগে আত্মসাৎ করে সৃষ্টিযোগে সম্প্রদান করছে। লেখার জোয়ার যেন রসেরও জোয়ার।

জোনকে পড়ে শোনায় লেখা ও তার ভাবানুবাদ। তিনি সুখী হয়ে বলেন, 'হাঁ,

এইবার তুমি তোমার আপনাকে পেয়েছ। এর পরে তুমি আর পেছন ফিরে তাকাবে না। তুমি মুক্ত। তোমার আপন অতীতের হাত থেকে!'

পরে তিনি ওকে পরামর্শ দেন, 'লেখকরূপে যেটা লিখবে পাঠকরূপে সেটা পড়বে। যখন পড়বে তখন ভুলে যাবে যে তুমিই লিখেছ। পাঠক হিসাবে মমতাশূন্য হবে। কিন্তু নির্মমভাবে কেটে নষ্ট করে ফেলবে না। পাঠক হিসাবে কেউ নির্ভরযোগ্য বিচারক নয়, তুমিও না। এই তো সেদিন কাফকা বলে এক জার্মান ভাষার লেখকের নাম শুনলুম। মরার আগে বন্ধুর হাতে পাণ্ডুলিপি দিয়ে বলে যান ধ্বংস করতে। বন্ধু যদি কথা রাখতেন তা হলে সাহিত্য একটা বিশেষ স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতো।'

এক একটি কবিতা যেন এক একটি আবিষ্কার। হারীত জানত না যে এ ধন তার খনিতে ছিল। খনি থেকে উদ্ধার করে এনেছে। বতি পরিমাণ সোনার সঙ্গে ভূরি-পরিমাণ আকরিক থাকে। শোধন করা সহজ নয়। শোধন করতে করতে কখন একসময় দেখবে সোনা ফেলে আঁচলে গেরো বেঁধেছে।

ওদিকে বকুলের চিঠিপত্রও কমে আসছিল। ভারতের রাজনীতি ক্রমেই সংঘর্ষমুখী হচ্ছে। দেশের শিকল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বকুলেরও শিকল ভাঙার ঝনঝন আওয়াজ উঠছে। হারীতের সঙ্গে মুক্তির যে সম্পর্কটা ছিল এখন সেটা নেতাদের সঙ্গে। এই দেশপ্রেমিকাকে নতুন কথা বলার কী আছে পূর্বপ্রেমিকের? জোনের কথা হারীত একবার উল্লেখ করেছিল। হয়তো সেটাই বকুলকে বিরক্ত হবার প্রেরণা দিয়েছে। তবে একেবারে বিরক্ত হবার পাত্রী ও নয়। হারীতও নিজের দোষী মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। নিজের পুরুষোচিত শিভালরি। চিঠি পেলে চিঠির জবাব দেয়। না পেলে লেখে না।

বিরহ থেকে বন্ধন দৃঢ় হয়। কিন্তু সম্পর্ক যেখানে অন্তরকম হয়ে গেছে সেখানে বিরহ থেকে বন্ধন শিথিল হওয়াই স্বাভাবিক। দু'বছর পরে হারীত অনুভব করে যে তার হৃদয় এখন তার কাছে ফিরে এসেছে ও ফিরে পাওয়া হৃদয় সে জোনকে দিয়েছে। একটিমাত্র নারীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে সে বরাবরই চেয়েছিল। ওই ছিল তার আদর্শ। তার বেদনার অন্তর্নিহিত কারণ কেবল আশাভঙ্গ নয়, আশাভঙ্গসত্ত্বেও একনিষ্ঠতা। একটি নারীই সব নারী। একজনকে ভালোবাসলেই সবাইকে ভালোবাসা যায়। সব নারীকে। সব মানুষকে। সর্ব জগৎকে। সর্বজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে। সেই এককে। এক থেকে আরম্ভ করে একেই পরিসমাপ্তি। একনিষ্ঠতাজনিত বেদনা আশাভঙ্গের বেদনাকেও ছাড়িয়ে যায়। এতদিনে এ বেদনার অবসান হয়েছে।

এখন আরেকটি নারীর প্রতি একনিষ্ঠতা। হারীত যদি দেশে ফিরে যায় এ বন্ধনও কি শিথিল হবে না? সে ভাবতে চায় না। তার ভাবতে কষ্ট হয়। জোন যদিও তাকে

বিশেষ কোনো আশা দেননি তবু সে একসঙ্গে থাকার স্বপ্ন দেখে। যাতে সেটা সম্ভব হয় তার জন্যে ইংলণ্ডে থেকে যাওয়ার বাসনাও পোষণ করে। কিন্তু তার বাস্তববোধ তাকে ওই আইডিয়া নিয়ে খেলা করতে দেয় না। বাংলাভাষার লেখক বাংলাদেশে বাস না করে ইংলণ্ডে বাস করবে, এটা দু'পাঁচবছর চলতে পারে, কিন্তু আজীবন চলবে না। তবে কি জোনের জন্যে ও বাংলা ছেড়ে ইংরেজীতে লিখবে? না, তেমন সিদ্ধান্ত সে নেবে না। একদিন না একদিন তাকে দেশে ফিরে যেতে হবেই। দুইয়ের বদলে পাঁচ হলেও বছরের সংখ্যা সারাজীবনের সমান নয়।

বিরহ অপরিহার্য। বিরহের জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হওয়াই বিজ্ঞতা। বিরহের ফলে বন্ধন যদি শিথিল না হয়ে দৃঢ় হয় তবে আবার না হয় ফিরে আসবে জোনের দেশে। জীবন যদি সেরূপ নির্দেশ দেয় প্রেমের দাবীর কাছে সাহিত্যের দাবী খাটো হবে। কখনো যে কারো জীবনে তা হয়নি তা নয়। টুর্গেনিয়েভ রাশিয়ার মায়া কাটিয়ে প্যারিসেই স্বেচ্ছানির্বাসিত হন। একুশ বছর পরে সেইখানেই দেহ রাখেন। মাদাম ভিয়ার্দো কোনোদিন কি তাঁর প্রেমের প্রতিদান দেন? মাঝখান থেকে রুশ কথা-সাহিত্যে তাঁর স্থান প্রথম থেকে তৃতীয়ে নেমে যায়। অবশ্য আর্থিক স্বচ্ছলতার ইতর-বিশেষ হয় না। প্রাইভেট ইনকাম তো ছিলই, রাশিয়ায় তাঁর লেখার বাজারদর ছিল টলস্টয়ের পিঠোপিঠি। ডস্টয়েভ্স্কি বেচারা সেদিক থেকে দুর্ভাগা। মহাকাল তাঁকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন, তিনি দেখে যেতে পারেননি।

মানুষকে বেশীদূর দেখবার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। সে সমগ্র জীবনের জন্যে পরিকল্পনা করতে পারে না। জোর করে করতে গেলে নিয়তির কাছে হেরে যায়। দ্বিতীয়বার একই ভুল করতে হারীতের ইচ্ছা নেই। জোন ও সে পরস্পরকে চিরকাল ভালোবা-সবেই এটা ধরে নিয়ে জীবনব্যাপী পরিকল্পনা করতে সে উদ্যোগী হয় না। জোনও সেটা চান না।

তিনি বলেন, 'আমাদের ভালোবাসার প্রচ্ছন্ন শর্ত এই যে, আমরা কেউ কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে যে-যার জীবনের কাজ করে যাব। তোমার জীবনের কাজ অনিবার্য-ভাবে তোমাকে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এ আমি অভ্রান্তরূপে জানি। তেমনি আমার জীবনের কাজ আমার স্বদেশে। সেইজন্যে জীবনের সঙ্গে জীবন যুক্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব বা সঙ্গত নয়। তা বলে যে সব সম্পর্ক কেটে গেল তা-ও নয়। যারা পরলোকে যায় তাদের সঙ্গেও সব সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। ইংলণ্ড আর ভারত তো এ-ঘর আর ও-ঘর।'

এটা মেনে নিলে যা থাকে, তা অকৃত্রিম অনুরাগ, কিন্তু বৈরাগ্যের গৈরিক রঙে রাঙানো। জোন এ-জীবনে স্বামী চাইবেন না, সন্তান চাইবেন না, তাঁর পক্ষে এ-বৈরাগ্য

অসহন হবে না। কিন্তু হারীতের পক্ষে? সে কেমন করে বলবে সে স্ত্রী চায় না, সন্তান চায় না? তার স্বাধীনতা তার কাছে একান্ত প্রিয়, কিন্তু এমন প্রেম যদি আসে যে তার স্বাধীনতা খর্ব করছে না, অথচ তাকে প্রেমিকরূপে পতিরূপে পিতারূপে পরিপূর্ণতা দিচ্ছে, তবে কি সে বিয়ে না করে জোনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করবে? বকুলকে তো বিয়ে করতেই প্রস্তুত ছিল। বিবাহের সঙ্গে স্বাধীনতার বিরোধ ঘটলে সে স্বাধীনতার পক্ষে, কিন্তু সামঞ্জস্য ঘটলে বিবাহের বিপক্ষে নয়।

তাহলে তাদের দু'জনের সত্যিকার সম্পর্কটা কী ধরনের? বন্ধুতা? না, বন্ধুতার মধ্যে নারীর নারীত্বের বা পুরুষের পৌরুষের স্থান নেই। বন্ধুতা হচ্ছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির। তা সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক। সম্পর্কটা যেখানে ব্যক্তিত্বের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে সেখানে সেটা বন্ধুতার চেয়ে বড়ো। অথচ সর্বাঙ্গীন প্রেমের চেয়ে খাটো। নারীকে ও পুরুষকে এ-প্রেম পরমা প্রাপ্তি দেয় না। মধুর রসের স্বাদ নেই এতে। হারীত তার জন্যে দুয়ার খোলা রাখতে চায়। জোন সে কথা জানেন। পূর্ণবয়স্ক একজন যুবা ওছাড়া আর কী করলে স্বাভাবিক হবে? ও তো গোড়া থেকেই বলে রেখেছে ও সন্ন্যাসী হবে না। তার চেয়ে হবে বোহিমিয়ান। স্বাধীনতার যাতে পরাকাষ্ঠা। কিন্তু প্রেমের পরাকাষ্ঠা কিনা সন্দেহ।

সর্বাঙ্গীন প্রেমের চেয়ে খাটো হলেও সাধারণ প্রেমের তুলনায় মহান হতে পারে। নইলে কেন দান্তে বিয়াত্রিসের প্রেম মহৎ কাব্যের বিষয় হতো? উত্তমা নায়িকার জন্যে পরমা প্রাপ্তিও ত্যাগ করা যায়। কিংবা উত্তম নায়কের জন্যে প্রেমের শ্রেষ্ঠতা মিলনে নয়, ভাবসম্মিলনে। আর সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানসসন্তান। বেঠোফেনের সিম্ফোনি বা সোনাটা যেমন। সেই নিঃসন্তান চিরকুমার যাদের জন্ম দিয়ে গেছেন তারা অমর বিধাতা যদি বলেন, হারীত, তুমি বেঠোফেনের মতো অমর সন্তান চাও, না, ভাগ্যবান গৃহস্থের মতো দীর্ঘায়ু বংশধর, সে কী উত্তর দেবে?

শরীরী হোক, অশরীরী হোক প্রেমের একটি উন্নত আদর্শের কাছে আর সব কিছুকে দ্বিতীয় করাই হারীতের অন্তরের নির্দেশ। এ নির্দেশ সে আগেও শুনেছে। তার অন্তরতম কণ্ঠস্বর তাকে বলেছে, তোমার কাজ ভালোবেসে যাওয়া, ভালো করে ভালোবেসে যাওয়া। বাকীটা ভগবানের করুণা। তিনিই জানেন তিনি কাকে কী দেবেন। কিছু না দিলেও ভালোবাসার ক্ষমতা ও সুযোগ তো দিয়েছেন। আর এই যে তুমি একটি নারীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম পাচ্ছ এটাও কি তাঁর দান নয়? এর চেয়ে বড়ো দান আর কী হতে পারে? মাথা নোয়াও, মাথা নোয়াও। মাথা পেতে নাও। প্রতিদানে অক্ষম হলে মাফ চেয়ে নিয়ো।

প্রেম আর ভগবান একই শব্দের দুই বিভিন্ন পাঠ। প্রেম বলতে যা বোঝায় ভগবান

বলতে তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। ভগবান বলতে যা বোঝায় প্রেম বলতে তার চেয়ে কম কিছু নয়। যেখানে দেখবে কম কিংবা বেশী সেখানে বুঝবে মানুষ তার নিজের মাপেই মহাসাগরের পরিমাপ করতে নেমে হিসাব মেলাতে পারছে না। ভগবানের মতো প্রেমও অপরিমেয়।

কন্টিনেন্ট যাত্রার প্রাক্কালে হারীত তার বাসা ছেড়ে দিয়ে দু'তিনদিনের জন্যে মিডলটনদের বাড়ীতে অতিথি হয়। জোনের ভাই আর্থারও সেসময় ছুটিতে ছিলেন। মুখচোরা লাজুকপ্রকৃতির লোকটিকে হারীতের বিশেষ ভালো লাগে। কিন্তু কথাবার্তা বেশীদূর এগোয় না। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ বাগানের টুকটাক কাজ করেন।

'কন্টিনেন্ট থেকে ঘুরে না এসে আপনি আপনার স্বদেশে ফিরে যাবেন, মিস্টার নিয়োগী। আপনার সঙ্গে আর বোধহয় দেখা হবে না। শুভযাত্রা ও জীবনের সাফল্য-কামনা জানিয়ে এই বইখানি আমি আপনাকে দিচ্ছি।' এই বলে লেডী মিডলটন তাকে একখানি কাব্যগ্রন্থ উপহার দেন। রিল্কের কবিতা। জার্মান থেকে অনুবাদ।

হারীত অশেষ কৃতজ্ঞতা জানায়। 'একদিন কি দু'দিনের জন্যে আমাকে লণ্ডনে ঘুরে এসে চাকরির কাগজপত্র সই করতে হবে, লেডী মিডলটন। জোন তখন যাবেন ভিয়েনায় কয়েকদিন কাটাতে। এলে বোধহয় দেখা করতে সময় পাব না, মালপত্র রওনা করে দিতে হবে। তাই এখনি বিদায় নিয়ে রাখি। আপনার স্নেহ আমি জীবনে ভুলব না। আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। সেইসঙ্গে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য।' বলতে বলতে তার চোখে জল আসে। এই বৃদ্ধা আর বেশী দিন এ জগতে নেই।

তাঁর কন্যার সঙ্গে হারীতের কী সম্পর্ক তা তিনি জানেন না, জানতে চান না। মেয়েকে তিনি অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। ছেলেকেও। নিজেও অতি স্বাধীন প্রকৃতির শক্তিমতী মহিলা। নির্লিপ্ত ও নিঃস্পৃহ। কখনো কারো নিন্দা করেন না। কিন্তু শিশু ও পশুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে শুনলে ক্ষেপে যান।

॥ বাইশ ॥

ইতালীগামী জাহাজে উঠে হারীত বলে, 'জোন, এখন হতে তুমি আমার বিয়াত্রিস। দান্তের মতো আমি তোমার অনুগমন করব। আর তুমি আমাকে নিয়ে যাবে দেশ হতে দেশান্তরে। লোক হতে লোকান্তরে। রূপ হতে রূপান্তরে। আমাদের এই পরিক্রমার একটা কস্মিক ভাব আছে। যেমন ছিল দান্তে বিয়াত্রিসের।'

হাসির জলতরঙ্গ বাজিয়ে জোন তার হাত ধরে বলেন, 'চল, তোমাকে তোমার ক্যাবিন পর্যন্ত এগিয়ে দিই। রাত এখন অনেক। চটপট শুয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখো। দান্তের মতো।'

রাত পোহালে হল্যাণ্ড। হারীতের হাত তাঁর হাতে নিয়ে জোন বলেন, 'অনুগমন নয়, পায়ে পা মিলিয়ে একসঙ্গে হাঁটা।'

বহুদিনের অভ্যাসের ফলে দু'জনের পায়ে পায়ে মিল ছিল। ছন্দপতন ঘটত না। জোনের হাত ধরে হারীত পাশাপাশি পথ চলে। যাত্রা শুরু হয়

চলতে চলতে জোন বলেন, 'দান্তে স্বর্গে গিয়েও রাজনীতি ভোলেননি। তুমি কিন্তু যতদিন আমার সঙ্গে বেড়াবে রাজনীতির কথা মুখে আনবে না। তা যদি কর তার চেয়ে ঢের বড় জিনিস তোমার দৃষ্টি ও মনোযোগ এড়াবে। ছোট জিনিসের জন্যে বড় জিনিস খোয়ানো মূঢ়তা। যেদেশের যেটা শ্রেষ্ঠ সেইটেই আমরা দেখব আর শুনব।'

হারীত রাজনৈতিক ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হতে ভালোবাসে। কী করবে। পড়েছে যোগলের হাতে। বলে, 'আচ্ছা।'

জোন তাকে খবরের কাগজ পড়তে দেন না। দুনিয়ায় কী হচ্ছে না হচ্ছে সে জানতে পায় না। নিজেও পড়েন না বা জানেন না। দু'জনেরই পাঠ্য বেডেকারের নতুন সংস্করণ আর যতরাজ্যের আর্টের বই, সঙ্গীতের বই, সাহিত্যের বই যেখানে যায় হোটেলে বা হস্পিসে ওঠে। ব্রেকফাস্টের পর বেরিয়ে পড়ে। বাইরে লাঞ্চ ও চা সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে নীড়ে ফিরে আসে ডিনার, বিশ্রাম ও অধ্যয়ন। যে যার ঘরে শুতে যায়।

যেদিন থিয়েটারে বা কনসার্টে যায় সেদিন অত ঘোরাঘুরি করে না। বিকেলটা যে যার ঘরে কাটায়। জোন সাধারণত শুয়ে শুয়ে বই পড়েন। যে নাটকটা দেখতে যাবেন সেটা বা যে সঙ্গীত শুনতে যাবেন তার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য। প্রস্তুত না হয়ে তিনি নড়বেন না। সে যদি বুঝতে না পারে তাকে বোঝাবেন। জার্মান সে পড়তে পারে না ইংরেজীতে সবকিছু পাওয়া যায় না। তিনিই তার দোভাষী জার্মানীর কোলোন, বন্ রাইন নদ। রাইন নদের জাহাজে উজান যাত্রা। হারীত মুগ্ধ হয়ে দর্শন করে। বায়রনের কবিতা মনে পড়ে যায়। চাইল্ড হ্যারল্ডের তীর্থযাত্রা।

'সৌন্দর্যের থেকে সৌন্দর্যে চলেছি। আর তুমি আমার সঙ্গে এর চেয়ে কাম্য আর কী থাকতে পারে। সারাজীবনটাই যদি হতে পারত এই যাত্রার সম্প্রসারণ, এরই বর্ধিত সংস্করণ তা হলে কি আমার মনে এতটুকুও খেদ থাকত।' হারীত উচ্ছ্বসিত হয়।

'সৌন্দর্য থেকে সৌন্দর্যে চলেছ। কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টি করে চলেছ কি? সেও কি তোমার কাম্য নয়? কোথায় তার জন্যে বেদনা। যে বেদনা যার নেই সে কবি নয়, শিল্পী নয়। হারীত, তুমি যদি কবি বা শিল্পী হয়ে থাক তবে এখন থেকে এই হোক

তোমার শল্য। একটির পর একটি সৃষ্টি করবে আর একটু একটু করে বিশল্য হবে। সারাজীবন ধরে চলবে তার সাধনা।' জোন তার দিকে অসীম প্রীতিভরে তাকান।

'তোমাকে আমি ঈর্ষা করি, জোন। তুমি তো কেমন অনায়াসে এঁকে যাচ্ছ। আমি কেন লিখতে পারিনে? লিখলে ও অভিনিবেশ থাকবে না। লেখা হবে, কিন্তু দেখা হবে না।'

'কবিতে আর চিত্রকরে এইখানেই প্রভেদ। তোমরা দেখতে দেখতে লিখতে পারো না। কিন্তু আমার এ স্কেচ তা বলে তোমার কবিতার মতো মূল্যবান কিছু নয়। যখন সত্যি সত্যি আঁকতে বসব তখন এর দিকে ফিরেও তাকাব না। তা হলে স্কেচ করাই বা কেন? করছি এইজন্যে যে এসব দৃশ্য দু'বার দেখবার জো নেই। এসব দৃশ্য পলাতক শুধু নয়, চিরপলাতক। এ যেন একপ্রকার ডায়েরি রাখা।'

বন্‌-এ ওরা বেঠোফেনের জন্মস্থানে শ্রদ্ধানত হয়। তেমনি ফ্রাঙ্কফুর্টে গ্যেটের জন্মস্থানে। সব চেয়ে বেশী আইজেনাখে বাখ্-এর জন্মস্থানে। এও এক তীর্থযাত্রা। এ নিয়ে লিখতে পারা যেত কুমার হারীতের তীর্থযাত্রা।

আইজেনাখ থেকে ভাইমারে যায়। গোটে ভবনে মহাকবির স্মৃতি এখনো সজীব। শিলার, হের্ডার, ভীলাণ্ড এঁরাও সেখানে তাদের স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছেন। জার্মান জাগরণের সেই পীঠক্ষেত্রই বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রর পর সংবিধান প্রণেতাদের মিলন-ক্ষেত্র হয়।

জোনের বিশেষ আগ্রহ ছিল বাউহাউস দেখবেন। ক্লে, কান্দিনস্কি প্রমুখ আধুনিক শিল্পীরা যেখানে চারু ও কারুশিল্পের সমন্বয় সাধনে উদ্যোগী। কিন্তু বাউহাউস এই সম্প্রতি ডেসাউতে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের চাপে।

প্রতিক্রিয়া? হাঁ, প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এক বছরের সঙ্গে আরেক বছরের কত না তফাৎ! দিব্যকান্তির সঙ্গে জার্মানী পরিভ্রমণের সময় ভাইমার কেন্দ্রিক উদারচিত্ত জার্মানী একহাতে প্রতিক্রিয়াশীলদের ও আরেক হাতে বিপ্লববাদীদের ঠেকিয়ে রেখে কোনোমতে পথ কেটে চলেছিল। এখন সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। তার আত্মিক ক্লান্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

বার্লিনে এটা আরো স্পষ্ট হয়। হারীত আর চুপ করে থাকতে পারে না। উচ্চ স্বরে ভাবে, 'জার্মানদের নিয়ে আবার বিপদ বাধবে, জোন।'

'ওদের কি আর সে বাহুবল আছে। দেখেছ না কেমন হাডজিরজির চেহারা।' জোন করুণার সঙ্গে বলেন।

বার্লিনে ওরা প্রাণভরে থিয়েটার দেখে। রকমারি প্রোডাকশন। ফিলহার্মনিক অর্কেস্ট্রার সঙ্গীত শোনে। পরম উপভোগ্য সন্ধ্যা। আর জোন খুঁজে বেড়ান তাঁর পূর্ব-

যুগের বন্ধুদের। হারীতকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে যান।

ম্যাক্স বেকমান কোথায় বেড়াতে গেছেন। শরৎকালটা বেড়ানোর সময় বলে শিল্পীদের স্বস্থানে পাওয়া দুঃসাধ্য। তাঁর চিত্রার্পিত দুঃস্বপ্ন দেখে হারীত আতঙ্কিত হয়। আর জোন নীর ছেড়ে ক্ষীর গ্রহণ করেন। বিষয় নয়, প্রাণশক্তি, সিম্বলিজম, রং ও রেখা।

এর পরে লাইপৎসিগ হয়ে ড্রেসডেন। সেখানে তখনো 'সেতু' মণ্ডলীর প্রভাব ক্ষয়ে যায়নি। যদিও গোষ্ঠী ভেঙে গেছে কবে।

'পাঁচজন শিল্পী বেশীদিন একমত হয়ে কাজ করতে পারেন না। দল তখন ভাবসূত্র হারায়। এর কোনো প্রতিকার নেই, হারীত। তুমি আমি দু'জনেই যদি চিত্রকর হতুম দু'দিন পরে দেখা যেত আমাদেরও মিল নেই। তা বলে সেই দুটো দিন আর্টের ইতিহাসে তুচ্ছ নয়। এক একটা গ্রূপ যেন এক একটা অধ্যায়। আর একসঙ্গে কাজ করতে মন গেলে প্রত্যেকটি আর্টিস্ট যেন দুই হাতে খাটেন। পাঁচ বছরেই দশ বছরের কাজ হয়ে যায়।'

জোন তেমন কোনো মণ্ডলীর একজন নন। সেদিকে মন যায়নি। খেদ আছে।

ড্রেসডেনে থাকতে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। যে হোটেলে ওরা ওঠে সেটা উঁচু দরের হোটেল। যদিও তেমন কোনো অনুরোধ করা হয়নি তবু ওদের দেওয়া হয় পাশাপাশি দু'খানা ঘর। পাশাপাশি না দিয়ে দূরে দূরে দিলেও চলত। অন্যত্র এলো-মেলোভাবে দিয়েছে। একজন দোতালায় তো আরেকজন তেতালায়। কোনো অসুবিধে হয়নি।

সেদিন জোনের দারুণ মাথা ধরা। ডিনারের পর সটান নিজের ঘরে যান। গিয়ে দুয়ার দেন। হারীত কিছুক্ষণ লাউঞ্জে বসে রাফেলের উপর একটা কবিতা লেখে। সিস্টিন ম্যাডোনা দেখে সে সৌন্দর্যের রসে অভিষিক্ত হয়েছিল। এটা তারই প্রেরণায়।

নিজের ঘরে গিয়ে রাতের কাপড় পরে সে যখন শুতে যাবে তখন দিনের পোশাক সাজিয়ে রাখতে গিয়ে আবিষ্কার করে পর্দার আড়ালে এক দরজা। এ যেন আরব্য উপন্যাসের এক রজনী।

দরজাটা খুলতেই জোনের ঘর। আলো নেবানো। জোন একাকিনী শায়িতা।

হারীত কান পেতে শোনে জোন যন্ত্রণায় উসখুস করছেন। সমবেদনা তাকে টেনে নিয়ে যায় ওঁর বিছানার ধারে, ওঁর শিয়রে। সে আলগোছে তাঁর কপালে হাত বুলিয়ে দেয়।

'ও কে। হারীত!' জোন চমকে ওঠেন। 'তুমি এঘরে এলে কী করে!'

'যৌগিক প্রক্রিয়ায়। কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? দুই ঘরের মাঝখানে একটা দরজা

আছে। খুলে দেখি তুমি জেগে আছো আর কষ্ট পাচ্ছ। ঘুমিয়ে থাকলে ঘরে ঢুকতুম না।'

'তা হলেও টোকা দিতে হয়। কে যে কখন কী অবস্থায় থাকে।' জোন তার গায়ের উপর চাদর টেনে নেন।

'তোমাকে আমি না দেখলে কে দেখবে, ডিয়ার। তুমি এঘরে সারারাত ছটফট করবে আর আমি ওঘরে আরাম করে ঘুমোব।'

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন, 'ডার্লিং, এই আমাদের মোমেন্ট অফ ট্রুথ। এতদিন একে এড়িয়েছি, ভেবেছি তোমার দেশে ফেরার আগে এ কোনোদিন আসবে না। আজ হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছে। এখন সত্যের মুখোমুখি হতে হবে।'

হারীত তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। তিনি ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, 'একটি শিশুকে এ জগতে আনার দায়িত্ব এ বয়সে আমি নেব না। আর আমি জানি যে ওর জন্যে তুমি সুখী হবে না। একদিন না একদিন তার কাছে তুমি যাবেই যে তোমার সন্তানের মা হবে। আমাকে তুমি পরিত্যাগ করবে। আমাদের যা কিছু দিয়ে হয়ে থাকে তা কিবে ভেঙে যাবে। কেমন, ঠিক বলেছি কি না?'

হারীত সাড়া দেয় না। তার মুখ দিয়ে কথা সরে না। তিনি আরো ধীরে ধীরে বলে যান, 'বিবাহ না করে বিবাহিতের মতো আচরণ, এ আমি ভাবতেই পারিনে ডিয়ার। তোমার কামনা পূরণ করা আমার সাধ্য নয়। আমি অক্ষম।' তার চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে যায়। অন্ধকারে দেখা যায় না।

এবার হারীতের মুখ ফোটে। 'আমাকে বিশ্বাস করো, ডার্লিং। আমি তেমন কোনো অভিপ্রায় নিয়ে আসিনি। আমি জানি আমার দৌড় কতদূর। তা ছাড়া আমারও তো পৌরুষের অহঙ্কার আছে। যে নারী আমাকে কামনা করে না আমিই বা কেন তাকে কামনা করি? এ ছাড়া আর যা বলেছ তা আমি মানি।'

তিনি ক্ষমা চেয়ে বলেন, 'তোমার কোমল স্পর্শ আমার ভালো লাগে। তা বলে তোমাকে জাগিয়ে রাখতে পারিনে। আচ্ছা, তুমি আমার পাশে এক মিনিট শুতে পারো।'

ওর চেয়ে কাছাকাছি ওরা কোনোদিন হয়নি, ও হবে না। দু'জনের জীবনের ওটি একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। আত্মার মিলন ওর চেয়ে বেশীদূর যায় না।

॥ তেইশ ॥

চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাহায় গিয়ে জোন তাঁর বন্ধু মিলাডা রিপকার ওখানে ওঠেন। ফ্ল্যাটে জায়গা থাকলে ভদ্রমহিলা হারীতকেও অতিথিরূপে নিতেন। ভারতের প্রতি তাঁর অনেকদিনের শ্রদ্ধা। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের প্রতি। কবিকে তিনি দর্শন করেছেন।

মহাযুদ্ধ যখন বাধে রিপকারা তখন লণ্ডনে। স্বামীকে ধরে নিয়ে যুদ্ধকালীন আটক-বন্দীদের সঙ্গে রাখা হয়। কোলের ছেলে নিয়ে ফ্রাউ রিপকা পড়েন অথই জলে। ইস্কোপ করে বিয়ে, সাহায্যের সব ক'টা রাস্তা বন্ধ। বেহালা বাজিয়ে রোজগার করা শত্রুর দেশের মেয়ের সাধ্য নয়। সঙ্গীতের জাতিভেদ নেই, কিন্তু এমন দিনকাল যে ইংরেজের পক্ষে বাখ্ বেঠোফেন শোনাও নাকি দেশদ্রোহ। ওসব নাকি হূন সঙ্গীত।

সেই দুর্দিনে জোন ও তাঁর বন্ধুরা যদি সহায় না হতেন মিলাডা হয়তো আত্মহত্যা করে দারিদ্র্যজাল থেকে উদ্ধার পেতেন। দুর্যোগেরও অন্ত আছে। কিন্তু বন্দীশিবির থেকে মুক্তি পেয়ে স্বামী রোবার্ট রিপকা আরেকটি নারীর সঙ্গে আমেরিকায় পালিয়ে যান। হতভাগিনী মিলাডা শিশুপুত্র কারেলকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন ও অতি কষ্টে প্রতিষ্ঠিত হন। এখন তাঁর সেই ছেলে বড়ো হয়েছে। সেও বেহালা বাজায়।

ইংলণ্ডে থাকতে একরাত্রেই তার সব চুল সাদা হয়ে যায়। এখন কিন্তু কুচকুচে কালো। কলপ না মাখলে নাকি ছাত্র জুটবে না। বেহালার ছাত্রী আর ক'জন।

একদিন রিপকাদের ফ্ল্যাটে ডিনারের পর হোটেলে শুতে যাবে হারীত এমন সময় টুপুরটাপুর বৃষ্টি। সঙ্গে রেনকোট ছিল না। বর্ষাকাল নয় বলে লণ্ডন থেকে বেরোবার সময় বুদ্ধিমানের মতো আনেনি। জোন তাঁর নিজের কোটটা তার গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বলেন যে, রাত্রে কেউ লক্ষ করবে না ওটা মেয়েলি কোট। পরের দিন সকালবেলাও বৃষ্টি। ব্রেকফাস্টের জন্যে রিপকাদের ওখানে যাবার সময় কী করবে, জোনের কোটটাই চাপায়।

দু'কানকাটার মতো প্রকাশ্য দিবালোকে মেয়েলি কোট পরে চলা সেই রানী গোডিভার কাহিনী মনে করিয়ে দেয়। সান্ত্বনা এই যে পথটা সংক্ষিপ্ত। পথচারী বা দু'ধারের অধিবাসী কেউ মুখ টিপে হেসেছে কি না হারীত অত লক্ষ করেনি, কিন্তু বাড়ীর তরুণী মেয়ের সহাস্য দৃষ্টির কাছে হেঁট হয়ে যায়।

নাঃ। বোহিমিয়ার লোক বোহিমিয়ান নয়। নতুবা হারীতকে লরেল দিয়ে বলত, তুমিই সত্যিকার বোহিমিয়ান।

বহু শতক পরে স্বাধীনতা ফিরে পেয়ে চেকরা ও স্লোভাকরা অসাধারণ কর্মিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে। সব চেয়ে বড়ো কথা তারা মনে প্রাণে নবীন। জার্মান ফরাসী ইংরেজ তাদের তুলনায় ক্লান্ত। দেশটা কিন্তু প্রাচীন। প্রাহার দুর্গ আর গির্জা তার সাক্ষ্য দেয়। পাষাণপিহিত অসমতল পথঘাট। চড়াই আর উৎরাই জোনের পক্ষে পীড়াকর।

প্রাহা থেকে উল্টোপথে বাভেরিয়ার ঐতিহ্যময় নগর ন্যুর্নবার্গ। মধ্যযুগ যে কত সুন্দর ছিল তার নীরব নিদর্শন। চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রাহার মতোই পাষাণপিহিত বন্ধুরগাত্র। সিঁড়ি বেয়ে এক রাস্তার থেকে আরেক রাস্তায় উঠতে হয়। বেচারি জোন। উৎসাহের অনুরূপ স্বাস্থ্য যদি থাকত।

ড্যুরার ভবনে গিয়ে ওরা সেকালের জার্মানীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসে। একালেও ওদেশে তার দোসর জন্মায়নি। আর মাইস্টারসিঙ্গার হানস সাখস্। ভাগনার যাকে নিয়ে অপেরা লিখেছেন। তারই বা দোসর কোথায়? তার স্মারক গৃহে গিয়ে তাকেও ওরা শ্রদ্ধা জানায়। জোন মুখে মুখে বলেন অপেরার গল্প।

এরপর দু'জনের দুই দিকে যাত্রা। হারীতকে প্রত্যাবর্তন করতে হয় লণ্ডনে। সাময়িকভাবে। সেই অবসরে জোন পুনর্দর্শন করবেন ভিয়েনা। সেইখানেই তাঁর সবচেয়ে বেশী বন্ধু আর সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ বেঠোফেন ও শুবার্ট সেখানকার হাওয়ায়।

লণ্ডনের আর সে টান নেই। মন বলছে, যাওয়াই ভালো। যাওয়াই ভালো। চল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল। যে কাজের জন্যে সে এত দূর দেশে এসেছিল, এতদিন ছিল সে কন্ট্রাক্টের কয়েকের মধ্যেই সারা হয়ে যায়। কাভেনাণ্টে স্বাক্ষর করে সে এখন পুরোদস্তুর চাকুরে।

সই করবে কি করবে না দু'বছর ধরে ভেবেছে। না করলে লোকে ভুল বুঝত। ভাবত সে ফেল করেছে। করলেও লোকে ভুল বুঝবে। ধরে নেবে সে দাসখৎ লিখে দিয়েছে। মনটাকে সে অনেক করে বুঝিয়েছে যে, তুই অন্তত বোঝ। আপনি ঠিক থাকলে কেউ তোকে বেঠিক করতে পারবে না। যেদিন দেখবি তা সম্ভব নয় সেদিন বেরিয়ে পড়বি। আরো আগে, যদি আর কোনো জীবিকায় সৃষ্টির অবকাশ পাস। কিংবা যদি সৃষ্টিই হয় জীবিকা।

বাকী থাকে বন্ধুজনের সঙ্গে বিদায়সম্ভাষণ। সবাই বলে পুনর্দর্শনায় চ। কিন্তু কে জানে কবে আর কোথায়। জীবনে এভাবে একনীড় হওয়া একটি দুর্লভ সৌভাগ্য। লণ্ডনের এ দুটি বছর বন্ধুপ্রীতির সুধায় গেছে ভরে।

এবার যদিও সে অন্যত্র উঠেছে তবু মিসেস ব্যাসেটের সঙ্গে তার অন্তরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এই প্রৌঢ়া তাকে সুখে রাখার জন্যে কম পরিশ্রম বা কম খরচ করেননি। এমন নিঃস্বার্থ মানুষ সে জীবনে অল্প দেখেছে। যেমন মিষ্টি তাঁর

কথা তেমনি মিষ্টি তাঁর স্বভাব। গভীর শোক পেয়ে তিনি স্বামী ও কন্যার জন্যে বেঁচে আছেন।

'গুড বাই, মিসেস ব্যাসেট। মাই গুড সামারিটান।' বলে হারীত তাঁর হাতে ঝাঁকা'ন দেয়। আর শোনে, 'গড ব্লেস ইউ, মিস্টার নিয়োগী।'

হ্যাম্পস্টেড হীথ আর কেনউড বলে তার আরো দুই বন্ধু ছিল। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে সময় পায় না। বাই বাই, হ্যাম্পস্টেড হীথ। বাই বাই, কেনউড।

লণ্ডন থেকে মিলান চব্বিশ ঘণ্টার মামলা। চ্যানেল পার হয়ে ফ্রান্স ও সুইটজারল্যাণ্ডের বুকের উপর দিয়ে, কিন্তু প্যারিসকে একপাশে রেখে। তার জন্যে খেদ থেকে যায়। হারীতের চোখে জোন ছাড়া আর কেউ নেই। পকৃতির দিকে একরকম চোখ বুজে থাকে।

ও যেমন জোনের অভিমুখে যাচ্ছে তেমনি জোনও আসছেন তার অভিমুখে। দেখা হবে মিলানে। সে জপতে জপতে চলেছে, দেখা হবে মিলানে। দেখা হবে মিলানে এই যে ক'দিন দেখা হয়নি এ যেন একটা যুগ।

বকুলকে তার আর মনে পড়ে না। সে আর অতীতের বন্দী নয়। জোনের সঙ্গে পরিক্রমা করতে করতে সে মুক্ত হয়েছে বিশল্য হওয়া অবশ্য অত সহজ নয়। তার জন্যে সৃষ্টির কাজ করতে হবে নিরলস নিষ্ঠার সঙ্গে। কে জানে কতকাল ধরে! কিছু একটা গড়ে তুলতে হবে। সেটা ছোট কিছু নয়। তা নিয়ে মেতে থাকতে হবে বুঁদ হতে হবে। তন্ময় হতে হবে।

প্রথমে চাই ধ্যান। ধ্যান এক আধদিনের ব্যাপার নয়। বছরের পর বছর গড়িয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। স্থৈর্য অভ্যাস করতে হবে। অশান্ত অস্থির যার মতি সে কেমন করে ধ্যান করবে, কেমন করে গড়বে?

ইটালী। স্বপ্নের ইটালী। এই সেই ইটালী। হারীত বাণের আল্পস ভেদ ক'রে সিমপ্লঁ সুড়ঙ্গপথে ইটালী প্রবেশ করে। ডোমোডসোলা হয়ে মিলান যেতে পথে পড়ে বিখ্যাত সেই সব হ্রদ। সূর্যের প্রখর আলোকে নীল যেন আরো নীল দেখায়।

কিন্তু নতুন দেশ দেখে যত আনন্দ তার চেয়ে বেশী আনন্দ পুরাতন মানুষকে দেখে। জোন ও হারীতের সেই আনন্দ মিলানকে দ্বিগুণ আনন্দের করে। আর ওরা এক হোটেলে ওঠে, এক সঙ্গে খায়-দায় বেড়ায়। মাঝখানের পৃথক অস্তিত্ব মাথা হয়ে যায়।

লেওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা প্রাচীর চিত্র 'যীশুখ্রীস্টের শেষ ভোজন' ম্লান হয়ে এসেছে। কালের কবল থেকে কবিতা বাঁচলেও বাঁচতে পারে, চিত্রের রূপ ও বর্ণ ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসে। কিন্তু যে কদিন সে বাঁচে অপরকে বাচায়। পরম্পরার মধ্যে সে বাঁচে। বহমান জীবনস্রোতের মধ্যে সে বহমান হয়। সেই তার অমরত্ব।

ভেরোনা হয়ে ভেনিস। সান মার্কো। সেই সব পায়রা। রাস্তার বদলে কেনাল। গাড়ীর বদলে গন্দোলা। ভেনিসের তুলনা ভেনিস। যেমন প্যারিসের তুলনা প্যারিস। এর প্রজাতন্ত্রী ঐতিহ্য প্যারিসের চেয়েও পুরোনো।

ভেনিস থেকে রোম। চিরন্তন নগরী। রোমান প্রজাতন্ত্রের, রোমান সাম্রাজ্যের, রোমান ক্যাথলিক চার্চের, রোমান কমিউনের প্রতিষ্ঠাত্রী রোম। জোন আর হারীত সারাদিন ঘোরাঘুরি করেও রোমের কূল পায় না।

মাইকেল এঞ্জেলোর আঁকা সীলিং চিত্র। ঈশ্বর আদমের জীবন্ন্যাস করছেন। রাফেলের আঁকা প্রাচীরচিত্র। বয়স তখন তাঁর পঁচিশ। হায়, হারীত, তোমার পঁচিশ বছর বয়সে তুমি কী করলে! সৌন্দর্যলোকে তোমার বিহার, কিন্তু তোমার পদচিহ্ন কোথায়!

মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া মোজেস। শিল্পী জীবন্ন্যাস করেছেন মর্মর শিলায়। প্রাচীন ভারতীয় ঋষির সঙ্গে মেলে। সে ছিল এক যুগ যখন প্রোফেট বা ঋষিরা পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন করতেন, পরবর্তী কালের সাধুসন্তের মতো অর্ধাঙ্গিনীহীন অর্ধাঙ্গ জীবন নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের জীবনদর্শনে এই যে গুরুতর বিভেদ এটা যখন অগ্রগতির অন্তরায় হয় তখন আসে রেনেসাঁস। আধুনিক জীবনদর্শন ভূমিষ্ঠ হয়।

ফ্লোরেন্স। দান্তে বিয়াত্রিসের ফ্লোরেন্স। রাফেল লেওনার্দো মাইকেল এঞ্জেলোর ফ্লোরেন্স। লৌকিক ও অলৌকিকের প্রয়াগ। পার্থিব ও অপার্থিবের সঙ্গম। সৌন্দর্য যার পথের ধূলায় ফেলাছড়া যাচ্ছে। যেটাই কুড়িয়ে নেবে সেটাই শিল্প।

'এই আমার ঠাঁই। এইখানে ইচ্ছা করে অনন্তকাল থাকতে। জোন, তোমারও কি ইচ্ছা করে না? বল তো জাহাজের প্যাসেজ ক্যানসেল করি। তুমি আঁকবে, আমি লিখব। চলে যাবে।' হারীত জেগে স্বপ্ন দেখে।

'ফুল অফ আর্ট!' জোন হেসে উড়িয়ে দেন।

'যেটা হলে ভালো হতো সেটা কেন হয় না, বিধাতার সঙ্গে এই নিয়ে আমার অনবরত কলহ। এখানে থাকলে আমিও একখানা ডিভাইন কমেডি লিখতে পারতুম।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে ডিভাইন কমেডি লেখা হয় নির্বাসনে। দান্তে তাঁর জীবদ্দশায় ফ্লোরেন্সের ছায়া মাড়াননি। মৃত্যুর পর তাঁকে সমাধি দেওয়া হয় রাভেনায়। ফ্লোরেন্সের লোক এখনো তাঁর শবকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। যদিও কবর খুঁড়ে রাখা হয়েছে তখন থেকেই। হিউম্যান ট্র্যাজেডি।'

ফ্লোরেন্স হারীতকে প্রেরণা দেয় সৌন্দর্যলোকে আপনার স্থান করে নিতে। বাসস্থান নিয়ে মাথা না ঘামাতে। সৌন্দর্যলোকই তার বাসস্থান।

॥ চব্বিশ ॥

পরের দিন প্রয়াণ। শুধু রোম থেকে নয়, ইউরোপ থেকে। মার্সেলসে জাহাজ ধরতে হবে হারীতকে। তার জন্যে ভোরে উঠে এক্সপ্রেস ধরতে হবে।

সকাল সকাল শুতে যাবার কথা। হারীত বলে, 'জোন, তোমার ঘরে আসতে পারি ?'

'তাহলে এক কাজ করা যাক। আমার ঘরেই দু'জনের জন্যে সাপার দিতে বলি। রাত এগারোটা পর্যন্ত কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না।'

রোম শহরটাই একটু ঢিলেঢালা। আর রাত এগারোটা তো সবে সন্ধ্যা। হোটেলের অতিথিরা বারোটার আগে হোটেলে ফেরার নাম করবে না।

'সেই যে একটা কথা আছে, মধুরেণ সমাপয়েৎ। ফ্লোরেন্স হচ্ছে সেই মধুর। রাভেনার জন্যে আমার খেদ নেই। তোমার আছে, জানি। অবশ্য ইচ্ছা করলে এ জাহাজে যাওয়া বাতিল করতে পারতুম, কিন্তু পরের জাহাজে বার্থ পাওয়া আমার ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়। ভারতগামী জাহাজে এখন বিষম ভিড়।'

'তোমার জন্যেই রাভেনার কথা ভাবছিলুম, আমার জন্যে নয়। আমি তো একবার দেখেছি। তুমি যদি সময় করতে পারতে তাহলে সেই হতো মধুর সমাপ্তি।'

'ইটালীর মধু অত অল্পে ফুরোবার নয়, জোন। নেপলস্ দেখা হলো না। 'কিন্তু দেখতে ভয় করে। কে জানে যদি মরে যাই। জানো তো ওরা বলে, সী নেপলস অ্যাণ্ড ডাই।' হারীত হাসে। জোনও।

'কাপ্রি দেখা হলো না, সেটাও কম আফশোসের কথা নয়। কিন্তু আমাদের এ যাত্রার প্রোগ্রাম নিসর্গ দর্শনের নয়। আমরা চেয়েছি মানুষের সৃষ্ট সৌন্দর্য দেখতে। যাতে আমরাও সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রেরণা পাই। আমার ভালো লাগছে ভাবতে যে, তুমি সে প্রেরণা পেয়েছ। এবার আমি দেখতে চাই তুমি কী সৃষ্টি কর। বাংলা জানি নে, সেই যা দুঃখ।'

'আমি যে সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছি এটা সত্য। এইটেই আমার ইউরোপ প্রবাসের ফলশ্রুতি। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রেম। ভগবানের অশেষ করুণা।'

হাতে হাত রেখে দু'জনে পাশাপাশি বসে। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি।

জোন বলেন, 'ভালোবাসা পাওয়া যেমন তাঁর করুণা, ভালোবাসতে পারাও তেমনি তোমার হৃদয়বত্তা। জানি নে এ হৃদয় তোমার কতদিন থাকবে। একে রাখতে পারা কঠিন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের চাপে ও তাপে হৃদয়বানও ক্রমে ক্রমে হৃদয়-

হীন হয়ে ওঠে। তোমার বেলা যেন তা না হয়।'

'তোমার বেলা যখন হয়নি তখন আমার বেলাও হবে না, ডিয়ার।'

'ডারলিং, তুমি যা বললে তার জন্তে তোমাকে ধন্তবাদ। আমার হৃদয় যদি এখনো নরম থাকে তবে তার জন্তে আমাকে কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। কঠোর হৃদয় হলে আমি এত কষ্ট পেতুম না। আমার অনুভবশক্তিটাই অসাড় হয়ে যেত। যাদের তা হয় তারা তাদের সৃষ্টিতে উষ্ণতা সঞ্চার করতে পারে না। তাদের হৃদয় যেমন ঠাণ্ডা তাদের আঁকা ছবিও তেমনি ঠাণ্ডা।'

মনে আছে একবার লেডী মিডলটন হারীতের হাতে ঝাঁকানি দিতে গিয়ে বলেন, ওঃ। কী ঠাণ্ডা আপনার হাত! এর উত্তরে হারীত স্ফূর্তি করে বলে, কিন্তু আমার হৃদয়টা উষ্ণ। তখন তিনি বলেন, আমাদের আদর্শ হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথা আর উষ্ণ হৃদয়। মিস্টার নিয়োগী, দেখবেন যেন উল্টোটি না হয়।

'মাথা গরম শিল্পীর পক্ষে দোষের নয়, হারীত। কার যে মাথা ঠাণ্ডা তা তো সহসা মাথায় আসছে না। কিন্তু হৃদয় যাদের ঠাণ্ডা, তাদের সৃষ্টিও তেমনি ঠাণ্ডা। সেইজন্তে তোমাকে আমি বলব হৃদয় উষ্ণ রাখতে। আর যে চাকরিতে তুমি যোগ দিচ্ছ সে-চাকরি তোমাকে শেখাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে।'

'তোমার মা'র অনুশাসন আমার মনে থাকবে, ডিয়ার।'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখতে শেখাও একটা উঁচুদরের শিক্ষা। চাকরি থেকে যদি এ-শিক্ষা হয় তবে চাকরি কিছু নির্জলা মন্দ নয়। ওর জন্তে তোমাকে সব সময় সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হবে না। সবাই তোমার গুরু। সকলেরই কাছ থেকে শিখবে। জীবনের শিক্ষানবীশী সারাজীবন ধরে চলবে। জীবিকার শিক্ষানবীশী না হয় দু' বছরেই শেষ।'

'তাই বলে সারাজীবন বিকিয়ে দিতে পারব না। বড়জোর পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরের জন্তে আমার একটা পরিকল্পনা আছে। দেশে ফিরে গিয়ে শুরু করে দেব। জাহাজে বসে তার ছক কাটা হবে। কোথায় বিশ্রাম? আমার কি বিশ্রামের তর আছে? জাহাজ শুধু আমার শরীরকে বিশ্রাম দেবে। মন আমার দৌড়ের ঘোড়া। আরো জবর দৌড়ের জন্তে তৈয়ার হচ্ছে।' হারীত চুপ করে বসে থাকতে পারে না। উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ায় ও রোমের লোকের নিশাভিসার অবলোকন করে।

জোন তার পাশে এসে দাঁড়ান। 'ডারলিং, আমার এত ভালো লাগছে শুনতে। তোমাকে দেখে মনে হতো কী এক অনির্দেশ্য ব্যথায় কাতর। তারপর তুমি নিজেই প্রকাশ করলে তোমার গোপন ব্যথা। তোমার শল্য। আমার ভারী ভাবনা ছিল যে, তুমি তোমার অতীতের টান থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। এখন একটু আশা হচ্ছে, তোমার ভবিষ্যৎ তোমাকে আরো জোরে টানবে।'

'অতীতের টান এমনিতেই ক্ষয় হয়ে এসেছে, ডিয়ার। তুমি জানো কার কল্যাণে। তুমি যখন থাকবে না, তখন আশঙ্কা হয় আর কেউ আসবে।' হারীত ভয়ে ভয়ে বলে।

জোন হেসে বলেন, 'আশঙ্কা কেন? আশা। আমি যে মনে মনে প্রার্থনা করছি যেন আরেকজন এসে তোমার ভার নেন। তোমার দেখাশুনার দরকার।'

হারীত সে হাসির ভাগ নেয় না। গম্ভীরভাবে বলে, 'তার মানে আবার সেই বেদনার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। একজনকে দেওয়া হৃদয় ফিরিয়ে নিয়ে আরেকজনকে দিতে হবে। আবার সেই অন্যায়বোধ। যে আমাকে ভালোবাসে তাকে পরিত্যাগ। একনিষ্ঠতার আদর্শে জলাঞ্জলি। না, ডারলিং। তার চেয়ে অনেক ভালো দান্তের মতো বিয়াত্রিসের প্রতি একানুগত্য। একটি প্রেয়সী নারীকে আজীবন ভালোবেসে যাওয়া। তোমাকে যখন চিনেছি, তখন আমার জীবনের ধ্রুবতারাকেও চিনেছি।'

জোন তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'তোমাকেও আমি চিনেছি। অশরীরী একানুগত্য তোমাকে দিয়ে হবে না। দান্তেও বিয়ে করেছিলেন। না করলে তিনি নষ্ট হয়ে যেতেন। নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলেন। সেটা তো ভালো নয়। তুমি তো গোড়াতেই বলে রেখেছ যে তুমি সন্ন্যাসী হবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ বোহিমিয়ান হবে। আমি তোমাকে সন্ন্যাসী হতেও বলব না, বোহিমিয়ান হতেও না। তুমি যদি আর কারো ভালোবাসা পাও তো তাঁকে বিয়ে করে ঘরসংসার পেতো। আমি কিছু মনে করব না।'

হারীতের চোখ দিয়ে জল ঝরে। 'তুমি কেন বুঝছ না যে, আমি যদি বিয়ে করি তো পাঁচ বছর পরে বেরিয়ে আসতে পারব না? ছেলেমেয়ে হলে হাতে পায়ে বেড়ী পড়বে। তখন আমার স্বাধীনতার কী হবে?'

জোন তার কাঁধে মাথা রেখে বলেন, 'ছেলেমেয়ে না হলে কি তুমি সুখী হবে? তুমি না একদিন আমাকে বলেছিলে যে তোমার ছেলের নাম রাখবে প্রেম আর তোমার মেয়ের নাম প্রজ্ঞা? আমস্টারডামের মিউজিয়ামে জাভার প্রজ্ঞাপারমিতা দেখে তোমার মেয়ের নাম তোমার কল্পনায় আসে।'

হারীতের মনে ছিল। 'বেচারি প্রেম আর প্রজ্ঞা! কোনোদিন কি ওরা জন্ম নেবে! ওদের মার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তো। কোথায় আছে সে নারী! কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সে আসবে, ভালোবাসবে, মা হতে রাজী হবে, প্রেম জন্ম নেবে তার কোলে, প্রজ্ঞা তার কোল আলো করবে। ভবিষ্যতের দূরতম দিগন্তেও আমি সে নারীর আঁচলের রেখাটুকুও দেখতে পাইনে।'

জোন পরিহাস করে বলেন, 'কে যেন একটু আগে আশঙ্কা করছিল যে, আমি না থাকলে আর কেউ আসবে। হারীত নয় তো?'

'সে আশঙ্কাও অমূলক নয়, জোন। একজন বলেছিল ও শবরীর মতো প্রতীক্ষা করবে।'

হাবীতের হাত ছেড়ে দিয়ে জোন বলেন, 'ও প্রসঙ্গ থাক। আমার ধারণা ছিল তুমি ওর কাছে চিরবিদায় নিয়ে এসেছ। তাহলে আশঙ্কা ওর থেকে কেন? দেশে কি আর কোনো মেয়ে নেই?'

ছিল। এখন নেই। পার্বতীর বিয়ে হয়ে গেছে। খবরটা লণ্ডন ছাড়বার সময় পাওয়া গেল বন্ধুদের মুখে। হারীত কিন্তু জোনকে ও কথা বলে না।

সাপার এসে হাজির হয়। কিন্তু খিদে কোথায় যে কেউ খাবে। একটু আগে ডিনার খেয়ে উঠেছে।

জোন এবার তাঁর বিছানায় গিয়ে হেলান দিয়ে শোন। তাঁর ক্লান্ত লাগছে। হারীত অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে। দূর থেকে।

'কাছে সরে আসতে পারো, ডিয়ার। বিছানার একধারে বসতে পারো।' তাঁর কণ্ঠস্বরে বিরক্তির লেশমাত্র নেই।

'তুমি কিছু মনে করলে না তো, ডারলিং। আজকের দিনে কিছু মনে করতে নেই। মনে রাখতে নেই। মাফ কোরো।' হারীত ব্যবধান রক্ষা করে তাঁর পাশে বসে।

তিনি তাকে টেনে নিয়ে তার মুখমণ্ডল চুম্বনে চুম্বনে ভরে দেন। তাকে প্রতিদানের ফাঁক না দিয়ে বলেন, এই আমার বাণী, এই আমার প্রার্থনা, এই আমার অনুরাগ, এই আমার বৈরাগ্য, এই আমার অক্ষমতা, এই আমার ক্ষমা চাওয়া।'

হারীত এতগুলির উত্তরে একটিমাত্র চুম্বন মুদ্রিত করে। সেটি যুগ যুগ ধরে। তারপর একটিমাত্র কথা বলে ফিসফিস করে। 'ধন্যবাদ।'

কিছুক্ষণ পরে শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় ও বেশ পরিবর্তন করে শয্যায় লুটিয়ে পড়ে। বহুকাল সে এমন অঝোরনয়নে কাঁদেনি।

সে জানে যে এ বিদায় চিরবিদায়, এ বিরহ চিরবিরহ। সাতসমুদ্র তেরো নদীর দূরত্ব কমে সাত বছরের কি তেরো বছরের হবে। তবু একটুখানি আশার আমেজ লেগে থাকে যে, বেঁচে থাকলে আবার হয়তো দেখা হবে।

॥ উপসংহার ॥

ওই দুটি রূপমুগ্ধ আত্মার মন্দির পরিক্রমা তখনকার মতো সমাপ্ত হলেও কালের কোলে অসমাপ্ত রয়ে যায়। পিছন ফিরে তাকালে মনে হয় ও যেন ওদের স্বপ্নপ্রয়াণ। স্বপ্নযাত্রা। স্বপ্নে একদা ঘটেছিল।

তেমনি ওদের প্রেম বা সখ্য। সুন্দর একটি স্বপ্ন। ওকে দৈনন্দিন জীবনের সংসারযাত্রার পাথেয় করলে ওর থেকে কবিত্ব চলে যেত। বিয়াত্রিস যদি দান্তের বধূ ও ঘরণী হতেন তবে তাঁকে নিয়ে ডিভাইন কমেডী লেখা হতো না। যেটা হতো সেটা হয়তো হিউম্যান ট্র্যাজেডী। একদিক থেকে না হোক আরেকদিক থেকে ট্র্যাজেডীর সম্ভাবনা ছিল বইকি। সেইজন্যে জোন ও হারীতের প্রেমের ওই পরিণতি ওদের বিধুর করলেও ওরা মেনে নিয়েছিল যে বাস্তব দৃষ্টিতে ওই সব চেয়ে ভালো।

এ ছাড়া আর কী হতে পারত। হারীত তার ডেকচেয়ারে গা মেলে দিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে। গাঢ় নীল শান্ত মৌন ভূমধ্যসাগরের দিকে। কোথাও তটভূমির উদ্দেশ নেই। ইউরোপ ইতিমধ্যে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে। সেও কি একটা স্বপ্ন?

আর কী হতে পারত। হারীত ভাবে। জোন একদিন ওকে গ্রাম দেখতে নিয়ে যান। ইংলণ্ডের গ্রাম। সেখানে একরাত কাটিয়ে ফেরবার পথে ওরা জোনের পুরাতন বান্ধবী মডের ওখানে বিশ্রাম করে। জোনের মতো মডও চিরকুমারী। যুদ্ধ তার বিবাহের দুয়ার রুদ্ধ করে। যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা তিনি ফ্লাণ্ডার্সের মাঠে পপি ফুল হয়ে ফুটে আছেন।

মড তাঁর বৃদ্ধ পিতার সেবাযত্ন করেন। তার উপরে আছে পড়াশুনা ও সমাজের কাজ। জীবন একদিক দিয়ে অসার্থক বলে তাঁর অভিযোগ নেই, কারণ অন্যদিক দিয়ে সার্থক। বয়সে অনেক ছোট এক সুইডিশ যুবক কাছাকাছি কটেজে বাস করেন। সুইডেনের নাগরিক হলেও তিনি বলিষ্ঠ নন। হারীতের মতোই দুবলা পাতলা ও তার চেয়েও অসহায়। শুনার যদি মডের হাতে না পড়তেন তো কবে একদিন ক্ষয়রোগে মারা যেতেন। আর নয়তো সমবয়সী শিল্পীদের মতো সঙ্গদোষে বকে যেতেন। তাঁর নৈতিক প্রভাব যুবকটির উপর কাজ করছে। তিনিও তেমনি মডের অনুগত বান্ধব। তাঁর জীবনে অন্য কোনো নারী নেই। ওই একজনই তাঁকে প্রেরণা দেন। সম্পর্কটা সম্পূর্ণ অশরীরী

অথচ সহৃদয়। সেই দান্তে বিয়াত্রিসের মতো।

জোনের বোধহয় কল্পনা ছিল যে হারীতের মতো মিস্টিক কবিও সেই পন্থ বরণ করতে রাজী হবে। তা হলে একসঙ্গে কাজ করতে পারা যেত। একজন চিত্রকলায়, অপর জন কবিতায়। দুজনেই পরস্পরকে এগিয়ে দিতে পারত। হারীত অবশ্য হাতের পাখী হারিয়ে ঝোপের পাখীর জন্যে ঘোরাফেরা করত, কিন্তু জোন ওর জন্যে উঠে পড়ে লাগলে জীবিকা একটা জুটে যেতই। ভারতীয় মহলেও সেরকম দু'একটি কেস ওর জানা।

তা ছাড়া জোনের বাসভবনের দুয়ার তো খোলা থাকতই। অবশ্য থাকবার জন্যে নয়। থাকবার জন্যে কাছাকাছি কোথাও কটেজ বা গ্যারেট বা বোর্ডিং। সেখানে মাথা গুঁজে রোজ একবার জোনের সঙ্গে দেখা করা, কথা বলা, বাগানে বসে কাজ করা। নিজের লেখার তর্জমা পাঠ করে জোনকে শোনানো। তাঁকে দিয়ে শোধরানো। তেমনি করে ইংরেজী কাব্যসংসারে প্রবেশ। কবিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও মিস্টিক মণ্ডলীতে যাতায়াত। মিস্টিকদের সঙ্গে উপলব্ধি বিনিময়।

হারীত কিন্তু সেই পন্থ বরণ করে না। তার জীবনাদর্শ অন্যরূপ। সে মধ্যযুগের মিস্টিক সাধক কবিদের পছন্দ করলেও তাঁদের একজন নয়। যা নয় তাই হতে গিয়ে ইতিপূর্বে একবার হাত পুড়িয়েছে। বকুলের ভালোবাসার ঋণ শোধ করতে। তখন তার ধারণা ছিল সে মধ্যযুগের নাইট। বিপন্না বালা দেখলে উদ্ধার করাই তার স্বধর্ম। মুক্ত করতে গিয়ে প্রেমে পড়ে। প্রেমে পড়ে আপনার মুক্তি হারাতে বসে। শল্যবিদ্ধ হয়ে এমন দুঃখ পায় যে বিশল্যকরণীর অন্বেষণে দেশান্তরী হয়।

একটি নারীর অনুগত হয়ে বঞ্চিতভাবে একটা জীবন অতিবাহিত করাও মধ্যযুগের নাইটদের জীবনাদর্শ। সে যুগের কবি ও মরমীদেরও পন্থ। হারীতের হৃদয়মনের তথা শিল্পীসত্তার বিকাশের উপর এর অপরিসীম প্রভাব। কিন্তু তার রক্তমাংসের শরীর জানে যে প্রকৃতির প্রবহমান স্রোতের উজানে গেলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। মধ্যযুগের অপ্রাকৃত জীবনাদর্শ সেকালেও ছিল স্খলনে পতনে ভরা। যে পথে স্খলন আছে পতন আছে সে পথে কেনই বা চলা? যেটা স্খলন বা পতন নয় সেটাকে স্খলন বা পতন কেনই বা বলা? যেটা পাপ নয় সেটাকে পাপ বলে কেনই বা নরকের ভয়ে মা মেরীর শরণ নেওয়া? রেনেসাঁস নিয়ে আসে নতুন এক জীবনাদর্শ। আধুনিক কালের মানুষ রেনেসাঁসের বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে ও বাড়তে চায়। হারীতও আধুনিক যুগের মানুষ।

তা বলে কি সে জোনের মতো উত্তমা নারীকে ভালোবাসবে না? তাঁর ভালোবাসা দেবতার আশীর্বাদ বলে মাথা পেতে নেবে না? নিশ্চয় ভালোবাসবে, নিশ্চয় ভালোবাসা নেবে। তার হৃদয় এখনো তাঁর কাছে। হৃদয়কে সে তার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারছে

না। হৃদয় পড়ে আছে পিছনে। এগিয়ে চলেছে দেহমন।

হারতে হারতে হারাতে হারাতে হারীত। সেবারকার সমুদ্রযাত্রা বকুলের কাছে হেরে, বকুলকে হারিয়ে। এবারকার সমুদ্রযাত্রা জোনের কাছে হেরে, জোনকে হারিয়ে। সেবারের মতো এবারেও সে পরাজিত। নারীর কাছে পরাজিত। নারীর প্রেমের কাছে পরাজিত। অনুগত থাকলে জয়ী হতে পারত হয়তো, কিন্তু জয়ী হলে দেখত জয়টাও দুঃখের। পরাজয়ের চাইতেও দুঃখের। বকুলের সঙ্গে অসামঞ্জস্য বাড়ত বই কমত না। আর জোনের সঙ্গে বয়সের অমিল দিন দিন অসহন হতো। যৌবন যার পিছনে আর যৌবন যার সামনে তাদের একজনের জোয়ার ও অপরজনের ভাঁটা পরস্পরবিরুদ্ধ।

অতি ঘরন্তী না পায় ঘর। তেমনি, এত প্রেম পেয়েও যে পুরুষ তৃপ্ত নয় বা হবে না তার কপালে প্রেম নেই। ঈশ্বর তাকে দু-দুবার পরখ করে দেখলেন যে সে নারীর প্রেমের অযোগ্য। আর কোনো নারী তাকে ভালোবাসবে না, ভালোবাসলেও জোনের চেয়ে ভালোবাসবে না, জোনের চেয়ে উত্তমা নারী হবে না। জোনকে হারানোর ক্ষতিপূরণ নেই। তবে রূপবতী বা গুণবতী বধূ মিলতে পারে। কিন্তু তা বলে সে আপস করবে না। যেখানে প্রেম নেই সেখানে বিয়ে করবে না। ফলে হয়তো জোনের মতো অবিবাহিত রয়ে যাবে। দশ বছর কি পনেরো বছর বাদে কুমার হারীতের যৌবন গড়িয়ে গেলে তখন জোনের কাছে ফিরে গিয়ে কুমার গুনারের মতো একানুগত্য দুঃসহ হবে না। সেকথা মনে করে জোনের সঙ্গে বর্তমান সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। যতদিন না তৃতীয় একজন এসে মাঝখানে দাঁড়ান।

তৃতীয় একজন? তার জাহাজের সহযাত্রিণীদের মুখের দিকে তাকাতেও তার ডর। পাছে জোনের ছবিখানি ম্লান হয়। তার ডেকচেয়ার ছেড়ে সে উঠতে চায় না। উঠলেও একা একা পায়চারি করে। কিংবা সৌরীনের সঙ্গে। ও ছেলেকে দেখলে আর চেনা যায় না। এতকাল সে ছিল বিরহী যক্ষ। এখন অলকার পথে সবেগে চলেছে। এবার তার মুখে হাসির ফোয়ারা। তার জায়ার সঙ্গে দেশের ব্যবধান কালের ব্যবধান কমে আসছে। পক্ষান্তরে হারীতের প্রিয়ার সঙ্গে দেশকালের ব্যবধান সেই অনুপাতে বেড়ে যাচ্ছে। তাই একজনের হর্ষ, অপরজনের বিষাদ।

বিষাদ থেকে মনে হতে পারে সে বিশল্য নয়। না, সেই শল্যবিদ্ধ ভাবটা আর নেই। থাকে যদি তবে প্রেমের দরুন নয়, আর্টের দরুন। জোনের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সে নতুন একটা দায় মাথায় নিয়েছে। সৌন্দর্যের দায়। সিষ্টিন মাডোনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে কথা দিয়েছে সে সৌন্দর্যের দায় গ্রহণ করবে ও বহন করবে। যাবজ্জীবন শেলের মতো বিঁধে থাকবে এ দায়। সেইজন্যে সে ঠিক বিশল্য নয়। তবু সেবারকার তুলনায় বিশল্য।

বকুলের জন্যে তার সে নিগূঢ় বেদনা করে অন্তর্হিত হয়েছে। সে আগুন নিবে ছাই হয়ে গেছে। শুধু আশঙ্কা আছে, বকুলের আগুন যদি নিবে ছাই না হয়ে গিয়ে থাকে তবে হারীতকে দেশে ফিরে পেলে আবার জ্বলে উঠতে কতক্ষণ? বকুল যদি সত্যি সত্যি মুক্তি পায় ও একদিন হারীতের একলা ঘরে এসে উপস্থিত হয় তা হলে ওদের ওই ভাইবোন সম্পর্কের বালির বাঁধ কতক্ষণ টিকবে? তখন বিশল্যকরণী কোন্ কাজে লাগবে? আবার তো সেই পুরাতন শল্য বহন করে দিন যাবে। তা হলে কি আবার দেশ ছেড়ে পলায়ন। তা কি হয়। দেশে ফিরে গিয়ে কত কী সৃষ্টি করার ধ্যান আছে মানসে। দেশের মানুষের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা না পাতালে কি সেসব রূপায়িত হবে? শিল্পীর শিকড় তার স্বদেশের মাটিতে। ডালপালা যদিও স্বকালের আকাশে।

ওই জাহাজে ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যমণি ছিলেন মিসেস মোহনলাল বলে এক পাঞ্জাবী মহিলা। মধ্যবয়সিনী। তন্বী। কিন্তু প্রিয়দর্শনা নন। স্মার্ট। একদিন হারীত শুনতে পায় তিনি নাকি তার উপর বিষম বিরক্ত। সে নাকি একমাত্র ভারতীয় যাত্রী যে তাঁর দিকে ফিরে তাকায় না। তাঁকে কোর্ট করে না। ছেলেটা কেন অমন আনসোশিয়াল, কেন অমন কুনো? খেলাধুলা আমোদ প্রমোদ গল্পগুজব কিছুই কি ওর ভালো লাগে না? বিমলকীর্তির মুখে এসব শুনে হারীত লজ্জিত হয়। তৎক্ষণাৎ ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও ক্ষমা চায়।

ভদ্রা ওকে দুকথা শুনিয়ে দেন। রাগ পড়লে বলেন, 'একবার ভেবে দেখেছেন কি কটা দিনের জন্যে আমরা এক নৌকায়? তারপরে কে কোথায় ছিটকে পড়বে, জীবনে আর কখনো দেখা হবে না। এই কটা দিন পরস্পরকে দেখা উচিত নয় কি?'

সত্যিই তো। হারীতের মনে পড়ে যায় টলস্টয়ের সেই প্রসিদ্ধ কাহিনী। বর্তমান ক্ষণটিই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। উপস্থিত মানুষটিই সব চেয়ে প্রয়োজনীয় মানুষ। আর সব চেয়ে দরকারি কাজ হচ্ছে তার কিছু উপকার করা।

এরপরে ওকে দেখা যায় মক্ষিরানীর মজলিসে, বড় টেবিলে, ডেক টেনিসের আখড়ায় বাজী উজীর মারার আড্ডায়। সেও তার দশজনের মতো আলাপী ও মিলাপী। জোন একবার বলেছিলেন 'ম্যান অ্যাবাউট টাউন'। ও যখন ফুর্তি করার জন্যে কোমর বাঁধে তখন ওর চেহারা বদলে যায়। কখন ওর কোথায় বিষাদ। কোথায় বিরহব্যথা! কোথায় শল্য। দেখতে দেখতে মিসেস মোহনলালের সঙ্গে ওর দিব্যি ভাব জমে যায়।

এডেনের পর জাহাজ যেন ভাঙা হাট। মক্ষিরানী উদাসকণ্ঠে বলেন, 'আর ভালো লাগছে না, মিস্টার নিয়োগী। বাচ্চাদের জন্যে মন কেমন করছে।'

শেষকালে হারীতই তাঁকে আশ্বাসনা জোগায়। 'আপনার যাত্রা তো সারা হয়ে এল, মিসেস মোহনলাল। আমার যাত্রাই অশেষ।'

তাঁর জিজ্ঞাসু চাহনির উত্তরে বিশদ করে, 'এই সমুদ্রযাত্রার পূর্বে আরো একটি যাত্রা ছিল। সেটি রূপলোক যাত্রা। দুটি রূপমুগ্ধ আত্মার। সে যাত্রা এখনকার মতো সমাপ্ত হলেও কালের কোলে অসমাপ্ত রয়েছে। কে জানে কবে আবার খেই তুলে নিতে হবে।'

'ওঃ। আপনার হৃদয় আপনি পিছনে রেখে এসেছেন। সেইজন্যে আপনাকে অমন উদাসীন দেখতে।' তিনি যেন এতদিন পরে হারীতের ব্যবহারের একটা অর্থ খুঁজে পান।

'আপনি আমাকে ভুল বুঝেছিলেন, বহিন।' হারীত এই প্রথম বোন বলে ডাকে।

'তা হলে তো আমারি মাফ চাইবার কথা, ভাই।' তিনি স্নেহভরে বলেন।

জাহাজের শেষ রাতটিতে অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটিয়ে তিনি একে একে সবাইকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাবিনে যান। সকলেরই মুখে হাসি, চোখে জল। আহা বড়ো আনন্দে বয়ে গেল ক'টা দিন। মনে থাকবে এর রেশ।

মধ্যরাত্রে যে কয়েকজনকে ডেকে পায়চারি করতে বা ডেকচেয়ার পেতে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে দেখা যায় হারীত তাঁদের একজন। বেশীর ভাগই ইংরেজ। ইউরোপের প্রতিভূ এই জাহাজ। এর থেকে বিদায় যেন ইউরোপ থেকে দ্বিতীয় বিদায়।

হারীত তার নিজের অতীতকে বিদায় দিতে ও ভবিষ্যৎকে অভ্যর্থনা করতে ব্যাপৃত। একথা ওকথা ভাবতে ভাবতে তার মনে উদয় হয় এই চিন্তা যে, জীবনকে নিয়ে কত কী করতে পারা যায়, যদি ওই একটি জিনিস ঠিক হয়ে যায়। কে কার পুরুষ। কে কার নারী।

সে কার পুরুষ? কে তার নারী? সে নারী যদি জোন না হয়ে আর কেউ হয়ে থাকে।

না না। হারীত পুলক দমন করে আবেগে উদ্বেল হয়। না, না ওই রূপলোক যাত্রা সমাপন হয়নি যে। ও কি তবে চিরকালের মতো অসমাপ্ত রয়ে যাবে।

জোনের জন্যে তার মন কেমন করে। তার বিযাত্রিসের জন্যে। কে জানে আবার কবে তার জীবনে আর কোন্ নারীর আবির্ভাব ঘটবে। জোনের চেয়ে তাকে ভালোবাসবে এমন নারী কি এ জগতে আছে না থাকতে পারে। তা হলেও আপনাকে হাতে রাখতে হয় উত্তমা নায়িকার জন্যে। যে নারী তার হাত ধরে তাকে নিয়ে যাবে মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভগৃহে ভগবানের স্পর্শ পেতে। পরিক্রমায় তৃপ্তি কই! তৃপ্তি পরশনে।

—

পরিশিষ্ট

না

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম তিন টাকা

রচনাকাল ১৯৫০-৫১।

উৎসর্গ—অমিয় চক্রবর্তী বন্ধুবরেষু।

প্রথম সংস্করণ ১৩৫৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ কার্তিক ১৩৫৯

রচনাবলীতে বইয়ের তৃতীয় মুদ্রণ ছাপা হয়েছে।
লেখকের মতে মনপবন ও যৌবনজ্বালার মতো না-তেও তিনি নিজেকে প্রক্ষেপ করেছেন অংশত। কিন্তু কাহিনী কাহিনীই। চরিত্রগুলিও কাল্পনিক।

কন্যা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

দাম সাড়ে তিন টাকা

রচনাকাল ১৯৫৩।

উৎসর্গ—শ্রীমান পুণ্যশ্লোক রায় কল্যাণীয়েষু।

প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৬০
দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৬১

সুখ

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।
ভিতরের নামাঙ্কন শ্রীমতী গীতা রায়ের।

দাম পাঁচ টাকা

উৎসর্গ—অমিতাভ ও জয়া রায় যুক্তকরকমলেষু।

রচনাবলীতে বইয়ের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছে।
গ্রন্থের সূচনায় এই কথামুখটি ছিল—তরুণ তরুণী / দুর্লভ এই জীবন / জীবনে মিলন / মিলনে সুখ। // যা পেয়েছ তারে / অর্জন করো বিনয়ে / চির প্রণয়ে / সহাস মুখ।

বিশল্যকরণী

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রকাশক—সুপ্রিয় সরকার

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

মূল্য পাঁচ টাকা

উৎসর্গ—শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু।

=

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

১ম খণ্ডে আছে : উপন্যাস—অসমাপিকা, আগুন নিয়ে খেলা / ভ্রমণকাহিনী—পথে প্রবাসে / প্রবন্ধগ্রন্থ—তারুণ্য

২য় খণ্ডে আছে : উপন্যাস—সত্যাসত্য ১ম খণ্ড : যার যেথা দেশ / সত্যাসত্য ২য় খণ্ড : অজ্ঞাতবাস / ৭টি কাব্যগ্রন্থ

৩য় খণ্ডে আছে : উপন্যাস—সত্যাসত্য ৩য় খণ্ড : কলঙ্কবতী / সত্যাসত্য ৪র্থ খণ্ড : দুঃখমোচন / ২টি গল্পগ্রন্থ

৪র্থ খণ্ডে আছে : উপন্যাস—সত্যাসত্য ৫ম খণ্ড : মর্তের স্বর্গ / সত্যাসত্য ৬ষ্ঠ খণ্ড : অপসরণ / উপন্যাস—পুতুল নিয়ে খেলা

৫ম খণ্ডে আছে : উপন্যাস—রত্ন ও শ্রীমতী [৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ]

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ [পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ]

বিনুর বই [আত্মজীবন ও আত্মশিল্প মূলক]

সংস্কৃতির বিবর্তন [২য় সংস্করণ]

সাহিত্যিকের জবানবন্দী [১ম সংস্করণ]

ছড়া-সমগ্র [২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ]

সাত ভাই চম্পা [নতুন ছড়া সংকলন]

শ্রেষ্ঠ কবিতা [২য় সংস্করণ]

শ্রেষ্ঠ গল্প [২য় সংস্করণ]

না [উপন্যাস]

রত্ন ও শ্রীমতী [উপন্যাস / অখণ্ড সংস্করণ]